

শ্রীকান্ত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

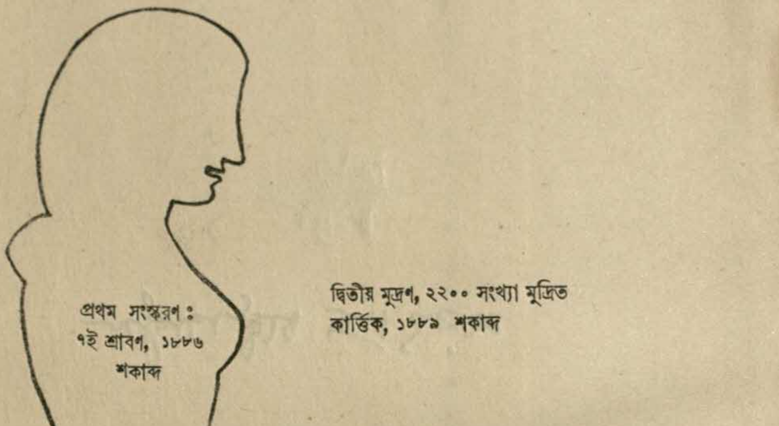


শ্রীকান্ত

(অখণ্ড)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭



দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২২০০ সংখ্যা মুদ্রিত
কার্ত্তিক, ১৮৮৯ শকাব্দ

প্রথম সংস্করণ :
৭ই শ্রাবণ, ১৮৮৬
শকাব্দ

ষোল টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, [১ম ও ২য় পর্ব]
২১১/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি, পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং [৩য় ও চতুর্থ পর্ব]
১৯, গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬

এক

আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্নবেলায় দাঁড়াইয়া, ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা 'ছি-ছি' শুনিয়া শুনিয়া, নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু, কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ 'ছি-ছি'র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেইসব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি-ছি'টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান্ যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল-ছেলে হইয়া একজামিন্ পাশ করিবার সুবিধাও দেন না, গাড়ী-পাল্কী চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া, তাহাকে 'কাহিনী' নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না। বুদ্ধি হয়ত তাহাদের কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তাহাকে সু-বুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এমনি অসঙ্গত, খাপছাড়া—এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া, অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে—সুদীর্ঘদিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ-সকলও থাক্। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই ত বলা হয় না ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটো আছে, সে-ই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দু'টা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত। তা' ছাড়া মস্ত

মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান্ আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দু'টো পোড়া-চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি, ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্ব্বতকে পাহাড়-পর্ব্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া, জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ। কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া-চাহিয়া চোখ ঠিক্‌রাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারো মুখটুকু ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান্ যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে-কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না, জানি না। কারণ বহু বৎসর পূর্ব্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘর-বাড়ী, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না! উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!

ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ'। সন্ধ্যা হয় হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ—ওরে বাবা —এ কি রে! চটাপট্ চটাপট্ শব্দ এবং 'মারো শালাকে, ধরো শালাকে।' কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই তিন। ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না; ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা মস্ত ছাতির বাঁট পটাশ্ করিয়া ভাঙ্গিল এবং আরো গোটা-দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর, উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুলসমান ছোকরা তখন আমার চারিদিকে বূহ-রচনা করিয়াছে—পলাইবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁট—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্‌গতিতে বূহ্যভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সে-ই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশীর মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই চারিটি বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড়। কহিল, ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্ল্লভ হইলেও, অসাধারণ হয়ত নয়; কিন্তু তাহার হাত দু'খানি যে সত্যই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দু'টি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত পড়িত। ইহার পরম সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কস্মিন্‌কালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়।

মিনিট-দু'য়ের মধ্যে তাহার পিঠ-ঘেঁযিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, 'পালা'।

ছুটিতে সুরু করিয়া কহিলাম, 'তুমি'?

সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, 'তুই পালা না—গাধা কোথাকার!'

গাধাই হই—আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—'না'।

ছেলেবেলায় মারপিট কে না করিয়াছে? কিন্তু, পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা—মাস দুই তিন পূর্ব্বে লেখাপড়ার জন্য সহরে পিসিমার বাড়ী আসিয়াছি—ইতিপূর্ব্বে এভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আস্ত দু'টা ছাতার বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাঙ্গে নাই। তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, 'না—তবে কি? দাঁড়িয়ে মার খাবি নাকি?—ঐ, ওই দিক্ থেকে আসছে—আচ্ছা, তবে খুব ক'সে দৌড়ো—'

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌঁছানো গেল ; তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং পথের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে একটা আর ওই ওখানে একটা জ্বালা হইয়াছে। চোখের জোর থাকিলে, একটার কাছে দাঁড়াইয়া আর একটা দেখা যায় না, তা নয়। আততায়ীর শঙ্কা আর নাই। ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা কহিল। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু আশ্চর্য্য, সে এতটুকুও হাঁপায় নাই। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয় ; এম্‌নিভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি রে ?

'শ্রী—কা—ন্ত—'

'শ্রীকান্ত ? আচ্ছা।' বলিয়া সে তাহার পকেট হইতে এক-মুঠা শুক্‌না পাতা বাহির করিয়া কতকটা নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া, কতকটা আমার হাতে দিয়া বলিল, ব্যাটাদের খুব ঠুকেছি—চিবো।

কি এ ?

সিদ্ধি।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সিদ্ধি ? এ আমি খাইনে।

সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, খাস্‌নে ! কোথাকার গাধা রে ? বেশ নেশা হবে—চিবো ! চিবিয়ে গিয়ে ফ্যাল্।

নেশা জিনিষটার মাধুর্য্য তখন ত আর জানি নাই, তাই, ঘাড় নাড়িয়া ফিরাইয়া দিলাম। সে তাহাও নিজের মুখে দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল।

আচ্ছা, তা হলে সিগ্‌রেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা-দুই সিগ্‌রেট ও দেশলাই বাহির করিয়া, একটি আমার হাতে দিয়া, অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। তারপরে তাহার দুই করতল বিচিত্র উপায়ে জড়ো করিয়া সেই সিগ্‌রেটটাকে কলিকার মত করিয়া টানিতে লাগিল। বাপ্‌রে—সে কি টান ! একটানে সিগ্‌রেটের আগুন মাথা হইতে তলায় নামিয়া আসিল। চারিদিকে লোক—আমি অত্যন্ত ভয়

পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে?

ফেল্‌লেই বা। সবাই জানে! বলিয়া স্বচ্ছন্দে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া, আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

আজ আমার সেইদিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না—ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিম্বা, তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।

* * * *

তারপর মাস-খানেক গত হইয়াছে। সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটি পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না। ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর। কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বংশীতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে তাহা জানিতাম না। বাড়ীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজ-খবর লইত না—সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গরু-বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সরু একটা পথ পড়িয়াছিল। মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশীর সুর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বড় ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হাঁ রে নবীন, বাঁশী বাজায় কে, রায়েদের ইন্দ্র নাকি? বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ওই বংশীধারীকে চেনেন। বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশীই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে?

বলিস্ কি রে? ও কি গোঁসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসছে নাকি?

বড়দা বলিলেন, হুঁ।

পিসিমা এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ওই অদূরবর্ত্তী গভীর জঙ্গলটা স্মরণ করিয়া মনে মনে বোধ করি শিহরিয়া উঠিলেন। ভীত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা,

ওর মা কি বারণ করে না? গোসাঁইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেছে তার সংখ্যা নেই—আচ্ছা, ও জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কেন? ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নেই, প্রাণের মায়া নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে, মা? ওর শীগ্‌গির আসা নিয়ে দরকার। তা সে-পথে নদী-নালাই থাক্ আর সাপ-খোপ বাঘ-ভালুকই থাক্।

ধন্যি ছেলে! বলিয়া পিসিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বাঁশীর স্বর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

এই সেই ইন্দ্রনাথ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম যদি অতখানি জোর এবং এমনি করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম! আর আজ রাত্রে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অমনি করিয়া বাঁশী বাজাইতে পারিতাম!

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি! সে যে আমার অনেক উচ্চে। তখন ইস্কুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম হেডমাষ্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্ম্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাষ্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিং ডিঙাইয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর ক্লাসের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইত। এমনি একসময়ে সে তাঁহার গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ, পণ্ডিতজী বাড়ী গিয়া তাঁহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই। তথাপি কেন যে পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই এবং হেডমাষ্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে-কথা আজ পর্য্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে নাই। সেটা পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে ইস্কুল হইতে রেলিং ডিঙাইয়া বাড়ী আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর

প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল কি ছিল না, এ দেখিবার সখও তাহার আদৌ ছিল না। এমন কি, মাথার উপর দশ-বিশ জন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না! ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙ্গি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা-স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—দশ-পনের দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। এম্‌নি একদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাসিয়া যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত-বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাই এত কথা আমার বলা।

কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা বলিবে, তোমার এ সাজে নাই বাপু? গরীবের ছেলে, লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়ীতে আসিয়াছিলে; তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন এবং মিশিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেই বা কেন? তা না হইলে ত আজ তোমার—

থাক্ থাক্, আর বলিয়া কাজ নাই। সহস্র লোক এ-কথা আমাকে লক্ষবার বলিয়াছে; নিজেকে নিজে এ প্রশ্ন কোটীবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে। কেন যে—এ জবাব তোমরাও দিতে পারিবে না; এবং না হইলে আজ আমি কি হইতে পারিতাম, সে প্রশ্ন সমাধান করিতেও কেহ তোমরা পারিবে না। যিনি সব জনেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত প্রাণটা পড়িয়া থাকিত এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কণাটি পর্য্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

* * * *

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে

ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয়-ভাই নিত্য-প্রথামত বাহিরের বৈঠকখানায় ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্য-তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্‌চায আফিং খাইয়া অন্ধকারে চোখ বুজিয়া থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন। দেউড়ীতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এন্ট্রাস ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে-সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়া মেজদার 'পাশে'র পড়ার বিঘ্ন না করি, এইজন্য তিনি প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনটাতে 'থুথুফেলা', কোনটাতে 'নাকঝাড়া', কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদার সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—'হুঁ—৮টা ৩৩ মিনিট হইনে ৮টা ৩৪॥ মিনিট পর্য্যন্ত,' অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট-হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারী করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জ্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—'হুঁ—৮টা ৪১ মিনিট হইতে ৮টা ৪৭ মিনিট পর্য্যন্ত'। পরওয়ানা লইয়া ছোড়টা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময়

মিলাইয়া, একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদার অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড় ঘণ্টাকাল অতিশয় বিদ্যাভাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ীর ভিতর শুইতে আসিতাম, তখন মা-সরস্বতী নিশ্চয় ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলের ক্লাশের মধ্যে যে সকল সম্মান সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদার দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্ব্বোধ পরীক্ষকগুলো তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল্ করাইয়া দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার! যাক্—এখন সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে!

সে-রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা-পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার পিঠের কাছে একটা 'হুম্' শব্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্ত্ত-কণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চীৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেললে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্ব্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ

উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদার ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'গোঁ-গোঁ' করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া, তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ী ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-বেটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ীর সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—শালাকে মার ডালো—ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠোন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধ-মরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল! আরে, এ যে ভট্‌চায্যিমশাই!

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে-মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতর মেজদা'কে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটছিলেন কেন?

ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো!

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিলেন ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ করে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষের উপর বসেছিল।

মেজদার চৈতন্য হইলে, তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক, আর

রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই।

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিতনেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই এক-লাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের একপ্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভীড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ীর গগনবাবুদের মুঙ্গেরী গাদা-বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও' ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিমগাছটা যে দরজার কাছেই এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না। তামাসা দেখিতে যাহারা বাড়ী ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছে। নিমেষে শত-কণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া, একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন! নীচে ভীড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী

সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকাবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।

ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, শালাকো কান পাকাড়কে লাও।

কিশোরী সিং তাহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সে-ই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চায্যিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দি বলিতে লাগিলেন, এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁঠাল পাকায় দিয়া—

ছিনাথের বাড়ী বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ-বাড়ীতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায়, সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বা'র হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা,

আর তোমার দরওয়ানরা! ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর ক'রে দাও দেউড়ীর ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ী লোকের তা' নেই।

পিসেমশাই কোন কথাই শুনলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন তাহার সেই রঙিন কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও; তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

ইন্দ্র আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বুঝি এই বাড়ীতে থাকিস্ শ্রীকান্ত?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ?

ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে—মাছ ধরে আনতে। যাবি?

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়বে?

সে আবার হাসিল। কহিল, ভয় কি রে! সেই ত মজা। তা ছাড়া অন্ধকার না হলে কি মাছ পাওয়া যায়? সাঁতার জানিস্?

খুব জানি।

তবে আয় ভাই! বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি একলা এত স্রোতে উজোন-বাইতে পারিনে—একজন কাউকে খুঁজি, যে ভয় পায় না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রাস্তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমটা আমার নিজেরই যেন বিশ্বাস হইল না—আমি সত্যই এই রাত্রে নৌকায় চলিয়াছি। কারণ, যে আহ্বানে এই স্তব্ধ-নিবিড়-নিশীথে বাড়ীর সমস্ত কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া দিয়া একাকী বাহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড আকর্ষণ, তাহা তখন

বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধ্যই ছিল না। অনতিকাল পরে গোসাঁইবাগানের সেই ভয়ঙ্কর বনপথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া, স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষ। মূর্ত্তিমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সূচীভেদ্য আঁধারতলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া, আবর্ত্ত রচিয়া, উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে। উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীব্র জলধারার মুখে একখানি ছোট্ট মোচার খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। কিন্তু ইন্দ্র যখন উপর হইতে নীচে একগাছি রজ্জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধরে পা টিপে টিপে নেবে যা ; সাবধানে নাবিস, পিছলে পড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ; তখন যথার্থই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু, তথাপি আমার ত দড়ি অবলম্বন আছে, —'কিন্তু তুমি ?'

সে কহিল, তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে দিয়ে নাববো। ভয় নেই, আমার নেবে যাবার অনেক ঘাসের শিকড় ঝুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি দড়িতে ভর দিয়া অনেক যত্নে অনেক দুঃখে নীচে আসিয়া নৌকায় বসিলাল। তখন দড়ি খুলিয়া দিয়া ইন্দ্র ঝুলিয়া পড়িল। সে যে কি অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আজও আমি জানি না! ভয়ে বুকের ভিতরটায় এমনি ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল যে, তাহার পানে চাহিতেই পারিলাম না। মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মত্ত-গর্জ্জন ছাড়া কোথাও শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট্ট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরী তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

কয়েক মুহূর্ত্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সমান্তরাল-প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্র-গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরিণীটি এবং কিশোর বয়স্ক দু'টি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু সে-কথা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিঃস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট্ কালীমূর্ত্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশে-পাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে, তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল,—'কি রে শ্রীকান্ত, ভয় করে ?'

আমি বলিলাম, 'নাঃ—'

ইন্দ্র খুসী হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জান্‌লে আবার ভয় কিসের !

প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু, এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জ্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এইভাবে

চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙাইয়া সে আহ্বান আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এম্‌নি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না—বাড়েও না—থামিতেও চাহে না। মাঝে-মাঝে এক একবার ঝুপ্‌-ঝাপ্‌ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায় ?

সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড় ? কেমন স্রোত ?

সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাই ত, কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙে পড়লে ডিঙি-শুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাবো। তুই দাঁড় টানতে পারিস্‌ ?

পারি।

তবে টান্‌।

আমি টানিতে সুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, উই—উই যে কালো-মত বাঁ-দিকে দেখা যায়, ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।

এ আবার কি কথা ! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে !

ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর ত পথ নেই। এর মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁ-দিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাবো কি ক'রে ? ফিরে আসতে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র

বিরক্ত হইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল,—তবে এলি কেন? চল্ তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ! তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনেরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুসী হইয়া বলিল, এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারি পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কা-খেতের ভেতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাবো যে, শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা। ছাখ শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস্ ঘিরে ফেললে বলে—আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ ক'রে লাফিয়ে পড়ে' এক-ডুবে যতদূর পারিস্ গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নাই—তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায়, উঠে ভোরবেলায় সাতরে এপারে এসে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ী ফিরে গেলেই বাস্! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, সতুয়ার চড়া ত ঘোরনালার সুমুখে, সে ত অনেক দূর!

ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর? ছ-সাত কোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিৎ হয়ে থাকলেই হ'ল। তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক্-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্ত্তসঙ্কুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাতক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা! ইহার মধ্যে আর একদিকের তীরে উঠিবার যো নাই। দশ-পনের হাত খাড়া উঁচু বালির পাড় মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে—এইদিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীর-হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ত আমি ঠিক এমনি ক'রেই পালিয়েছিলাম। তার

পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম, বল্‌লাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।

তবে এ-সকল এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ-করা সত্য! ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকা-গুলি সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে—মিট্‌-মিট্‌ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্ত্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে-স্থানটার জলের বেগে অনেকগুলা মোহানার মত হইয়াছে এবং সব-কয়টাকেই, বুনো ঝাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলা তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো গেল।

ধীবর-প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না, তখন এ-ধার হইতে ও-ধার পর্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দ্দিকে জাল টাঙাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই-কাতলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনের, বিশ সের রুই-কাতলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমিষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র ডিঙিখানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভাই?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা

দমক্ মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতি-পরিবর্ত্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি ? কি হ'ল ?

ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ। শালারা টের পেয়েচে, চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসচে—ঐ ছাখ্। তাই ত বটে! প্রবল জলতাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া তিনখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা—পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কি হবে ভাই? বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্ব্বে পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর এক-হাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাৎ হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র?

হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে!

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বার করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়বে।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানাস্ত্রা-পিটানো ও চেরা-বাঁশের কটাকট্ শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই?

সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপরে বসে বুনো শূয়ার তাড়াচ্চে।

বুনো শূয়ার! কোথায় সে?

ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে।

জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, ভাবিলাম, কা'র মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল! সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শূয়ারের হাতে পড়িব, তাহা আর বিচিত্র কি? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ঐ লোকটি এক-বুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে—এক-পা নড়িবার-চড়িবার উপায় পর্য্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনের এইভাবে কাটিল! আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক একটা জনার ভুট্টা-গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শূয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্ছা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়চে।

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ, ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখরো, করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই দেখচিস্‌নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না, ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার গা-ঘেঁসে পালালো। এক একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া ঢোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি ক'রব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কাণে কতক পৌছিল, কতক পৌছিল না। আমি নির্ব্বাক্-নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিঃশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সেকথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরী? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ? সমস্ত বিপদের বার্তা তন্ন-তন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিত-চিত্তে এই ভয়াবহ অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল; একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—'শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা'। সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানিতে পারিত! এ ত শুধু খেলা নয়! জীবন্মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে? ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্যভাবে বলিয়াছিল, 'মরতে একদিন ত হবেই', এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার অতবড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এতবড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির

হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত সুখদুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি; কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এতবড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদ্‌বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিস্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান্! টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এতবড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্য্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

যাক সে কথা। ক্রমশঃ ঘোর জল-কল্লোল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম। অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ—যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্টীমার যাইতে পারে না—তাহাই প্রধাবিত হইতেছে। বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ধূসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোট হাতে করিয়া সম্মুখবর্ত্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েচি। মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু, কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্ন-ভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল। কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্য্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম,

বন-ঝাউ এবং ভুট্টা-জনারের চড়া ডানদিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতে লাগিল।

তিন

বড় ঘুম পেয়েছে, ইন্দ্র, বাড়ী ফিরে চল না, ভাই।

ইন্দ্র একটুখানি হাসিয়া ঠিক যেন মেয়েমানুষের মত স্নেহার্দ্র কোমল-স্বরে কথা কহিল ; বলিল, ঘুম ত পাবার কথাই ভাই! কি করব শ্রীকান্ত, আজ একটু দেরী হবেই—অনেক কাজ রয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ কর্ না কেন। ঐখানে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না ?

আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। আমি গুটিশুটি হইয়া সেই তক্তাখানির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। স্তিমিতচক্ষে চুপ করিয়া আকাশের গায়ে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে লাগিলাম। ঐ ডোবে, ঐ ভাসে, আবার ডোবে, আবার হাসে। আর কাণে আসিতে লাগিল—জলস্রোতের সেই একটানা হুঙ্কার। আমার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিন অমন করিয়া সব ভুলিয়া মেঘ আর চাঁদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম কি করিয়া ? সে ত আমার তন্ময় হইয়া চাঁদ দেখিবার বয়স নয়। কিন্তু ঐ যে বুড়োরা পৃথিবীর অনেক ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া বলে যে, ঐ বাহিরের চাঁদটাও কিছু না, মেঘটাও কিছু না, সব ফাঁকি—সব ফাঁকি! আসল যা' কিছু, তা এই নিজের মনটা। সে যখন যাকে যা দেখায়, বিভোর হয়ে সে তখন তাই শুধু দেখে। আমারও সেই দশা। এত-রকমের ভয়ঙ্কর ঘটনার ভিতর দিয়া এমন নিরাপদে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়া আমার নির্জ্জীব মনটা তখন বোধ করি এমনি-কিছু-একটা শান্ত ছবির অন্তরেই বিশ্রাম করিতে চাহিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যে ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেছে, তাহা টেরও পাই নাই। হঠাৎ মনে হইল আমার, চাঁদ যেন মেঘের মধ্যে একটা লম্বা ডুব-সাঁতার দিয়া

একেবারে ডানদিক হইতে বাঁদিকে গিয়া মুখ বাহির করিলেন। ঘাড়টা একটু তুলিয়া দেখিলাম, নৌকা এবার ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার বা একটা কথা কহিবার উদ্যমও তখন বোধ করি আমার মধ্যে ছিল না; তাই তখনি আবার তেমনি করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। আবার সেই দু'চক্ষু ভরিয়া চাঁদের খেলা এবং দু'কান ভরিয়া স্রোতের তর্জ্জন। বোধ করি, আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল।

খস্—স্—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কোন্ জায়গা? বাড়ী আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না? প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু বোস্, শ্রীকান্ত; আমি এখ্খুনি ফিরে আসব—তোর কিচ্ছু ভয় নেই। এই পাড়ের ওধারেই জেলেদের বাড়ী।

সাহসের এতগুলা পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। এম্নিই ত সর্ব্বকালেই মানুষের মানসিক গতিবিধি বড়ই দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব বোধ করি একেবারেই অজ্ঞেয়। তাই বোধ করি শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ—কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল—আবার কেহ বা কোন কথাই শুনিল না—তর্কাতর্কির সমস্ত গণ্ডি মাড়াইয়া ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া কাঁদিয়া গান গাহিয়া, সব একাকার করিয়া দিয়া, সংসারটাকে যেন একটা পাগলাগারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই। যাহাদের রুচির সহিত মিশ

খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল—এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল,—সেই সে সর্ব্বদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন বৃন্দাবনের বনে বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র—মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ,—তাহার কে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়াও যায় না। তাই বলিতেছিলাম, তেম্‌নি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স! যৌবনের তেজ এবং দৃঢ়তা না আসুক, তাহার দম্ভ ত তখন আসিয়া হাজির হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত হৃদয়ে সজাগ হইয়াছে! তখন সঙ্গীর কাছে ভীরু বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহে? অতএব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ভয় কর্‌ব আবার কিসের? বেশ ত, যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে, মাথার উপরে আবার সেই আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহুদূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জ্জন। আর সুমুখে সেই বালির পাড়। এটা কোন্ জায়গা তাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিস্‌নে—খবরদার ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়েও যদি কেউ আসে, তবু দিবিনে—বল্‌বি, মুখে তোর ছাই দেবো—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার, হাতে করে দিতে যাস্‌নে যেন—ঠিক আমি হ'লেও না—খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বল্‌ব—খবরদার কিন্তু—, বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনি ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা উপশিরা দিয়া বরফগলা জল বহিয়া চলিতে লাগিল। নিতান্ত শিশুটি নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম্ম অনুমান করিতে পারি নাই। আমার জীবনে এমন অনেক

ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জল। কিন্তু তথাপি এই নিশা-অভিযানের রাতটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ করি, ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের ওদিক্ হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে! যেমনি আড়-চোখে চাই, অম্‌নি সেও মাথা নীচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ হইল চলিয়া গিয়াছে— আর ফিরিতেছে না!

মনে হইল, যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে শতপাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নীচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে এইদিকে আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং অপর দুইজন হিন্দুস্থানী। কিন্তু সে যাহা হোক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ,—এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতেই জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ,—ঐ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক, তবুও ছায়া! জগতে আমার মত সেদিন কোন মানুষ কোন বস্তু চোখে দেখিয়া কি এমন তৃপ্তি পাইয়াছে! পাক্ আর নাই পাক্, ইহাকেই যে বলে দৃষ্টির চরম আনন্দ, এ-কথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। যাক্। যাহারা আসিল, তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত এক প্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তৎপরিবর্ত্তে ইন্দ্রর হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু মধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু স্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁসিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি ঠেলিয়া ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না; কারণ আমার মন তখন তাহার

বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও কি এক প্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাহাকেই চাঁদের আলোয় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর-আনন্দে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

হাঁ, তা' মানুষের স্বভাবই ত এই! একটুখানি দোষ পাইলে পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই সমস্তই নিঃশেষে ভুলিয়া যাইতে তাহার কতক্ষণ লাগে? ছিঃ! ছিঃ! এমনি করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিল! এতক্ষণ এই মাছ-চুরি ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট চুরির আকারে বোধ করি স্থান পায় নাই। কেন-না, ছেলেবেলায় টাকা-কড়ি চুরিটাই শুধু যেন বাস্তবিক চুরি, আর সব অন্যায় বটে—কিন্তু, কেমন করিয়া যেন সে-সব ঠিক চুরি নয়—এমনই একটা অদ্ভুত ধারণা প্রায় সকল ছেলেরই থাকে; আমারও তাই ছিল। না হইলে এই 'টুং' শব্দটি কানে যাইবামাত্রই এতক্ষণের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, সমস্তই একমুহূর্ত্তে এমন শুষ্ক তৃণের মত ঝরিয়া পড়িত না। সে যদি মাছগুলা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিত, কিম্বা—আর যাহাই করুক, শুধু টাকা-কড়ির সহিত ইহার সংস্রব না ঘটাইত, তাহা হইলে আমাদের এই মৎস্য-সংগ্রহের অভিযানটিকে কেহ চুরি বলিলে ক্রোধে বোধ করি তাহার মাথাটাই ফাটাইয়া দিতাম এবং সে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য পাইয়াছে বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু ছিঃ ছিঃ! এ কি! এ কাজ ত জেলখানার কয়েদীরা করে!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাস্‌নি, না রে শ্রীকান্ত?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না।

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া ওখানে আর কেউ বসে থাকতে পারত না, তা জানিস? তোকে আমি খুব ভালবাসি—আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই। আমি যখন আসব তোকে শুধু ডেকে আনব, কেমন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মুখের উপর সদ্য মেঘমুক্ত যে চাঁদের আলোটুকু পড়িল, তাহাতে মুখখানি কি যে দেখাইল,

আমি এতক্ষণের সব রাগ-অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনও ঐ-সব দেখেছ?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখিনি—লোকে বলে, তাই শুনেছি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো?

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না?

না। রামনাম করি। কিছুতেই তারা আসতে পারে না। একটু থামিয়া কহিল, রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি রামনাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চলে যাস্, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হলেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করচে—তারা সব অন্তর্যামী কি না!

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাঁকরের পাড় সুরু হইল। ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল, স্রোত যেন উল্টামুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোটে হাতে করিয়া কহিল, ঐ যে সামনে বনের মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ঐখানে আমি একবার নেবে যাবো। যাবো আর আসব, কেমন?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা! কারণ, না বলিবার পথ ত এক প্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আবার ইন্দ্রও আমার নির্ভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান হইতে ঐ স্থানটা এমনি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতেছিল যে, এইমাত্র রামনামের অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাত্রে রামনামের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া লইতে আমার একটুকু প্রবৃত্তি হইল না এবং তখন হইতেই গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। সত্য বটে, মাছ আর ছিল না, সুতরাং মৎস্য-প্রার্থীদের শুভাগমন না হইতে পারে, কিন্তু সকলের লোভ

সে মানুষেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের ঘাড় মটকাইয়া উষ্ণরক্ত পান এবং মাংস-চর্বণের ইতিহাসও ত শোনা গিয়াছে।

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানা তর্ তর্ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণদিকের কাঞ্চীবময় বকবাউ এবং কলাড় বক মাথা তুলিয়া এই দুটি অসমসাহসী মানবশিশুর পানে বিস্ময়স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বামদিকেও তাহাদের আত্মীয়পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয় তাহাদের সঙ্কেত অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি, তাঁহার কাছে বোধ করি 'রাম'নামের জোরেই ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপই করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতিবশতঃ এ জায়গাটা একটি ছোটখাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উত্তরদিকের মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি ক'রে?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ; ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কি পচেচে ইন্দ্র।

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্চে কিনা। সবাই ত পোড়াতে পারে না—মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোন্খানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই?

ঐ হোতা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই শ্মশান কিনা। যেখানে হোক ফেলে রেখে, ঐ বটতলার ঘাটে চান ক'রে বাড়ী চলে যায়,—আরে

দূর! ভয় কি রে! ও শিয়ালে শিয়ালে লড়াই করচে।—আচ্ছা, আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস।

আমার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি, শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে একা আমি এই পথে যাই আসি—তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে!

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম—অস্ফুটে কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে কোথাও নেবো না—সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটিবার যেতেই হবে। এই টাকা ক'টি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিনদিন আসতে পারিনি।

টাকা কাল দিয়ো না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি বলিসনে। আমার সঙ্গে তুইও চল্—কিন্তু কারুকে এ কথা বলিস্‌নে যেন।

আমি অস্ফুটে 'না' বলিয়া তাহাকে তেমনি স্পর্শ করিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিলাম। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়া-চড়ার কোন প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরে সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপরে যে গাছপালা নাই, স্থানটি ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে,—দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায় এইজন্য ইন্দ্র পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয় জড়িত-স্বরে 'ইস্' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকাল-মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না। গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। শুধু মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত্ত কলহ-চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্দ্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন-শব্দ, আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্ত্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ ঝরিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নধর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে-স্থলে বিন্যস্ত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রর দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ-বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে ফেলে রেখে আসি।

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য, কিন্তু ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া—সে ঢের-ঢের কঠিন কাজ! তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে। একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা

ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাঁধাবাঁধি,—কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘটা। তাহাতে, এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কি না, সে খবরটা পর্য্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া এক হাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্য হাত হাঁটুর নীচে দিয়া, একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়া-ছিঁড়ি ক'রে খাবে। আহা! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্য্যন্ত রয়েছে রে! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্ব্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্দ্র কহিল, আরে, এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে? আম-গাছ জাম-গাছ যে কাঠেরই তৈরী হোক্—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আম-গাছ জাম-গাছ—বুঝলি না? এও তেম্‌নি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানুষেরই মত, এখন তাহা জানি। কিন্তু অন্তরের মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ণ সত্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে এমনি খাঁটি কথা সে বলিতে পারিত। তাই আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি, ওই বয়সে কাহারো কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া, বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, এই সকল তত্ত্ব সে পাইত কোথায়? এখন কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উত্তরটাও যেন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইন্দ্রর মধ্যে ছিলই না। উদ্দেশ্যকে গোপন রাখিয়া কোন কাজ সে করিতেই জানিত না। সেই জন্যই বোধ করি, তাহার সেই হৃদয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্য, কোন অজ্ঞাত নিয়মের বশে সেই বিশ্বব্যাপী

অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের দেখা পাইয়া, অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত। তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত। বাস্তবিক, অকপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই। ভাল করিয়া দেখিলে, মিথ্যা বলিয়া ত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চোখে পড়ে না। মিথ্যা শুধু মানুষের বুঝিবার এবং বুঝাইবার ফলটা। সোনাকে পিতল বলিয়া বুঝানও মিথ্যা, বুঝাও মিথ্যা, তাহা জানি। কিন্তু তাহাতে সোনারই বা কি, আর পিতলেরই বা কি আসে যায়। তোমার যাহা ইচ্ছা বুঝ না, তাহারা যা তাই ত থাকে। সোনা মনে করিয়া তাহাকে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার সত্যকার মূল্য-বৃদ্ধি হয় না, আর পিতল বলিয়া টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেও তাহার দাম কমে না। সেদিনও সে পিতল, আজও সে পিতলই। তোমার মিথ্যার জন্য তুমি ছাড়া আর কেহ দায়ীও হয় না, ভ্রূক্ষেপও করে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তটাই পরিপূর্ণ সত্য। মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে, তবে সে মানুষের মন ছাড়া আর কোথাও নয়। সুতরাং এই অসত্যকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, কোনদিন স্থান দেয় নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি যে মঙ্গল এবং সত্যকেই পাইবে, তাহা ত বিচিত্র নয়!

কিন্তু তাহার পক্ষে বিচিত্র না হইলেও কাহারও পক্ষেই যে বিচিত্র নয়, এমন কথা বলিতেছি না। ঠিক এই উপলক্ষে আমার নিজের জীবনেই তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিবার লোভ এখানে সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এই ঘটনার দশ-বারো বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন অপরাহ্নকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে, একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছেন—কোনমতেই তাঁহার সৎকারের লোক জুটে নাই। না জুটিবার হেতু এই যে, তিনি কাশী হইতে ফিরিবার পথে রোগগ্রস্ত হইয়া এই সহরেই রেলগাড়ী হইতে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য পরিচয়সূত্রে যাঁহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং দুই রাত্রি বাস করিয়া আজ সকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনি 'বিলেত-

ফেরৎ' এবং সে সময়ে 'একঘরে'। ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ যে, তাঁহাকে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এই 'একঘরে'র বাটীতে মরিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সৎকার করিয়া পরদিন সকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল, প্রত্যেকেরই বাটীর কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া গেল, গতরাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত হারিকেন-লণ্ঠন হাতে সমাজপতিরা বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, এই অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপকর্ম্ম (দাহ) করার জন্য এই কুলাঙ্গারদিগকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে, 'ঘাট' মানিতে হইবে এবং এমন একটা বস্তু সর্ব্বসমক্ষে ভোজন করিতে হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাদ্য নয়। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া প্রতি বাড়ীতেই বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের কোনই হাত নাই ; কারণ জীবিত থাকিতে তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারিবেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনিই তখন সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বিনা-দক্ষিণায় বাঙ্গালীর বাটীতে চিকিৎসা করিতেন। আমাদের কাহিনী শুনিয়া ডাক্তারবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিলেন, যাহারা এইরূপ নির্য্যাতন করিতেছে, তাহাদের বাটীর কেহ চোখের সম্মুখে বিনা-চিকিৎসায় মরিয়া গেলেও তিনি সেদিকে আর চাহিয়া দেখিবেন না। কে একথা তাঁহাদের গোচর করিল জানি না ; দিবা অবসান না হইতেই শুনিলাম, কেশচ্ছেদের আবশ্যকতা নাই, শুধু 'ঘাট' মানিয়া সেই সুপবিত্র পদার্থটা ভক্ষণ করিলেই হইবে। আমরা স্বীকার না করায় পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম, ঘাট মানিলেই হইবে—ওটা না হয় নাই খাইলাম। ইহাও অস্বীকার করায় শোনা গেল, আমাদের এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহারা এমনই মার্জ্জনা করিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দু'টো দিন ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছেন, সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ ; অর্থাৎ কাহারও বাটীতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাটীতে একে একে বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের

শুভাগমন হইয়াছিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহারা কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই; কিন্তু পরদিন ডাক্তারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না, আমাদিগকে ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়ই নাই।

যাক, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে যাই হউক, আমি নিশ্চয় জানি—যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এই নামধামহীন বিবরণটির মধ্যে সমস্ত সত্যটিই উপলব্ধি করিবেন। আমার বলিবার মূল বিষয়টি এই যে, ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, অত বড় বড় সমাজপতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই, এবং ডাক্তারবাবু সেদিন অমন করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চিকিৎসা না করিয়া দিলে, কোনদিন এ ব্যাধি তাঁহাদের আরোগ্য হইত কি না, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

চড়ার উপর আসিয়া অর্দ্ধমগ্ন বন-ঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল, তখন রাত্রি আর বড় বাকী নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা ঝুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে—অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুষ্কমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়?

এই যে বললে, কোথায় যাবে?

থাক্—আজ আর না।

আমি খুসী হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ী যাই।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয় তুই জানিস?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে। তুমি বাড়ী চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ী রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না, কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া, খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ্ আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, 'ভেইয়া'!

আমি কম্পিতকণ্ঠে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো।

ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে বোটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল। মিনিট দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রাম নাম কর্, সে নৌকা ছেড়ে যায়নি—আমার পেছনেই বসে আছে।

তার পরে সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমার মনে নাই। যখন চাহিলাম তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগানো। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে বোস্।

চার

পা আর চলে না—এমনি করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া সকালবেলা রক্তচক্ষু ও একান্ত শুষ্ক ম্লানমুখে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। এই যে! এই যে! করিয়া সবাই সমস্বরে এমনি অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল যে, আমার হৃৎপিণ্ড থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

যতীনদা আমার প্রায় সমবয়সী। অতএব তাহার আনন্দটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্মত্ত চীৎকার-শব্দে—এসেছে শ্রীকান্ত—এই এল, মেজদা! বলিয়া বাড়ী ফাটাইয়া আমার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া পরম সমাদরে আমার হাতটি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বৈঠকখানায় পাপোষের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

সেখানে মেজদা' গভীর মনোযোগের সহিত পাশের পড়া পড়িতে-ছিলেন। মুখ তুলিয়া একটিবারমাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন। অর্থাৎ বাঘ শিকার হস্তগত করিয়া নিরাপদে বসিয়া যেরূপ অবহেলার সহিত অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, তাঁহারও সেই ভাব। শাস্তি দিবার এতবড় মাহেন্দ্রযোগ তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহ।

মিনিটখানেক চুপচাপ! সারারাত্রি বাহিরে কাটাইয়া গেলে কর্ণযুগল ও উভয় গণ্ডের উপর যে-সকল ঘটনা ঘটিবে, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আর যে দাঁড়াতে পারি না! অথচ কর্ম্মকর্ত্তারও ফুসরৎ নাই। তাঁহারও যে আবার পাশের পড়া!

আমাদের এই মেজদাদাটিকে আপনারা বোধ করি এত শীঘ্র বিস্মৃত হ'ন নাই। সেই, যাঁহার কঠোর তত্ত্বাবধানে কাল সন্ধ্যাকালে আমরা পাঠাভ্যাস করিতেছিলাম এবং ক্ষণেক পরেই যাঁহার সুগম্ভীর 'অাঁ অাঁ-' রবে সেজ উল্টানোর চোটে গত রাত্রির সেই 'দি রয়েল বেঙ্গল'কেও দিশাহারা হইয়া একেবারে ডালিমতলায় ছুটিয়া পলাইতে হইয়াছিল, সেই তিনি।

পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে, সতীশ, এবেলা আবার বেগুন খেতে আছে না কি—বলিতে বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসীমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কখন এলি রে? কোথায় গিয়েছিলি? ধন্যি ছেলে বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমোতে পারিনি—ভেবে মরি, সেই যে ইন্দ্রের সঙ্গে চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল—আর দেখা নেই! না খাওয়া, না দাওয়া; কোথা ছিলি বল্ ত হতভাগা? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাঙা—ছল্ ছল্ করছে—বলি জ্বর-টর হয়নি ত? কই, কাছে আয় ত, গা দেখি—একসঙ্গে, এতগুলা প্রশ্ন করিয়া পিসীমা নিজেই আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেচি তাই। এই যে, বেশ গা গরম হয়েছে—এমন সব ছেলের হাত-পা বেঁধে জল-বিছুটি দিলে তবে রাগ যায়। তোমাকে বাড়ী থেকে একেবারে বিদেয় ক'রে তবে আমার আর কাজ। চল্ ঘরে, গিয়ে শুবি, আয় হতভাগা

ছোঁড়া!—বলিয়া তিনি বার্ত্তাকু-ভক্ষণের প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া, আমায় হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

মেজদা জলদগম্ভীর-কণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না।

কেন, কি করবে ও? না না, এখন আর পড়তে হবে না। আগে যা-হোক, দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক। আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া পিসীমা আমাকে লইয়া চলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয়। মেজদা স্থান-কাল ভুলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—খবরদার! যাস্‌নে বলচি শ্রীকান্ত!

পিসীমা পর্য্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন—স'তে! পিসীমা অত্যন্ত রাশভারি লোক। বাড়ীশুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল। আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না।

পিসীমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, কখনও কোন কারণেই তিনি চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে এখানে? দেখ সতীশ, যখন তখন শুনি, তুই ছেলেদের মারধোর করিস্। আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্, আমি জানতে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব। বেহায়া, নিজে ফি বছর ফেল হচ্ছে—ও আবার যায় পরকে শাসন করতে। কেউ পড়ুক, না পড়ুক, কারুকে তুই জিজ্ঞেসা পর্য্যন্ত করতে পাবিনে।—বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন। মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। এ আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়ীতে কাহারো নাই—সেকথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসীমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনিয়া

কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম-গরম জিলাপি আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—আমি মরিলেই তাঁর হাড় জুড়ায়—এই কথা জানাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিনিট পাঁচেক পরেই খুট্ করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। একটুখানি 'দম' লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, মেজদাকে মা কি হুকুম দিয়েচে জানিস্? আমাদের কোন কথায় তার থাকবার জো-টি নেই। তুই, আমি, য'তে এক ঘরে পড়ব—মেজদা অন্য ঘরে পড়বে। আমাদের পুরানো পড়া বড়দা দেখবেন। ওকে আমরা আর কেয়ার করব না।—বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

যতীনদাও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে তাহার কৃতিত্বের উত্তেজনায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছোড়দাকে এই শুভসংবাদ দিয়া সে-ই এখানে আনিয়াছিল। প্রথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে নিজের বুকে বারম্বার করাঘাত করিয়া কহিল, আমি! আমি! আমার জন্যেই হ'লো তা জানো? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হুকুম দিত! ছোড়দা, তোমার কলের লাট্টুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা দিলুম। নিগে যা আমার ডেস্ক থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাট্টুটা বোধ করি সে ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।

এম্নিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এম্নিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ! আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্ম্মূল্যতা একবিন্দু কম নয়। মেজদা তাহার অগ্রজের অধিকারে স্বেচ্ছাচারে ছোটদের যে সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকেই ফিরিয়া পাইবার সৌভাগ্যে ছোড়দা তাহার প্রাণতুল্য প্রিয় বস্তুটিকেও অসঙ্কোচে হাতছাড়া করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ,

মেজদার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না। রবিবারে দুপুর-রৌদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাঁহার তাসখেলার বন্ধু ডাকিয়া আনিতে হইত। গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাঁহার দিবানিদ্রার সমস্ত সময়টা পাখার বাতাস করিতে হইত; শীতের রাত্রে তিনি লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকাইয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাঁহার বহির পাতা উল্টাইয়া দিতে হইত—এম্‌নি সমস্ত অত্যাচার! অথচ, 'না' বলিবার যো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পর্য্যন্ত নাই। ঘূণাক্ষরে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ হুকুম করিয়া বসিতেন, কেশব, তোমার জিয়োগ্রাফি আনো, পুরনো পড়া দেখি। যতীন, যাও—একটা ভাল দেখে ঝাউয়ের ছড়ি ভেঙে আনো। অর্থাৎ প্রহার অনিবার্য্য। অতএব আনন্দের মাত্রাও যে ইহাদের বাড়াবাড়িতে গিয়া পড়িবে ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

কিন্তু সে যতই হউক, আপাততঃ তাহাকে স্থগিত রাখা আবশ্যক, কারণ, স্কুলের সময় হইতেছে। আমার জ্বর। সুতরাং কোথাও যাইতে হইবে না।

মনে পড়ে, সেই রাত্রেই জ্বরটা প্রবল হইয়াছিল এবং সাত আট দিন পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।

তার কতদিন পরে স্কুলে গিয়াছিলাম এবং আরও যে কতদিন পরে ইন্দ্রের সহিত আবার দেখা হইয়াছিল, তাহা মনে নাই; কিন্তু সেটা যে অনেকদিন পরে, এ-কথা মনে আছে। সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গায় জল তখন মরিতে সুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি। অনেকেই ধরিতেছে। হঠাৎ চোখ পড়িল, কে একজন অদূরে একটা শর-ঝাড়ের আড়ালে বসিয়া টপাটপ্‌ মাছ ধরিতেছে। লোকটিকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু, তাহার মাছধরা দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইতেই আমার এ জায়গাটা পছন্দ হইতেছিল না। মনে করিলাম, উহারই পাশে গিয়া বসি। ছিপ হাতে করিয়া একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে কহিল,

আমার ডান দিকে বোস্। ভাল আছিস্ ত রে শ্রীকান্ত? বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বুঝিলাম, এ ইন্দ্র। দেহের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গেলে, যে যেখানে আছে, একমুহূর্ত্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে, ইহার কণ্ঠস্বরেও আমার সেই দশা হইল। চক্ষের পলকে সর্ব্বাঙ্গের রক্ত চঞ্চল, উদ্দাম হইয়া বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কোনমতেই মুখ দিয়া একটা জবাব বাহির হইল না। এই কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু জিনিষটা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পরকে বুঝানো শুধুই যে অত্যন্ত কঠিন, তা' নয়, বোধ করি বা অসাধ্য! কারণ, বলিতে গেলে, এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্যরাশি—যেমন বুকের রক্ত তোলপাড় করা,—উদ্দাম চঞ্চল হইয়া আছাড় খাওয়া,—তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া যাওয়া—এই সব ছাড়া ত আর পথ নাই। কিন্তু কতটুকু ইহাতে বুঝাইল? যে জানে না, তাহার কাছে আমার মনের কথা কতটুকু প্রকাশ পাইল? আমিই বা কি করিয়া তাহাকে জানাইব এবং সেই বা কি করিয়া জানিবে? যে নিজের জীবনে একটি দিনের তরেও অনুভব করে নাই, যাহাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়াছি, কামনা করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, অথচ পাছে কোথাও কোনরূপে দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়েও অহরহ কাঁটা হইয়া আছি, সে এমনি অকস্মাৎ, এতই অভাবনীয়রূপে আমার চোখের উপর থাকিয়া আমাকে পার্শ্বে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিল! পার্শ্বে গিয়াও বসিলাম, কিন্তু তখনও কথা কহিতে পারিলাম না।

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ফিরে এসে বড় মার খেয়েছিলি—না রে, শ্রীকান্ত? আমি তোকে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করিনি। আমার সেজন্যে রোজ বড় দুঃখ হয়।

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, মার খাই নাই।

ইন্দ্র খুসী হইয়া বলিল, খাস্‌নি! দেখ্ রে শ্রীকান্ত, তুই চ'লে গেলে আমি মা কালীকে অনেক ডেকেছিলাম—যেন তোকে কেউ না মারে! কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা রে! মন দিয়ে ডাকলে কখনো কেউ মারতে পারে না। মা এসে তাদের এমনি ভুলিয়ে দেন যে, কেউ কিছু করতে

পারে না—বলিয়া সে ছিপটা রাখিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া, বোধ করি তাঁকেই মনে মনে প্রণাম করিল। বঁড়শীতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি ত ভাবিনি তোর জ্বর হবে; তা হ'লে সেও হ'তে দিতুম না।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলাম, কি করতে তুমি?

ইন্দ্র কহিল, কিছুই না। শুধু জবাফুল তুলে এনে মা কালীর পায়ে দিতুম। উনি জবাফুল বড় ভালবাসেন! যে যা ব'লে দেয়, তার তাই হয়। এ ত সবাই জানে। তুই জানিস্‌নে?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ করেনি?

ইন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, আমার কখ্‌খনো অসুখ করে না, কখ্‌খনো কিচ্ছু হয় না। হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, দেখ শ্রীকান্ত, আমি তোকে একটা জিনিষ শিখিয়ে দেবো। যদি তুই দু'বেলা খুব মন দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম করিস্—তাঁরা সব সামনে এসে দাঁড়াবেন, তুই স্পষ্ট দেখতে পাবি; তখন আর তোর কোন অসুখ করবে না! তোর একগাছি চুল পর্য্যন্তও ছুঁতে পার্‌বে না—তুই আপনি টের পাবি—আমার মতন যেখানে খুসী যা, যা খুসী কর্, কোন ভাবনা নেই। বুঝলি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হুঁ। বঁড়শীতে টোপ দিয়া জলে ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কাকে নিয়ে সেখানে যাও?

কোথায়?

ওপারে মাছ ধরতে।

ইন্দ্র ছিপটা তুলিয়া লইয়া সাবধানে পাশে রাখিয়া বলিল, আমি আর যাইনে।

তাহার কথা শুনিয়া ভারী আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, আর একদিনও যাওনি?

না, একদিনও না। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে—কথাটা ইন্দ্র শেষ না করিয়াই ঠিক যেন থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

উহার সম্বন্ধে এই কথাই আমাকে অহরহ খোঁচার মত বিঁধিয়াছে। কোনমতেই সেদিনের সেই মাছ-বিক্রীটা ভুলিতে পারি নাই। তাই সে যদি

বা চুপ করিয়া গেল, আমি পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে মাথার দিব্যি দিলে ভাই ? তোমার মা ?

না, মা নয়।—বলিয়া ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে ছিপের গায়ে সূতাটা ধীরে ধীরে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, শ্রীকান্ত, আমাদের সে রাত্রির কথা তুই বাড়ীতে ব'লে দিস্ নি ?

আমি বলিলাম, না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চলে গিয়েছিলুম, তা সবাই জানে।

ইন্দ্র আর কোন প্রশ্ন করিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এইবার সে উঠিবে। কিন্তু তাহাও করিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখে সর্ব্বদাই কেমন একটা হাসির ভাব থাকে, এখন তাহাও নাই, এবং কি একটা সে যেন আমাকে বলিতে চায়, অথচ তাহাও পারিতেছে না বলিয়া উঠিতেও পারিতেছে না—বসিয়া থাকিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। আপনারা পাঁচজন এখানে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এটি বাপু তোমার কিন্তু মিছে কথা। অতখানি মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বয়সটা ত তা' নয়। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু, আপনারাও একথাটা ভুলিতেছেন যে, আমি ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলাম। একজন আর একজনের মন বুঝে সহানুভূতি এবং ভালবাসা দিয়া—বয়স এবং বুদ্ধি দিয়া নয়। সংসারে যে যত ভালবাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যন্ত কঠিন অন্তর্দৃষ্টি শুধু ভালবাসার জোরেই পাওয়া যায়, আর কিছুতে নয়। তাহার প্রমাণ দিতেছি। ইন্দ্র মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে না পারিয়া সমস্ত মুখ তার অকারণে রাঙা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা শরের ডাঁটা ছিঁড়িয়া নতমুখে জলের উপর নাড়িতে নাড়িতে কহিল, শ্রীকান্ত !

কি ভাই ?

তোর—তোর কাছে—টাকা আছে ?

ক'টাকা ?

ক'টাকা ? এই—ধর, পাঁচ টাকা—

আছে। তুমি নেবে ? বলিয়া আমি ভারি খুসী হইয়া তাহার মুখপানে

চাহিলাম। এ কয়টি টাকাই আমার ছিল। ইন্দ্রের কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সদ্ব্যবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু ইন্দ্র ত কৈ খুসী হইল না। মুখ যেন তাহার অধিকতর লজ্জায় কি একরকম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু, আমি ত এখন তোকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি আর চাইনে, বলিয়া সগর্ব্বে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি নিজে চাইনে। একজনদের দিতে হবে, তাই। তারা বড় দুঃখী রে,—খেতেও পায় না। তুই যাবি সেখানে?

চক্ষের নিমেষে আমার সেই রাত্রির কথা মনে পড়িল। কহিলাম, সেই যাদের তুমি টাকা দিতে নেমে যেতে চেয়েছিলে?

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, তারাই। টাকা আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুতে নিতে চায় না। তোকে একটিবার যেতে হবে, শ্রীকান্ত, নইলে এ টাকাও নেবে না, মনে করবে আমি মায়ের বাক্স থেকে চুরি ক'রে এনেচি! যাবি শ্রীকান্ত?

তারা বুঝি তোমার দিদি হয়?

ইন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, না, দিদি হয় না—দিদি বলি। যাবি ত?

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তখনি কহিল, দিনের বেলা গেলে সেখানে কোন ভয় নেই। কাল রবিবার; তুই খেয়ে-দেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্, আমি নিয়ে যাবো; আবার তখুনি ফিরিয়ে আন্‌ব। যাবি ত ভাই? বলিয়া যেমন করিয়া সে আমার হাতটি ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহাতে আমার 'না' বলিবার সাধ্য রহিল না। আমি দ্বিতীয়বার তাহার নৌকায় উঠিবার কথা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

কথা দিলাম সত্য, কিন্তু, সে যে কতবড় দুঃসাহসের কথা, সে ত আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। সমস্ত বিকালবেলাটা মন ভারী হইয়া রহিল, এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরে প্রগাঢ় অশান্তির ভাব সর্ব্বাঙ্গে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভোরবেলা উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে ইহাই মনে পড়িল, আজ যেখানে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেখানে যাইলে কোনমতেই

আমার ভাল হইবে না। কোন সূত্রে কেহ জানিতে পারিলে, ফিরিয়া আসিয়া যে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, মেজদার জন্যও ছোড়দা বোধ করি সে শাস্তি কামনা করিতে পারিত না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে টাকা পাঁচটি লুকাইয়া লইয়া নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন এমন কথাও অনেকবার মনে হইল—কাজ নাই গিয়া। নাই বা কথা রাখিলাম ; এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শর-ঝাড়ের নীচে সেই ছোট্ট নৌকাটির উপর ইন্দ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। চোখোচোখি হইবামাত্র সে এমন করিয়া হাসিয়া আহ্বান করিল যে, না-যাওয়ার কথা মুখে আনিতেও পারিলাম না। সাবধানে ধীরে-ধীরে নামিয়া নিঃশব্দে নৌকাটিতে চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আজ মনে ভাবি, আমার বহু জন্মের সুকৃতির ফল যে, সেদিন ভয়ে পিছাইয়া আসি নাই। সেই দিনটিকে উপলক্ষ করিয়া যে জিনিষটি দেখিয়া লইয়াছিলাম, সারাজীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াও তেমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? আমিই বা তাহার মত আর কোথায় দেখিতে পাইলাম ? জীবনে এমন সব শুভ মুহূর্ত্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে, সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা ছাপ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত পরবর্ত্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেননা তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই ? নাই যদি, তবে পথে-ঘাটে এত পাপের মূর্ত্তি দেখি কাহাদের ? সবাই যদি সেই ইন্দ্রের দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা ? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ ; যখন খুসী ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার একটা অতি জঘন্য শোচনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়—আমার সংস্কার। সংস্কারের মূলে যিনি, জানি না সেই পুণ্যবতী আজও বাঁচিয়া আছেন কিনা।

থাকিলেও কোথায় কি ভাবে আছেন, তাঁহার নির্দ্দেশমত কখনো কোন সংবাদ লইবার চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু কত যে মনে-মনে তাঁকে প্রণাম করিয়াছি, তাহা যিনি সব জানিতে পারেন, তিনিই জানেন।

শ্মশানের সেই সঙ্কীর্ণ ঘাটের পাশে বটবৃক্ষমূলে ডিঙ্গি বাঁধিয়া যখন দু'জনে রওনা হইলাম, তখনও অনেক বেলা ছিল। কিছুদূর গিয়া ডানদিকে বনের ভিতর ঠাহর করিয়া দেখায়, একটা পথের মতও দেখা গেল! ইন্দ্র তাহাই ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা পর্ণকুটীর দেখা গেল। কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার পথ আগড় দিয়া আবদ্ধ। ইন্দ্র সাবধানে তাহার বাঁধন খুলিয়া ঠেলা দিয়া প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া লইয়া পুনরায় তেমনি করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি তেমন বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই। একে ত চতুর্দিকেই নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ এবং পাকুড় গাছে সমস্ত জায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া একপাল মুরগী এবং ছানাগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটা-দুই ছাগল ম্যাঁ-ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুমুখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিমেষে অস্ফুট চীৎকারে মুরগীগুলাকে আরও ত্রস্ত-ভীত করিয়া দিয়া আঁচড়-পিঁচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড় ভালমানুষ। ওর নাম রহিম। বলিয়া, কাছে গিয়া তাহার পেটটা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ওধারে সরাইয়া দিল। তখন নামিয়া আসিয়া ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই পর্ণকুটীরের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলাগোছের লোক প্রবল কাশির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোটবড় মালা। গায়ের জামা এবং পরণের কাপড় অত্যন্ত মলিন এবং একপ্রকার হল্‌দে রঙে ছোপানো। তাহার লম্বা দাড়ি বস্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল

বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই ; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে তাহাকে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতাম। আমাদের বাটীতেও তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহজী সম্বোধন করিল এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া আদেশ পালন করিতে লাগিয়া গেল, এবং প্রস্তুত হইলে শাহজী সেই কাশির উপর ঠিক যেন 'মরি-বাঁচি' পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নাকেমুখে বাম-করতল চাপা দিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, পিয়ো—

ইন্দ্র পান করিল না। ধীরে-ধীরে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, না। শাহজী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল ; কিন্তু উত্তরের জন্য একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা না কহিয়াই সেটা নিজেই তুলিয়া লইয়া টানিয়া-টানিয়া নিঃশেষ করিয়া উপুড় করিয়া রাখিল। তার পরে দু'জনের মৃদু-কণ্ঠে কথাবার্ত্তা সুরু হইল। তাহার অধিকাংশ শুনিতেও পাইলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, শাহজী হিন্দীতে কথা কহিলেও ইন্দ্র বাঙলা ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিল না।

শাহজীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা উন্মত্ত চীৎকারে পরিণত হইল। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে যে এরূপ অকথ্য অশ্রাব্য গালি-গালাজ উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা তখন বুঝিলে, ইন্দ্র সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি করিতাম না। তার পরে লোকটা বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিল এবং অনতিকাল পরেই ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসিয়া থাকিয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, বেলা যায় ; তুমি সেখানে যাবে না ?

কোথায়, শ্রীকান্ত ?

তোমার দিদিকে টাকা দিতে যাবে না ?

দিদির জন্যেই ত ব'সে আছি। এই ত তাঁর বাড়ী।

এই তোমার দিদির বাড়ী ? এরা ত সাপুড়ে—মুসলমান !

ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই, চাপিয়া গিয়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড় ব্যথায় একেবারে যেন ম্লান হইয়া গেল। একটু পরেই কহিল, একদিন তোকে সব কথা বল্‌ব। সাপ খেলাব দেখবি, শ্রীকান্ত ?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—তুমি সাপ খেলাবে কি ? কামড়ায় যদি ?

ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধন আল্‌গা করিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম, ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখরো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না ; শুধু ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে গোখরো সাপই খেলাইবে ; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া বাঁশী বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে-সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখরো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রের হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্ রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশীর লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালী করিয়া কহিল,—এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়।

ভয়ে, বিরক্তিতে, রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল ; বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে ? ও বেরিয়ে যদি শাহ্‌জীকে কামড়ায় ?

ইন্দ্রের লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব ? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে ?

আমি বলিলাম, তা হ'লে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে।

ইন্দ্র নিরুপায়ভাবে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া বলিল, কামড়াক্ ব্যাটাকে। বুনো সাপ ধ'রে রাখে—গাঁজাখোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এই যে দিদি! এসো না, এসো না ; ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো—

আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম—যেন ভস্মাচ্ছাদিত

বহ্নি। যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটি-বাঁধা কতকগুলি শুক্‌নো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-সব্জী। পরণে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামা-কাপড় —গেরুয়া রঙে ছোপানো, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দু'গাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দুস্থানীর মত সিঁদুরের আয়তিচিহ্ন। তিনি কাঠের বোঝাটা নামাইয়া রাখিয়া আগড়টা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, কি?

ইন্দ্র মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে ঢুকেচে।

তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, তাই ত! সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেচে, এ ত বড় আশ্চর্য্য! কি বল শ্রীকান্ত? আমি অনিমেষ-দৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।—কিন্তু কি ক'রে সাপ ঢুকল ইন্দ্রনাথ?

ইন্দ্র বলিল, ঝাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েচে। একেবারে বুনো সাপ!

উনি ঘুমোচ্ছেন বুঝি?

ইন্দ্র রাগিয়া কহিল, গাঁজা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্চে; চেঁচিয়ে ম'রে গেলেও উঠবে না।

তিনি আবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর সেই সুযোগে তুমি শ্রীকান্তকে সাপ-খেলানো দেখাতে গিয়েছিলে, না? আচ্ছা, এসো, আমি ধ'রে দিচ্ছি।

তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহ্‌জীকে তুলে দাও—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া, ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

তাহার এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি টের পাইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য চোখ দুটি তাঁহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল।

কিন্তু গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, অত পুণ্যি তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে—এখ্খুনি ধ'রে দিচ্চি ত্থাখ—! বলিয়া বাঁশের মাচা হইতে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং একমিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

ইন্দ্র টিপ্ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, দিদি, তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে!

তিনি ডান হাত বাড়াইয়া ইন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া মুখ ফিরাইয়া বোধ করি অলক্ষ্যে একবার নিজের চোখ-দুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

পাঁচ

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে শুনিতে ইন্দ্রের দিদি হঠাৎ বার-দুই এমনি শিহরিয়া উঠিলেন যে, ইন্দ্রের সেদিকে যদি কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত, সে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি পাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন, ছি দাদা, এমন কাজ আর কখ্খনো ক'রো না। এসব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই? ভাগ্যে তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল, না হ'লে আজ কি কাণ্ড হ'ত বল ত?

আমি কি তেম্নি বোকা, দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস্ করিয়া তাহার কোঁচার কাপড়টা টানিয়া ফেলিয়া কোমরে সূতা-বাঁধা কি একটা শুক্না শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই ত্থাখো দিদি, আটঘাট বেঁধে রেখেচি কি না! এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত? শাহ্জীর কাছে এটুকু আদায় করতে আমাকে কি কষ্টই না পেতে হয়েছে! এ সঙ্গে থাকলে কেউ ত কামড়াতে পারেই না, আর তাই যদি বা কামড়াত—তাতেই বা কি! শাহ্জীকে টেনে তুলে তখ্খুনি বিষ-

পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা, দিদি, ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে? আধ ঘণ্টা? এক ঘণ্টা? না, অতক্ষণ লাগে না, না দিদি?

দিদি কিন্তু তেমনি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, আজ দাও না দিদি আমাকে একটি। তোমাদের ত দুটো তিনটে রয়েচে—আর আমি কতদিন ধ'রে চাইচি। —বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, আমাকে তোমরা যা' বল, আমি তাই করি—আর তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—যদি নাই দেবে, তবে ব'লে দাও না কেন? আমি আর আসব না—যাও।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে, তাঁর মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া একটুখানি হাসির ভাব সেই শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধরে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়ীতে শুধু সাপের মন্তর আর বিষ-পাথরের জন্যেই আসিস্ রে?

ইন্দ্র অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, তা না ত কি! নিদ্রিত শাহ্‌জীকে একবার আড়-চোখে চাহিয়া কহিল, কিন্তু ও কেবল আমাকে ভোগা দিচ্ছে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়; সেই যে কবে শুধু হাতচালার মন্তরটুকু দিয়েছিল, আর দিতেই চায় না! কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও কম নয়,—তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোসামোদ করচিনে দিদি, তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মন্তর আদায় ক'রে নেব বলিয়াই আমার প্রতি চাহিয়া, সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সাহজীকে উদ্দেশ করিয়া গভীর সম্ভ্রমের সহিত কহিল, শাহ্‌জী গাঁজা-টাজা খান বটে, শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসি মড়া আধ ঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, এতবড় ওস্তাদ উনি! হাঁ, দিদি, তুমিও মরা বাঁচাতে পারো?

দিদি কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা খিল্‌খিল্ করিয়া

হাসিয়া উঠিলেন। সে কি মধুর হাসি! অমন করিয়া হাসিতে আমি আজ পর্য্যন্ত কম লোককেই দেখিয়াছি। কিন্তু, সে যেন নিবিড় মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত পরক্ষণেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু ইন্দ্র সেদিক্ দিয়াই গেল না, বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল। সেও হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি সব জানো। কিন্তু আমাকে একটি একটি ক'রে তোমাকে সব বিদ্যে দিতে হবে, তা ব'লে দিচ্চি! আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের একেবারে গোলাম হয়ে থাক্‌ব। তুমি ক'টা মড়া বাঁচিয়েচ, দিদি?

দিদি বলিলেন, আমি ত মড়া বাঁচাতে জানিনে, ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মন্তর শাহ্‌জী দেয়নি?

দিদি ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিলে, মিনিটখানেক তাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজেই তখন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এ বিদ্যে কি কেউ শীগ্‌গির দিতে চায় দিদি! আচ্ছা, কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?

দিদি বলিলেন, কা'কে কড়ি-চালা বলে, তাই ত জানিনে ভাই!

ইন্দ্র বিশ্বাস করিল না। বলিল, ইস্! জান না বৈ কি! দেবে না, তাই বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনো দেখেচিস্ শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মন্তর প'ড়ে ছেড়ে দিলে, তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধ'রে, সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির ক'রে দেয়। এম্‌নি মন্তরের জোর! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধূলো-পড়া এ সব জান ত? আর যদি না-ই জানবে, ত অমন সাপটাকে ধ'রে দিলে কি ক'রে? —বলিয়া সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দিদির মুখপানে চাহিয়া রহিল।

দিদি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, শেষে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এ-সব কাণাকড়ির বিদ্যেও নেই। কিন্তু, কেন নেই, সে যদি তোরা বিশ্বাস করিস্ ভাই, তা' হ'লে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেঙ্গে ব'লে

আমার বুকখানা হাল্কা ক'রে ফেলি। বল্, তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি? বলিতে-বলিতেই তাঁহার শেষের কথাগুলি কেমন একরকম যেন ভারী হইয়া উঠিল।

আমি নিজে এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই কহি নাই। এইবার সর্ব্বাগ্রে জোর করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি। সব—যা' বলবে, সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করবে বই কি ভাই! তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে! যারা ইতর, তারাই শুধু অজানা অচেনা লোকের কথায় সন্দেহে ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া, আমি ত কখনও মিথ্যে কথা কইনে ভাই! বলিয়া তিনি আর একবার আমার প্রতি চাহিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ঝাপ্সা কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং তাহারই অস্ফুট কিরণ-রেখা গাছের ঘন-বিন্যস্ত ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়া নীচের গাঢ় অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ মনে করেছিলুম, আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব। কিন্তু ভেবে দেখচি, এখনও সে সময় আসেনি। আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস ক'রো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহ্‌জীর পিছনে-পিছনে ঘুরে বেড়িয়ো না—আমরা মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধ'রে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কি না জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।

কি জানি কেন, আমি এই অত্যল্পকালের পরিচয়েই তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু, এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, যদি পার না, তবে সাপ ধরলে কি ক'রে?

দিদি বলিলেন, এটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র,—কোন মন্ত্রের জোরে নয়! সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে।

ইন্দ্র বলিল, যদি জান না, তবে তোমরা দু'জনে জুচ্চুরি ক'রে, ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন?

দিদি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিলেন না; বোধ করি বা নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় কর্কশকণ্ঠে কহিল, ঠগ্ জোচ্চোর সব—আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।

অদূরেই একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। আমি তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত শাদা হইয়া গেল। সভয়ে, সসঙ্কোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে, ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা—।

ব্যবসা বার ক'রে দিচ্ছি—চল্ রে শ্রীকান্ত, জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা!—বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না; কারণ তাহার অনেকদিনের অনেক বড় আশা একেবারে চোখের পলকে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কিন্তু আমার দুই চোখ যে দিদির সেই দুটি চোখের পানে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। জোর করিয়া ইন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া লইয়া, পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এনেছিলাম দিদি—এই নাও।

ইন্দ্র ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা! জুচ্চুরি ক'রে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস্ শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, সেই আমি চাই।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না, ইন্দ্র, দাও—আমি দিদির নাম ক'রে এনেচি—

ওঃ—ভারি দিদি!—বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে গোলমালে শাহ্‌জীর নেশার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া?—বলিয়া উঠিয়া বসিল।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু শালা! রাস্তায় তোমায় দেখতে পেলে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। কেয়া হুয়া! বদমাস ব্যাটা কিচ্ছু জানে না—আর ব'লে বেড়ায় মন্তরের জোরে মড়া বাঁচাই! কখনো পথে দেখা হ'লে এবার ভাল ক'রে বাঁচাব তোমাকে! বলিয়া সে অমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে, শাহ্‌জী চমকাইয়া উঠিল।

তাহার একে নেশার ঘোর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড;—সেই যে সাধু ভাষায় বলে 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' হইয়া বসিয়া থাকা, ঠিক সেইভাবে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন সে বোধ করি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিষ্কার বাঙলা করিয়া ডাকিল, শোনো ইন্দ্রনাথ, কি হয়েচে, বল ত? আমি তাহাকে এই প্রথম বাঙলা বলিতে শুনিলাম!

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে ধোঁকা দিয়ে এতদিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও।

সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বললে?

ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ওই স্তব্ধ নতমুখী দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, ওই বললে, তোমার কাণা-কড়ির বিদ্যে নেই। বিদ্যে আছে শুধু জুচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী, চোর!

শাহ্‌জীর চোখদুটা ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই ভীষণ চোখের দৃষ্টিতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লোকটা তাহার এলোমেলো জটাটা বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, বলেচিস্ তুই?

দিদি তেমনি নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন।

ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, রাত্তির হচ্চে—চল্ না।

রাত্রি হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার পা যে আর নড়ে না। কিন্তু ইন্দ্র

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না, আমাকে প্রায় জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহ্‌জীর কণ্ঠস্বর আবার কাণে আসিল—কেন বললি?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই, অকস্মাৎ চারিদিকের সেই নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র আর্ত্তস্বর পিছনের আঁধার কুটীর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কাণে বিঁধিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল। সুমুখেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল, আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক—কিন্তু, নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট হইয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই ত সে কাঁটায় কাপড় বাধে, সে কাঁটা ছাড়াই ত আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায়; এমনি করিয়া অনেক কষ্টে অনেক বিলম্বে যখন কোনমতে শাহ্‌জীর বাড়ীর প্রাঙ্গণের ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি, সেই প্রাঙ্গণেরই একপ্রান্তে দিদি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে গুরু-শিষ্যের রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।

শাহ্‌জী লোকটা অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অপেক্ষাও কত বেশী শক্তিশালী, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধ হয়, সে এতবড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া, তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে, আমি বাধা না দিলে হয়ত সে যাত্রা শাহ্‌জীর সাপুড়ে-যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তর টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক্ করিলাম, তখন ইন্দ্রর অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজর পড়ে নাই যে, তাহার সমস্ত কাপড়-জামা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কহিল, শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্শা দিয়ে খোঁচা

মেরেচে—এই ছাখ্। জামার আস্তিন তুলিয়া দেখাইল, বাহুতে প্রায় দুই তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাঁদিস্‌নে—এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বেঁধে—এই খপরদার! ঠিক অমনি বসে থাকো। উঠলেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে ব'ার করব—হারামজাদা শূয়োর! নে, তুই টেনে বাঁধ্—দেরী করিস্‌নে। বলিয়া সে চড়্‌চড়্‌ করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। আমি কম্পিতহস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং শাহ্‌জী অদূরে বসিয়া মুমূর্ষু বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন করতে পারো। আমি তোমার হাত বাঁধব।—বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া-টানিয়া তাহার দুই হাত জড় করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্য্যন্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, কি নিমকহারাম শয়তান এই ব্যাটা! বাবার কত টাকা যে চুরি ক'রে একে দিয়েছি আরও কত হয় ত দিতাম, যদি না দিদি আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ঐ বল্লমটা আমাকে ছুঁড়ে মেরে বসল! শ্রীকান্ত, নজর রাখ্, যেন না ওঠে—আমি দিদির চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিই।

জলের ঝাপটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হ'লে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল-পরকাল মাটি করব না, সেইদিন থেকে ঐ শয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেছে, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে, ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্চে—তবু কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি একে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব—না হ'লে দিদিকে ও খুন ক'রে ফেলবে—ও খুন করতে পারে!

আমার মনে হইল, লোকটা যেন এই কথায় শিহরিয়া মুখ তুলিয়া

চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। সে একটি নিমেষ মাত্র। কিন্তু অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা তাতে এমনি পরিস্ফুট হইতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আজিও তাহার তখনকার সেই মুখের চেহারাটা স্পষ্ট মনে করিতে পারি।

আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত করিবেই, পরন্তু, উদ্ভট-কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইতস্ততঃ করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ সত্যের উপর না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না। প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ৎ নিজের কোন জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া টানিয়া ধরিতে থাকে।

যাক সে কথা। দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ করি দ্বিপ্রহর। তাঁহার বিহ্বল ভাবটা ঘুচাইতে আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তার পরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, ধীরে-ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহ্‌জীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে।

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে, তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া, তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর্ ভাই, আর কখনো এ বাড়ীতে আসিস্‌নে। আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্‌নে।

ইন্দ্র প্রথমটা অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তা বটে! আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু না। আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেচি, তাতেই তোমার এত রাগ! এমন না হ'লে কলিকাল বলেচে কেন? কি নেমকহারাম তোমরা দু'জন! আয় শ্রীকান্ত, আর না।

দিদি চুপ করিয়া রহিলেন—একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না। কেন যে করিলেন না, তাহা পরে যত বেশীই বুঝিয়া থাকি না কেন,

তখন বুঝি নাই। তথাপি, আমি অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সেই টাকা পাঁচটি খুঁটির কাছে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্রের অনুসরণ করিলাম। ইন্দ্র প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, হিঁদুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্ম্মকর্ম্ম! চুলোয় যাও—আর আমি খোঁজ করব না, খবরও নেব না—হারামজাদা নচ্ছার! বলিয়া দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

দু'জনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।

শ্মশানের সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই পথ দিয়াই এখনও চলিয়াছি; কিন্তু কেন জানি না, আজ আমার ভয়ের কথাও মনে আসিল না। বোধ করি, মন আমার এমনি বিহ্বল আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, এত রাত্রে কেমন করিয়া বাড়ী ঢুকিব এবং ঢুকিলেও যে কি দশা হইবে, সে চিন্তাও মনে স্থান পাইল না।

প্রায় শেষ-রাত্রে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, বাড়ী যা, শ্রীকান্ত! তুই বড় অপয়া! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না-একটা ফ্যাসাদ বাধে। আজ থেকে তোকে আর আমি কোন কাজে ডাকব না—তুইও আর আমার সামনে আসিস্‌নে। যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দেখিতে দেখিতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জ্জন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছয়

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সে তাহার কোন মূল্যই

দিল না। পরের বাড়ীর যে কঠিন শাসনপাশ উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারও এতটুকু মর্য্যাদা রাখিল না। উপরন্তু অপয়া, অকর্ম্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিঁধিয়াছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা করাও বাহুল্য। তারপরে অনেকদিন সেও আর সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথে-ঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকেই শুধু সারাদিন তুষের আগুনে দগ্ধ করিত—তাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত? ছেলে-মহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল-ক্রিকেটের দলের কর্ত্তা, জিম্‌ন্যাষ্টিকে আখড়ার মাষ্টার, তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত! আমি ত তাহার তুলনায় কিছুই নয়। তবে—কেনই বা দু'দিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলিয়া ডাকিল, কেনই বা বিসর্জ্জন দিল! কিন্তু সে যখন দিল, তখন আমিও টানাটানি করিয়া বাঁধিতে গেলাম না। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গী-সাথীরা যখন ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত আশ্চর্য্য গল্প সুরু করিয়া দিত, আমি চুপ করিয়া শুনিতাম। একটা কথার দ্বারাও কখনও ইহা প্রকাশ করি নাই যে, সে আমাকে চিনে, কিম্বা আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানি। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড়' ও 'ছোট'র বন্ধুত্ব সচরাচর এমনি দাঁড়ায়। বোধ করি, ভাগ্যবশে পরবর্ত্তী জীবনে অনেকে 'বড়' বন্ধুর সংস্পর্শে আসিব বলিয়াই ভগবান দয়া করিয়া এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়াছিলেন যে, কখনও কোন কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য্য করিতে না যাই! গেলেই যে দেখিতে দেখিতে 'বন্ধু' প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্ব-পাশ দাসত্বের বেড়ী হইয়া 'ছোট'র পায়ে বাজে, এই দিব্যজ্ঞানটি এত সহজে এমন সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম বলিয়া লাঞ্ছনার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছি।

তিন চারি মাস কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তা' বেদনা এক পক্ষের যত নিদারুণই হোক—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

দত্তদের বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইতেছে। মেঘনাদবধ হইবে। ইতিপূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার চোখে বেশী দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়াও নাই, বিশ্রামও নাই। ষ্টেজ-বাঁধার সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি; শুধু তাই নয়, যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্তদিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রামচন্দ্র কতবার আসিলেন—গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতেও পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হইয়া গেলে, নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গেলাম! সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্য্যয় কাণ্ড। তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নাই। অনেকদিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারান পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ-সিন উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প স্বল্প

বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত ষ্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল--ফুট-লাইটের গোটা-পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তাহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ-বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ-বা সিন্ ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইল না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেণ্টুলানের মুখ চাপিয়া, ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেক অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছি মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়,—শুধু ডান হাত এবং তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে-যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি, এমন সময়ে পিঠের উপর একটা আঙ্গুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি—ইন্দ্র। চুপি-চুপি কহিল,—আয় শ্রীকান্ত, দিদি একবার তোকে ডাকচেন। তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা খাড়া হইয়া উঠিলাম। কোথায় তিনি?

বেরিয়ে আয় না—বলচি। পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, আমার সঙ্গে আয়।—বলিয়া চলিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাঁধা আছে—নিঃশব্দে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বাহিয়া দু'জনে শাহ্‌জীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি, রাত্রি আর বেশী নাই।

একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহ্‌জীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ লম্বা হইয়া আছে। দিদি মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। আজ দুপুরবেলা কাহার বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে। সেখানে ঐ সাপটিকে ধরিয়া যাহা বক্‌সিস্ পায়, তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরিয়া, দিদির পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাঙ্গ করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিবার সময় মদের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহ্‌জীর গলায় উপর তীব্র চুম্বন দিয়াছে।

দিদি তাঁহার মলিন অঞ্চলপ্রান্তে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তাঁর চৈতন্য হ'ল যে, সময় আর বেশী নাই। বললেন, আয় দু'জনে একসঙ্গেই যাই, ব'লে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধ'রে দুই হাত দিয়ে তাকে টেনে টেনে ঐ অতবড় ক'রে ফেলে দিলেন। তারপরে দু'জনেরই খেলা সাঙ্গ হ'ল। বলিয়া তিনি হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহ্‌জীর মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া, গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যাক, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনে।

আমরা উভয়েই নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে কণ্ঠস্বরে যে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই যে, জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য?

একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ভাই; তাই এই ভিক্ষে করি, এঁর একটু তোমরা উপায় ক'রে দিয়ে যাও। আঙুল দিয়া কুটীরের দক্ষিণদিকের জঙ্গলটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে একটু জায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ। আমি অনেকদিন ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শুয়ে

থাকতে পাই। সকাল হ'লে সেই জায়গাটুকুতে এঁকে শুইয়ে রেখো ভাই, অনেক কষ্টই এ-জীবনে ভোগ ক'রে গেছেন—তবু একটু শান্তি পাবেন।

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, শাহ্‌জীকে কি কবর দিতে হবে?

দিদি বলিলেন, মুসলমান যখন, তখন দিতে হবে বৈ কি ভাই!

ইন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, দিদি, তুমিও কি মুসলমান?

দিদি বলিলেন, হাঁ, মুসলমান বৈ কি।

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বেশ দেখিতে পাইলাম, এ জবাব সে আশা করে নাই। দিদিকে সে বাস্তবিকই ভালবাসিয়াছিল। তাই বোধ করি, মনের মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার দিদি তাহাদেরই একজন। আমার কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তাঁহার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না যে, তিনি হিন্দুকন্যা নহেন।

বাকী রাতটুকু কাটিয়া গেল, ইন্দ্র সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল এবং তিনজনে ধরাধরি করিয়া শাহ্‌জীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষ-শয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাত নীচেই জাহ্নবী-মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্য লতার আচ্ছাদন। প্রিয়বস্তুকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—আর একজন আমাদের কোলের কাছে মৃত্তিকাতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—নীচে মন্দস্রোতা ভাগীরথীর কুলুকুলু শব্দ কাণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল—মাথার উপরে আশে-পাশে বনের পাখীরা প্রভাতী গাহিতে লাগিল। কাল যে ছিল, আজ সে নাই। কাল কে ভাবিয়াছিল, আজ এমনি করিয়া আমাদের নিশাবসান হইবে! কে জানিত, একজনের শেষমুহূর্ত্ত এত কাছেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণকণ্ঠে কাঁদিয়া

উঠিলেন,—মা গঙ্গা, আমাকে পায়ে স্থান দাও মা। আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই। তাঁহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক সত্য, তাহা তখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই, যেমন দু'দিন পরে পারিয়াছিলাম। ইন্দ্র একবার আমার মুখের পানে চোখ তুলিল, তারপর উঠিয়া গিয়া সেই আর্ত্ত নারীর ভূ-লুণ্ঠিত মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাঁহারই মত আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, দিদি, আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে ফেলবেন না—কোলে টেনে নেবেন। তাঁর বড় মায়ার শরীর, একবার শুধু তাঁর কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।

দিদি কথা কহিলেন না। মূর্চ্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তারপর উঠিয়া আসিয়া তিনজনে গঙ্গাস্নান করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গালার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মাটী দিয়া সিঁথির সিন্দুর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহ্‌জী তাঁর স্বামী ছিলেন।

ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না; সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে, দিদি!

দিদি বলিলেন, হাঁ, বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন?

দিদি বলিলেন, সে-কথা ঠিক জানিনে ভাই। কিন্তু তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেইসঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী বই ত নয়। নইলে আমি নিজে হ'তে জাতও দিইনি—কোনদিন কোন অনাচারও করিনি।

ইন্দ্র গাঢ়স্বরে কহিল, সে আমি দেখেচি দিদি—সেইজন্যেই আমার যখন তখন এই কথাই মনে হয়েছে—আমাকে মাপ ক'রো দিদি, তুমি কি

ক'রে এর মধ্যে আছ—তোমার কেমন ক'রে এমন তুর্ম্মতি হয়েছিল ! কিন্তু, এখন আমি কোন কথা শুনব না, আমাদের বাড়ীতে তোমাকে যেতেই হবে। এখনি চল।

দিদি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে, ইন্দ্রনাথ !

কেন পার না, দিদি ?

দিদি বলিলেন, আমি জানি, তিনি কিছু-কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলো শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।

ইন্দ্র হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল,—সে আমিও জানি। তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা। কিন্তু তোমার তাতে কি ? কার সাধ্যি তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে ? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমায় আটকায় দেখি একবার !

অত তুঃখেও দিদি একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক ক'রে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম্ম। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ। সে পাওনাদারকে তুমি কি ক'রে বাধা দেবে ভাই ! তা হয় না। আজ তোমরা বাড়ী যাও—আমার অল্প-স্বল্প যা-কিছু আছে বিক্রী ক'রে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি। কাল-পরশু একদিন এসো।

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলাম। এইবার কথা কহিলাম। বলিলাম, দিদি, আমার কাছে বাড়ীতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আস্‌ব ?

কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া, মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, না দাদা, আর এনে কাজ নেই। তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দয়া আমি মরণ পর্য্যন্ত মনে রাখব ভাই। আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই, তোমার বুকের ভিতরে ব'সে ভগবান চিরদিন যেন অমনি ক'রে তুঃখীর

জন্যে চোখের জল ফেলেন। বলিতে বলিতেই তাঁহার দু'চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা আটটা-নয়টার সময় আমরা বাটীতে ফিরিতে উদ্যত হইলে, সেদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিলেন। যাইবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্ব্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্ব্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে-মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার ক'রে নেন?

ইন্দ্রকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সত্বেও ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতেই মন সরচে না। আমার কি জানি কেন, কেবলি মনে হচ্চে, তোমাকে দেখতে পাব না।

দিদি জবাব দিলেন না—সহসা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। কিন্তু একটিবারও আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না—তেম্নি মাথা নত করিয়া একভাবে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেলেন। অথচ কেন যে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহা দু'জনেই মনে-মনে অনুভব করিলাম।

তিনদিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাহির হইয়া দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ছেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি তো দেখিই নাই—বোধ করি, আর কেহও দেখে নাই। ইসারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া ইন্দ্র বলিল,—দিদি নেই—কোথায় চ'লে গেছেন। আমার মুখের প্রতিও আর সে চাহিয়া দেখিল না। কহিল,

কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেচি, কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন—এই নে, বলিয়া একখানা ভাঁজকরা হল্‌দে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বোধ করি, হৃদয় তাহার এতই পীড়িত, এতই শোকাতুর হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গ বা কাহারও সহিত আলোচনা তাহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানেই আমি ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঁজ খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলাম। চিঠিতে যাহা লেখা ছিল, এতকাল পরে তাহার সমস্ত কথা যদিচ মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি। চিঠিতে লেখা ছিল,—শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব ততদিন তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিব। কিন্তু, আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিও না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি; কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিও। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝিতে পারিবে, তাহা নয়; কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে, সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই ত তোমাদের কাছে বলিয়া যাইতে পারিতাম। অথচ কেন যে বলি নাই,—বলি-বলি করিয়াও কেন চুপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটাই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা—শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তাও ভাল কথা নয়। এ-জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পরজন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-গ্লানি করিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিয়াই যে, বলিতে আর দোষ নাই সে মনে করি না। অথচ কেন জানি না, আমার এই অন্তবিহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়াও কোনমতে বিদায় লইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা। স্বামীর নাম

কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ—এই লেখাটুকুর শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই! আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন—ইঁহাকেই হত্যা করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হ'ন! এ দুষ্কর্ম্ম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ, আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক, বল ত শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড়! এ লজ্জা কি মর্ম্মান্তিক! তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে জ্বালা আজও তোমার দিদির থামে নাই। যাক সেকথা। তার পরে সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমি স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল, অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই। কারণ, স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই। পিতাকে চিনিতাম; তিনি কোনমতেই তাঁর সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁহাকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা' ছাড়া আমি মুসলমানী।

এখানে স্বামীর ঋণ যাহা ছিল পরিশোধ করিয়াছি। আমার কাছে লুকানো দু'টি সোনার মাকড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি, তুমি যে পাঁচটি

টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই ; আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদীর দোকান আছে, তাহার কর্ত্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে। মনে দুঃখ করিও না ভাই! টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পূরিয়া লইয়া গেলাম। আর এইটি তোমার দিদির আদেশ, শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিও না। মনে করিও, তোমার দিদি যেখানেই থাকুক ভালই থাকিবে—কেন না, দুঃখ সহিয়া-সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তারগায়ে লাগে না। তাকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারে না। আমার ভাই দুটি, তোমাদের আমি কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই না। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পতিব্রতার যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।

তোমাদের দিদি

অন্নদা

সাত

আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটি ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দুটি সোনার মাক্‌ড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকাকয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, বহু মাক্‌ড়ি দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রী করিয়া শাহ্‌জীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন তাহা জানি না। এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ মুখে-মুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে-পাঁচ আনা পয়সা ছিল। অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন। পাছে তাঁহার সেই স্নেহাস্পদ বালক দুইটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়, এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায়, কাহাকেও

জানিতে পর্য্যন্ত দেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা পাঁচটি নিলেন না! অথচ নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে গর্ব্বে কত দিন কত আকাশকুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহাই এই বুড়ার কাছে লুকাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলাম। বার বার বলিতে লাগিলাম, ইন্দ্রর কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না—যাবার সময় না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নাই। বড় হইয়া বুঝিয়াছি আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, তাঁহাকে দান করিতে পাইব! সেই জ্বলন্ত শিখায় যাহা আমি দিব, তা'ই বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে বলিয়াই দিদি আমার দান প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র। ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রস্তুত যে, সে যেখানে দান করিবে, আমি সেখানে হাত বাড়াইব! তা ছাড়া ইহাও ত বুঝিতে পারি, দিদি কাহার মুখ চাহিয়া সেই ইন্দ্রের কাছেও হাত পাতিয়াছিলেন। যাক্ সেকথা।

তার পরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি; কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসিমুখখানি চিরদিন তেম্‌নই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্ম্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি। তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারীজাতিকে কর্ত্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছ—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি; কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম্ম নিলে—সমাজ, সংসার, সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি

ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই—তাঁকে, তাঁর বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া! বেশ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?

হায় রে! কোথায় তাঁহার এইসব আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র—এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সেদেশ যেখানে যতদূরেই হোক, এ দেশের বাহিরে হইলেও, হয়ত একদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের অন্নদা! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদদর যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছ, সকালবেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াইতে পারিবে।

তবে, আমি একটা বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী, তিনি ছাড়া জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।

তার পর অনেকদিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙ্গি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিন মাত্র আমরা উভয়ে সেই নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ! তার পরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকাযাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়—সে দিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকট দৃষ্টান্ত

দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সে কথাটাই বলিব।

সেদিন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক-পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, ···তে থিয়েটার হবে, যাবি?

থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় প'রে শীগ্‌গির আমাদের বাড়ী আয়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেণে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ীর গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত-বা সময়ে উপস্থিত হইতেই পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে, দেরী হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেচেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া, পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রের নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্‌চকে পাম্প্ সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কি রে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম—শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী—কান্ত—! শুধু কান্ত।

নে, তামাক সাজ্। ইন্দ্র, হুঁকো-কল্‌কে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে, তামাক সাজুক।

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গী করিয়া কেহ আদেশ করে না! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর্, আমি তামাক সাজচি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রের মাসতুতো ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল-এ. পাশ করিয়াছেন। কিন্তু, মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্ন-মুখে টানিতে-টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস্ কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা র‍্যাপারের কি শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়! ফুটচে—পেতে দে দেখি, বসি।

আমি দিচ্ছি, নতুনদা। আমার শীত করচে না—এই নাও; বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়—আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা, এ যে ভারী মুস্কিল হ'ল, হাওয়া প'ড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।

কলিকাতাবাসী নতুনদাদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এই রেত্ ঠেলে উজোন ব'য়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া নতুনদা একমুহূর্ত্তেই একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন,—তবে আন্‌লি কেন হতভাগা? যেমন ক'রে হোক, তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ ক'রে ধরেচে।

ইন্দ্র কহিল, তাদের বাজাবার লোক আছে, নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়ম! চল্, যেমন ক'রে পারিস্ নিয়ে চল্। বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গী করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইঁহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সেকথার প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রের অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?

কথাটা শেষ হইতে না-হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত-মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজিও মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে! জানোয়ারের মত ব'সে থাকা হচ্ছে কেন?

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া ক'রতে পারবেন না।

ইন্দ্র বলিতে গেল, না খুলে—

হ্যাঁ! দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি! নে—যা করচিস্ কর্।

বস্তুতঃ, আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী

ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে-চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ,—গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে-দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিক চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দু'টা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোট্টা-মোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?

ইন্দ্র কহিল, সাম্‌নেই একটা বেশ বড় বস্তি, নতুনদা, সব জিনিষ পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐঃ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাস্‌নে? ইন্দ্র, বল্ না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতে-ছিলাম, তেমনিভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙ্গি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দু'জনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হাত-পা একটু খেলানো চাই। নামা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র-সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দু'জনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ, বুঝিয়াছিলাম এত রাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না! অথচ তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, চল না নতুনদা,

একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে; এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।

নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয়! আমরা দর্জ্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে, তা জানিস্। কিন্তু তা' ব'লে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে-মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজী হইলাম না; ইন্দ্রের সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জ্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন—ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা—

আমরা অনেকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকিসুরে সঙ্গীতচর্চ্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে-মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে-ধীরে কহিল, এরা কলকাতার লোক কিনা, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝলি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম, হুঁ।

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই—দিতে-দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি-এ. পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি, কিম্বা আদৌ সে-কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন আর কোন কালে নয়, অথচ ঘণ্টা-কয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে

ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্ব্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ-থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক্ সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে পথ-ঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদীর দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী, সেকথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী নিষ্কর্ম্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর-নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জ্জুন জয়দ্রথবধের পরিবর্ত্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞাপাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া এবং যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া আধ ঘণ্টা পরে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! 'দর্জ্জিপাড়া'র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দু'জনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—নতুনদা! কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারম্বার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে-মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ারে'র জ্বালায় সময়ে-সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে! ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র

ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এতবড় অভিশাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছুদূরে বালুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্‌ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু'র এক পাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল,—শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেচেন যে! আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না। তখন ধীরে-ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদীর দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন, এইদিকের কুকুরগুলাও যে সমবেত আর্ত্ত-চীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। এখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে, নেকড়ে-গুলা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব।

আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম,—পাগল হয়েচ ভাই!

ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না, ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক্‌, শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়ীতে খবর দিস্‌—আমি চল্‌লুম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর; কিন্তু চোখ-দুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দু'টো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না—সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চিরপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া, বাধা দিব! যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা হোক একটা কিছু হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম।

এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল; বলিল, তুই ক্ষেপেচিস্, শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া একমুহূর্ত্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোনমতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কি, ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুনদাকে আনতে চাইনি। কিন্তু, একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু আমারও ত যাওয়া চাই। কারণ পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাকবিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইলাম।

ইন্দ্র কহিল, বালির ওপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার—সে চেষ্টা করিস্‌নে—জলে গিয়ে পড়্‌বি।

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেকদূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা!

নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন,—এই যে আমি।

দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম। কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার দর্জ্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার পায়ে একটা বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি,—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে

সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন্‌-ঠুন্‌-পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীত-চর্চ্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অশ্রুতপূর্ব্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই দুর্দ্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতলজলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া, এই অর্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও সে রাত্রে আমাকে কম মেহন্নত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প ?

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য, একে একে পুনঃ-পুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং সে-রাত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্ব্বোধের মত সে সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে তা ধূলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটী হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এ সব কখনো চোখ্‌খে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রাম বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্ব্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দু'টার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্ব্বে মূর্চ্ছিত

হইতেছিলেন, সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে-করিতে—পা মুছিতেও ঘৃণা হয়, তাহা পুনঃ-পুনঃ শুনাইতে-শুনাইতে, ইন্দ্রর খানি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হৌক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্র-কবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া, আজ নৌকা-চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জ্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া, কাঁপিতে-কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

আট

লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়েই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, এই সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত তাহারা একটির পর একটি, শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই! আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলিই বজায় আছে? তাও ত নাই। কতক হারাইয়া গিয়াছে টের পাই—কিন্তু, তবু ত শিকল ছিঁড়িয়া যায় না! কে তবে নূতন করিয়া এ সব জোড়া দিয়া রাখে?

আরও একটা বিস্ময়ের বস্তু আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জীবনের প্রধান ও মুখ্য ঘটনাগুলিই ত কেবল মনে থাকিবারই কথা। কিন্তু তাও ত দেখি না। ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ একসময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না-জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে, এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। অতএব, বলিবার সময়েও ঠিক তাহা ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ, কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ৎ আমি পাঠককে দিতে পারিব না,—শুধু যা ঘটে, তাহা জানাইয়া দিলাম।

এমনি একটা তুচ্ছ বিষয় যে মনের মধ্যে এতদিন নীরবে, এমন সঙ্গোপনে, এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া আমি নিজেও বড় বিস্মিত হইয়া গেছি। সেইটাই আজ পাঠককে বলিব। অথচ, জিনিষটি ঠিক কি, তাহার সমস্ত পরিচয়টা না দেওয়া পর্য্যন্ত, চেহারাটা কিছুতেই পরিষ্কার হইবে না। কারণ, গোড়াতেই যদি বলি—সে একটা 'প্রেমের ইতিহাস'—মিথ্যাভাষণের পাপ তাহাতে হইবে না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা নিজের চেষ্টায় যতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, আমার ভাষাটা হয় ত তাহাকেও ডিঙ্গাইয়া যাইবে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বলা আবশ্যক।

সে বহুকাল পরের কথা। দিদির স্মৃতিটাও তখন ঝাপ্সা হইয়া গেছে। যাঁর মুখখানি মনে করিলেই, কি জানি কেন, প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা আপনি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত, সে দিদিকে আর তখন তেমন করিয়া মনে পড়িত না। এ সেই সময়ের কথা। এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাঁর শিকার-পার্টিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এঁর সঙ্গে অনেকদিন স্কুলে পড়িয়াছি, গোপনে অনেক আঁক কষিয়া দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তার পরে এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলেদের স্মৃতিশক্তি কম, তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শুরু করিবেন, ভাবি নাই। মাঝে হঠাৎ একদিন দেখা। তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তার পরে —ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কাণে গিয়াছে—অতিরঞ্জিত হইয়াই গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই, এবং আরও এত প্রকারের গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত। তবে কি না, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা আপনার লোকের সুখ্যাতিটা একটু বাড়াইয়া করে, না হইলে, সত্যসত্যই যে অতখানি বিদ্যা অমন বেশী পরিমাণে ওই বয়সটাতেও অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলাম, সে অহঙ্কার করা আমার শোভা পায় না। অন্ততঃ একটু বিনয় থাকা ভাল।

কিন্তু যাক সে কথা। শাস্ত্রকারেরা বলেন, রাজা-রাজড়ার সাদর আহ্বান

কখনো উপেক্ষা করিবে না। হিঁদুর ছেলে, শাস্ত্র অমান্য করিতে ত আর পারি না। কাজেই গেলাম। স্টেশন হইতে দশ বারো ক্রোশ পথ গজপৃষ্ঠে গিয়া দেখি, হাঁ, রাজপুত্রের সাবালকের লক্ষণ বটে। গোটা-পাঁচেক তাঁবু পড়িয়াছে। একটা তাঁর নিজস্ব, একটা বন্ধুদের, একটা ভৃত্যদের, একটায় খাবার বন্দোবস্ত। আর একটা অমনি একটু দূরে—সেটা দুই ভাগ করিয়া জন-দুই বাইজী ও তাঁর সঙ্গোপাঙ্গদের আড্ডা।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপুত্রের খাস-কামরায় অনেকক্ষণ হইতেই যে সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়াছে, তাহা প্রবেশমাত্রই টের পাইলাম। রাজপুত্র অত্যন্ত সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। এমন কি, আদরের আতিশয্যে দাঁড়াইবার আয়োজন করিয়া তিনি তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা বিহ্বল-কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু, সেটা, তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে অপরিচয়ের জন্য বাধে না।

এই বাইজীটি পাটনা হইতে অনেক টাকার সর্ত্তে দুই সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। এইখানে রাজকুমার যে বিবেচনা এবং যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাইজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গাহিতে জানে।

আমি প্রবেশ করিতেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। তার পরে সময়োচিত বাক্যালাপ ও আদব-কায়দা সমাপন করিতে কিছুক্ষণ গেল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফর্মাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই বুঝিলাম, এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যাহোক একটু ঝাপ্সা দেখি, আর সবাই ছুঁচোর মত কাণা।

বাইজী প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পয়সার লোভে অনেক কাজই পারা যায় জানি; কিন্তু, এই নিরেটের দরবারে বীণা-বাজানো বাস্তবিকই এতক্ষণ তাহার একটা সুকঠিন কাজ হইতেছিল। এইবার একজন সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। তার পরে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত যেন শুদ্ধমাত্র আমার জন্যই, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য্য ও কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য্য দিয়া

আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল।

বাইজী পাটনার লোক—নাম পিয়ারী। সে রাত্রে আমাকে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি, এমন আর সে কখনও শুনায় নাই। মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল,—বেশ!

পিয়ারী মুখ নীচু করিয়া হাসিল! তারপর দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—সেলাম করিল না। মজলিস রাত্রির মত শেষ হইয়াছিল।

তখন দলের মধ্যে কেহ সুপ্ত, কেহ তন্দ্রাভিভূত—অধিকাংশই অচৈতন্য। নিজের তাঁবুতে যাইবার জন্য বাইজী যখন তাহার দলবল লইয়া বাহির হইতেছিল, আমি তখন আনন্দের আতিশয্যে হিন্দী করিয়া বলিয়া ফেলিলাম,—বাইজী, আমার বড় সৌভাগ্য যে তোমার গান দু'সপ্তাহ ধ'রে শুনতে পা'ব।

বাইজী প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, টাকা নিয়েছি, আমাকে ত গাইতেই হবে ; কিন্তু আপনি এই পনের-ষোল দিন ধ'রে এঁর মোসাহেবি করবেন? যান, কালকেই বাড়ী চ'লে যান।

কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি, কাঠ হইয়া গেলাম এবং কি জবাব দিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই বাইজী বাহির হইয়া গেল।

সকালে সোরগোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। মদ্য-মাংসের আয়োজনটাই সবচেয়ে বেশী। সঙ্গে জন-দশেক শিকারী অনুচর। বন্দুক পনেরটা—তার মধ্যে ছয়টা রাইফেল। স্থান—একটা আধশুক্‌নো নদীর উভয় তীর। এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ক্রোশ ব্যাপিয়া বড় বড় শিমুল গাছ—ওপারে বালুর উপর স্থানে স্থানে কাশ ও কুশের ঝোপ। এইখানে এই পনেরটা বন্দুক লইয়া শিকার করিতে

হইবে। শিমুলগাছে-গাছে ঘুঘু গোটাকয়েক দেখিলাম, মরা নদীর বাঁকের কাছটায়ও দুটো চকা-চকী ভাসিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইবেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতে-করিতেই সবাই দুই-এক পাত্র টানিয়া লইয়া দেহ ও মন বীরের মত করিয়া লইলেন। আমি বন্দুক রাখিয়া দিলাম। একে বাইজীর খোঁচা খাইয়া রাত্রি হইতেই মনটা বিকল হইয়াছিল, তাহাতে শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, কি হে কান্ত, তুমি যে বড় চুপচাপ? ও কি, বন্দুক রেখে দিলে যে!

আমি পাখী মারি না।

সে কি হে? কেন, কেন?

আমি গোঁফ ওঠবার পর থেকে আর ছর্‌রা দেওয়া বন্দুক ছুঁড়িনি—ও আমি ভুলে গেছি।

কুমার-সাহেব হাসিয়াই খুন। কিন্তু সে হাসির কতটা দ্রব্যগুণে, সে কথা অবশ্য আলাদা।

সূরযুর চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অবর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি আমি আসিয়াই শুনিয়াছিলাম। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, চিড়িয়া শিকারমে কুছ্ সরম হ্যায়?

আমারও মেজাজ ত ভাল ছিল না, সুতরাং জবাব দিলাম, সবাইকার নেহি হ্যায়, কিন্তু আমার হ্যায়। যাক, আমি তাঁবুতে ফিরিলাম; কুমার-সাহেব, আমার শরীরটা ভাল নেই, বলিয়া ফিরিলাম। ইহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে মুখ ভ্যাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

তখন সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরিয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছি এবং আর এক পেয়ালা চা আদেশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি,—বেহারা আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল বাইজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ করিতে চায়?

তা' জানিনে।

তুমি কে?

আমি বাইজীর খানসামা।

তুমি বাঙ্গালী?

আজ্ঞে হাঁ—পরামানিক। নাম রতন।

বাইজী হিন্দু?

রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাকব কেন বাবু?

আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল। পর্দ্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাইজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই—আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাইজী যে-ই হৌক, বাঙ্গালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ী পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে। ভিজা এলোচুল পিঠের ওপর ছড়ানো; হাতের কাছে পানের সাজ-সরঞ্জাম, সুমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া হাসিমুখে আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ব'সো। তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন, গুড়গুড়িটা নিয়ে যা। ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ব'সো না?

রতন আসিয়া গুড়গুড়ি লইয়া গেল। বাইজী কহিল, তুমি তামাক খাও তা জানি; কিন্তু দেবো কিসে? অন্য জায়গায় যা কর, তা কর; কিন্তু আমি জেনে শুনে আমার গুরগুড়িটা ত আর তোমাকে দিতে পারিনে। আচ্ছা, চুরুট আনিয়ে দিচ্চি—ওরে ও—

থাক্ থাক্; চুরুটে কাজ নেই, আমার পকেটেই আছে।

আছে? বেশ, তাহ'লে ঠাণ্ডা হ'য়ে একটু ব'সো, ঢের কথা আছে। ভগবান কখন যে কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তা' কেউ বলতে পারে না। স্বপ্নের অগোচর। শিকারে গিয়েছিলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে?

ভাল লা'গল না।

না লাগবারই কথা। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা। অনর্থক জীবহত্যা ক'রে কি আমোদ পায়, তা' তারাই জানে। বাবা ভাল আছেন?

বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন! মা?

তিনি আগেই গেছেন।

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল, তাহার চোখ দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল; কিন্তু সে হয় ত আমার মনের ভুল। কিন্তু, পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ভুল রহিল না যে, এই মুখরা নারীর চটুল ও পরিহাস-লঘু কণ্ঠস্বর সত্য-সত্যই মৃদু এবং আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। কহিল, তা, হ'লে যত্ন-টত্ন করবার আর কেউ নেই বলো। পিসীমার ওখানেই আছ ত? নইলে আর থাকবেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি, সে ত দেখতেই পাচ্ছি। পড়াশুনা করচ না, তাও ঐ-সঙ্গে শেষ ক'রে দিয়েচ?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার কৌতূহল এবং প্রশ্নমালা আমি যথাসাধ্য সহ্য করিয়া গিয়াছি। কিন্তু শেষ কথাটা কেমন যেন হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। বিরক্ত এবং রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, আচ্ছা, কে তুমি? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেছি ব'লেও ত মনে হয় না। আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানতে চাইছই বা কেন? আর জেনেই বা তোমার লাভ কি?

বাইজী রাগ করিল না, হাসিল; কহিল লাভ-ক্ষতিই কি সংসারে সব? মায়া, মমতা, ভালবাসাটাসা কি কিছু নেই? আমার নাম পিয়ারী, কিন্তু—আমার মুখ দেখেও যখন চিনতে পারলে না, তখন ছেলেবেলার ডাকনাম শুনেই কি আমাকে চিনতে পারবে? তা' ছাড়া আমি তোমাদের—ও গ্রামের মেয়েও নই।

আচ্ছা, তোমাদের বাড়ী কোথায় বল?

না, সে আমি ব'লব না।

তবে তোমার বাবার নাম কি, বল?

বাইজী জিভ কাটিয়া কহিল, তিনি স্বর্গে গেছেন। ছি ছি, তাঁর নাম কি আর মুখে উচ্চারণ ক'রতে পারি?

আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তা যদি না পারো, আমাকে চিনলে কি ক'রে, সেকথা বোধ হয় উচ্চারণ ক'রতে দোষ হবে না?

পিয়ারী আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, না, তাতে দোষ নেই। কিন্তু সে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

বলেই দেখ না?

পিয়ারী কহিল, তোমাকে চিনেছিলাম ঠাকুর, দুর্ব্বুদ্ধির তাড়ায়— আর কিসে? তুমি যত চোখের জল আমার ফেলিয়েছিলে, ভাগ্যি সূয্যিদেব তা শুকিয়ে নিয়েছেন, নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হ'য়ে থাকত! বলি, বিশ্বাস ক'রতে পারো কি!

সত্যই বিশ্বাস ক'রতে পারিলাম না। কিন্তু, সে আমারই ভুল। তখন কিছুতেই মনে পড়িল না যে, পিয়ারীর ঠোঁটের গঠনই এইরূপ—যেন সব কথাই সে তামাসা করিয়া বলিতেছে এবং মনে-মনে হাসিতেছে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্য-সত্যই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এতক্ষণে, কেমন করিয়া জানি না, আমার সহসা মনে হইল, সে নিজের লজ্জিত অবস্থা যেন সামলাইয়া ফেলিল। সহাস্যে কহিল, না ঠাকুর, তোমাকে যত বোকা ভেবেছিলুম, তুমি তা নও। এ যে আমার একটা বলার ভঙ্গী, তা তুমি ঠিক ধরেচ। কিন্তু তাও বলি, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও আমার এই কথাটা অবিশ্বাস ক'রতে পারেনি। তা' এতই যদি বুদ্ধিমান, তবে মোসাহেবি ব্যবসাটা ধরা হ'ল কেন? এ চাকরী ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না! যাও, চট্‌পট স'রে পড়।

ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলাম না। সহজভাবে বলিলাম,—চাকরী যতদিন হয় ততদিনই ভাল। ব'সে না থাকি, বেগার খাটি—জানো ত? আচ্ছা, এখন উঠি। বাইরের লোক হয় ত বা কিছু মনে ক'রে ব'সবে।

পিয়ারী কহিল, করলে সে ত তোমার সৌভাগ্য ঠাকুর! এ কি আর একটা আপশোষের কথা?

উত্তর না দিয়া যখন আমি দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সে অকস্মাৎ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু দেখো ভাই, আমার সেই

চোখের জলের গল্পটা যেন ভুলে যেয়ো না। বন্ধুমহলে, কুমার-সাহেবের দরবারে, প্রকাশ ক'রলে—চাই কি তোমার নসিবটাই হয় ত ফিরে যেতে পারে।

আমি নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য্য পরিহাস আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল।

স্বস্থানে আসিয়া, এক পেয়ালা চা খাইয়া, চুরুট ধরাইয়া, মাথা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করিয়া, ভাবিতে লাগিলাম—কে এ? আমার পাঁচবছর বয়সের ঘটনা পর্য্যন্ত আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি। কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারীকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ, এ আমাকে বেশ চিনে। পিসীমার কথা পর্য্যন্ত জানে? আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে। সুতরাং আর কোন অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না, অথচ, যেমন করিয়া পারে, আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায়। কিন্তু কিসের জন্য? আমার থাকা-না-থাকায় ইহার কি? তখন কথায়-কথায় বলিয়াছিল, সংসারে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত? ভালবাসাটাসা কিছু নাই? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার মুখের এই কথাটা মনে করিয়াও আমার হাসি পাইল; কিন্তু সমস্ত কথাবার্ত্তা ছাপাইয়া তাহার শেষ বিদ্রূপটা আমাকে যেন অবিশ্রান্ত মর্ম্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শিকারীর দল ফিরিয়া আসিল। চাকরের মুখে শুনিলাম, আটটা ঘুঘুপাখী মারিয়া আনা হইয়াছে। কুমার ডাকিয়া পাঠাইলেন; অসুস্থতার ছুতা করিয়া বিছানায় পড়িয়াই রহিলাম, এবং এই ভাবেই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ারীর গান এবং মাতালের বাহবা শুনিতে পাইলাম।

তার পরের তিনচারিদিন প্রায় একভাবেই কাটিয়া গেল। 'প্রায়' বলিলাম—কারণ, এক শিকার করা ছাড়া আর সমস্তই একপ্রকার। পিয়ারীর অভিশাপ ফলিল না কি, প্রাণিহত্যার প্রতি আর কাহারো কোন উৎসাহই দেখিলাম না। কেহ তাঁবুর বাহির হইতেই যেন চাহে না। অথচ, আমাকেও ছাড়িয়া দেয় না। আমার পলাইবার আর যে কোন বিশেষ

কারণ ছিল, তাহা নয়। কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল; সে হাজির হইলেই, আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত—উঠিয়া গিয়া স্বস্তি পাইতাম। উঠিতে না পারিলে, অন্ততঃ আর কোন দিকে মুখ ফিরাইয়া, কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতাম। অথচ, সে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার সহিত চোখোচোখি করিবার সহস্র কৌশল করিত, তাহাও টের পাইতাম। প্রথম দুই-একদিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই পরিহাসের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সেও একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি আর কোনমতেই থাকিতে পারি না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই রওনা হইয়া পড়িব স্থির হওয়ায়,—আজ সকাল হইতেই গান-বাজনার বৈঠক বসিয়া গিয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া বাইজী গান থামাইয়াছে, হঠাৎ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। নিমিষে যে যেখানে ছিল, আগ্রহে বক্তাকে ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তাচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম। কিন্তু শেষে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া বলিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রেত-যোনিতে যদি কাহারো সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হৌন এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রের মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে সেই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায় এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলা যায়।

আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন।

আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না?

না।

কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?

না।

তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন যাঁরা চোখে দেখেছেন! তবুও যে আপনারা বিশ্বাস করেন না, মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দু'পাতা ইংরিজী পড়ার ফল। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা ত নাস্তিক—ম্লেচ্ছ।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল দেখিয়া, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বলিলাম, দেখুন, এ সম্বন্ধে আমি তর্ক করতে চাইনে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই, ম্লেচ্ছই হই, ভূত মানিনে। যাঁরা চোখে দেখেচেন বলেন—হয় তাঁরা ঠকেচেন, না হয় তাঁরা মিথ্যাবাদী, এই আমার ধারণা।

ভদ্রলোক খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আপনি আজ রাত্রে শ্মশানে যেতে পারেন?

আমি হাসিয়া বলিলাম, পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক শ্মশানেই অনেক রাত্রে গেছি।

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপ্ সেখি মৎ করো বাবু, বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া, এই শ্মশানের মহা-ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। এ শ্মশান যে যে-সে স্থান নয়, ইহা মহা-শ্মশান, এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহা-ভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন; তাঁহাদের খল্খল্ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী ইংরাজ, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটেরও হৃৎস্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনের বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন্ এক সময়ে কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিয়াছে এবং কথাগুলো যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গিলিতেছে।

এইরূপে এই মহাশ্মশানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বক্তা

গর্ব্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেয়া বাবুসাহেব, আপ্ যায়েগা ?

যায়েগা বৈ কি।

যায়েগা ? আচ্ছা, আপ্‌কা খুসি। প্রাণ জানেসে—

আমি হাসিয়া বলিলাম, না বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না, তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা জায়গায় আমিও ত শুধু-হাতে যাব না—বন্দুক নিয়ে যাব।

তখন আলোচনাটা একটু অতিমাত্রায় খর হইয়া উঠিল দেখিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। আমি পাখী মারিতে পারি না, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি; বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না; তাহারা মুরগী খায়; তাহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্য্যকালে ভাগিয়া যায়; তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁতকপাটি লাগে—এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে আমাদের রাজা-রাজড়াদের আনন্দোদয় হয় এবং তাঁহাদের মস্তিষ্ককে অতিক্রম করিয়া যায় না অর্থাৎ তাঁহারাও দু'কথা কহিতে পারেন, সেইসব কথাবার্ত্তা।

ইহাদের দলে শুধু একটিমাত্র লোক ছিল, যে স্বীকার করিয়াছিল,—সে শিকার করিতে জানে না, এবং কথাটাও সে সচরাচর একটু কম কহিত এবং মদও একটু কম করিয়া খাইত। তাহার নাম পুরুষোত্তম। সে সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাকে ধরিল—সঙ্গে যাইবে। কারণ, ইতিপূর্ব্বে সেও কোনদিন ভূত দেখে নাই। অতএব আজ যদি এমন সুবিধা ঘটিয়াছে, তবে ত্যাগ করিবে না, বলিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ভূত মান না ?

একেবারে না।

কেন মান না ?

মানি না, নেই ব'লে, এই বলিয়া সে প্রচলিত তর্ক তুলিয়া বারম্বার অস্বীকার করিতে লাগিল।

আমি কিন্তু অত সহজে তাহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলাম না।

কারণ, বহুদিনের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছিলাম, এ সকল যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়,—সংস্কার। বুদ্ধি দিয়া যাহারা একেবারেই মানে না, তাহারাও ভয়ের জায়গায় আসিয়া পড়িলে ভয়ে মূর্চ্ছা যায়।

পুরুষোত্তম কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে মালকোঁচা মারিয়া পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আপনার ইচ্ছা হয় বন্দুক নিন, কিন্তু আমাদের হাতে লাঠি থাকতে ভূতই বলো আর প্রেতই বলো, —কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেব না।

কিন্তু সময়ে লাঠি হাতে থাকবে ত?

ঠিক থাকবে বাবু, আপনি তখন দেখে নেবেন। এক ক্রোশ পথ—রাত্রি এগারোটার মধ্যেই রওনা হওয়া চাই।

দেখিলাম, তাহার আগ্রহটা যেন একটু অতিরিক্ত।

যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পায়চারি করিয়া এই ব্যাপারটিই মনে-মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম—জিনিষটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে। এ সকল বিষয়ে আমি যে লোকের শিষ্য, তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—সেই একটি রাত্রে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, শ্রীকান্ত, মনে-মনে রামনাম কর্। ছেলেটি আমার পিছনে বসিয়া আছে—সেইদিনই শুধু ভয়ে চৈতন্য হারাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্পটা যদি সত্যি হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজেও ভূত বিশ্বাস করিত। কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই। আমি নিজেও মনে-মনে যত অবিশ্বাসই করি, স্থান এবং কাল মাহাত্ম্যে গা ছম্-ছম্ যে না করিত, তাহা নয়। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্যার অন্ধকারের পানে চাহিয়া আমার আর একটা অমা-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সে দিনটাও এমনি শনিবারই ছিল।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয়মাস ভুগিয়া-ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটীর ঘরে তিনি একাকিনী বাস

করিতেন। সকলের সর্ব্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, সূচের কাজ শিখাইয়া, গৃহস্থালীর সর্ব্বপ্রকার তুরূহ কাজকর্ম্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। একান্তস্নিগ্ধ, শান্তস্বভাব এবং সুনির্ম্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু, সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন-উঁচু মাথাটি একেবারে মাটীর সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই তুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষস্পর্শ-লেশহীন নির্ম্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত-দরজা-জানলা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং, যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না যে, কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অন্তিম-শয্যা পাতিয়া এই তুর্ভাগিনী ঘৃণায়, লজ্জায়, নিঃশব্দে, নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাসকাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া, শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যে-লোকে চলিয়া গেলেন, তাঁহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোনো স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।

আমার পিসীমা যে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, এ কথা আমি এবং বাটীর বুড়া ঝি ছাড়া আর জগতে কেহই জানে না। পিসীমা একদিন তুপুরবেলা আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা শ্রীকান্ত, তোরা ত এমন অনেকেরই রোগে শোকে গিয়ে দেখিস্, এই ছুঁড়ীটাকে এক-আধবার গিয়ে দেখিস্ না। সেই অবধি মাঝে-মাঝে গিয়া দেখিতাম এবং পিসীমার পয়সায় এটা-ওটা-সেটা কিনিয়া দিয়া আসিতাম। তাঁর শেষকালে একা আমিই কাছে ছিলাম। মরণকালে অমন পরিপূর্ণ বিকার এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান আমি আর দেখি নাই! বিশ্বাস না করিলেও যে ভয়ে গা ছম্-ছম্ করে, আমি সেই কথাটাই বলিতেছি।

সে দিন শ্রাবণের অমাবস্যা। রাত্রি বারোটার পর ঝড় এবং জলের প্রকোপে পৃথিবী যেন উপড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ; আমি খাটের অদূরে বহুপ্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়া আছি। নিরুদিদি স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া, হাত তুলিয়া আমার কাণটা তাঁর মুখের কাছে আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন, শ্রীকান্ত, তুই বাড়ী যা।

সে কি নিরুদি, এই ঝড়-জলের মধ্যে?

তা' হোক। প্রাণটা আগে।

ভুল বকিতেছে ভাবিয়া বলিলাম, আচ্ছা যাচ্চি—জলটা একটু থামুক।

নিরুদিদি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—না, না, শ্রীকান্ত, তুই যা। যা ভাই,—যা,—আর এতটুকু দেরী করিস্‌নে—তুই পালা।

এইবার তাঁর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম, আমাকে যেতে বলচ কেন?

প্রত্যুত্তরে তিনি আমার হাতটা টানিয়া লইয়া রুদ্ধ জানালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, যাবিনি, তবে কি প্রাণটা দিবি? দেখচিস্‌নে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কালো কালো সেপাই এসেচে? তুই আছিস্ ব'লে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসাচ্চে?

তার পরে সেই যে শুরু করিলেন—ওই খাটের তলায়! ওই মাথার শিয়রে! ওই মারতে আসচে! ওই নিলে! ওই ধরলে! এ চীৎকার শুধু থামিল শেষরাত্রে, যখন প্রাণটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

ব্যাপারটা আজও আমার বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া আছে। সে রাত্রে ভয় পাইয়াছিলাম ত বটেই, বোধ করি বা যেন কি-সব চেহারাও দেখিয়াছিলাম। এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য; কিন্তু সেদিন অমাবস্যার ঘোর দুর্য্যোগ তুচ্ছ করিয়াও বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না একথা অসংশয়ে বিশ্বাস হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিরুদিদির কালো কালো সেপাই-সান্ত্রীর ভীড়ের মধ্যে গিয়া পড়িব। অথচ এ সব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম; মুমূর্ষু যে কেবলমাত্র নিদারুণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। অথচ—

বাবু ?

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন।

কি রে ?

বাইজী একবার প্রণাম জানাচ্চেন।

যেমন বিস্মিত হইলাম, তেমনি বিরক্ত হইলাম। এতরাত্রে অকস্মাৎ আহ্বান করাটা শুধু যে অত্যন্ত অপমানকর স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহা নয়, গত তিন-চারিদিনের উভয়পক্ষের ব্যবহারগুলা স্মরণ করিয়াও এই প্রণাম পাঠানোটা যেন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া ঠেকিল। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে কোনরূপ উত্তেজনা পাছে প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় নিজেকে প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া কহিলাম, আজ আমার সময় নেই রতন, আমাকে বেরুতে হবে ; কাল দেখা হবে।

রতন সুশিক্ষিত ভৃত্য, আদব-কায়দায় পাকা। সম্ভ্রমের সহিত মৃদুস্বরে কহিল, বড় দরকার বাবু, এখনি একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে। নইলে বাইজীই আসবেন বললেন।

কি সর্ব্বনাশ! এই তাঁবুতে এত রাত্রে এত লোকের সুমুখে! বলিলাম, তুমি বুঝিয়ে বলগে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা হবে। আজি আমি কোনমতেই যেতে পারব না।

রতন কহিল, তা' হ'লে তিনিই আসবেন! আমি এই পাঁচ বছর দেখে আসচি বাবু, বাইজীর কোনদিন কখনো এতটুকু কথার নড়-চড় হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

এই অন্যায় অসঙ্গত জিদ দেখিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসচি। তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বারুণীর কৃপায় জাগ্রত আর কেহ নাই। পুরুষোত্তম গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাকরদের তাঁবুতে দুই-চারিজন জাগিয়া আছে মাত্র। তাড়াতাড়ি বুটটা পরিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল। হাতে লইয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর তাঁবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারী সুমুখেই দাঁড়াইয়াছিল। আমার আপাদমস্তক বার-বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই,

ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল,—শ্মশানে-টশানে তোমার কোনমতেই যাওয়া হবে না,—কোনমতেই না।

ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম,—কেন ?

কেন আবার কি ? ভূত-প্রেত কি নেই যে, শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শ্মশানে ? প্রাণ নিয়ে কি তা হ'লে আর ফিরে আসতে হবে! বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কি করিব, কি জবাব দিব, ভাবিয়াই পাইলাম না! ভাবিয়া না পাওয়ার আর আশ্চর্য্য কি ? যাহাকে চিনি না, জানি না, সে যদি উৎকট হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর-রাত্রে ডাকাইয়া আনিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া খামোকা কান্না জুড়িয়া দেয়—হতবুদ্ধি হয় না কে ? আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে-মুছিতে কহিল, তুমি কি কোনদিন শান্ত-সুবোধ হবে না ? তেম্নি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে ? কই, যাও দিকি কেমন ক'রে যাবে ? আমিও তাহ'লে সঙ্গে যাবো, বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, বেশ, চল।

আমার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পিয়ারী কহিল—আহা! দেশ-বিদেশে তা হ'লে সুখ্যাতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না! বাবু শিকারে এসে একটা বাইউলী সঙ্গে ক'রে দুপুর-রাত্রে ভূত দেখতে গিয়েছিলেন। বলি, বাড়ীতে কি একেবারে আউট্ হয়ে গেছ না কি ? ঘেন্না-পিত্তি লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই ? বলিতে-বলিতেই তাহার তীব্র কণ্ঠ ভিজিয়া যেন ভারী হইয়া উঠিল; কহিল, কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধঃপাতে তুমি যেতে পারো, কেউ ত কোন দিন ভাবেনি।

তাহার শেষ কথাটায় অন্য কোন সময়ে আমার বিরক্তির হয়ত অবধি থাকিত না, কিন্তু এখন রাগ হইল না। মনে হইল পিয়ারীকে যেন চিনিয়াছি। কেন যে মনে হইল, তাহা পরে বলিতেছি। কহিলাম, লোকের ভাবাভাবির দাম কত, সে নিজেও ত জানো ? তুমিই যে এত অধঃপাতে যাবে, সেই বা ক'জন ভেবেছিল ?

মুহূর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সহজ হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই সে ভীতস্বরে কহিল, আমার তুমি কি জানো? কে আমি, বল ত দেখি?

তুমি পিয়ারী।

সে ত সবাই জানে।

সবাই যা জানে না, আমি জানি—শুনলে কি তুমি খুশী হবে? হ'লে ত নিজেই তোমার পরিচয় দিতে। যখন দাওনি, তখন আমার মুখ থেকেও কোন কথা পাবে না। এর মধ্যে ভেবে দেখো, আত্মপ্রকাশ করবে কি না! কিন্তু এখন আর সময় নেই—আমি চললুম।

পিয়ারী বিদ্যুদ্‌গতিতে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যদি যেত না দিই, জোর ক'রে যেতো পার?

কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন?

পিয়ারী কহিল—দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই যে, তুমি যাবে বললেই যেতে দেব? মাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা ব'লে দিচ্ছি, বলিয়াই আমার বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক পা পিছাইয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ হইতেই আমার বিরক্তির পরিবর্তে হাসি পাইতেছিল। এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, সত্যিকারের ভূত আছে কি না, জানি না; কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে, জানি। তারা সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগলায়—এমন অনেক কীর্ত্তি করে, আবার দরকার হ'লে ঘাড় মট্‌কেও খায়।

পিয়ারী মলিন হইয়া গেল এবং ক্ষণকালের জন্য বোধ করি বা কথা খুঁজিয়া পাইল না। তারপরে বলিল, আমাকে তাহ'লে তুমি চিনেচ বল। কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক কীর্ত্তি করে সত্যি, কিন্তু ঘাড় মট্‌কাবার জন্যেই পথ আগলায় না। তাদেরও আপনার-পর বোধ আছে।

আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, এ ত' তোমার নিজের কথা, কিন্তু তুমি কি ভূত?

পিয়ারী কহিল, ভূত বই কি। যারা ম'রে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত; এই ত তোমার বলবার কথা? একটুখানি থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিতে লাগিল, এক-হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু সত্যি হোক, মিথ্যা হোক—নিজের মরণ আমি নিজে রটাইনি, মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন। শুনবে সব কথা?

তাহার মরণের কথা শুনিয়া এতক্ষণে আমার সংশয় কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী! অনেকদিন পূর্ব্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাওঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাকে কখনো যে আমি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম—এ কথা মনে করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছিল। কখন্, কোথায়, কাহাকে যেন ঠিক এম্‌নিধারা করিতে অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল; কিন্তু কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি—কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিয়া আমি ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সর্দ্দার-পোড়ো, সেই সময়ে উহার দুই-পুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামিপরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী—দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবরই ফর্সা; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত; মাথার চুলগুলা তামার শলার মত—কতগুলি তাহা গুনিয়া বলা যাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বঁইচি-ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত। সেটা কোনদিন ছোট হইলেই, পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে প্রাণ ভরিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা

ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটুখানি সংশয় হইল। তা সে যাক্। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার! ভাগ্নীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিঞ্চি দত্তের পাচক-ব্রাহ্মণ ভঙ্গ-কুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দত্তমশাই বাঁকুড়া হইতে বদলী হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবা-গোবা ভালমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক-বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্নো টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সস্তায় হবে না মশাই—বাজার যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ-এক টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগলও পাওয়া যায় না—তা জামাই খুঁজছেন। একশ একটি টাকা দিন—একবার এ-পিঁড়িতে ব'সে, আর একবার ও-পিঁড়িতে ব'সে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্চি! দুটি ভাগ্নীই একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি টাকা—দুটি ষাঁড় কেনার খরচাও দেবেন না? কথাটা অসঙ্গত নয়। তথাপি অনেক কষা-মাজা ও সহি-সুপারিশের পর সত্তর টাকায় রফা হইয়া একসঙ্গে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুইদিন পরে সত্তর টাকা নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। বছর-দেড়েক পরে প্লীহা-জ্বরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর-দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল! এই ত পিয়ারী বাইজীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাইজী কহিল, তুমি কি ভাবচ, ব'লব?

কি ভাবচি?

তুমি ভাবচ, আহা! ছেলেবেলায় একে কত কষ্টই দিয়েচি! কাঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েচি, আর তার বদলে শুধু মার-ধোর করেচি। মার খেয়ে চুপ ক'রে কেবল কেঁদেচে, কিন্তু কখনো কিছু চায়নি।

আজ যদি একটা কথা বল্‌চে ত শুনিই না। না হয়, নাই গেলাম শ্মশানে। এই না?

আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

পিয়ারীও হাসিয়া কহিল, হবেই ত। ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়? সে একটা অনুরোধ করলে কেউ কখনো কি পায়ে ঠেলে যেতে পারে? এমন নিষ্ঠুর সংসারে আর কে আছে? চল, একটু বসিগে, অনেক কথা আছে। রতন, বাবুর বুটটা খুলে দিয়ে যা রে। হাস্‌চ যে?

হাস্‌চি, কি ক'রে তোমরা মানুষ ভুলিয়ে বশ করো, তাই দেখে।

পিয়ারীও হাসিল, কহিল, তাই বই কি! পরকে কথায় ভুলিয়ে বশ করা যায়, কিন্তু, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত নিজেই যার বশ হয়ে আছি, তাকেও কি কথায় ভুলানো যায়? আচ্ছা, আজই না হয় কথা কইচি; কিন্তু প্রত্যহ কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যখন বঁইচির মালা গেঁথে দিতুম, তখন ক'টা কথা কয়েছিলুম শুনি? সে কি তোমার মারের ভয়ে নাকি? মনেও ক'রো না। সে মেয়ে রাজলক্ষ্মী নয়। কিন্তু ছিঃ! আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে—দেখে চিনতে পারোওনি! বলিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িতেই তাহার দুই কানের হীরাগুলা পর্য্যন্ত দুলিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমাকে মনেই বা কবে করেছিলাম যে, ভুলে যাবো না? বরং আজ চিনতে পেরেচি দেখে, নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আচ্ছা, বারোটা বাজে—চললুম।

পিয়ারীর হাসিমুখ একনিমেষেই একেবারে বিবর্ণ, ম্লান হইয়া গেল। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, ভূতপ্রেত না মানো, সাপখোপ, বাঘভালুক, বুনোশূয়ার এগুলোকে ত বনে-জঙ্গলে অন্ধকার রাত্রে মানা চাই।

আমি বলিলাম, এগুলোকে আমি মেনে থাকি এবং যথেষ্ট সতর্ক হয়েও চলি।

আমাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, তুমি যে ধাতের মানুষ, তাতে তোমাকে যে আটকাতে পারব না, যে ভয় আমার খুবই

ছিল ; তবু ভেবেছিলাম, কান্নাকাটি ক'রে হাতে-পায়ে ধরলে শেষ পর্য্যন্ত হয় ত নাও যেতে পারো। কিন্তু আমার কান্নাই সার হ'ল! আমি জবাব দিলাম না দেখিয়া, পুনরায় কহিল, আচ্ছা, যাও, পেছু ডেকে আর অমঙ্গল ক'রব না। কিন্তু একটা কিছু হ'লে, এই বিদেশ-বিভুঁয়ে রাজা-রাজড়া বন্ধুবান্ধব কোন কাজেই লাগবে না, তখন আমাকেই ভুগতে হবে। আমাকে চিনতে পারো না, আমার মুখের পরে ব'লে তুমি পৌরুষী করে গেলে, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের মন ত? বিপদের সময় আমি ত আর বলতে পারব না—এঁকে চিনিনে।—বলিয়া সে একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল।

আমি যাইতে-যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলাম। কেমন যেন একটা ক্লেশ বোধ হইল। বলিলাম, বেশ ত বাইজী, সেও ত আমার একটা মস্ত লাভ। আমার কেউ কোথাও নেই—তবু ত জানতে পারব, একজন আছে—যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

পিয়ারী কহিল, সে কি আর তুমি জানো না? একশ'বার 'বাইজী' ব'লে যত অপমানই করো না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—এ কি আর তুমি মনে-মনে বোঝো না? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভাল হ'তো—তোমাদের একটা শিক্ষা হ'তো। কিন্তু কি বিশ্রী এই মেয়েমানুষ জাতটা ; একবার যদি ভালবেসেচে, ত মরেচে!

আমি বলিলাম, পিয়ারী, ভাল সন্ন্যাসীতেও ভিক্ষা পায় না, কেন জানো?

পিয়ারী বলিল, জানি। কিন্তু তোমার এ খোঁচায় এত ধার নেই যে আমাকে বেঁধো। এ আমার ঈশ্বরদত্ত ধন। যখন সংসারের ভাল-মন্দ জ্ঞান পর্য্যন্ত হয়নি, তখনকার ; আজকের নয়।

আমি নরম হইয়া বলিলাম,—বেশ কথা। আশা করি, আমার আজ একটা কিছু হবে। হ'লে তোমার ঈশ্বরদত্ত ধনের হাতে-হাতে একটা যাচাই হয়ে যাবে।

পিয়ারী কহিল, —দুর্গা দুর্গা! ছিঃ! অমন কথা ব'লো না। ভালোয়-ভালোয় ফিরে এস—এ সত্যি আর যাচাই ক'রে কাজ নেই। আমার কি

সেই কপাল যে, নিজের হাতে নেড়ে-চেড়ে, সেবা ক'রে, দুঃসময়ে তোমাকে সুস্থ সবল ক'রে তুলব! তা হ'লে ত জানতুম, এ জন্মের একটা কাজ ক'রে নিলুম। বলিয়া সে যে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিল, তাহা হারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও টের পাইলাম।

আচ্ছা, ভগবান তোমার এ সাধ হয় ত একদিন পূর্ণ ক'রে দেবেন, বলিয়া আমি আর দেরী না করিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তামাসা করিতে গিয়া যে মুখ দিয়া একটা প্রচণ্ড সত্য বাহির হইয়া গেল, সে কথা তখন আর কে ভাবিয়াছিল?

তাঁবুর ভিতর হইতে অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠের 'দুর্গা! দুর্গা!' নামের সকাতর ডাক কানে আসিয়া পৌঁছিল। আমি দ্রুতপদে শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

সমস্ত মনটা পিয়ারীর কথাতেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কখন যে আমবাগানের দীর্ঘ অন্ধকার পথ পার হইয়া গেলাম, কখন নদীর ধারের সরকারী বাঁধের উপর আসিয়া পড়িলাম, জানিতে পারিলাম না। সমস্ত পথটা শুধু এই একটা কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি—এ কি বিরাট্ অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা। কবে যে এই পীলে-রোগা মেয়েটা তাহার ধামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল এবং বঁইচি-ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র-পূজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই। যখন টের পাইলাম, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বিস্ময় সেজন্যও নয়। নভেল-নাটকেও বাল্যপ্রণয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সগর্ব্বে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে সে একদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শত-কোটি মিথ্যা প্রণয়-অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌খানে জীবিত রাখিয়াছিল? কোথা হইতে ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত? কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত?

বাপ্!

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ্। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশে, সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্য্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখীটা একবার 'বাপ্' বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না! পশ্চিমমুখে ধীরে-ধীরে চলিলাম— এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুলগাছগুলা দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছুদূর আসিতেই তাহাদের কালো-কালো ডাল-পালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল। ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরও একটু অগ্রসর হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া-কাঁদিয়া শেষকালে নির্জ্জীব হইয়া যে প্রকারে রহিয়া-রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না এবং পূর্ব্বে শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়, শকুন-শিশু —অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে,—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম —ঠিক তাই বটে। কালো-কালো ঝুড়ির মত শিমুলের ডালে-ডালে

অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাঁদিতেই লাগিল, আমি নীচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন, লক্ষ নরমুণ্ড গণিয়া লওয়া যায়,—দেখিলাম, কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকঙ্কালে খচিত হইয়া আছে। গেণ্ডুয়া খেলিবার নর-কপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে; তবে খেলোয়াড়েরা তখনও আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। আমি ছাড়া আর কোন অশরীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন কি না, এই দু'টা নশ্বর চোখে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। তখন ঘোর অমাবস্যা। সুতরাং খেলা সুরু হইবার আর বেশী দেরী নাই আশা করিয়া, একটা বালুর ঢিপির উপর গিয়া চাপিয়া বসিলাম। বন্দুকটা খুলিয়া, টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কোলের উপর রাখিয়া, প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। হায় রে টোটা! বিপদের সময় কিন্তু সে কোনই সাহায্য করিল না।

পিয়ারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, যদি অকপটে বিশ্বাসই কর না, তবে কর্ম্মভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তাহা হইলে ভূত-প্রেত থাক্ বা না থাক্ তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। সত্যই ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচরে ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—আমার সাহস কত। সকালে যাহারা বলিয়াছিল, ভীরু বাঙ্গালী কার্য্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্রমাণ করা যে, বাঙ্গালী বড় বীর।

আমার বহুদিনের দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না; এবং যদি বা বাঁচে, যে শ্মশানে তাহার পার্থিব দেহটাকে অশেষপ্রকারে নিপীড়িত করা হয়, সেইখানেই ফিরিয়া নিজের মাথাটায় লাথি মারিয়া-মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, উচিৎও নয়। অন্ততঃ আমার পক্ষে ত নয়; তবে কি না, মানুষের রুচি ভিন্ন

যদি বা কাহারো হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রাত্রে রাত্রি জাগিয়া আমার এতদূরে আসাটা নিষ্ফল হইবে না। অপিচ, এমনি একটা গুরুতর আশাই আজিকার প্রবীণ ব্যক্তিটি দিয়াছিলেন।

হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস কতকগুলা ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল, এবং সেটা শেষ না হইতেই আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না! যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু একটা অজানা-গোছের থাকে—এ সংস্কার হাড়-মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড়-মাস আছে ততক্ষণ সেও আছে—তা স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দম্‌কা বাতাসটা শুধু ধূলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত সেই গোপন সংস্কারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ ধীরে-ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলা গোছের শব্দ হয়। দেখিতে-দেখিতে আশে-পাশে, সুমুখে, পিছনে, দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা-হুতাশ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে; এবং ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'uncanny feeling' ঠিক সেই ধরণের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটাছুই ঝাঁকানি দিয়া গেল। সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশী করিয়া গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম, ভয় পাইয়াছি। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ জানিতাম, এ যে-স্থানে আসিয়াছি, এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপতে না পারিলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এইরূপ ভয়ানক জায়গায় ইতিপূর্ব্বে আমি কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিত, সে ইন্দ্র, —আমি নয়। অনেকবার তাহার সঙ্গে অনেক ভয়ানক স্থানে গিয়া গিয়া আমারও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে আমিও তাহার মত এই সব স্থানে একাকী আসিতে পারি। কিন্তু সেটা যে কতবড় ভ্রম এবং আমি যে শুধু ঝোঁকের উপরেই তাহাকে অনুকরণ করিতে

গিয়াছিলাম, একমুহূর্ত্তেই আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সেই চওড়া বুক কই? আমার সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই 'রাম'-নামের অভেদ্য কবচ কই? আমি ত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া, প্রেতাত্মার গেণ্ডুয়া-খেলা দেখিব? মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুঝি বাঁচিয়া যাই। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহা এম্‌নি শীতল যে, তুষারকণার মত সেইখানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিঃশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, একফোঁটা রক্তের সংস্রব পর্য্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর! সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে—অন্ধকার। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশে-পাশের হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনি কন্‌কনে নিঃশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু এ-কথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য্য। দেখি, ডান পা-টা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।

ঠিক এমনি সময়ে অনেকদূরে অনেকগুলা গলার সমবেত চীৎকার কানে পৌঁছিল—বাবুজী! বাবুসাব! সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। কাহারা ডাকে? আবার চীৎকার করিল—গুলি ছুঁড়বেন না যেন। শব্দ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটা-দুই ক্ষীণ আলোর রেখাও আড়-চোখে চাহিতে চোখে পড়িল। একবার মনে হইল, চীৎকারের মধ্যে যেন রতনের গলার আভাস পাইলাম। খানিক পরেই টের পাইলাম, সে-ই বটে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমুলের আড়ালে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিল, বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলিটুলি ছুঁড়বেন না—

আমরা রতন। রতন লোকটা যে সত্যই নাপিত তাহাতে আর ভুল নাই।

উল্লাসে চেঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, ভূত-প্রেত যাবার সময় কিছু একটা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গিয়া দিয়াই বিদায় হইল।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটা-দুই লণ্ঠন ও লাঠিসোঁটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছট্টুলাল—সে তব্‌লা বাজায়, এবং আর একজন পিয়ারীর দরওয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকীদার।

রতন কহিল, চলুন, তিনটে বাজে।

চল, বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে-যাইতে রতন বলিতে লাগিল,—বাবু, ধন্য আপনার সাহস! আমরা চারজনে যে কত ভয়ে-ভয়েই এসেচি, তা বলতে পারিনে।

এলি কেন?

রতন কহিল, টাকার লোভে। আমরা সবাই একমাসের মাইনে নগদ পেয়ে গেছি। বলিয়া আমার পাশে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল,—বাবু, আপনি চ'লে এলে, গিয়ে দেখি, মা ব'সে ব'সে কাঁদচেন। আমাকে বললেন, রতন, কি হবে বাবা? তোরা পিছনে যা। আমি এক-এক মাসের মাইনে তোদের বকশিস্ দিচ্চি। আমি বললুম, ছট্টুলাল আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারি, মা; কিন্তু, পথ ত চিনিনে। এমন সময় চৌকীদার হাঁক দিতেই মা বললেন, ওকে ডেকে আন রতন, ও নিশ্চয়ই পথ চেনে। বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আনলুম। চৌকীদার ছ'টাকা হাতে পেয়ে, তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা, বাবু, কচি-ছেলের কান্না শুনতে পেয়েচেন? বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া আমার কোটের পিছনটা চাপিয়া ধরিল, কহিল, আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামুন মানুষ, তাই আজ রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে—

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাহারো ভুল ভাঙ্গিবার

মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচ্ছন্ন, অভিভূতের মত নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, আজ কিছু দেখতে পেলেন, বাবু?

আমি বলিলাম, —না।

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে রতন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমার যাওয়ায় আপনি কি রাগ করেচেন, বাবু? মা'র কান্না দেখলে কিন্তু—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, না রতন, আমি একটুও রাগ করিনি।

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চৌকীদার তাহার কাজে চলিয়া গেল। গণেশ ও ছট্টুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান করিল। রতন কহিল, মা বলেছিলেন, যাবার সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। চোখের উপর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, পিয়ারী দীপের সম্মুখে অধীর আগ্রহে সজল-চক্ষে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে এবং আমার সমস্ত মনটা উন্মত্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রতন সবিনয়ে ডাকিল, আসুন!

মুহূর্ত্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রকৃতিস্থ কেহ নাই। সবাই আকণ্ঠ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। ছি, ছি! এই মাতালের দল লইয়া যাইব দেখা করিতে? সে আমি কিছুতেই পারিব না।

বিলম্ব দেখিয়া রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালেন কেন বাবু—আসুন?

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, না রতন, এখন নয়—আমি চললুম।

রতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মা কিন্তু পথ চেয়ে ব'সে আছেন—

পথ চেয়ে? তা হোক। তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে ব'লো, কাল যাবার আগে দেখা হবে—এখন নয়; আমার বড় ঘুম

পেয়েচে রতন, আমি চললুম। বলিয়া বিস্মিত, ক্ষুব্ধ রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

নয়

মানুষের অন্তর জিনিষটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্য্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ-কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে-কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না,—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই নয়, পরের সম্বন্ধেও দেখি তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলা পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহারা কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোনমতেই ওরূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও সেরূপ করিতে পারে না—এমনি কত কথা। লোকে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে, বাঃ! এই ত ক্রিটিসিজম্! একেই ত বলে চরিত্র-সমালোচনা! সত্যই ত! অমুক সমালোচক বর্ত্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ যা-তা লিখিলেই কি চলিবে? এই দেখ, বইখানার যত ভুলভ্রান্তি সমস্ত তন্ন-তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে। তা দিক। ত্রুটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব পড়িয়া, তাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে-মনে বলি, হা রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিষটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দম্ভপ্রকাশের বেলায় কি তাহার কাণাকড়ির মূল্য নাই! তোমার কোটী কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু একমুহূর্ত্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে,

এ কথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না, এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন!

এই ত আমি অন্নদাদিদিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অম্লান দিব্যমূর্তি ত এখনো ভুলিয়া যাই নাই। দিদি যখন চলিয়া গেলেন, তখন কতগভীর স্তব্ধরাত্রে চোখের জলে বালিস ভাসিয়া গিয়াছে; আর মনে মনে বলিয়াছি, দিদি, নিজের জন্য আর ভাবি না, তোমার পরশমাণিক-স্পর্শে আমার অন্তর-বাহিরের সব লোহা সোণা হইয়া গিয়াছে; কোথাকার কোন জল-হাওয়ার দৌরাত্ম্যেই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই। কিন্তু কোথায় তুমি গেলে দিদি! দিদি! আর কাহাকেও এ সৌভাগ্যের ভাগ দিতে পারিলাম না। আর কেহ তোমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে, যে যেখানে আছে, সবাই যে সচ্চরিত্র সাধু হইয়া যাইত, তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারিত, তখন এ লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া ছেলেমানুষি কল্পনার বিরাম ছিল না। কখনো ভাবিতাম, দেবী-চৌধুরাণীর মত কোথাও যদি সাত-ঘড়া মোহর পাই ত, অন্নদাদিদিকে একটা মস্ত সিংহাসনে বসাই; বন কাটিয়া, জায়গা করিয়া, দেশের লোক ডাকিয়া তাঁর সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে জড় করি। কখনো ভাবিতাম, একটা প্রকাণ্ড বজরায় চাপাইয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে দেশ-বিদেশে লইয়া বেড়াই। এমনি কত কি যে উদ্ভট আকাশকুসুমের মালা গাঁথা—সে সব মনে করিলেও এখন হাসি পায়; চোখের জলও বড় কম পড়ে না।

তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ়ও ছিল—আমাকে ভুলাইতে পারে এমন নারী ত ইহলোকে নাই-ই, পরলোকে আছে কি না, তাহাও যেন ভাবিতে পারিতাম না। মনে করিতাম, জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এমনি মৃদু কথা, ঠোঁটে এমনি মধুর হাসি, ললাটে এমনি অপরূপ আভা, চোখে এমনি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এমনি সতী, এমনি সাধ্বী হয়। প্রতিপদক্ষেপে তাহারও যেন এমনি অনির্বচনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে,

এমনি করিয়া সে-ও যেন সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে পারে।

সেই ত আমি! তবুও আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে-সঙ্গেই কাহার মুখের কথা, কাহার ঠোঁটের হাসি, কাহার চোখের জল মনে পড়িয়া বুকের একান্তে একটুখানি ব্যথা বাজিল? আমার সন্ন্যাসিনী দিদির সঙ্গে কোথাও কোন অংশে কি তাহার বিন্দু-পরিমাণও সাদৃশ্য ছিল? অথচ এম্‌নিই বটে। ছয়টা দিন আগে আমার অন্তর্য্যামী আসিয়াও যদি এ-কথা বলিয়া যাইতেন, আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতাম, অন্তর্য্যামি! তোমার এই শুভকামনার জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি তোমার কাজে যাও, আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমার বুকের কষ্টিপাথরে পাকা সোনার কষ ধরানো আছে, সেখানে পিতলের দোকান খুলিলে খরিদ্দার জুটিবে না।

কিন্তু তবু ত খরিদ্দার জুটিল। আমার অন্তরের মধ্যে যেখানে অন্নদাদিদির আশীর্ব্বাদে পাকা সোনার ছড়াছড়ি, তার মধ্যেও যে এক দুর্ভাগা পিতলের লোভ সামলাইতে পারিল না, কিনিয়া বসিল,—এ কি কম আশ্চর্য্যের কথা!

আমি বেশ বুঝিতেছি, যাঁরা খুব কড়া সমঝদার, তাঁরা আমার আত্ম-কথার এইখানে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিবেন, বাপু, এত ফেনিয়ে কি বলতে চাও তুমি? বেশ স্পষ্ট ক'রেই বল না, সেটা কি? আজ ঘুম ভাঙ্গিয়াই পিয়ারীর মুখ মনে করিয়া তোমার ব্যথা বাজিয়াছিল—এই ত? যাহাকে মনের দোরগোড়া হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতেছিলে, আজ তাহাকেই ডাকিয়া ঘরে বসাইতে চাহিতেছ,—এই ত? তা বেশ। এ যদি সত্য হয়, তবে এর মধ্যে তোমার অন্নদাদিদির নামটা আর তুলিও না। কারণ, তুমি যত কথা যেমন করিয়াই সাজাইয়া বল না কেন, আমরা মানব-চরিত্র বুঝি! জোর করিয়া বলিতে পারি, সে সতী-সাধ্বীর আদর্শ তোমার মনের মধ্যে স্থায়ী হয় নাই, তাঁহাকে তোমার সমস্ত মন দিয়া কস্মিন্‌কালেও গ্রহণ করিতে পার নাই। পারিলে ঝুটায় তোমাকে ভুলাইতে পারিত না।

তা বটে। কিন্তু আর তর্ক নয়। আমি টের পাইয়াছি, মানুষ শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা' নয়, তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়া রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তা নিতান্ত লঘুও নয়। কিন্তু থাক্, আমি ত নিজে জানি, আমি কোন্ নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা 'প্রিচ' করিয়া বেড়াইয়াছি? সুতরাং আজ আমার এ দুর্গতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হম্‌বগ্—হিপোক্রিট্, তখন আমাকে চুপ করিয়াই শুনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট্ আমি ছিলাম না; হম্‌বগ্ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে, আমার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা আত্মগোপন করিয়া ছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া, মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাহারই মত আর একটা দুর্ব্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু যাও বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায়-কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে! লোকসান যা হয়, তা হোক্, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না।

'বাবু-সাব্!' রাজভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিলাম। সে সসম্মানে নিবেদন করিল, কুমারসাহেব এবং বহু লোক আমার গত-রাত্রির কাহিনী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। প্রশ্ন করিলাম, তাঁরা জানিলেন কিরূপে? বেহারা কহিল, তাঁবুর দারোয়ান জানাইয়াছে যে, আমি রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসিয়াছি।

হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, বড়-তাঁবুতে প্রবেশ করিবামাত্রই সকলে হৈ-হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। একসঙ্গে এক লক্ষ প্রশ্ন হইয়া গেল। দেখিলাম, কালকের সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিও আছেন এবং একপাশে পিয়ারী তাহার দলবল লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। প্রতিদিনের মত আজ আর তাহার সহিত চোখোচোখি হইল না। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল।

উচ্ছ্বসিত প্রশ্নতরঙ্গ শান্ত হইয়া আসিলে জবাব দিতে সুরু করিলাম। কুমারজী কহিলেন, ধন্য সাহস তোমার, শ্রীকান্ত! কত রাত্রে সেখানে পৌঁছলে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিটি কহিলেন, ঘোর অমাবস্যা। সাড়ে-এগারোটার পর অমাবস্যা পড়িয়াছিল।

চারিপাশ হইতেই বিস্ময়সূচক ধ্বনি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে, কুমারজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর? কি দেখলে?

আমি বলিলাম, বিস্তর হাড়গোড় আর মড়ার মাথা।

কুমারজী বলিলেন, উঃ, কি ভয়ঙ্কর সাহস! শ্মশানের ভেতর ঢুকলে, না বাইরে দাঁড়িয়েছিলে?

আমি বলিলাম, ভেতরে ঢুকে একটা বালির ঢিবিতে গিয়ে বসলুম।

তারপর, তারপর? ব'সে কি দেখলে?

ধূ ধূ করচে বালির চর।

আর?

কসাড়-ঝোপ আর শিমুলগাছ।

আর?

নদীর জল।

কুমারজী অধীর হইয়া কহিলেন, এ-সব ত জানি হে! বলি সে-সব কিছু—

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আর গোটা-দুই বাদুড় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলুম।

প্রবীণ ব্যক্তিটি তখন নিজে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আউর্ কুছ্ নেহি দেখা?

আমি কহিলাম, 'না।'

উত্তর শুনিয়া এক-তাঁবু লোক সকলেই যেন নিরাশ হইয়া পড়িল। প্রবীণ লোকটি তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ্যাসা কভি হো নহি সক্তা। আপ্ গয়া নহি।

তাঁহার রাগ দেখিয়া আমি শুধু হাসিলাম। কারণ, রাগ হইবারই কথা। কুমারজী আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন, তোমার দিব্যি শ্রীকান্ত, কি দেখলে, সত্যি বল।

সত্যি বলচি, কিছু দেখিনি।

কতক্ষণ ছিলে সেখানে?

ঘণ্টা-তিনেক।

আচ্ছা, না দেখেচ, কিছু শুনতে পাওনি?

তা পেয়েচি।

একমুহূর্ত্তেই সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কি শুনিয়াছি, শুনিবার জন্য তাহারা আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিল। আমি তখন বলিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া পথের উপরেই একটা রাত্রিচর পাখী 'বাপ্' বলিয়া উড়িয়া গেল; কেমন করিয়া শিশুকণ্ঠে শকুনশিশু শিমুল-গাছের উপর গোঁয়াইয়া-গোঁয়াইয়া কাঁদিতে লাগিল; কেমন করিয়া হঠাৎ ঝড় উঠিল এবং মড়ার মাথাগুলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং সকলের শেষে কে যেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া অবিশ্রাম তুষারশীতল নিঃশ্বাস আমার ডান কাণের উপর ফেলিতে লাগিল। আমার বলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারো মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না। সমস্ত তাঁবুটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া ধীরে-ধীরে কহিলেন,—বাবুজী, আপনি যথার্থ ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই কাল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর কেহ হইলে পারিত না। কিন্তু আজ হইতে এই বুড়ার শপথ রহিল, বাবুজী, আর কখনও এরূপ দুঃসাহস করিবেন না। আপনার পিতামাতার চরণে আমার কোটী-কোটী প্রণাম—এ শুধু তাঁহাদেরই পুণ্যে আপনি বাঁচিয়াছেন। বলিয়া তিনি ঝোঁকের মাথায় খপ করিয়া আমার পায়েতেই হাত দিয়া ফেলিলেন।

আগে বলিয়াছি, এই লোকটি কথা কহিতে জানে। এইবার সে কথা সুরু করিল। চোখের তারা, ভুরু, কখনো সঙ্কুচিত, কখনো প্রসারিত,

কখনো নির্ব্বাপিত, কখনো প্রজ্বলিত করিয়া সে শকুনির কান্না হইতে আরম্ভ করিয়া কানের উপর নিঃশ্বাস ফেলার এম্‌নি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল যে, দিনের বেলা এতগুলা লোকের মধ্যে বসিয়াও আমার পর্য্যন্ত মাথার চুল কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। কাল সকালের মত আজও কখন যে পিয়ারী নিঃশব্দে ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ একটা নিঃশ্বাসের শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, সে আমার ঠিক পিঠের কাছে বসিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া আছে এবং তাহার নিজের দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডের উপর ঝরা-অশ্রুর ধারাদুটি শুকাইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কখন্ কি জন্য যে চোখের জল গড়াইয়াছিল, এ বোধ করি সে টের পায় নাই; পাইলে মুছিয়া ফেলিত। কিন্তু সেই অশ্রু-কলুষিত তন্ময় মুখখানি পলকের দৃষ্টিপাতেই আমার বুকের মধ্যে আগুনের রেখায় আঁকিয়া গেল। গল্প শেষ হইলেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমারজীকে একটা সেলাম করিয়া অনুমতি লইয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আজ সকালেই আমার বিদায় লইবার কথা ছিল। কিন্তু শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া, কুমারজীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া ও-বেলায় যাওয়াই স্থির করিয়া নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম পিয়ারীর আচরণে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। এতদিন সে পরিহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কলহের আভাস পর্য্যন্ত তাহার দুটি চোখের দৃষ্টিতে কতদিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এরূপ ঔদাসীন্য কখনও দেখি নাই। অথচ ব্যথার পরিবর্ত্তে খুসীই হইলাম। কেন তাহা জানি। যদিচ, যুবতী নারীর মনের গতিবিধি লইয়া মাথা-ঘামানো আমার পেশা নহে, ইতিপূর্ব্বে একাজ কোনদিন করিও নাই,—কিন্তু আমার মনের মধ্যে বহু-জনমের যে অখণ্ড ধারাবাহিকতা লুকাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় রমণী-হৃদয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ধরা পড়িয়া গেল। সে ইহাকে তাচ্ছিল্য মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং প্রণয়-অভিমান জানিয়া পুলকিত হইল। বোধ করি ইহারই গোপন ইসারায় আমার

শ্মশান-অভিযানের এতখানি ইতিহাসের মধ্যে শুধু এই কথাটার উল্লেখ পর্য্যন্ত করিলাম না যে, পিয়ারী কাল রাত্রে আমাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্মশানে লোক পাঠাইয়াছিল, এবং সে নিজেও গল্প-শেষে তেম্‌নি নীরবেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটিয়াছিল। যে-কথা সকলের আগে একলা বসিয়া তাহার শুনিবার অধিকার ছিল, তাহাই আজ সে সকলের পিছনে বসিয়া যেন দৈবাৎ শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু, অভিমান যে এত মধুর, জীবনে এই স্বাদ আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া শিশুর মত তাহাকে নির্জ্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আজ দুপুরবেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা; বিছানায় পড়িয়া মাঝে-মাঝে তন্দ্রাও আসিতে লাগিল; কিন্তু রতনের আসার আশাটা ক্রমাগত নাড়া দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়াইয়া গেল, কিন্তু রতন আসিল না। সে যে আসিবেই, এ বিশ্বাস আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলাম, সূর্য্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে হইল, আমার কোন এক তন্দ্রার ফাঁকে রতন ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া ফিরিয়া গেছে। মূর্খ! একবার ডাকিতে কি হইয়াছিল! দ্বিপ্রহরের নির্জ্জন অবসর নিরর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম; কিন্তু সন্ধ্যার পরে সে যে আবার আসিবে—একটা কিছু অনুরোধ—না হয় একছত্র লেখা—যা হোক একটা, গোপনে হাতে গুঁজিয়া দিয়া যাইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু এই সময়টুকু কাটাই কি করিয়া? সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্মৃত জমিদারের মস্ত কীর্ত্তি। দীঘিটা প্রায় আধক্রোশ দীর্ঘ। উপরদিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না! কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটা যে কতদিনের

এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরানো ভাঙ্গা ঘাট ছিল; তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। একসময়ে ইহারই চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠায় ও মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। অস্তগামী সূর্য্যের তির্য্যক রশ্মিটা ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তারপর ক্রমশঃ সূর্য্য ডুবিয়া দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল; অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত্ত শৃগাল ভয়ে-ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে, —যে সময়টুকু কাটাইতে আসিয়াছিলাম, তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না,—এই ভাঙ্গা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়াছি, সেইখানে পা দিয়া কত লোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন্ জলাশয়ে এইসমস্ত নিত্য-কর্ম্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এম্নি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমূর্ষু হয়ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয় ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না, তাহাই যে নাই, এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? আজ সকালেই সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিয়াছিলেন, বাবুজী, মৃত্যুর পরে যে কিছুই থাকে না, অসহায় প্রেতাত্মারা যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা লইয়া বিচরণ করে না, তাহা কদাচ মনে করিও না। এই বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প, তালবেতাল-সিদ্ধির গল্প, আরও কত

তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন যে, সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে, কথা কহিতে পারে না বা করে না, তাহাও ভাবিও না; তোমাকে আর কখনো সে স্থানে যাইতে বলি না; কিন্তু, যাহারা এ-কাজে পারে, তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না, এ-কথা স্বপ্নেও অবিশ্বাস করিও না।

তখন সকালবেলার আলোর মধ্যে যে কথাগুলা শুধু নিরর্থক হাসির উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এখন সেই কথাগুলাই এই নির্জ্জন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আর একপ্রকারের চেহারা লইয়া দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল, জগতে প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলা যেন আতসবাজী, বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে মৃত্যুর পরপারে ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তার চেয়ে লাভ আর আছে কি? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম, শুধু অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, 'না, আর বসে থাকা নয়। কাল ডান কানের উপর নিঃশ্বাস ফেলে গেছে, আজ এসে যদি বাঁ কানের উপর সুরু ক'রে দেয় ত সে বড় সোজা হবে না।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ত চলিয়াছি—এই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ যে আর শেষ হয় না! এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতেই সম্মুখে একটা বাঁশঝাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, কৈ এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই! দিক্ ভুল করিয়া ত আর একদিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম, সেটা বাঁশঝাড় নয়, গোটাকয়েক তেঁতুলগাছ জড়াজড়ি করিয়া,

দিগন্ত আবৃত করিয়া, অন্ধকার জমাট বাধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; তাহারই নীচে দিয়া পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এম্‌নি অন্ধকার যে, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা যেন গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায় ? চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে তেঁতুলতলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায় ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি ? নদীর ধারের সরকারী বাঁধ নয় ত ? বাঁধই ত বটে ?

পা-দুটা যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, তবুও টানিয়া-টানিয়া কোন-মতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই। ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান ! আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল ! এইবার টলিয়া টলিয়া সেই ধূলা-বালুর উপরেই মূর্চ্ছিতের মত ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানে পথ দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙ্গা ঘাটের উপর গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

দশ

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদ্‌টা মানুষের যে বয়সে থাকে, সে বয়স আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং কেমন করিয়াই যে এই সূচীভেদ্য অন্ধকার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙ্গাঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ-সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেমনি আঁধারে আবৃত

রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য্য নয়। কারণ, নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি—আমাদের গ্রামেই একটা বদ্ধ পাগল ছিল; সে দিনের বেলা বাড়ী বাড়ী ভাত চাহিয়া খাইত, আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, সেটা সুমুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে চেহারা দেখিয়া অন্ধকারে কত লোকের যে দাঁতকপাটী লাগিয়াছে, তাহার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই, অথচ এই ছিল তাহার অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড। নিরর্থক মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অদ্ভুত ফন্দী যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই। শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিত; মুখে কালিঝুলি মাখিয়া বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বহু-ক্লেশে খড়া বহিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত; গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া খোনা-গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত। অথচ, কেহ কোনদিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই, এবং দিনের বেলায় তাহার চাল-চলন স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া ঘুণাগ্রেও তাহাকে সংশয় করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। আর এ শুধু আমাদের গ্রামেই নয়,—আট-দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত। মরিবার সময় নিজের বজ্জাতি সে নিজে স্বীকার করিয়া যায় এবং ভূতের দৌরাত্ম্যও তখন হইতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রেও হয় ত তেমনি কিছু ছিল,—হয় ত ছিল না। কিন্তু যাক্‌গে।

বলিতেছিলাম যে, সেই ধূলাবালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দু'টি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—ছি ছি, ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য? আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়। এমন অশুচি, অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একান্তে বসিস্ না,—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্। কথাগুলা কাণে শুনিয়াছিলাম, কিম্বা হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু, তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার

কারণ—চৈতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এমনি একরকম করিয়া বজায় থাকে, একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু'-চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানোও নয়, জাগাও নয়। তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। ঐ এক রকম।

তথাপি এ-কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে—আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে, এবং সেজন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিতাম, কিন্তু মনে হইল সব বৃথা। এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু-শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে-পথে যেমন করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলক-ধাঁধার মত ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে।

সুতরাং চঞ্চল হইয়া ছট্‌ফট্ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া, কোন-প্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া, যখন স্থির হইয়া বসিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিষটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোনদিনই বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত

করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসী-কৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্ব্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন! তাই রাধার দু'চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম। কখনও এ-সকল কথা ভাবি নাই, কোনদিন এ-পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোনদিন জানি নাই! তবে হয় ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয় ত তার এমনি অফুরন্ত, সুন্দর রূপে আমার দু'চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব্ব-দুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জ্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার এই নির্ব্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তেবাসীর মত বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন হুঁস ছিল না। হুঁস হইতে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্ত্তার কোলাহল কাণে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমূলগাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের দুই-চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশে-পাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্ব্বার বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দু'খানা গরুর গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ জনকয়েক লোক এইদিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম, কাহারা এই পথে ষ্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক। কারণ, আগন্তুকের দল যত বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হোক, হঠাৎ এই অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর কিছু না করুক, একটা বিষম হৈ-হৈ-রৈ-রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইলাম; এবং অনতিকাল পরেই ছই-দেওয়া দু'খানা গো-শকট পাঁচ-ছয়জনের প্রহরায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার মনে হইল, ইহাদের অগ্রগামী লোক দুটা আমার দিকে চাহিয়াই ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কি যেন বলাবলি করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইয়া গেল, এবং অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত দলবল বাঁধের ধারে একটা ঝাঁকড়া-গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি আর বেশী বাকি নাই অনুভব করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সু-উচ্চ কণ্ঠের ডাক কানে গেল, শ্রীকান্তবাবু—

সাড়া দিলাম, কে রে, রতন?

আজ্ঞে, হাঁ বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।

দ্রুতপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, রতন, তোরা কি বাড়ী যাচ্ছিস?

রতন উত্তর দিল, হাঁ বাবু, বাড়ী যাচ্ছি—মা গাড়ীতে আছেন।

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দ্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দরোয়ানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি, গাড়ীতে উঠে এসো, কথা আছে।

আমি সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কথা?

উঠে এসো, বলচি।

না, তা পারব না, সময় নেই। ভোরের আগেই আমাকে তাঁবুতে পৌঁছতে হবে।

পিয়ারী হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তীব্র জিদের স্বরে বলিল, চাকর-বাকরের সামনে আর ঢলাঢলি ক'রো না—তোমার পায়ে পড়ি, একবার উঠে এসো—

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। পিয়ারী গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিয়া দিয়া কহিল, আজ আবার এখানে তুমি কেন এলে?

আমি সত্য কথাই কহিলাম। কহিলাম, জানি না।

পিয়ারী এখনও আমার হাতে ছাড়ে নাই। বলিল, জান না? আচ্ছা, বেশ, কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন?

বলিলাম, এখানে আসার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে আসিনি।

মিথ্যে কথা।

না।

তার মানে?

মানে যদি খুলে বলি, বিশ্বাস করবে? আমি লুকিয়েও আসিনি, আসবার ইচ্ছেও ছিল না।

পিয়ারী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তা হ'লে তাঁবু থেকে তোমাকে উড়িয়ে এনেচে—বোধ করি বলতে চাও?

না, তা বলতে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি; নিজের পায়ে হেঁটে এসেচি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, রাজলক্ষ্মি, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি না, জানিনে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্য। এই বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে-শুনিতে আমার হাত-ধরা তাহার হাতখানা বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দ্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশ ফর্সা হইয়া গেছে। বলিলাম, এইবার আমি যাই।

পিয়ারী স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, না।

না কি-রকম? এমনভাবে চ'লে যাবার অর্থ কি হবে জান?

জানি—সব জানি। কিন্তু এরা ত তোমার অভিভাবক নয় যে, মানের দায়ে প্রাণ দিতে হবে? বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পা ধরিয়া ফেলিয়াই রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কান্ত-দা, সেখানে ফিরে গেলে আর তুমি বাঁচবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেবো না। তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ী চ'লে যাও—কিম্বা যেখানে খুসী যাও, কিন্তু ওখানে আর এক দণ্ডও না।

আমি বলিলাম, আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে!

পিয়ারী কহিল, থাক্ প'ড়ে। তাদের ইচ্ছে হয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে; না হয় থাকগে। তার দাম বেশী নয়।

আমি বলিলাম, তার দাম বেশী নয় সত্য, কিন্তু যে মিথ্যা কুৎসার রটনা হবে, তার দাম ত কম নয়।

পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ী এইসময় মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, সম্মুখের ওই পূর্ব্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে,—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, চুপ ক'রে রইলে যে?

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি জান কান্ত-দা, যে কলম দিয়ে সারাজীবন শুধু জাল-খৎ তৈরী করেচি, সেই কলমটা দিয়েই

আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সর্‌চে না। যাবে? আচ্ছা, যাও! কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে।

আচ্ছা।

কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না, বল।

না।

পিয়ারী হাতের আঙ্‌টি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল; এবং পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আঙ্‌টিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, তবে যাও—বোধ করি, ক্রোশ-দেড়েক পথ তোমাকে বেশী হাঁটতে হবে।

গো-যান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বাড়ী ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।

আমি স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলাম। একটিবারও পিছনে চাহিয়া দেখিলাম না, তখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে, কিম্বা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলাম, দু'টি চক্ষের সজল-করুণ দৃষ্টি আমার পিঠের উপর বারম্বার আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

আড্ডায় পৌঁছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে পিয়ারীর ভাঙ্গা-তাঁবুর বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত জিনিষগুলা চোখে পড়িবামাত্র একটা নিষ্ফল ক্ষোভ বুকের মধ্যে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে তাঁবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হয়েছিলেন।

আমি হাঁ-না কোন কথাই না বলিয়া শয্যায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

এগারো

পিয়ারীর কাছে যে সত্য করিয়াছিলাম, তাহা যে রক্ষাও করিয়াছিলাম, বাটী ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কোনদিন পিয়ারী আমাকে তাহার পাটনার বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ত করে নাই, সামান্য একটা মুখের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে নিবেদন ছিল, যাহা আমি আজও ভুলি নাই। সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। পিয়ারীর স্মৃতি ঝাপ্সা হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিকার হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত আমার মন যেন কেমন বিমনা হইয়া গেছে; কেমন যেন একটা অভাবের বেদনা চাপা সর্দির মত দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে—বিছানায় শুইতে গেলেই তাহা খচ্-খচ্ করিয়া বাজে।

এটা মনে পড়ে, সেদিনটা হোলির রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবিরের গুঁড়া সাবান দিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। ক্লান্ত-বিবশ দেহে শয্যার উপর পড়িয়াছিলাম। পাশের জানালাটা খোলা ছিল; তাই দিয়া সুমুখের অশ্বত্থগাছের ফাঁক দিয়া আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়াছিলাম। এতটাই মনে পড়ে। কিন্তু কেন যে দোর খুলিয়া সোজা ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম, তাহা মনে পড়ে না। রাত্রিটা গেল। কিন্তু দিনের বেলা যখন শুনিলাম সেটা 'বাড়' ষ্টেশন এবং পাটনার আর দেরী নাই—তখন হঠাৎ সেইখানেই নামিয়া পড়িলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দু'আনি আর পয়সাতে দশটা পয়সা তখনও আছে। খুসী হইয়া

দোকানের সন্ধানে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চুড়া, দহি এবং শর্করা-সংযোগে অত্যুৎকৃষ্ট ভোজন সম্পন্ন করিতে অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়া গেল। তা যাক। জীবনে অমন কত যায়—সেজন্য ক্ষুণ্ণ হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টাখানেক ঘুরিতে-না-ঘুরিতে টের পাইলাম জায়গাটার দধি ও চূড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানীয় জলটা সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। আমার অমন ভূরিভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমনি পরিপাক করিয়া নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তণ্ডুল-কণাটিও মুখে যায় নাই। এরূপ কদর্য্য স্থানে বাস করা আর একদণ্ড উচিত নয় মনে করিয়া স্থান-ত্যাগের কল্পনা করিতেছি, দেখি অদূরে একটা আমবাগানের ভিতর হইতে ধূম দেখা দিয়াছে।

আমার ন্যায়-শাস্ত্র জানা ছিল। ধূম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম; বরঞ্চ অগ্নিরও হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সোজা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জলটা এখানকার বড় বদ।

বাঃ—এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রম! মস্ত ধুনির উপর লোটায় করিয়া চায়ের জল চড়িয়াছে। 'বাবা' অর্দ্ধমুদ্রিত-চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন; তাঁহার আশে-পাশে গাঁজার উপকরণ। একজন বাচ্চা-সন্ন্যাসী একটা ছাগী দোহন করিতেছে—চা-সেবায় লাগিবে। গোটা দুই উট, গোটা দুই টাট্টু ঘোড়া এবং সবৎসা গাভী কাছাকাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উঁকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাটী ধরিয়া মস্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ তৈয়ারী করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম, এবং চক্ষের পলকে সাধু-বাবাজীর পদতলে একেবারে লুটাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া করযোড়ে মনে মনে বলিলাম, ভগবান, তোমার কি অসীম করুণা! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে! চুলোয় যাক্‌গে পিয়ারী,—এই মুক্তিমার্গের সিংহদ্বার

ছাড়িয়া তিলার্দ্ধ যদি অন্যত্র যাই, আমার যেন অনন্ত নরকেও আর স্থান না হয়।

সাধুজী বলিলেন, কেঁও বেটা ?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি গৃহত্যাগী মুক্তিপথান্বেষী হতভাগ্য শিশু; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণসেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মৃদু হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দী করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, বেটা, ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।

আমি করুণ-কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, বাবা, মহাভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তিও পাইব না ? নিশ্চয়ই পাইব।

সাধুজী খুসী হইয়া বলিলেন, বাত্ তেরা সাচ্চা হ্যায়। আচ্ছা বেটা, রামজীকা খুসী। যিনি দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তৈরী করিয়া 'বাবা'কে দিলেন। তাঁহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ তৈয়ারী হইতেছিল সন্ধ্যার জন্য। তখনও বেলা ছিল, সুতরাং অন্যপ্রকার আনন্দের উদ্যোগ করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গঞ্জিকার কলিকাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয় সে-বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সর্ব্বদর্শী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ। তুমি আমার চেলা হইবার অতি উপযুক্ত পাত্র।

আমি পরমানন্দে আর একবার 'বাবার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা এক-সুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়া দশেক ছোট-বড় রুদ্রাক্ষমালা এবং একজোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন। যেখানে যেটি মানায়—সাজগোজ করিয়া,

খানিকটা ধুনির ছাই মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, বলি আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দেখিলাম, তাঁহারও রস-বোধ আছে। তথাপি একটু গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্যভরেই বলিলেন, হ্যায় একঠো।

তবে, লুকিয়ে আনো না একবার।

মিনিট-দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। পশ্চিমী নাপিতেরা যেরূপ একখানি আয়না হাতে ধরাইয়া দিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পন্ন করে, সেইরূপ ছোট একটুখানি টিনমোড়া আরসি। তা হোক, একটুখানি, দেখিলাম, যত্নে এবং সদা ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে—আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল পূর্ব্বেই রাজা-রাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন! তা যাক্।

ঘণ্টাখানেক পরে গুরু-মহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্য নীত হইলাম। মহারাজ চেহারা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, বেটা, মহিনা এক-আধ ঠহ্‌রো।

মনে মনে 'বহুত্ আচ্ছা' বলিয়া তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে ভক্তিভরে একপাশে বসিলাম।

আজ কথায়-কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার দুরূহতার বিষয়, ইহার গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয়, আজকাল ভণ্ড-পাষণ্ডেরা কি প্রকারে ইহা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ, এবং ভগবৎপাদপদ্মে মতি স্থির করিতে হইলেই বা কি কি আবশ্যক, এতৎপক্ষে বৃক্ষজাতীয় শুষ্ক বস্তুবিশেষের ধূম ঘন-ঘন মুখ-বিবর দ্বারা শোষণ করতঃ নাসারন্ধ্র পথে শনৈঃ শনৈঃ বিনির্গত করায় কিরূপ আশ্চর্য্য উপকার তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ বিষয়ে আমার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত আশাপ্রদ সেই ইঙ্গিত করিয়াও আমার উৎসাহবর্দ্ধন করিলেন। এইরূপে সেদিন মোক্ষপথের অনেক নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইয়া গুরু-মহারাজের তৃতীয় চেলাগিরিতে বাহাল হইয়া গেলাম।

গভীর বিরাগ ও কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা অম্‌নি একটু কঠোর রকমের ছিল। তাহার পরিমাণও যেমনি, রসনাতেও তাহা তেম্‌নি। চা, রুটি, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, চুড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান। আবার ভগবৎপদারবিন্দ হইতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সেদিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না। ফলে, আমার শুক্‌নো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা সর্ব্বপ্রধান কাজ না হইলেও, একটা প্রধান কাজ বটে। কারণ সাত্ত্বিক ভোজনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমরা তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম। সন্ন্যাসীর অপরাপর কর্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সত্বর ডিঙ্গাইয়া গেলাম; শুধু এইটাতেই বরাবর খোঁড়াইতে লাগিলাম। এটা কোনদিনই নিজের কাছে সহজ এবং রুচিকর করিয়া তুলিতে পারিলাম না। তবে এই একটা সুবিধা ছিল—সেটা হিন্দুস্থানীদের দেশ। আমি ভাল-মন্দর কথা বলিতেছি না; আমি বলিতেছি, বাঙ্গলাদেশের মত সেখানকার মেয়েরা 'হাতজোড়া—আর এক বাড়ী এগিয়ে দেখ' বলিয়া উপদেশ দিত না, এবং পুরুষেরাও চাকরী না করিয়া ভিক্ষা করি কেন, তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিত না। ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে প্রতি গৃহস্থই সেখানে ভিক্ষা দিত—কেহই বিমুখ করিত না।

এম্‌নি দিন যায়। দিন-পনের ত সেই আম-বাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কোন বালাই নাই, শুধু রাত্রে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত—থাক্‌ মোক্ষসাধন! গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না পারিলে ত আর বাঁচি না। অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালী যত সেরাই হোক, এ-বিষয়ে বাঙ্গালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী চামড়া যে সন্ন্যাসের পক্ষে ঢের বেশী অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাত্ত্বিক ভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরু-মহারাজ ডাকিয়া বলিলেন—

"ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা
যিনহি রামপদ অতি অনুরাগা—"

অর্থাৎ ষ্ট্রাইক্ দি টেন্ট—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ ত সহজ নয়। সন্ন্যাসীর যাত্রা কিনা। পা-বাঁধা টাট্টু খুঁজিয়া আনিয়া বোঝাই দিতে, উটের উপরে মহারাজের জিন কসিয়া দিতে, গরু-ছাগল সঙ্গে লইতে, পোঁটলা-পাঁটলি বাঁধিতে গুছাইতে একবেলা গেল। তারপরে রওনা হইয়া ক্রোশ-দুই দূরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিঠৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে আস্তানা ফেলা হইল। জায়গাটি মনোরম, গুরু-মহারাজের দিব্য পছন্দ হইল। তা ত' হইল, কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মুনির আস্তানায় পৌঁছিতে যে কয় মাস লাগিবে, সে ত' অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিঠৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা এইখানে বলিব। সেদিনটা পূর্ণিমা তিথি। অতএব গুরু-আদেশে আমরা তিন জনেই তিন দিকে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একা হইলে উদরপূর্ত্তির জন্য চেষ্টা-চরিত্র মন্দ করিতাম না। কিন্তু আজ আমার সে চাড় ছিল না বলিয়া অনেকটা নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একটা বাড়ীর খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটি বাঙ্গালী মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তার কাপড়খানা যদিচ দেশী তাঁতে বোনা গুন্‌চটের মতই ছিল, কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গীটাই আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাঁচ-ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে ত' দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও ত' চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই মেয়েটি আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, দশ-এগারো বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন-উদাস চাহনি আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠোঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাংলা করিয়া বলিলাম, চাট্টি ভিক্ষে

আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছুই বলিল না! তারপর তার ঠোঁট দু'টি বার দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তারপরে সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে-মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ, সম্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্ত্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া—দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্ব্বেই—মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক-নিঃশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—তুমি কোথা থেকে আসচ? তুমি কোথায় থাক? তোমার বাড়ী কি বর্দ্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেনো?

আমি কহিলাম, তোমার বাড়ী কি বর্দ্ধমানের রাজপুরে?

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, হাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শ্বশুরবাড়ী এসেচি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে কিচ্ছু জানিনে। ঐ যে অশথগাছ—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ী। ও-সোমবারে দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে—এরা বলে, না,—সে কলেরায় মরেচে।

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ব্যাপার কি? এরা ত দেখচি পুরা হিন্দুস্থানী, অথচ মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে। এতদূরে এ-বাড়ীতে এদের শ্বশুরবাড়ীটিই বা কি করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল?

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দিদি গলায় দড়ি দিলে কেন?

সে কহিল, দিদি রাজপুরে যাবার জন্য দিনরাত কাঁদত—খেতো না, শুতো না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।

প্রশ্ন করিলাম, তোমারও শ্বশুর-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী?

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে—আমি ত দিন-রাত কাঁদি। কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন কেন?

মেয়েটি কহিল, আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের ঘর ও-দেশে ত পাওয়া যায় না।

তোমাকে কি এরা মারধর করে?

করে না? এই দেখ না, বলিয়া মেয়েটি বাহুতে, পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর প্রশ্নোত্তর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বলবে ত? আমাকে একবার নিয়ে যেতে—নইলে আমি—। আমি কোনমতে একটা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুক-ভরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদীর দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বসিলাম, তখন সে কিছু আশ্চর্য্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারীর নামে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরিশেষে এ-কথাও লিখিতে ছাড়িলাম না যে, মেয়েটির দিদি সম্প্রতি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে এবং সেও মার-ধর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তুমি নিজে আসিয়া ইহার বিহিত না করিলে কি ঘটে, বলা যায় না। খুব সম্ভব তোমার চিঠিপত্র ইহারা মেয়েটিকে দেয় না। ঠিকানা দিলাম, বর্দ্ধমান

জেলার রাজপুর গ্রামে। জানি না, সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর হাতে পৌঁছিয়াছিল কিনা, এবং পৌঁছাইলেও সে কিছু করিয়াছিল কি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে এমনি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতকাল পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে, এবং এই আদর্শ হিন্দুসমাজের সুশৃঙ্খল জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই।

হইতে পারে, এই জাতিভেদ ব্যাপারটা খুব ভাল। এই উপায়েই সনাতন হিন্দু-জাতিটা যখন আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তখন ইহার অত্যন্ত উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই নাই। কে কোথায় দু'টো হতভাগ্য মেয়ে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিবে বলিয়া ইহার কঠোর বন্ধন একবিন্দু শিথিল করার কল্পনা করাও পাগলামি। কিন্তু মেয়েটার কান্না যে-লোক চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই, এ প্রশ্ন নিজের নিকট হইতে চাপা দিয়া রাখে যে—কোনমতে টিকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিই ত টিকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল-ভীল-সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক ছোট-খাটো দ্বীপের অনেক ছোট-খাটো জাতিরা মানুষ-সৃষ্টির শুরু হইতেই টিকিয়া আছে। আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায় আছে; তাহাদেরও এমন সকল কড়া সামাজিক আইন-কানুন আছে যে, শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা য়ুরোপের অনেক জাতির অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন—আমাদের চেয়েও পুরাতন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ, এমন অদ্ভুত সংশয় বোধ করি কাহারো মনে উঠে না। সামাজিক সমস্যা থাক বাঁধিয়া দেখা দেয় না। এমনি এক-আধটা কচিৎ কদাচিৎ আবির্ভূত হয়। নিজের বাঙ্গালী মেয়ে দুটির যোগ্য ঘরে বিবাহ দিবার সময় গৌরী তেওয়ারীর মনে বোধ করি এরূপ প্রশ্ন আসিয়াছিল। কিন্তু সে-বেচারা এই দুরূহ প্রশ্নের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়াই, শেষে সামাজিক যূপকাষ্ঠে কন্যা দুটিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সমাজ এই দুটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে

নাই, যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সেই পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না। কোথায় একজন মস্ত বড়লোকের লেখায় পড়িয়াছিলাম, আমাদের সমগ্র 'জাতিভেদ' বলিয়া যে একটা বড়রকম সামাজিক প্রশ্নের উত্তর জগতের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজিও হয় নাই—এইরকম একটা কথা। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের উত্তর দিতেও যেমন প্রবৃত্তি হয় না—হয় নাই, হবে না, বলিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেরই উত্তর প্রবল কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাহারা চাপিয়া বসিয়া যায়, তাহাদের জবাব দেওয়াও তেম্‌নি কঠিন। যাক্ গে।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া, যখন আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা আটা চাল, প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন কিছু বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, এ-গ্রামটা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়, সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক করে না ; সুতরাং কালই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। যে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম। পাটনাটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল কৌতূহল ছিল, নিজের কাছে আজ আর তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তা ছাড়া, এইসকল বেহারী পল্লীগুলাতে কোনরকম আকর্ষণই খুঁজিয়া পাই না। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলার অনেক গ্রামেই ত বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হয় না। নরনারী, গাছপালা, জলবায়ু—কোনটাকেই আপনার বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মনটা সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শুধু কেবল পালাই পালাই করিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায় পাড়ায় তেমন করিয়া খোল-করতালের সঙ্গে কীর্ত্তনের সুর কানে আসে না। দেব-মন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টাগুলোও সেরূপ গম্ভীর মধুর শব্দ করে না। এ-দেশের মেয়েরা শাঁখগুলাও কি ছাই

তেমনি মিষ্ট করিয়া বাজাইতে জানে না? এখানে মানুষ কি সুখেই থাকে! আর মনে হইতে লাগিল, এইসব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে না আসিয়া পড়িলে ত নিজেদের পাড়াগাঁয়ের মূল্য কোনদিনই এমন করিয়া চোখে পড়িত না। আমাদের জলে পানা, হাওয়ার ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে পেটে পিলে, ঘরে ঘরে মামলা, পাড়ায় পাড়ায় দলাদলি;—তা হোক, তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃপ্তি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াও সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।

পরদিন তাঁবু ভাঙ্গিয়া যাত্রা করা হইল; এবং সাধুবাবা যথাশক্তি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে সদলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পথটা সোজা হইবে বলিয়াই হৌক, কিম্বা মুনি আমার মন বুঝিয়াই হৌক, পাটনার দশ ক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গাড়িলেন না। মনে একটা বাসনা ছিল। তা' সে এখন থাক্। পাপতাপ অনেক করিয়াছি—সাধুসঙ্গে দিন-কতক পবিত্র হইয়া আসি গে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল, তাহার নাম ছোট-বাঘিয়া। আরা ষ্টেসন হইতে ক্রোশ আষ্টেক দূরে। এই গ্রামে একটি মহাপ্রাণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সদাশয়তার এইখানে একটু বিবরণ দিব। তাঁহার পৈতৃক নামটা গোপন করিয়া রামবাবু বলাই ভাল। কারণ এখনও তিনি জীবিত আছেন, এবং পরে অন্যত্র যদিচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। না পারা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব জানি,—গোপনে তিনি যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ্যে উল্লেখ করিলে, তিনি বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিতেছি। অতএব তাঁর নাম রামবাবু! কি সূত্রে যে রামবাবু এই গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া যে জমিজমা সংগ্রহ করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছিলেন, অত কথা জানি না। এইমাত্র জানি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ এবং গুটি তিন-চার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন সুখে বাস করিতেছিলেন।

সকালবেলা শোনা গেল, ছোটাবড়া বাঘিয়া ত বটেই, আরও পাঁচ-সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে গ্রামের এইসকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধুসন্ন্যাসীর সেবা বেশ সন্তোষজনক হয়। সুতরাং সাধুবাবা অবিচলিত-চিত্তে তথায় অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ভাল কথা। সন্ন্যাসী-জীবটার সম্বন্ধে এইখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। জীবনে ইঁহাদের অনেকগুলিকেই দেখিয়াছি। বার-চারেক এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবেও মিশিয়াছি। দোষ যাহা আছে, সে ত আছেই। আমি গুণের কথাই বলিব। নিছক 'পেটের দায়ে সাধুজী' আপনারা ত অনেকেই জানেন, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও এই দুটা দোষ আমার চোখে পড়ে নাই। আর চোখের দৃষ্টিটাও যে আমার খুব মোটা তাও নয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইঁহাদের সংযমই বলুন, আর উৎসাহের স্বল্পতাই বলুন,—খুব বেশী, এবং প্রাণের ভয়টা ইঁহাদের নিতান্তই কম—'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' ত আছেই; কিন্তু কি করিলে অনেকদিন জীবেৎ, এ খেয়াল নাই। আমাদের সাধুবাবারও এ-ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা তিনি তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

একটুখানি ধুনির ছাই এবং দু'ফোঁটা কমণ্ডলুর জলের পরিবর্তে যে-সকল বস্তু হু হু করিয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সন্ন্যাসী, গৃহী কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সস্ত্রীক কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। চারদিন জ্বরের পর আজ সকালে বড় ছেলেটির বসন্ত দেখা দিয়াছে এবং ছোট ছেলেটি কাল রাত্রি হইতেই জ্বরে অচৈতন্য। বাঙ্গালী দেখিয়া আমি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

ইহার পরে গল্পের মধ্যে মাসখানেকের বিচ্ছেদ দিতে চাই। কারণ, কেমন করিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, কেমন করিয়া ছেলে দু'টি ভাল হইল—সে অনেক কথা। বলিতে আমার নিজেরই ধৈর্য্য থাকিবে না, তা পাঠকের ত ঢের দূরের কথা। তবে, মাঝে একটা কথা বলিয়া রাখি। দিন-পনের পরে, রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজী তাঁহার আস্তানা

গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসী দাদা তুমি ত সত্যিই সন্ন্যাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-মায়া আছে। আমার নবীন জীবনকে তুমি ফেলে চ'লে গেলে, তারা কখ্‌খনো বাঁচবে না। কই, যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে ? বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। আমার চোখেও জল আসিল, রামবাবুও স্ত্রীর প্রার্থনায় যোগ দিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি যাইতে পারিলাম না। সাধু-বাবাকে বলিলাম, প্রভু, তোমরা অগ্রসর হও, আমি পথের মধ্যে না পারি, প্রয়াগে গিয়া যে তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রভু ক্ষুণ্ণ হইলেন। শেষে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া নিরর্থক কোথাও বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিয়া, সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটীতেই রহিয়া গেলাম। এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি যে প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হইয়া-ছিলাম, এবং টিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসীলীলার অবসানে উত্তরাধিকার সূত্রে টাট্টু এবং উট দু'টো যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাক,—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া, গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই।

ছেলে দু'টি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারীরূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার, তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা—লেখা পড়িয়া, গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস আমি করিব না। লোক পলাইতে আরম্ভ করিল—ইহার আর কোন বাচ-বিচার রহিল না। যে-বাড়ীতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত—শুধু মা তাঁর পীড়িত সন্তানকে আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর গাড়ীতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন। অনেকদিন আগেই দিতেন—শুধু বাধ্য হইয়াই পারেন নাই। দিন পাঁচ ছয় হইতেই আমার সমস্ত দেহটা এমনি একটা বিশ্রী আলস্যে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, কিছুই ভাল লাগিত না। ভাবিতাম, রাত-জাগা এবং

পরিশ্রমের জন্যই এরূপ বোধ হইত। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ্-টিপ্ করিতে লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইলাম, অপরাহ্ণবেলায় বমি হইয়া গেল। রাত্রি ন'টা দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে। সেদিন সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহাদের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন। অনেক মাত্রে রামবাবুর স্ত্রী বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসী-দাদা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই আরা পর্য্যন্ত চল না?

আমি বলিলাম, তাই যাবো। কিন্তু তোমাদের গাড়ীতে আমাকে একটু জায়গা দিতে হবে।

ভগিনী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন সন্ন্যাসী-দাদা? গাড়ী ত দু'টোর বেশী পাওয়া গেল না—আমাদের নিজেদেরই যে জায়গা হচ্ছে না।

আমি কহিলাম, আমার হাঁটবার যে ক্ষমতা নেই, দিদি! সকাল থেকেই বেশ জ্বর এসেছে।

জ্বর? বল কি গো? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার নূতন ভগিনী মুখ কালি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না। জাগিয়া দেখিলাম, বেলা হইয়াছে। বাড়ীর ভিতর ঘরে-ঘরে তালা-বন্ধ—জনপ্রাণীও নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকিতাম তাহার সুমুখ দিয়াই এই গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা আরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ-ছয়খানি গরুর গাড়ী মৃত্যুভীত নরনারী বোঝাই লইয়া ষ্টেশনে যাইত। সারাদিন অনেক চেষ্টার পরে ইহারই একখানিতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইছিলেন, তিনি অতি প্রত্যূষেই ষ্টেসনের কাছে একটা গাছতলায় আমাকে নামাইয়া দিলেন। তখন আর আমার বসিবার সামর্থ্য ছিল না; সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড্ ছিল। পূর্বে এটি মোসাফিরখানার কাজে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু বর্তমান সময়ে বৃষ্টি-বাদলার দিন গরু-বাছুরের ব্যবহার ছাড়া আর

কোন কাজে লাগিত না। ভদ্রলোকটি ষ্টেসন হইতে একজন বাঙ্গালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দয়ায় জন-কয়েক কুলীর সাহায্যেই এই শেড্‌খানির মধ্যে নীত হইলাম।

আমার বড় দুর্ভাগ্য, আমি যুবকটির কোন পরিচয়ই দিতে পারিলাম না; কারণ, কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মাস পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিবার যখন সুযোগ এবং শক্তি হইল, তখন সংবাদ লইয়া জানিলাম, বসন্ত-রোগে ইতিমধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক এবং পনের টাকা বেতনে ষ্টেসনে চাকরী করেন। খানিক পরে তিনি তাঁহার নিজের শতজীর্ণ বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খান এবং পরের ঘরে থাকেন। দুপুরবেলা একবাটি গরম দুধ আনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন; কিন্তু আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ইহাও বেশ বুঝিতেছিলাম, আর বেশীক্ষণ নয়। এমনি জ্বর যদি আর পাঁচ-ছয় ঘণ্টাও স্থায়ী হয় ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব যাহা কিছু করিবার, ইতিমধ্যে না করিলে, আর করাই হইবে না।

তা বটে; কিন্তু সংবাদ দিবার প্রস্তাবে ভাবনায় পড়িলাম। কেন তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ভাবিলাম, গরীবের টেলিগ্রামের পয়সাটা অপব্যয় করাইয়া আর লাভ কি?

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক তাঁর ডিউটির ফাঁকে এক ভাঁড় জল ও একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, যতক্ষণ আমার হুঁস আছে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে দেখবেন; তার পরে যা হয় তা হোক; আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত মুখচোরা প্রকৃতির লোক। কথা সাজাইয়া

বলিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রত্যুত্তরে তিনি শুধু 'না না' বলিয়াই চুপ করিলেন।

বলিলাম, আপনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার যথার্থ আপনার জন কেহ নাই। তবে পাটনায় পিয়ারী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দেন যে শ্রীকান্ত আরা ষ্টেসনের বাইরে একটা টিন-শেডের মধ্যে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে আছে, তা হ'লে—

ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি এখনি দিচ্চি, চিঠি এবং টেলিগ্রাফ দুই-ই পাঠিয়ে দিচ্চি,—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ভগবান, সংবাদটা যেন সে পায়।

* * * *

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম, সেটা আইস্-ব্যাগ। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপর শুইয়া আছি। সুমুখের টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটা-দুই-তিন ঔষধের শিশি এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর কে একজন লাল-চেক্ র‍্যাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তারপরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ধরাধরি করিয়া আমাকে ডুলিতে তোলা, মাথা-ন্যাড়া করিয়া ওষুধ খাওয়ানো—এম্‌নি কত কি ব্যাপার!

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম ইনি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারো-উনিশের বেশী নয়। তখন আমার শিয়রের নিকট হইতে মৃদুস্বরে যে তাহাকে সম্বোধন করিল, তাহার গলা চিনিতে পারিলাম।

পিয়ারী অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বঙ্কু, বরফটা একবার কেন বদ্‌লে দিলিনে বাবা।

ছেলেটি বলিল, দিচ্চি, তুমি একটুখানি শোও না মা। ডাক্তারবাবু যখন ব'লে গেলেন, বসন্ত নয়, তখন ত আর কোনো ভয় নেই মা।

পিয়ারী কহিল, ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বললেই কি মেয়েমানুষের ভয় যায়? তোকে সে ভাবনা করতে হবে না বঙ্কু, তুই শুধু বরফটা বদলে দিয়ে শুয়ে পড়—আর রাত জাগিস্‌নে।

বঙ্কু আসিয়া বরফ বদলাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম "পিয়ারী!"

পিয়ারী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কপালের জলবিন্দুগুলা আঁচলে মুছাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে কি চিনতে পারচ? এখন কেমন আছ? কা—

ভাল আছি। কখন এলে? এ কি আরা?

হাঁ, আরা। কাল আমরা বাড়ী যাবো।

কোথায়?

পাটনায়। আমার বাড়ী ছাড়া আর কি কোথাও এখন তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি?

এই ছেলেটি কে, রাজলক্ষ্মী?

আমার সতীন-পো। কিন্তু বঙ্কু আমার পেটের ছেলেই। আমার কাছে থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে। আজ আর কথা ক'য়ো না, ঘুমোও—কাল সব কথা বলব। বলিয়া সে আমার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

আমি হাত বাড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ডান-হাতখানি মুঠার মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

বারো

যাহাতে অচৈতন্য শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর। ডাক্তারি-শাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা কিছু গালভরা শক্ত নাম ছিল, কিন্তু আমি তাহা অবগত নই। খবর পাইয়া পিয়ারী তাহার

ছেলেকে লইয়া, জন দুই ভৃত্য এবং দাসী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইদিনই একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করে এবং সহরের ভাল-মন্দ নানাবিধ চিকিৎসক জড় করিয়া ফেলে। ভালই করিয়াছিল। না হইলে, অন্য ক্ষতি না হোক 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যের মহিমাটা সংসারে অবিদিত থাকিয়া যাইত।

ভোরবেলা পিয়ারী কহিল, বঙ্কু, আর দেরী করিস্‌নে বাবা, এইবেলা একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী রিজার্ভ ক'রে আয়। আমি একদণ্ডও এখানে রাখতে আর সাহস করিনে।

বঙ্কুর অতৃপ্ত নিদ্রা তখনও দু' চক্ষু জড়াইয়া ছিল, সে মুদ্রিত-নেত্রে অব্যক্ত-স্বরে জবাব দিল, তুমি ক্ষেপেচ মা, এ অবস্থায় কি নাড়ানাড়ি করা যায়?

পিয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আগে তুই উঠে চোখে-মুখে জল দে দেখি, তারপরে নাড়ানাড়ির কথা বোঝা যাবে। লক্ষ্মী বাপ আমার, ওঠ্।

বঙ্কু অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, ষ্টেশনে চলিয়া গেল। তখন সবেমাত্র সকাল হইতেছিল—ঘরে আর কেহ ছিল না। ধীরে ধীরে ডাকিলাম, "পিয়ারী!"

আমার শিয়রের দিকে আর একখানা খাটিয়া জোড়া দেওয়া ছিল। তাহারই উপরে ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি সে ইতিমধ্যে একটুখানি চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কোমল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙ্গল?

আমি ত জেগেই আছি।

পিয়ারী উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত আমার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, জ্বর এখন খুব কম। একটুখানি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর না কেন?

তা তো বরাবরই করচি পিয়ারী! আজ জ্বর আমার ক'দিন হ'লো?

তেরো দিন, বলিয়াই সে কতই যেন একটা বর্ষীয়সী প্রবীণার মত গম্ভীরভাবে কহিল, দেখ, ছেলেপিলেদের সামনে আর আমাকে ও ব'লে ডেকো না। চিরকাল লক্ষ্মী ব'লে ডেকেচ, তাই কেন বল না?

দিন-দুই হইতেই আমি পূর্ণ সচেতন ছিলাম। আমার সমস্ত কথাই স্মরণ হইয়াছিল। বলিলাম, আচ্ছা। তারপরে যাহা বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম, মনে-মনে সেই কথাগুলি একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচ—কিন্তু তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েচি, আর দিতে চাইনে।

তবে, কি করতে চাও?

আমি ভাবছি এখন যেমন আছি তাতে তিন-চারদিনেই বোধ হয় এক-রকম সেরে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই ক'টা দিন অপেক্ষা করে বাড়ী যাও।

তখন তুমি কি করবে শুনি?

সে যা হয় হবে।

তা হবে, বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। তারপর সুমুখে উঠিয়া আসিয়া খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিল, তিন চারদিনে না হোক, দশ-বারোদিনে এ রোগ সারবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে সারবে আমাকে বলতে পারো?

আসল রোগ আবার কি?

পিয়ারী কহিল, ভাববে একরকম, বলবে একরকম, করবে আর এক-রকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। তুমি জানো যে, একমাসের আগে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারব না—তবু বলবে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, তুমি যাও। ওগো দয়াময়! আমার ওপর যদি তোমার এতই দরদ—তবে যাই হোক গে—সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাঙ্গামাই বাধালে। এসে দেখি, মাটির ওপরে ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে অঘোর অচৈতন্য! মাথাটা ধূলো-কাদায় জট পাকিয়েচে, সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষি বাঁধা; হাতে দু'গাছা পেতলের বালা। মা গো মা! দেখে কেঁদে বাঁচিনে! বলিতে বলিতেই উদ্বেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ ভরিয়া টল-টল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বঙ্কু বলে, ইনি কে মা? মনে মনে বললুম, তুই ছেলে, তোর কাছে সে-কথা আর কি

বলব বাবা। উঃ, কি বিপদের দিনই সেদিনটা গেছে! মাইরি, কি শুভক্ষণেই পাঠশালে দু'জনের চার চক্ষু দেখা হয়েছিল! যে দুঃখটা তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূভারতে কেউ কখনো কাউকে দেয়নি—দেবে না। সহরের মধ্যে বসন্ত দেখা দিয়েচে—সবাইকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় পালাতে পারলে যে বাঁচি।—বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই রাত্রেই আমরা আরা ত্যাগ করিলাম। একজন ছোকরা ডাক্তারবাবু অনেকপ্রকার ঔষধের সরঞ্জাম লইয়া আমাদের পাটনা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সঙ্গে গেলেন।

পাটনায় পৌঁছিয়া বারো তেরোদিনের মধ্যে একপ্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ী একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। এমন যে ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই তাহা নয়। জিনিষগুলি ভালো এবং বেশী মূল্যের, তা বটে; কিন্তু এই মাড়োয়ারী পাড়ার মধ্যে, এইসকল ধনী ও অল্পশিক্ষিত সৌখীন মানুষের সংস্রবে এত সামান্য জিনিষপত্রেই এ সন্তুষ্ট রহিল কি করিয়া? ইতিপূর্ব্বে আমি আরও যতগুলি এই ধরণের ঘর-দ্বার দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত কোথাও কোন অংশে ইহার সাদৃশ্য নাই। সেখানে ঢুকিলেই মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালও অবস্থান করে কি করিয়া? ইহার ঝাড়, লণ্ঠন, ছবি, দেয়ালগিরি, আয়না, গ্লাসকেসের মধ্যে আনন্দের পরিবর্ত্তে আশঙ্কা হয়—সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের অবসরটুকুও বুঝি মিলিবে না? বহুলোকের বহুবিধ কামনা-সাধনার উপহাররাশি এমনি ঠাসাঠাসি গাদাগাদিভাবে চোখে পড়ে যে, দৃষ্টিমাত্রেই মনে হয়, এই অচেতন জিনিষগুলার মত তাহাদের সচেতন দাতারাও যে এই বাড়ীর মধ্যে একটুখানি জায়গার জন্য এমনি ভিড় করিয়া পরস্পরের সহিত রেষা-রেষি ঠেলাঠেলি করিতেছে। কিন্তু এ-বাড়ীর কোন আবশ্যকীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত একটা বস্তুও চোখে পড়িল না, এবং যাহা চোখে পড়িল না, এবং যাহা চোখে পড়িল, সেগুলি যে গৃহস্বামিনীর আপনার প্রয়োজনেই আহৃত হইয়াছে, এবং তাহার নিজের ইচ্ছা এবং অভিরুচিকে অতিক্রম

করিয়া আর কাহারও প্রলুব্ধ অভিলাষ যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া জায়গা জুড়িয়া বসিয়া নাই, তাহা অতি সহজেই বুঝা গেল। আরও একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটা নামজাদা বাইজীর গৃহে গান-বাজনার কোন আয়োজন কোথাও নাই। এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া দোতলার একটা কোণের ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এটি যে বাইজীর নিজের শয়নমন্দির, তাহার ভিতরে চাহিবামাত্রই টের পাইলাম; কিন্তু আমার কল্পনার সহিত ইহার কতই না প্রভেদ! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নাই। মেজেটি শাদা পাথরের, দেয়ালগুলি দুধের মত শাদা ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। ঘরের একধারে একটি ছোট তক্তাপোষের উপর বিছানা পাতা। একটি কাঠের আলনায় খান-কয়েক বস্ত্র এবং তাহারই পিছনে একটি লোহার আলমারি। আর কোথাও কিছু নাই। জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল— চৌকাটের বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। বোধ করি ক্লান্তি-বশতঃই তাহার শয্যায় আসিয়া বসিয়াছিলাম, না হইলে ঘরে আর কিছু বসিবার জায়গা থাকিলে তাহাতেই বসিতাম।

সুমুখের খোলা জানালা ঢাকিয়া একটা মস্ত নিমগাছ; তাহার ভিতর দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস আসিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা মিষ্ট শব্দে চমকিত হইয়া দেখিলাম, গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়াছে। সে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। সে এদিকে একেবারেই তাকায় নাই। সোজা আলনার কাছে গিয়া শুষ্কবস্ত্রে হাত দিতেই, আমি ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—ঘাটে কাপড় নিয়ে যাও না কেন?

পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, অ্যাঁ—চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে আছ? না, না, ব'সো ব'সো—যেতে হবে না; আমি ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসচি, বলিয়া লঘু-পদক্ষেপে গরদের কাপড়খানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেক পরে প্রফুল্লমুখে ফিরিয়া আসিয়া হাসিয়া কহিল,

আমার ঘরে ত কিছুই নেই; তবে কি চুরি করতে এসেছিলে বল ত? আমাকে নয় ত?

আমি বলিলাম, আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ পেয়েচ? তুমি আমার এত করলে, আর শেষে তোমাকেই চুরি করব? আমি অত লোভী নই।

পিয়ারীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। কথাটায় সে ব্যথা পাইতে পারে, বলিবার সময় তাহা ভাবি নাই। ব্যথা দিবার ইচ্ছাও ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। বিশেষতঃ দুই-একদিনের মধ্যেই আমি প্রস্থানের সঙ্কল্প করিতেছিলাম। বেফাঁস কথাটা সারিয়া লইবার জন্য জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, নিজের জিনিষ বুঝি কেউ চুরি করতে আসে? এই তোমার বুদ্ধি?

কিন্তু এত সহজে তাকে ভুলানো গেল না। মলিন-মুখে কহিল, তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হতে হবে না—দয়া করে সে-সময়ে যে একটা খবর পাঠিয়েছিলে, এই আমার ঢের।

তাহার শুদ্ধস্নাত প্রফুল্ল হাসি মুখখানি এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল-বেলাটাতেই ম্লান করিয়া দিলাম দেখিয়া, একটা বেদনার মত বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল। সেই হাসিটুকুর মধ্যে কি যেন একটা মাধুর্য্য ছিল যে, তাহা নষ্ট হইবামাত্র ক্ষতিটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফিরিয়া পাইবার আশায় তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত-স্বরে বলিয়া উঠিলাম, লক্ষ্মী, তোমার কাছে ত লুকানো কিছু নেই—সবই ত জানো। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধূলোবালির উপরেই মরে থাকতে হ'তো, কেউ ততদূরে গিয়ে একবার হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করত না। সেই যে চিঠিতে লিখেছিলে, সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে যেন মনে করি—নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলে কথাটা মনে পড়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি।

পারো?

নিশ্চয়।

তাহলে আমার জন্যই প্রাণটা ফিরে পেয়েচ বল?

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তাহলে ওটা দাবী করতে পারি বল?

তা পারো। কিন্তু আমার প্রাণটা এত তুচ্ছ যে, তার পরে তোমার লোভ হওয়াই উচিত নয়।

পিয়ারী এতক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল, তবু ভাল যে নিজের দামটা এতদিনে টের পেয়েচ। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, তামাসা থাক্—অসুখ ত একরকম ভাল হ'লো, এখন যাবে কবে মনে করচ?

তাহার প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গম্ভীর হইয়া কহিলাম, কোথাও যাবার ত আমার এখন তাড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন থাকব ভাবছি।

পিয়ারী কহিল, কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকিপুর থেকে আসচে। বেশিদিন থাকলে সে হয়ত কিছু ভাবতে পারে।

আমি বলিলাম, ভাবলেই বা। তাকে ত তোমার ভয় করে চলতে হয় না। এমন আরাম ছেড়ে শীঘ্র কোথাও নড়চিনে।

পিয়ারী বিরস-মুখে বলিল, তা কি হয়? বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গেল।

পরদিন বিকালবেলায় আমার ঘরের পশ্চিমদিকের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম, বঙ্কু আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিনে তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। একটা চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, বঙ্কু, কি পড় তুমি?

ছেলেটি অতিশয় সাদা সিধা ভালমানুষ। কহিল, গতবৎসর আমি এণ্ট্রান্স পাশ করেচি।

এখন তাহলে বাঁকিপুর কলেজেই পড়চ ত?

আজ্ঞে হাঁ।

তোমরা ক'টি ভাই-বোন?

ভাই আর নেই। চারটি বোন।

তাঁদের বিয়ে হয়ে গেছে?

আজ্ঞে হাঁ, মা-ই বিয়ে দিয়েচেন।

তোমার আপনার মা বেঁচে আছেন ?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি দেশের বাড়ীতেই আছেন।

তোমার এ মা কখনো তোমাদের বাড়ীতে গেছেন ?

অনেকবার। এই ত পাঁচ-ছ'মাস হ'লো এসেচেন।

সেজন্য দেশে কোন গোলযোগ হয় না ?

বঙ্কু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, হ'লোই বা! আমাদের একঘরে করে রেখেচে বলে ত আর আমি আপনার মাকে ত্যাগ করতে পারিনে! আর অমন মা-ই বা ক'জনের আছে!

মুখে আসিল জিজ্ঞাসা করি, মায়ের উপর এত ভক্তি আসিল কিরূপে ? কিন্তু চাপিয়া গেলাম।

বঙ্কু কহিতে লাগিল, আচ্ছা আপনিই বলুন, গান-বাজনা করাতে কি কোন দোষ আছে? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পরনিন্দে পরচর্চ্চা ত করেন না? বরঞ্চ গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই আট-দশজন ছেলের পড়ার খরচ দেন, শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কম্বল দেন। এ কি মন্দ কাজ করেন ?

আমি বলিলাম, না। এ ত খুব ভাল কাজ।

বঙ্কু উৎসাহিত হইয়া কহিল, তবে বলুন ত! আমাদের গাঁয়ের মত পাজি গাঁ কোথাও আছে? এই দেখুন না, সে-বছর ইঁট পুড়িয়ে আমাদের কোঠা-বাড়ী তৈরী হ'লো। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আমার মাকে বললেন, দিদি, আরও কিছু টাকা খরচ করে ইঁটখোলা-টাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই। তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে তাই করে দিলেন, ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন। কিন্তু গাঁয়ের লোক সে পুকুর মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না। অমন জল কিন্তু কেউ খাবে না, ছোঁবে না, এমনি বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংসায় সবাই মরে যায় যে, আমাদের কোঠাবাড়ী তৈরী হ'লো। বুঝলেন না ?

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, বল কি হে? এই দারুণ জলকষ্ট ভোগ করবে, তবু অমন জল ব্যবহার করবে না ?

বঙ্কু একটু হাসিয়া কহিল, তাই ত। কিন্তু সে কি বেশিদিন চলে ?

প্রথম বছর ভয়ে কেউ সে জল ছুঁলে না ; কিন্তু এখন ছোটলোকেরা সবাই নিচ্ছে, খাচ্ছে—বামুন-কায়েতেরাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তবু পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না—এ কি মায়ের কম কষ্ট !

আমি কহিলাম, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙবার যে একটা কথা আছে, এ যে দেখি তাই !

বন্ধু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই। এমন গাঁয়ে আলাদা একঘরে হয়ে থাকাই শাপে বর। আপনি কি বলেন ?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম, হাঁ-না স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সেজন্য বন্ধুর উদ্দীপনা বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছেলেটি তাহার বিমাতাকে সত্যই ভালবাসে। অনুকূল শ্রোতা পাইয়া ভক্তির আবেগে সে দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠিল এবং তাঁহার অজস্র স্তুতিবাদে আমাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময়ে তাহার হুঁস হইল যে, এতক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত ?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না, কাল সকালেই আমি যাচ্ছি।

কাল ?

হাঁ, কালই।

কিন্তু আপনার দেহ ত এখনো সবল হয় নি। অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে।

বলিলাম, সকাল পর্য্যন্ত সেরেচে বলেই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না। আজ দুপুর থেকেই আমার মাথাটা ধরেচে।

তবে কেন এত শীঘ্র যাবেন ? এখানে ত আপনার কোন কষ্ট নেই, বলিয়া ছেলেটি চিন্তিত-মুখে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া তাহার মুখের উপর ভিতরের যথার্থ কথাটা পড়িতে চেষ্টা করিলাম ; যতটা পড়িলাম, তাহাতে সত্য গোপনের কোন প্রয়াস অনুভব করিলাম না। তবে ছেলেটি

লজ্জা পাইল বটে, এবং সেই লজ্জাটা ঢাকিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করিল; কহিল, আপনি এখন যাবেন না।

কেন বল দেখি?

আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন।—বলিয়া ফেলিয়াই মুখ রাঙা করিয়া চট করিয়া উঠিয়া গেল।

দেখিলাম, ছেলেটি খুবই সরল বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ নয়। পিয়ারী কেন যে বলিয়াছিল, আর বেশিদিন থাকলে আমার ছেলে কি ভাববে। কথাটার সহিত ছেলেটির ব্যবহার আলোচনা করিয়া অর্থটা যেন বুঝিতে পারিলাম বলিয়া মনে হইল। মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায় যেন একটা নতুন জ্ঞান লাভ করিলাম। পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়, এবং সে যে সংসারে সবদিক্ দিয়া সর্ব্বপ্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে যে-মুহূর্ত্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শত-পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে! তাহার অসংযত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপাতেই তাহাকে ঠেলিতে চাহুক, কিন্তু এ-কথাও সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা; এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না! তাহার বিহ্বল-যৌবনের লালসামত্ত বসন্তদিনে কে যে ভালবাসিয়া তাহার পিয়ারী নাম দিয়াছিল, আমি জানি না, কিন্তু এই নামটা পর্য্যন্ত সে তাহার ছেলের কাছে গোপন করিতে চায়, এই কথাটা আমার স্মরণ হইয়া গেল।

চোখের উপর সূর্য্য অস্ত গেল। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না। আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এতদিন চলুক না, স্নেহ যত মাধুর্য্যই ঢালিয়া দিক না, উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য

অনুক্ষণ দুর্নিবারবেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে মনে বলিলাম, কাল সকালেই ত আমি এখান হইতে যাইতেছি, কিন্তু তখন যেন মনের লাভালাভের হিসাব করিতে গিয়া হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি। আমার এই যাওয়াটা যেন যাওয়াই হয়। দেখিতে নাই চাই—ছল করিয়া একখানি অতিসূক্ষ্ম বাসনার বাঁধন রাখিয়া না যাই, যাহার সূত্র ধরিয়া আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

অন্যমনস্ক হইয়া সেইখানেই বসিয়াছিলাম; সন্ধ্যার সময় ধুনোচিতে ধূপ-ধূনা দিয়া, সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর একটা ঘরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাথা ধরেচে, হিমে বসে কেন,—ঘরে যাও।

হাসি পাইল। বলিলাম, অবাক করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হিম না থাক্, ঠাণ্ডা বাতাস ত বইচে। সেইটাই কোন্ ভাল?

না, সেও তোমার ভুল। ঠাণ্ডা গরম কোন বাতাসই বইচে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথাধরাটা ত আর আমার ভুল নয়—সেটা সত্যি! ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড় না? রতন কি করচে? সে কি একটু ওডিকোলন মাথায় দিয়ে দিতে পারে না? এ-বাড়ীর চাকরগুলোর মত 'বাবু' চাকর আর পৃথিবীতে নেই। বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাছে চলিয়া গেল।

রতন যখন ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া ওডিকোলন, জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল এবং তাহার ভুলের জন্য বারম্বার অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, এতে আমার যে দোষ নেই, সে কি আমি জানিনে বাবু? কিন্তু মাকে ত বলবার জো নেই যে, তুমি রেগে থাকলে মিছিমিছি বাড়ীশুদ্ধ লোকের দোষ দেখতে পাও।

কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম, রাগ কেন?

রতন কহিল, সে কি কারো জানবার জো আছে? বড়লোকের রাগ বাবু শুধু-শুধু হয়, আবার শুধু-শুধুই যায়। তখন গা-ঢাকা দিয়ে না থাকতে পারলেই চাকর-বাকরদের প্রাণ গেল।

দ্বারের নিকট হইতে হঠাৎ প্রশ্ন আসিল—তখন তোদের কি আমি মাথা কেটে নি রে, রতন। আর বড়লোকের বাড়ীতে যদি এত জ্বালা ত আর কোথাও যাস্‌নে কেন?

মনিবের প্রশ্নে রতন কুণ্ঠিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, তোর কাজটা কি? ওঁর মাথা ধরেচে—বঙ্কুর মুখে শুনে আমি তোকে জানালুম। তাই এখন আটটা রাত্তিরে এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস্। কাল থেকে আর কোথাও কাজের চেষ্টা করিস্—এখানে হবে না। বুঝলি!

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে, রতন ওডিকোলন জল দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল সকালেই নাকি বাড়ী যাবে?

আমার যাবার সঙ্কল্প ছিল বটে, কিন্তু বাড়ী ফিরিবার সঙ্কল্প ছিল না। তাই প্রশ্নটার আর-একরকম করিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, কাল সকালেই যাব।

সকাল ক'টার গাড়ীতে যাবে?

সকালেই বেড়িয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ী জোটে।

আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবলের জন্য কাউকে না হয় ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিই গে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে ভৃত্যদের শব্দ-সাড়া নীরব হইল; বুঝিলাম সকলেই এবার নিদ্রার জন্য শয্যাশ্রয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে? রতন বলিয়াছিল, বড়লোকের ক্রোধ শুধু-শুধু হয়। কথাটা আর কোন

বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না, কিন্তু পিয়ারীর সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অত্যন্ত সংযমী এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি, এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি নাই থাক্, প্রবৃত্তি-সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়—বোধ করি কারও চেয়ে কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতিবড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারেও কোনদিন কিছু ব্যক্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্য্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা; কিন্তু আমার উপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। সুতরাং বিদায়ের সময় তাহার এই ঔদাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনেক রাত্রে হঠাৎ একসময়ে তন্দ্রা ভাঙিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া ওদিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল; পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারম্বার অনুভব করিতে লাগিল। নিভৃতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শে প্রথমটা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তখনই মনে হইল, সংজ্ঞাহীন রোগে সেবা করিয়া যে চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আমার লজ্জা পাইবার আছে কি! তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্য্যন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্তই বুঝিলাম। যে গোপনেই আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জ্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সকালে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ মুখ জ্বালা

করিতেছে; মাথা এত ভারী যে, শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবুও যাইতেই হইবে। এ-বাটীতে নিজেকে আর একদণ্ডও বিশ্বাস নাই—সে যে-কোন মুহূর্ত্তেই ভাঙিয়া পড়িতে পারে। নিজের জন্যও তত নয়। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জন্যই রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা করা চলিবে না।

মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, সে তাহার বিগত-জীবনের কালি অনেকখানিই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারিপাশে ছেলেমেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া, ছিনাইয়া বাহির করিয়া আনিব—এতবড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবন অধ্যায়েই চিরদিনের জন্যই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে!

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, এখন দেহটা কেমন আছে?

বলিলাম, খুব মন্দ নয়। যেতে পারব।

আজ না গেলেই কি নয়?

হাঁ, আজ যাওয়া চাই।

তাহলে বাড়ী পৌঁছেই একটা খবর দিয়ো। নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।

তাহার অবিচলিত ধৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আমি বাড়ীতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেবো।

পিয়ারী কহিল, দিয়ো। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বাহিরে পাল্‌কিতে যখন উঠিতে যাইতেছি, দেখি দ্বিতলের বারান্দায় পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের ভিতর যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অন্নদাদিদিকে মনে পড়িল। বহুকাল পূর্ব্বের একটা শেষদিনে তিনিও যেন ঠিক এমনি গম্ভীর, এমনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সেই দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি আমি আজিও ভুলি নাই, কিন্তু সে

চাহনিতে তখন কতবড় একটা আসন্ন বিদায়ের ব্যথা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই। কি জানি, আজিও তেমনিধারা একটা কিছু ওই দুটি নিবিড় কালো চোখের মধ্যেও আছে কি না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাল্‌কিতে উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোট-খাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত। বাহকেরা পাল্‌কি লইয়া ষ্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারম্বার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মী, দুঃখ করিয়ো না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার ঋণ ইহ-জীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে-জীবন তুমি দান করিলে, সে-জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সঙ্কল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে। কিন্তু ডাক যখন সত্যই পড়িল তখন বুঝিলাম বিস্ময় এবং সঙ্কোচ আমার যত বড়ই হোক, এ আহ্বান শিরোধার্য্য করিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করা চলিবে না।

তাই, আজ আবার এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার শতচ্ছিন্ন গ্রন্থিগুলি আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে, বাড়ী ফিরিয়া আসবার পরে, আমার এই সুখে-দুঃখে মেশানো জীবনটাকে কে যেন হঠাৎ কাটিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল, আমার এ জীবনের দুঃখের বোঝা আর আমার নিজের নয়। এ বোঝা বহিয়া বেড়াক সে—যাহার নিতান্ত গরজ। অর্থাৎ আমি যে দয়া করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, এই ত রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য। চোখে আকাশের রঙ বদলাইয়া গেল, বাতাসের স্পর্শ আর একরকম করিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল,—কোথাও যেন আর ঘর-বার, আপনার-পর রহিল না। এমনি এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে অন্তর-বাহির একাকার হইয়া উঠিল যে, রোগকে রোগ বলিয়া, বিপদকে বিপদ বলিয়া, অভাবকে অভাব বলিয়া আর মনেই হইল না। সংসারে কোথাও যাইতে, কোনও কিছু করিতে দ্বিধা-বাধার যেন আর লেশমাত্র সংস্রব রহিল না।

এসব অনেক দিনের কথা। সে আনন্দ আর আমার নাই; কিন্তু সেদিনের এই একান্ত বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্বাদ একটা দিনের জন্যও যে জীবনে উপভোগ করিতে পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ। অথচ, হারাইয়াছি বলিয়াও কোন দিন ক্ষোভ করি না। শুধু এই কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়, যে শক্তি সেদিন এই হৃদয়টার ভিতর হইতেই জাগ্রত হইয়া এত সত্বর সংসারের সমস্ত নিরানন্দ হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে কি

বিরাট শক্তি! আর মনে হয়, সেদিন আমারই মত আর দুটি অক্ষম, দুর্ব্বল হাতের উপর এত বড় গুরুভারটা চাপাইয়া না দিয়া, যদি সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ভারবাহী সেই দুটি হাতের উপরেই আমার সেদিনের সেই অখণ্ড বিশ্বাসের সমস্ত বোঝা সঁপিয়া দিতে শিখিতাম, তবে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল? কিন্তু, যাক্ সে কথা।

রাজলক্ষ্মীকে পৌঁছান সংবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে চিঠির জবাব আসিল, অনেক দিন পরে। আমার অসুস্থ দেহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া, অতঃপর সংসারী হইবার জন্য সে আমাকে কয়েকটা মোটা রকমের উপদেশ দিয়াছে, এবং সংক্ষিপ্ত পত্র শেষ করিয়াছে এই বলিয়া যে, সে কাজের ঝঞ্ঝাটে সময়মত পত্রাদি লিখিতে না পারিলেও আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই, এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি।

তথাস্তু! এত দিন পরে সেই রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি!

আকাশ-কুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল, এবং যে দুই-একটা শুক্‌নো পাপড়ি বাতাসে ঝরিয়া পড়িল, তাহাতে কুড়াইয়া ঘরে তুলিবার জন্যও মাটি হাতড়াইয়া ফিরিলাম না। চোখ দিয়া যদি বা দু' এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে ত, হয়ত পড়িয়াছে, কিন্তু সে কথা আমার মনে নাই। তবে, এ কথা মনে আছে যে, দিনগুলা আর স্বপ্ন দিয়া কাটিতে চাহিল না। তবুও এম্‌নি ভাবে আরও পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি, হঠাৎ একখানা অদ্ভুত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরে মেয়েলী কাঁচা অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা। খুলিতেই পত্রের ভিতর হইতে একখানি ছোট পত্র ঠুক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া তাহার অক্ষর এবং নাম-সইর পানে চাহিয়া সহসা নিজের চোখ দুটাকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার যে মা দশ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই শ্রীহস্তের লেখা। নাম-সই তাঁরই। পড়িয়া দেখিলাম, মা তাঁর 'গঙ্গাজল'কে যেমন করিয়া অভয় দিতে হয়, তা দিয়াছেন। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এই যে, বছর বারো-তেরো পূর্ব্বে এ 'গঙ্গাজলের' যখন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ ও দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা

জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে আমার স্বর্গবাসিনী জননী এই গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হইয়া তা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে, তাঁর নিজের ছেলে ত আছে! তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদি-বা একান্ত অভাব হয়, তখন আমি ত আছি! সমস্ত লেখাটা আগাগোড়া বার-দুই পড়িয়া দেখিলাম, মুন্সিয়ানা আছে বটে! মার উকীল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যত প্রকারে কল্পনা করা যাইতে পারে, তিনি নিজেকে, মায় তাঁর বংশধরটিকেও দায়িত্বে বাঁধিয়া গিয়াছেন। দলিলের কোথাও এতটুকু ফাঁক, এতটুকু ত্রুটি রাখিয়া যান নাই।

সে যাই হোক, 'গঙ্গাজল' যে এই সুদীর্ঘ তের বৎসর কাল এই পাকা দলিলটির উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নীরবে বসিয়া ছিলেন, তাহা মনে হইল না। বরঞ্চ মনে হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ ও লোকাভাবে সুপাত্র যখন তাঁহার পক্ষে একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনূঢ়া কন্যার শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকে বুকের রক্ত মগজে চড়িবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই এই হতভাগ্য সুপাত্রের উপর তাঁহার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এই চিঠির জন্য আজ তাঁহার মাথা খাইয়া ফেলিতাম ; কিন্তু এখন, যে উঁচুতে বসিয়া তিনি হাসিতেছেন, সেখানে লাফ দিয়াও যে তাঁর পায়ের তলায় সজোরে একটা ঢুঁ মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইব, সে পথও আমার বন্ধ হইয়া গেছে।

সুতরাং মায়ের কিছু না করিতে পারিয়া, তাঁর গঙ্গাজলের কি করিতে পারি না-পারি, পরখ করিবার জন্য, একদিন রাত্রে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সারারাত্রি, ট্রেণে কাটাইয়া পরদিন তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা অপরাহ্ণ। গঙ্গাজল-মা প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন না। শেষে পরিচয় পাইয়া এই তের বৎসর পরে এমন কান্নাই কাঁদিলেন যে, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁর কোন আপনার লোক চোখের উপর তাঁকে মরিতে দেখিয়াও এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বলিলেন, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তিনিই এখন আমার মাতৃস্থানীয়া এবং দায়িত্ব-গ্রহণের সোপান স্বরূপ আমার সাংসারিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবা কত রাখিয়া গিয়াছেন, মায়ের কি কি গহনা আছে, এবং তাহা কাহার কাছে আছে, আমি চাকরী করি না কেন, এবং করিলে কতটাকা আন্দাজ মাহিনা পাইতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আলোচনার ফল তাঁহার কাছে তেমন সন্তোষজনক হইল না। বলিলেন, তাঁহার কোন্ এক আত্মীয় বর্ম্মা মুল্লুকে চাক্‌রী করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান্ হইয়াছে। সেখানকার পথেঘাটে টাকা ছড়ানো আছে—শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না-নামিতে বাঙালীদের সাহেবেরা কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া চাক্‌রী দেয়—এইরূপ অনেক কাহিনী। পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে, এবং মোহভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। গঙ্গাজল-মায়ের বর্ম্মা মুল্লুকের বিবরণ আমাকে তীরের মত বিঁধিল। 'লাল' হইবার আশায় নহে—আমার মধ্যে যে 'ভবঘুরে'টা কিছুদিন হইতে ঝিমাইতেছিল সে তাহার শ্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তেই খাড়া হইয়া উঠিল। যে সমুদ্রকে ইতিপূর্ব্বে শুধু দূর হইতে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, সেই অনন্ত জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে পাইব, এই চিন্তাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোনমতে একবার ছাড়া পাইলে হয়।

মানুষকে মানুষ যতপ্রকারে জেরা করিতে পারে, তাহার কোনটাই গঙ্গাজল-মা আমাকে বাদ দেন নাই। সুতরাং, নিজের মেয়ের পাত্র হিসাবে আমাকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি এক প্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু রাত্রে খাবার সময় তাঁহার ভূমিকার ধরণ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাকে একেবারে হাতছাড়া করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি এই বলিয়া সুরু করিলেন যে, মেয়ের বরাতে সুখ

না থাকিলে, যেমন কেননা টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, বিদ্যাসাধ্যি দেখিয়া দাও, সমস্তই নিষ্ফল। এবং এ সম্বন্ধে নামধাম, বিবরণাদি সহযোগে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য নজির তুলিয়াও বিফলতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়। অন্য পক্ষে এমনও কতকগুলি লোকের নাম উল্লেখ করিলেন, যাহারা আকাট-মূর্খ হইয়াও, সুদ্ধমাত্র স্ত্রীর আয়-পয়ের জোরেই সম্প্রতি টাকার উপর দিবারাত্রি উপবেশন করিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, টাকা জিনিষটার প্রতি আমার আসক্তি থাকিলেও চব্বিশ ঘণ্টা তাহার উপরেই উপবেশন করিয়া থাকাটা আমি প্রীতিকর বিবেচনা করি না এবং এজন্য স্ত্রীর আয়-পয় যাচাই করিয়া দেখিবার কৌতূহলও আমার নাই। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না। কারণ, যিনি সুদীর্ঘ তের বৎসর পরেও এমন একটা পাত্রকে দলিলরূপে দাখিল করিতে পারেন, তাঁহাকে এত সহজে ভুলানো যায় না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, ইহাকে মায়ের ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত এবং যে সন্তান সমর্থ হইয়াও মাতৃঋণ পরিশোধ করে না, সে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন নিরতিশয় শঙ্কিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি, তখন কথায় কথায় অবগত হইলাম, নিকটবর্তী গ্রামে একটি সুপাত্র আছে বটে, কিন্তু পাঁচশত টাকার কম তাহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি চোখে পড়িল। মাসখানেক পরে যা হোক একটা উপায় করিব—কথা দিয়া, পরদিন সকালেই প্রস্থান করিলাম, কিন্তু উপায় কি করিয়া করিব—কোনদিকে চাহিয়া তাহার কোন কিনারা দেখিতে পাইলাম না।

আমার উপরে আরোপিত এই বাঁধনটা যে আমার পক্ষে সত্যকার বস্তু হইতেই পারে না, তাহা অনেক করিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু তথাপি মাকে তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির ফাঁস হইতে অব্যাহতি না দিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার কথাও কোনমতে ভাবিতে পারিলাম না।

বোধ করি, এক উপায় ছিল, পিয়ারীকে বলা, কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধেও মনস্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন হইল, তাহার সংবাদ

জানিতাম না। সেই পৌঁছান খবর ছাড়া আমিও আর চিঠি লিখি নাই, সেও তাহার জবাব দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পত্র লিখে নাই। বোধ করি, চিঠি-পত্রের ভিতর দিয়াও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, এ তার অভিপ্রায় ছিল না। অন্ততঃ, তাহার সেই একটা চিঠি হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। তবুও আশ্চর্য্য এই যে, পরের মেয়ের জন্য ভিক্ষার ছলে একদিন যথার্থই পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া নিচের বসিবার বারান্দায় দেখিলাম, দুজন উর্দ্দী-পরা দরওয়ান বসিয়া আছে। তাহারা হঠাৎ একটা শ্রীহীন অপরিচিত আগন্তুক দেখিয়া এমন করিয়া চাহিয়া রহিল যে, আমার সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। ইহাদের পূর্ব্বে দেখি নাই। পিয়ারীর সাবেক বুড়া দরওয়ানজীর পরিবর্ত্তে কেন যে তাহার এমন দু'জন বাহারে দরওয়ানের আবশ্যক হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাই হোক, ইহাদের অগ্রাহ্য করিয়া উপরে উঠিয়া যাইব, কিম্বা সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিব, স্থির করিতে না করিতে দেখি, রতন ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া সে প্রথমে অবাক্ হইয়া গেল। পরে পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন ? এখানে দাঁড়িয়ে যে ?

এইমাত্র আসচি রতন। খবর সব ভাল ?

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সব ভাল বাবু। ওপরে যান—আমি বরফ কিনে নিয়ে এখনি আসচি, বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তোমার মনিব ঠাক্রুণ উপরেই আছেন ?

আছেন, বলিয়াই সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চ হাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কানে গেল। একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাপ্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিষ একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ

দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপর শুভ্র জাজিম ধপধপ করিতেছে। তাকিয়াগুলার অড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরনে বাঙালীর মত ধুতি-পিরান থাকিলেও, মাথার উপর কাজ-করা মস্‌লিনের টুপিতে বেহারী বলিয়াই মনে হইল। একজোড়া বাঁয়া তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবলচী এবং তাহারই অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। একপাশে একটা ছোট হারমোনিয়াম। পিয়ারীর গায়ে মুজ্‌রার পোষাক ছিল না বটে, কিন্তু সাজসজ্জারও অভাব ছিল না। বুঝিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক—ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র।

আমাকে দেখিয়া পিয়ারীর মুখের সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। তার পর জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, এ কি! শ্রীকান্তবাবু যে! কবে এলেন?

আজই।

আজই? কখন? কোথা উঠলেন?

ক্ষণকালের জন্য হয়ত বা একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকিব, না হইলে জবাব দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইতেও বিলম্ব হইল না। বলিলাম, এখানকার সমস্ত লোককেই ত তুমি চেন না, নাম শুনলে চিনতে পারবে না।

যে ভদ্রলোকটি সবচেয়ে জমকাইয়া বসিয়াছিলেন, বোধ করি, এ যজ্ঞের যজমান তিনিই। বলিলেন,—আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে। বলিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভাবে বুঝাইলেন যে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা তিনি ঠিক আঁচ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে একটা সসম্মান অভিবাদন করিয়া জুতার ফিতা খুলিবার ছলে মুখ নীচু করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া লইতে চাহিলাম। বিচারের সময় বেশি ছিল না বটে, কিন্তু এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে এটা স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, ভিতরে আমার যাই থাক, বাহিরের ব্যবহারে তাহা কোনমতেই প্রকাশ পাইলে চলিবে না। আমার মুখের কথায়, আমার চোখের চাহনিতে, আমার সমস্ত আচরণের

কোন ফাঁক দিয়া যেন অন্তরের ক্ষোভ বা অভিমানের একটি বিন্দুও বাহিরে আসিয়া না পড়িতে পারে। ক্ষণকাল পরে ভিতরে সকলের মধ্যে আসিয়া যখন উপবেশন করিলাম, তখন নিজের মুখের চেহারাটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু অন্তরে অনুভব করিলাম যে, তাহাতে অপ্রসন্নতার চিহ্ন লেশমাত্রও আর নাই। রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলাম, বাইজী বিবি, আজ শুকদেব ঠাকুরের ঠিকানা পেলে তাঁকে তোমার সামনে বসিয়ে একবার মনের জোরটা তাঁর যাচাই ক'রে নিতুম। বলি, করেচ কি? এ যে রূপের সমুদ্র বইয়ে দিয়েচ!

প্রশংসা শুনিয়া কর্ম্মকর্ত্তা বাবুটি আহ্লাদে গলিয়া বারংবার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিয়া জেলার লোক; দেখিলাম, তিনি বাংলা বলিতে না পারিলেও বেশ বুঝেন। কিন্তু পিয়ারীর কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা যে লজ্জায় নয়,—রাগে, তাহাও বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলাম না, বাবুটিকে উদ্দেশ করিয়া তেম্‌নি হাসিমুখে বাংলা করিয়া কহিলাম, আমার আসার জন্যে আপনাদের আমোদ-আহ্লাদের যদি এতটুকু বিঘ্ন হয় ত অত্যন্ত দুঃখিত হব। গান-বাজনা চলুক।

বাবুটি এত খুসী হইয়া উঠিলেন যে, আবেগে আমার পিঠের উপর একটা চাপড় মারিয়া বসিলেন, বহুৎ আচ্ছা বাবু! পিয়ারী বিবি, একঠো ভালা সঙ্গীত হোক্।

সন্ধ্যার পর হবে—আর এখন নয়, বলিয়া পিয়ারী হারমোনিয়ামটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া সহসা উঠিয়া গেল।

এইবার বাবুটি আমার পরিচয় গ্রহণের উপলক্ষে নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁর নাম রামচন্দ্র সিংহ। তিনি পূর্ণিয়া জেলার একজন জমিদার, দারভাঙ্গার মহারাজ তাঁর কুটুম্ব, পিয়ারীবিবিকে তিনি সাত-আট বৎসর হইতে জানেন। সে তাঁর পূর্ণিয়ার বাড়ীতে তিন চার বার মুজ্‌রা করিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও অনেকবার এখানে গান শুনিতে আসেন; কখন কখন দশ-বারো দিন পর্য্যন্ত থাকেন—মাস-তিনেক পূর্ব্বেও একবার আসিয়া এক সপ্তাহ বাস করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি

ইত্যাদি। আমি কেন আসিয়াছি—একবার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পিয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, বাইজীকে জিজ্ঞাসা করুন না, কেন এসেছি।

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিল, কিন্তু জবাব দিল সহজ, শান্ত স্বরে কহিল,—উনি আমার দেশের লোক।

আমি হাসিয়া বলিলাম, বাবুজী, মধু থাকলেই মৌমাছি এসে জোটে—তারা দেশ-বিদেশের বিচার করে না। কিন্তু বলিয়াই দেখিলাম, রহস্যটা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পূর্ণিয়া জেলার জমিদার মুখখানা গম্ভীর করিলেন এবং তাঁহার চাকর আসিয়া যেই জানাইল সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করা হইয়াছে, তিনি তখনি প্রস্থান করিলেন। তবল্‌চী এবং আর দুইজন ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। তাঁর মনের ভাবটা অকস্মাৎ কেন এমন বিকল হইয়া গেল, তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিলাম না।

রতন আসিয়া কহিল, মা, বাবুর বিছানা করি কোথায়?

পিয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আর কি ঘর নেই রতন? আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে কি এতটুকু বুদ্ধি খাটাতে পারিস্ নে? যা এখান থেকে। বলিয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাহির হইয়া গেল। বেশ দেখিতে পাইলাম, আমার আকস্মিক শুভাগমনে এ বাড়ীর ভারকেন্দ্রটা সাংঘাতিক রকম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—এমন হঠাৎ আসা হ'ল যে?

বলিলাম, দেশের লোক, অনেকদিন না দেখে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম, বাইজী!

পিয়ারীর মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল। আমার পরিহাসে সে কিছু-মাত্র যোগ না দিয়া বলিল, আজ রাত্রে এখানেই থাকবে ত?

থাকতে বল, থাকব।

আমার আর বলাবলি কি! তবে, তোমার হয়ত অসুবিধা হবে। যে ঘরটায় তুমি শুতে, সেটাতে—

বাবু শুচ্চেন ? বেশ ! আমি নীচে শোব, তোমার নীচের ঘরগুলোও ত চমৎকার।

নীচে শোবে ? বল কি ! মনের মধ্যে এতটুকু বিকার নেই—দুদিনেই এত বড় পরমহংস হয়ে উঠলে কি ক'রে ?

মনে মনে বলিলাম, পিয়ারী, আমাকে তুমি এখনও চেনোনি। মুখে বলিলাম, আমার তাতে মান অভিমান একবিন্দু নেই। আর কষ্টের কথা যদি মনে কর ত সেটা একেবারে নিরর্থক। আমি বাড়ী থেকে বেরোবার সময় খাবার-শোবার ভাবনাগুলোও ফেলে রেখে আসি। সে ত তুমি নিজেও জানো। বেশি বিছানা থাকে ত একটা পেতে দিতে ব'লো, না থাকে দরকার নেই—আমার কম্বল সম্বল আছে।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আছে জানি। কিন্তু এতে তোমার মনে কোনরকম দুঃখ হবে না ত ?

আমি হাসিয়া বলিলাম,—না, কারণ ষ্টেশনে প'ড়ে থাকার চেয়ে এটা ঢের ভাল।

পিয়ারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি হ'লে বরঞ্চ গাছতলায় পড়ে থাকতুম, এত অপমান সহ্য করতুম না।

তাহার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া আমি না হাসিয়া পারিলাম না। সে যে কি কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে চায়, তাহা আমি অনেকক্ষণ টের পাইয়াছিলাম। কিন্তু শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলাম, আমি এত নির্ব্বোধ নই যে মনে করব, তুমি ইচ্ছে ক'রে আমাকে নীচে শুতে ব'লে অপমান করচ। তোমার সাধ্য থাকলে তুমি সেবারের মতই আমার শোবার ব্যবস্থা করতে। সে যাক, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথা-কাটাকাটি করবার দরকার নেই—তুমি রতনকে পাঠিয়ে দাও গে, আমাকে নীচের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসুক, আমি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

পিয়ারী কহিল, তুমি জ্ঞানী লোক, তুমি আমার ঠিক অবস্থা বুঝবে না ত বুঝবে কে ? যাক, বাঁচলুম ! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ আসার সত্যি কারণটা শুনতে পাইনে কি ?

বলিলাম, প্রথম কারণটা শুনতে পাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা পাবে।

প্রথমটা পাব না কেন?

অনাবশ্যক ব'লে।

আচ্ছা, দ্বিতীয়টা শুনি।

আমি বর্ম্মায় যাচ্ছি। হয়ত আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ অনেক দিন যে দেখা হবে না, সে নিশ্চয়। যাবার আগে একবার দেখতে এলুম।

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আপনার বিছানা তৈরী হয়েছে, আসুন।

খুসী হইয়া কহিলাম, চল। পিয়ারীকে বলিলাম, আমার ভারি ঘুম পাচ্চে। ঘণ্টাখানেক পরে যদি সময় পাও ত একবার নীচে এসো—আমার আরও কথা আছে, বলিয়া রতনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম।

পিয়ারীর নিজের শোবার ঘরে আনিয়া রতন যখন আমাকে শয্যা দেখাইয়া দিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বলিলাম, আমার বিছানা নীচের ঘরে না ক'রে এ ঘরে করা হ'ল কেন?

রতন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, নীচের ঘরে?

আমি বলিলাম, সেই রকমই ত কথা ছিল।

সে অবাক্ হইয়া ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনার বিছানা হবে নীচের ঘরে? আপনি কি যে তামাসা করেন বাবু! বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মনিব শোবেন কোথায়?

রতন কহিল, বঙ্কুবাবুর ঘরে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়েছি। কাছে আসিয়া দেখিলাম, এ সেই রাজলক্ষ্মীর দেড়হাত চওড়া তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা হয় নাই। একটা মস্ত খাটের উপর মস্ত পুরু গদি পাতিয়া রাজশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর সেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। একধারে কয়েকখানি বাংলা বই, অন্যধারে একটা বাটির মধ্যে কতকগুলি বেলফুল। চোখ চাহিবামাত্র টের পাইলাম, এর কোনটাই ভৃত্যের হাতে তৈরী হয় নাই—যে বড় ভালবাসে, এসব তাহারই স্বহস্ত-প্রস্তুত। উপরের চাদরখানি পর্য্যন্ত যে রাজলক্ষ্মী নিজের

হাতে পাতিয়া রাখিয়া গেছে, এ যেন নিজের অন্তরের ভিতর হইতে অনুভব করিলাম।

আজ ওই লোকটার সম্মুখে আমার অচিন্ত্যপূর্ব্ব অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী হতবুদ্ধি হইয়া প্রথমে যে ব্যবহারই করুক, আমার নির্বিকার ঔদাসীন্যে মনে মনে সে যে কতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না, এবং কেন যে আমার মধ্যে একটা ঈর্ষ্যার প্রকাশ দেখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া এত প্রকারে অমাকে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল, তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও যে নিজের নিষ্ঠুর রূঢ়তাকেই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া তাহার অভিমানের কোন মান্য রাখি নাই, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র আঘাতটিকেই শতগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি, এই অন্যায় আমার মনের মধ্যে এখন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। নিশ্চয় জানিতাম, একবার সে আসিবেই। এখন সেই সময়টুকুর জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শ্রান্তিবশতঃ হয়ত একটুখানি ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। সহসা চোখ মেলিয়া দেখিলাম, পিয়ারী আমার গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া বসিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, বর্ম্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না —সে খবর জানো?

না, তা জানি নে।

তবে?

ফিরতেই হবে, এমন ত কারো মাথার দিব্যি নেই।

নেই? তুমি কি পৃথিবীর সকলের মনের কথাই জানো নাকি?

কথাটা অতি সামান্য। কিন্তু সংসারে এই একটা ভারি আশ্চর্য্য যে মানুষের দুর্ব্বলতা কখন কোন্ ফাঁক দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে কত অসংখ্য গুরুতর কারণ ঘটিয়া গিয়াছে, আমি কোনদিন আপনাকে ধরা দিই নাই; কিন্তু আজ তাহার মুখের এই অত্যন্ত সোজা কথাটা সহ্য করিতে পারিলাম না। মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল—সকলের মনের কথা ত জানি নে রাজলক্ষ্মী,

কিন্তু একজনের জানি। যদি কোনদিন ফিরে আসি ত শুধু তোমার জন্যই আসব। তোমার মাথার দিব্যি আমি অবহেলা করব না।

পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাঙিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না। কিন্তু মিনিট দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না, তখন তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বলিলাম, উঠে বোস; এ অবস্থায় কেউ দেখলে সে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে!

কিন্তু পিয়ারী একটা জবাব পর্য্যন্ত যখন দিল না, তখন জোর করিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার নীরব অশ্রুতে সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া গেছে। টানাটানি করিতে, সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, আগে আমার দু'মিনিটের কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠব।

কি কথা, বল?

আগে বল, ও লোকটা এখানে থাকতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে করনি?

না।

পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ভাল নই, সে ত তুমি জানো? তবে কেন সন্দেহ হয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন। সে যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যতই মন্দ হয়ে যাক, ভাল হ'তে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলায় সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে প'ড়ে একদিন যা করেছি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হ'তে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোনদিন মানা করি নে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ কারো আটকে রাখতে পারে না।

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া

থাকিয়া, শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ। তা হ'লে তুমিও আটকাতে পারবে না।

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই রতনের কাশির শব্দ দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কি রে রতন?

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা, রাত্রি ত অনেক হ'ল—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না? বামুনঠাকুর ঢুলে ঢুলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েচে।

তাই ত, তোদের কারুর যে এখনো খাওয়া হয় নি, বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত হইয়া লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার খাবারটা সে বরাবর নিজের হাতেই লইয়া আসিত; আজও আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, তোমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েছি—আজ তোমাকেও জাগিয়ে রাখব। বলিয়া, সম্মতির জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া, আমার পায়ের বালিশটা টানিয়া লইয়া বাঁ হাতটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, তোমার এত দূরদেশে যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'তে পারে তা হ'লে? এম্‌নি ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো?

পিয়ারী তাহার জবাব না দিয়া বলিল, তা ছাড়া, কিসের জন্য বর্ম্মায় যেতে চাচ্চ শুনি?

চাক্‌রী করতে, ঘুরে বেড়াতে নয়।

আমার কথা শুনিয়া পিয়ারী উত্তেজনায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দেখ, অপরকে যা বল, তা বল; কিন্তু আমাকে ঠকিয়ো না। আমাকে ঠকালে তোমার ইহকালও নেই, পরকালেও নেই—তা জানো?

সেটা বিলক্ষণ জানি; এখন কি করতে বল তুমি?

আমার স্বীকারোক্তিতে পিয়ারী খুসী হইল; হাসিমুখে বলিল, মেয়ে-

মানুষ চিরকাল যা ব'লে থাকে, আমিও তাই বলি। একটা বিয়ে ক'রে সংসারী হও—সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

প্রশ্ন করিলাম, সত্যি সুখী হবে তাতে ?

সে মাথা নাড়িয়া, কানের দুল দুলাইয়া, সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়! একশ'বার। এতে আমি সুখী হব না ত সংসারে কে হবে শুনি ?

বলিলাম, তা জানিনে; কিন্তু এ আমার একটা দুর্ভাবনা গেল। বাস্তবিক এই সংবাদ দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম যে, বিয়ে না ক'রে আমার আর উপায় নেই।

পিয়ারী আর একবার তাহার কানের স্বর্ণাভরণ দুলাইয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমি ত তা হ'লে কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে আসব। কিন্তু মেয়ে আমি দেখে পছন্দ ক'রব, তা ব'লে দিচ্ছি।

আমি বলিলাম, তার আর সময় নেই—পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।

আমার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বোধ করি পিয়ারী লক্ষ্য করিল। সহসা তাহার হাসিমুখে একটা ম্লান ছায়া পড়িল; কহিল, বেশ ত, ভালই ত। স্থির হয়ে গেলে ত পরম সুখের কথা।

বলিলাম, সুখ-দুঃখ জানি নে রাজলক্ষ্মী; যা' স্থির হয়ে গেছে, তাই তোমাকে জানাচ্ছি।

পিয়ারী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, যাও—চালাকি করতে হবে না,—সব মিছে কথা।

একটা কথাও মিথ্যে নয়; চিঠি দেখলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া জামার পকেট হইতে দুখানা পত্রই বাহির করিলাম।

কৈ দেখি চিঠি, বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ারী চিঠি দুখানা হাতে লইতেই, তাহার সমস্ত মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। হাতের মধ্যে পত্র দুখানা ধরিয়া রাখিয়াই বলিল, পরের চিঠি পড়বার আমার দরকারই বা কি! তা কোথায় স্থির হ'ল ?

প'ড়ে দেখ।

আমি পরের চিঠি পড়িনে।

তা হ'লে পরের খবর তোমার জেনেও কাজ নেই।

আমি জানতে চাইনে, বলিয়া সে ঝুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চিঠি দুটা কিন্তু তাহার মুঠার মধ্যেই রহিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোন কথা কহিল না। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মেজের উপর দুইখানা পত্র লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। লেখাগুলা বোধ করি সে দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিল! তারপরে উঠিয়া আসিয়া আবার তেমনি করিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ঘুমুলে ?

না।

এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভাল নয়, তাকে আমি ছেলেবেলায় দেখেচি।

মা'র চিঠি পড়লে ?

হাঁ, কিন্তু খুড়ীমার চিঠিতে এমন কিছু লেখা নেই যে, তোমাকে তাকে ঘাড়ে করতে হবে। আর থাক ভাল, না থাক ভাল, এ মেয়ে আমি কোন-মতেই ঘরে আনব না।

কি রকম মেয়ে ঘরে আনতে চাও, শুনতে পাই কি ?

সে আমি এখনি কি ক'রে বলব! বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে ত!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলাম, তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে হ'লে, আমাকে আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে আর এক জন্ম এগিয়ে যেতে হবে—এতে কুলোবে না। যাক, যথাসময়ে তাই না হয় যাবো, আমার তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু এই মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার ক'রে দিয়ো, শ-পাঁচেক টাকা হ'লেই তা হবে, আমি তাঁর মুখেই শুনে এসেছিলুম।

পিয়ারী উৎসাহে আর একবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, খুড়ীমার কথা মিথ্যে হ'তে দেব না। একটুখানি থামিয়া কহিল, সত্যি বলচি তোমাকে, এ মেয়ে ভাল নয় বলেই আমার আপত্তি, নইলে—

নইলে কি ?

নইলে আবার কি! তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি খুঁজে বার ক'রে তবে একথার উত্তর দেব—এখন নয়।

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, তুমি মিথ্যে চেষ্টা ক'রো না রাজলক্ষ্মী, আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি নিজে কোনদিন খুঁজে বার করতে পারবে না।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা সে না হয় নাই পারব; কিন্তু তুমি বর্ম্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেবে?

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া হাসিলাম। কহিলাম, আমার সঙ্গে যেতে তোমার সাহস হবে?

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—সাহস! এ কি একটা শক্ত কথা ব'লে তুমি মনে কর?

আমি যাই করি, কিন্তু তোমার এ সমস্ত বাড়ীঘর জিনিষপত্র বিষয়-আশয়—তার কি হবে?

পিয়ারী কহিল, যা ইচ্ছে তা হোক। তোমাকে চাকরি করবার জন্যে যখন এত দূরে যেতে হ'ল, এত থাকতেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বন্ধুকে দিয়ে যাবো।

এ কথার জবাব দিতে পারিলাম না। খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে পুনরায় কহিল, অত দূরে না গেলেই কি নয়? এসব তোমার কি কোনদিন কোন কাজেই লাগতে পারে না?

বলিলাম, না, কোনদিন নয়।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে? বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আবার তাহার হাতখানা রাখিল। একদিন এই পিয়ারীই আমাকে যখন তাহার বাড়ী হইতে একরকম জোর করিয়াই বিদায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও মনের জোর দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। আজ তাহারই আবার এত বড় দুর্ব্বলতা, এই করুণ কণ্ঠের সকাতর মিনতি, সমস্ত একসঙ্গে মনে করিয়া আমার বুক ফাটিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিনে বটে, কিন্তু যখনি

ডাকবে, তখনি ফিরে আসব! যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাকব রাজলক্ষ্মী!

এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাকবে?

হাঁ, চিরদিন থাকব।

তা হ'লে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল?

না। তার কারণ, তোমার অমতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে আমার কোনদিন প্রবৃত্তি হবে না।

পিয়ারী অপলক-চক্ষে কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পরে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া, বড় বড় ফোঁটা গাল বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে?

বলিলাম, তা আমি থাকব। তোমার কাছে যে জিনিষ আমি পেয়েছি, তার বদলে সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা আমার লোকসান নয়;—যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোনদিন অবিশ্বাস ক'রো না।

পলকের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া-কাঁপিয়া, ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়ীটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয়-সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।

দুই

এক-একটা কথা দেখিয়াছি, সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে—তাহার শব্দগুলা পর্য্যন্ত যেন কানের মধ্যে বাজিয়া

উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলাও তেমনি। আজও আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই। সে স্বভাবতঃই কত বড় সংযমী, সে পরিচয় ছেলেবেলাতেই সে বহুবার দিয়াছে। তাহার উপর এতদিনের এই এত বড় সাংসারিক শিক্ষা! গতবারে বিদায়ের ক্ষণটিতে কোনমতে পলাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল ঃ কিন্তু এবার কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, চাকর-বাকরদের সামনেই কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, দেখ, আমি অবোধ নই, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি ; কিন্তু, তবু বলচি, আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দ্দয়! একেও এর শাস্তি একদিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!

সমাজের উপর কেন যে সে এত বড় অভিশাপ দিল, তাহা সে-ই জানে, আর তাহার অন্তর্য্যামী জানেন! আমিও যে না জানি, তা নয়, কিন্তু নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। বুড়া দরওয়ান গাড়ীর কপাট খুলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। পা বাড়াইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, পিয়ারী চোখের জলের ভিতর দিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল; কহিল, কোথায় যাচ্ছ—আর হয়ত দেখা হবে না—একটা ভিক্ষে দেবে?

বলিলাম, দেব।

পিয়ারী কহিল, ভগবান না করুন, কিন্তু তোমার জীবনযাত্রার যে ধরণ, তাতে—আচ্ছা, যেখানেই থাকো, সে সময়ে একটা খবর দেবে? লজ্জা করবে না?

না, লজ্জা করব না—খবর দেব, বলিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। পিয়ারী পিছনে পিছনে আসিয়া আজ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে আমার পায়ের ধূলা লইল।

ওগো, শুনচ? মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার ওষ্ঠাধারের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার চোখের জল আবার ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল; অস্ফুট অবরুদ্ধ স্বরে চুপি-চুপি বলিল, নাই গেলে অত দূরে? থাক্ গে, যেও না।

নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

চাবুক ও চারখানা চাকার সম্মিলিত সপাসপ্ ও ঘড়ঘড় শব্দে অপরাহ্ণবেলা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত চাপা দিয়া একটা ধরাগলার চাপা কান্নাই শুধু আমার কানে বাজিতে লাগিল।

তিন

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন ভোরবেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাতলা বিছানামাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে নামিতে-না-নামিতে, এক খাঁকি-কুর্ত্তি-পরা কুলি আসিয়া এই দুটোকে ছোঁ মারিয়া লইয়া কোথায় যে চক্ষের পলকে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল, খুঁজিতে-খুঁজিতে দুশ্চিন্তায় চোখ ফাটিয়া জল না আসা পর্য্যন্ত আর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। গাড়ীতে আসিতে আসিতেই দেখিয়াছিলাম, জেটি ও বড় রাস্তার অন্তর্ব্বর্তী সমস্ত ভূখণ্ডটাই নানা রঙের পদার্থে বোঝাই হইয়া আছে। লাল, কালো, পাঁশুটে, গেরুয়া—একটু কুয়াসা করিয়াও ছিল—মনে হইল, একপাল বাছুর বোধ হয় বাঁধা আছে, চালান যাইবে। কাছে আসিয়া ঠাহর করিয়া দেখি, চালান যাইবে বটে কিন্তু বাছুর নয়—মানুষ। মোটঘাট লইয়া, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া সারারাত্রি অমনি করিয়া হিমে পড়িয়া আছে—প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে জাহাজের একটু ভালো স্থান অধিকার করিয়া লইবে। অতএব কাহার সাধ্য পরে আসিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া জেটির দোরগোড়ায় যায়! অনতিকাল পরে এই দল যখন সজাগ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম, কাবুলের উত্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্য্যন্ত এই কয়লাঘাটে প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই।

সব আছে। কালো কালো গেঞ্জি গায়ে একদল চীনাও বাদ যায় নাই। আমিও নাকি ডেকের যাত্রী (অর্থাৎ যার নিচে আর নাই), সুতরাং ইহাদিগকেই পরাস্ত করিয়া আমারও একটুখানি বসিবার জায়গা করিয়া লইবার কথা। কিন্তু কথা মনে করিতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম লইয়া

গেল। অথচ যখন যাইতেই হইবে, এবং জাহাজ ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানও জানা নাই, তখন যেমন করিয়া হোক, ইহাদের দৃষ্টান্তই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বলিয়া যতই নিজের মনকে সাহস দিতে লাগিলাম, ততই সে যেন হাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ যে কখন আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে ;—সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোদ্দ-পনেরশ' লোক ইতিমধ্যে কখন ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ ত সকলে বসেছিলে, —হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন ?

সে কহিল, ডগ্‌দরি হোগা।

ডগ্‌দরি পদার্থটি কি বাপু ?

লোকটা পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্তমুখে কহিল, আরে, পিলেগকা ডগ্‌দরি।

জিনিষটা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু বুঝি না বুঝি, এতগুলো লোকের যাহা আবশ্যক, আমারও ত তাহা চাই। কিন্তু কি কৌশলে যে নিজেকে ওই পালের মধ্যে গুঁজিয়া দিব, সে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কোথাও একটু ফাঁক আছে কিনা খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, অনেক দূরে কয়েকটি খিদিরপুরের মুসলমান সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এটা আমি স্বদেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র দেখিয়াছি—যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে। ভারতের অপরাপর জাতির মত অসঙ্কোচে ঠেলাঠেলি মারামারি করিতে পারে না। এমন করিয়া দাঁড়ানোটাই যে একটা হীনতা, এই লজ্জাতেই যেন সকলের অগোচরে মাথা হেঁট করিয়া থাকে। ইহারা রেঙ্গুনে দরজির কাজ করে, অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। প্রশ্ন করিতে বুঝাইয়া দিল যে, বর্ম্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাস করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কিনা, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরাজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ। শুনিয়াছি, কসাইখানার যাত্রীদের পর্যন্ত জবাই হওয়ার অধিকারটুকুর জন্য এঁদের মুখ

চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অবস্থা হিসাবে রেঙ্গুনযাত্রীদের সহিত তাহাদের যে এত বড় মিল ছিল, এ কথা তখন কে ভাবিয়াছিল! ক্রমশঃ 'পিলেগকা ডগ্‌দরি' আসন্ন হইয়া উঠিল—সাহেব ডাক্তার স-পেয়াদা দেখা দিলেন। সেই লাইনবর্ত্তী অবস্থায় বেশ ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না; তথাপি পুরোবর্ত্তী সঙ্গীদের প্রতি পরীক্ষা-পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে ভাবনার সীমা পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত করায় ভীত হইবে, অবশ্য বাঙালী ছাড়া এরূপ কাপুরুষ সেখানে কেহ ছিল না; কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী সেই সাহসী বীর পুরুষগণকেও পরীক্ষায় চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতে দেখিয়া শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সকলেই অবগত আছেন, প্লেগ রোগে, দেহের স্থানবিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তার সাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্ব্বিকার-চিত্তে সেই সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা। কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন সভ্যতা আছে বলিয়াই তবু যা হোক একবার চমকাইয়া স্থির হইতে পারিতেছিল; আর কোন জাত হইলে ডাক্তারের হাতটা সেদিন মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া না দিয়া আর নিরস্ত হইতে পারিত না। সে যাই হোক, পাস করা যখন অবশ্য-কর্ত্তব্য, তখন আর উপায় কি! যথাসময়ে চোখ বুজিয়া, সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া এক-প্রকার মরিয়া হইয়াই ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, এবং পাস হইয়াও গেলাম। অতঃপর জাহাজে উঠিবার পালা। কিন্তু ডেক প্যাসেঞ্জারের এই অধিরোহণ-ক্রিয়া যে কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ধারণা করা অসাধ্য। তবে কলকারখানায় দাঁতওয়ালা চাকার ক্রিয়া দেখা থাকিলে বুঝা কতকটা সম্ভব হইবে। সে যেমন সুমুখের টানে ও পিছনের ঠেলায় অগ্রসর হইয়া চলে, আমাদেরও এই কাবুলী-পাঞ্জাবী-মাড়ওয়ারী-মাদ্রাজী-মারহাট্টি-বাঙালী-চীনা-খোট্টা-উড়িয়া গঠিত সুবিপুল বাহিনী শুদ্ধমাত্র পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বেগে ডাঙ্গা হইতে জাহাজের ডেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া আসিল এবং সেই গতি সেইখানেই প্রতিরুদ্ধ হইল না। সম্মুখেই দেখিলাম, একটা গর্ত্তের মুখে

সিঁড়ি লাগানো আছে। জাহাজের খোলে নামিবার এই পথ। আবদ্ধ নালার মুখ খুলিয়া দিলে বৃষ্টির সঞ্চিত জল যেমন খরবেগে নীচে পড়ে, ঠিক তেমনি করিয়া এই দল, স্থান অধিকার করিতে মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া অবরোহণ করিতে লাগিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নীচে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, পা দিয়া হাঁটিয়াও নামি নাই। ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও, বোধ করি, শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সচেতন হইয়া দেখিলাম, খোলের মধ্যে অনেক দূরে এক কোণে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। পায়ের নীচে চাহিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ভোজবাজীর মত চক্ষের পলকে যে যাহার কম্বল বিছাইয়া বাক্স-পেঁটরার বেড়া দিয়া নিরাপদে বসিয়া প্রতিবেশীর পরিচয় গ্রহণ করিতেছে। এতক্ষণে আমার সেই নম্বর-আঁটা কুলি আসিয়া দেখা দিল; কহিল, তোরঙ্গ ও বিছানা উপরে রেখেছি; যদি বলেন, নীচে আনি।

বলিলাম, না, বরঞ্চ, আমাকেও কোনমতে উদ্ধার ক'রে উপরে নিয়ে চল।

কারণ, পরের বিছানা না মাড়াইয়া, তাহার সহিত হাতাহাতির সম্ভাবনা না ঘটাইয়া, পা ফেলিতে পারি, এমন একটুখানি স্থানও চোখে পড়িল না। বর্ষার দিনে উপরে জলে ভিজি, সেও ভালো, কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও না। কুলিটা অধিক পয়সার লোভে, অনেক চেষ্টায়, অনেক তর্কাতর্কি করিয়া কম্বল ও সতরঞ্চির এক-আধটু ধার মুড়িয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল এবং আমার জিনিষপত্র দেখাইয়া দিয়া বক্‌শিস লইয়া প্রস্থান করিল। এখানেও সেই ব্যাপার—বিছানা পাতিবার জায়গা নাই। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরেই নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নিবিষ্টচিত্তে মা ভাগীরথীর উভয় কূলের মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইয়াছিল। এই দুই ঘণ্টাকাল যে কাণ্ড মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না,—এমন কঠিন বুক সংসারে অল্পই আছে। কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল

একটা গ্লাস, না ছিল একটা ঘটি। সহযাত্রীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙালী থাকে ত, একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে নামিবার সেই গর্ত্তটার কাছাকাছি হইবামাত্র একপ্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌঁছিল—যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে ; কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গোশালার আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয়-চিত্তে সিঁড়ির দুই এক ধাপ নামিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার national সঙ্গীত সুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্য্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্রহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে। এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে এবং সঙ্গীতই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, তাহা সেইখানে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় এই যে, এতগুলা সঙ্গীত-বিশারদ একসঙ্গে জুটিল কিরূপে ?

নীচে নামা উচিত হইবে কিনা, স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, ইংরাজের মহাকবি সেক্ষপীর নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে মুগ্ধ না হয়, সে খুন করিতে পারে, না, এমনি কি একটা কথা। কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি, তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কিনা, জানি না ; না হইলে, কাবুলিআলা গান গায়, এ কথা কে ভাবিতে পারে ? একপ্রান্তে এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিতেছিল, হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি ; হঠাৎ দেখি, এক ব্যক্তি তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। অনেক কষ্টে অনেক লোকের চোখ রাঙানি মাথায় করিয়া এই লোকটির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাতযোড় করিয়া নমস্কার করিল এবং নিজেকে রেঙ্গুনের

বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে একটি বিগত-যৌবনা স্থূলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এত বড় ছুটো ভাঁটার মত চোখ ও এত মোটা জোড়া ভুরু আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবু মহাশয়, ইটি আমার পরি—

কথাটা শেষ না হইতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল—পরিবার! আমার সাত-পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্তিরী, যার তার কাছে মিছে কথা ব'লে আমার বদনাম ক'রো না ব'লে দিচ্চি।

আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস্ কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল! জাত-বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবর্ত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার যো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাত-জন্ম খোয়াবে না—তা জানো? এই বলিয়া এই জাত-বোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্ব্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ ছুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারম্বার বলিতে লাগিল, দেখলেন মশায়, দেখলেন? এখনো এদের জাতের দেমাক! দেখলেন! আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হ'লে—কথাটা সে তাহার বিশ বচ্ছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতেই পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাত-বোষ্টমীর কথাগুলা মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত

একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং সহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে! এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা শুদ্ধমাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়া পরিত্রাণ পাইতেছে! তবে এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই। আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পরে সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্ট-শান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্র-পীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলেবেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বমি করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু, সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখন উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্ব্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিস্ত্রীমশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জ্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই! মা গো মা, কি কাণ্ডই হয়ে গেল!

একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া, হাই তুলিয়া গোটা-দুই তুড়ি দিয়া অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমন কিছু নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশ-ভাজা বিক্রী করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙার নিচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল-ডাল-মটর-কলাই-ছোলা-বরবটি-

মুসুরি-খেঁসারি সব একাকার ক'রে দেয়, দেবতার কৃপায় আমরা সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম,—এই খানিকক্ষণ হ'ল, যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহার পর টগরের পানে চাহিয়া কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত গর্জ্জিয়া উঠিল—আবার! ফের!

না, তবে থাক, বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিল। মূর্ত্তিমান নোংরা একযোড়া কাবলিআলা আপাদমস্তকে সমস্ত পৃথিবীর অপরিচ্ছন্নতা লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি তাহার অতবড় দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, আজ তা হ'লে খাওয়া-দাওয়া হবে না বল ?

পরিবার কহিল,—মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি!

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকাল, একটু বেলা হ'লে—

নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিব্যি এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল মশাই, জাহাজে উঠে পর্য্যন্ত বলচি, আয় টগর কিছু খাই, আত্মাকে কষ্ট দিস্ নে—নাঃ, রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে!

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানে একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়াই, পুনরায় সেই হতভাগ্য কাবলিকে চোখের দৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে লাগিল।

আমি ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা ?

নন্দ, টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বলতে পারিনে। ওই দেখুন ভাঙা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময় তার রস ; এর বেশী যদি কিছু জানতে চানত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া সে টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিলাম, তা যাক, সঙ্গে চিঁড়ে আছে ত!

একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং সহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে! এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা শুদ্ধমাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়া পরিত্রাণ পাইতেছে! তবে এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই। আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পরে সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্ট-শান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্র-পীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলেবেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বমি করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু, সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখন উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্ব্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিস্ত্রীমশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জ্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই! মা গো মা, কি কাণ্ডই হয়ে গেল!

একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া, হাই তুলিয়া গোটা-দুই তুড়ি দিয়া অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমন কিছু নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশ-ভাজা বিক্রী করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙার নিচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল-ডাল-মটর-কলাই-ছোলা-বরবটি-

মুসুরি-খেঁসারি সব একাকার ক'রে দেয়, দেবতার কৃপায় আমরা সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম,—এই খানিকক্ষণ হ'ল, যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহার পর টগরের পানে চাহিয়া কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত গর্জ্জিয়া উঠিল—আবার! ফের!

না, তবে থাক, বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিল। মূর্ত্তিমান নোংরা একযোড়া কাবলিআলা আপাদমস্তকে সমস্ত পৃথিবীর অপরিচ্ছন্নতা লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি তাহার অতবড় দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, আজ তা হ'লে খাওয়া-দাওয়া হবে না বল ?

পরিবার কহিল,—মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি!

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকাল, একটু বেলা হ'লে—

নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিব্যি এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল মশাই, জাহাজে উঠে পর্য্যন্ত বলচি, আয় টগর কিছু খাই, আত্মাকে কষ্ট দিস্ নে—নাঃ, রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে!

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানে একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়াই, পুনরায় সেই হতভাগ্য কাবলিকে চোখের দৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে লাগিল।

আমি ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা ?

নন্দ, টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বলতে পারিনে। ওই দেখুন ভাঙা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময় তার রস ; এর বেশী যদি কিছু জানতে চানত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া সে টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিলাম, তা যাক, সঙ্গে চিঁড়ে আছে ত!

নন্দ কহিল, সেদিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর!

টগর একটা ছোট পুঁটুলি পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—দেখাও গে তুমি—

নন্দ কহিল, যাই বলুন বাবু, কাবলি জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুল দেশের মোটা রুটিও অম্‌নি বেঁধে দেয়। ফেলিস্‌নে টগর, তুলে রাখ, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।

নন্দর এই পরিহাসে আমি হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই টগরের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ কালো করিয়া, মোটা গলায় বজ্র-কর্কশ শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে চমকিত করিয়া, টগর চীৎকার করিয়া উঠিল—জাত তুলে কথা ক'য়ো না বলচি, মিস্তিরী,—ভাল হবে না তা বল্‌চি—

চীৎকার-শব্দে যাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভালমতেই চিনিত, একটা বেফাঁস ঠাট্টার জন্য ক্রোধটা তাহার সে শান্ত করিতে পারিলেই বাঁচে। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, মাথা খাস টগর, রাগ করিস্ নে—আমি তামাসা করেচি বৈ ত নয়।

টগর সে কথা কানেও তুলিল না। চোখের তারা, ভুরু একবার বামে ও একবার দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইয়া, গলার সুর আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, কিসের তামাসা! জাত তুলে আবার তামাসা কি! মোচলমানের রুটি দিয়ে মলসা-ভোগ হবে? তোর কৈবত্তের মুখে আগুন—দরকার থাকে, তুই তুলে রাখ্‌গে—বাপের পিণ্ডি দিস্!

জ্যা-মুক্ত ধনুর মত নন্দ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াই টগরের কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—হারামজাদী, তুই বাপ তুলিস্!

টগর কোমরের কাপড় জড়াইতে-জড়াইতে, হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল, হারামজাদা, তুই জাত তুলিস্! বলিয়াই আকর্ণ মুখব্যাদন করিয়া নন্দর বাহুর একাংশ দংশন করিয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও

টগর বোষ্টমীর মল্লযুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিয়া ঘিরিয়া ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্রপীড়া ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবীরা ছি ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চেঁচামেচি করিতে লাগিল—সবশুদ্ধ একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত সামান্য কারণে এত বড় অনাবৃত নির্লজ্জতা যে সংসারে ঘটিতে পারে, ইহা ত আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। তাহাই আবার বাঙালী নরনারীর দ্বারা একজাহাজ লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া, লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। কাছেই একজন জৌনপুরী দরওয়ান অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত তামাসা দেখিতেছিল; আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবুজী, বাঙ্গালীন্ তো বহুৎ আচ্ছি লড়নেওয়ালী হ্যায়! হট্‌তি নহি!

আমি তাহার পানে চাহিতেও পারিলাম না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া কোনমতে ভিড় ঠেলিয়া উপরে পলাইয়া গেলাম।

চার

সেদিন এমন প্রবৃত্তি হইল না যে নীচে যাই। সুতরাং নন্দ-টগরের যুদ্ধের অবসান কি ভাবে হইল, সন্ধিপত্রে কোন্ কোন্ সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল, কিছুই জানি না। তবে, পরে দেখিয়াছি, সর্ত্ত যাই হোক, বিপদের দিনে সেই স্ক্র্যাপ্-অফ-পেপারটা কোন কাজেই লাগে না। যাহার যখন আবশ্যক হয়, অবলীলাক্রমে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অপরের ব্যূহ ভেদ করে। বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়াছে এবং আরও বিশ বৎসর যে করিবে না, এমন শপথ বোধ করি স্বয়ং বিধাতা পুরুষও করিতে পারেন না।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্ণের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিক্‌চক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের

মুখেচোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলাফেরার মধ্যেও একপ্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ গোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্ত্তা, নীচে যাও; কাপ্তান কইচে, ছাইক্লোন হোতি পারে।

মিনিট-পনের পরেই দেখিলাম, কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া, খালাসীরা হোল্‌ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দুই চারিজন আপত্তি করায়, সেকেণ্ড-অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানা-পত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা দশটাকার বেশী ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া, গর্ত্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্ব্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন, ডাঙাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিষেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা' অদৃষ্টে যা ঘটে, তা' ঘটুক। আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারাই যায়, ত অমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া-ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন, যতক্ষণ পারি, হাত-পা নাড়িয়া, ঢেউয়ের উপরে নাগরদোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক সময়ে টুপ্‌ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়ীতে অতিথি হইলেই চলিবে। কিন্তু রাজার জাহাজ যে আগে-পিছে লক্ষকোটি হাঙ্গর অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া

ফেলিতেও যে তাঁহাদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না—এ সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে, পলাইয়া বেড়াইবার আর যো রহিল না, যেখানে হৌক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়া কাপ্তেন দূরবীণ হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্ত্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলা ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব ক'টিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই 'ছাই-ক্লোন'; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদ্‌লাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই,—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই, এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতর ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার

কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোম্‌রা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে-করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে। তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়; শতকোটি;—উন্মত্ত কোলাহলে এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়,—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জ্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে লইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্‌বজ্‌ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল,তখন হাতজোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান্! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে! এতদিন ধরিয়া ত সংসারের সর্ব্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই! যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজত-শুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিকেই

এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সম্রাট্! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে, সে ত আমি জানিই; কিন্তু এখনও ত' তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিটকাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিষের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃত দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ, তা' হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, সেই অপরিমেয় শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্র-জলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর, কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয় ত তেমন করিয়া দেখিতে পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ু-বেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল এবং ভয়ার্ত্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছাইয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন! একটা প্রকাণ্ড গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি; সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশে-পাশে, উপরে নীচে চারিদিকেই কালো জল! জাহাজশুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ

হইবে ? কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজশুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না। আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম কেন কাপ্তেন সাহেব মানুষগুলাকে, জানোয়ারের মত গর্ত্তে পুরিয়া চাবি-বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে-মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস ও মুরগীগুলা বারকতক ঝট্‌পট্ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর একপ্রকারের বিপদ জুটিল ! শুধু যে জলের ছাট ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্-ঠক্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল, জলে ডোবার হাত হইতে যদিবা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে ? এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হৌক, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বল্লমের ফলার মত গায়ে না বেঁধে। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয় ? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোণা জলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি না ম্যা-ম্যা করি, মা মা করিয়াও অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্বপরিবর্ত্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায় ; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয় ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদি-বা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কবাট হাজার ঠেলা-ঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং

আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্ষ্ট-ক্লাসের দোর-গোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্য-দেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোর-বেলা পর্য্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিসপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, বিশেষ করিয়া মিস্ত্রী মহাশয় সস্ত্রীক কি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, জানিবার জন্য সকালবেলা নীচে নামিয়া গেলাম। কাল নন্দ মিস্ত্রী একটু রসিকতা করিয়াই বলিয়াছিল, 'মশায়, সাড়েবত্রিশ ভাজার মত আমরা মিশিয়ে গিয়েছিলুম; এইমাত্র যে যার কোটে ফিরিয়া আসিয়াছি।' আজিকার মিশামিশি সাড়ে-বত্রিশ-ভাজায় চলে কি না, জানি না; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহই যে কাহারও নিজের কোটে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।

তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন-চারশ' যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকা ত অনেক দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত কেহই ছিল না।

মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ' লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিষপত্র, বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এ-ধার হইতে ও-ধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে! বমি এবং অনুরূপ আর দু'টা প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার। এখন ডাক্তারবাবু জাহাজের মেথর ও খালাসীদের লইয়া ইহাদের পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডাক্তারবাবু আমার আপাদমস্তক বার-বার নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করি আমাকে সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী ঠিক করিয়াছিলেন,তথাপি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'মশাইকে ত খুব তাজা দেখাচ্ছে; বোধ করি, একটা হ্যামক্ পেয়েছিলেন, না?'

হ্যামক্ কোথায় পাব মশাই, পেয়েছিলাম একটা ভেড়ার খাঁচা। তাই তাজা দেখাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম, ডাক্তারবাবু, অধমও এই নরককুণ্ডেরই যাত্রী। কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া এখানে ঢুকিতে পারি নাই; সুরু হইতে ডেকের উপরেই ছিলাম। কাল সাইক্লোনের খবর পাইয়া খানিকটা সময় ভেড়ার খাঁচার উপরে বসিয়া, আর বাকী রাত্রিটা ফার্ষ্ট-ক্লাসের একটা ঘরের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। কি বলেন, অন্যায় করিয়াছি কি?

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ডাক্তারবাবু এমনি খুসী হইয়া গেলেন যে তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে বাকী দুটো দিন কাটাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য, সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই; শুধু ডেক-চেয়ারটা তাঁহার লইয়াছিলাম।

দুপুরবেলা ক্ষুধার তাড়নে নির্জ্জীবের মত এই কেদারাটার উপর পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের খাদ্য-বস্তুর চিন্তা করিতেছি;—কোথায় গিয়া কি ফন্দি করিলে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য মিলিবে, সে দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময়ে খিদিরপুরের সেই মুসলমান দর্জ্জিদের একজন আসিয়া কহিল, বাবুমশায়, একটি বাঙালী 'মেয়েলোক' আপনাকে ডাক্‌তেচে।

মেয়েলোক? বুঝিলাম, ইনি টগর। কেন যে ডাকিতেছেন, তাহাও অনুমান করা কঠিন হইল না। নিশ্চয়ই মিস্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপারে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাকে কেন? 'Trial by ordeal' ছাড়া বাহিরের লোক আসিয়া কোনদিন ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, তাহা মনে করাও শক্ত।

বলিলাম, ঘণ্টাখানেক পরে যাবো, বল গে।

লোকটি কুণ্ঠিতভাবে কহিল, না বাবুমশায়, বড় কাতর হয়ে ডাকতেচে—

কাতর? কিন্তু টগর ত আমার কাতর হবার মানুষ নয়? জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষমানুষটি কি করচে?

লোকটি কহিল, তেনার বেমারির জন্যেই ত ডাক্‌তেচে।

বেমারি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়,—কাজেই উঠিলাম। লোকটি সঙ্গে করিয়া আমাকে নীচে লইয়া গেল। অনেক দূরে এক কোণে কতকগুলা কাছি বিঁড়ার মত করিয়া রাখা ছিল; তাহারই আড়ালে একটি ২২।২৩ বছরের বাঙালী মেয়ে যে বসিয়াছিল, তাহা একদিনও আমার চোখে পড়ে নাই। কাজেই একখানি ময়লা সতরঞ্চির উপর এই বয়সেরই একটি অত্যন্ত ক্ষীণকায় যুবক মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—অসুখ ইহারই।

আমি নিকটে আসিতে মেয়েটি আস্তে-আস্তে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল; কিন্তু আমি ইহার মুখ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

সে মুখ সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিষ নয়। কারণ, বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি, কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপমারা দেখিতে পাইলাম, যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি। আমার অন্নদাদিদির কপালও বড় ছিল,—অনেকটা যেন তাঁর মতই। সিঁথায় সিন্দূর ডগ্‌মগ্‌ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নাই। পরণে একখানি শাদাসিদা রাঙাপেড়ে শাড়ী।

পরিচয় নাই অথচ এমন সহজভাবে কথা কহিলেন যে, বিস্মিত হইয়া গেলাম। কহিলেন, আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর ত আলাপ আছে, একবার ডেকে আনতে পারেন?

বলিলাম, আলাপ আজই হয়েছে। তবে মনে হয়, ডাক্তারবাবু লোক ভাল, কিন্তু, কি প্রয়োজন?

তিনি বলিলেন, ডাকলে ভিজিট দিতে হয়, তা কাজ নেই, ইনি না হয় কষ্ট ক'রে ওপরে যাবেন, বলিয়া সেই রুগ্ন লোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, জাহাজের ডাক্তারকে ডাকলে বোধ করি কিছু দিতে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক্, এঁর হয়েছে কি?

আমি মনে করিয়াছিলাম, এঁর স্বামী? কিন্তু স্ত্রীলোকটির কথায় যেন সন্দেহ হইল। লোকটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ী থেকেই তোমার একটু পেটের অসুখ ছিল, না?

লোকটি মাথা নাড়িলে, তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, হাঁ, এঁর পেটের অসুখ দেশেতেই হয়েছিল, কাল থেকে জ্বর হয়েচে। এখন দেখচি, জ্বর খুব বেশী, একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।

আমি নিজেও হাত দিয়া লোকটির গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিক খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু নীচে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্র দিয়া কহিলেন, চলুন শ্রীকান্তবাবু, ঘরে গিয়ে দুটো গল্পগাছা করা যাক্।

ডাক্তারবাবু লোকটি চমৎকার। তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, চা খান ত?

বলিলাম, হ্যাঁ।

বিস্কুট?

তাও খাই।

আচ্ছা।

খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর দুজনে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে বসিলে, ডাক্তারবাবু কহিলেন, আপনি জুটলেন কি ক'রে?

বলিলাম, স্ত্রীলোকটি আমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাঠাইবারই কথা। বিয়ে-টিয়ে করেছেন?

বলিলাম, না।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, তা হ'লে জুটে পড়ুন, নেহাৎ মন্দ হবে না। লোকটার ঐ ত চেহারা; তা'তে টাইফয়েডের লক্ষণ বলেই মনে হচ্চে। যা হোক্, বেশীদিন টিক্‌বে না, তা ঠিক্। ইতিমধ্যে একটু নজর রাখবেন, আর কোন ব্যাটা না ভিড়ে যায়।

অবাক্ হইয়া বলিলাম, আপনি এ সব কি বল্‌চেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, ছোঁড়াটা বার ক'রে আনচে, না, ওকেই বার ক'রে এনেচে, কি মনে হয় বলুন ত শ্রীকান্তবাবু? খুব forward না? দিব্যি কথাবার্ত্তা কয়!

ডাক্তারবাবু বলিলেন, প্রতি ট্রিপেই দেখি কি না, একটা-না-একটা

আছেই। গত বারেই ত বেলঘোরের একজোড়া ছিল। একবার বর্ম্মায় গিয়ে পা দিন, তখন দেখবেন, আমার কথাটা ঠিক কি না।

বর্ম্মার কথাটা যে তাঁর অনেকটাই সত্য, তাহা পরে দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আপাততঃ সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একবার নন্দ মিস্ত্রীর খবর লইতে নীচে গেলাম। সপরিবার মিস্ত্রীমশায় তখন ফলাহারের আয়োজন করিতেছিল; একটা নমস্কার করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, ঐ মেয়েমানুষটি কে মশাই?

টগর শিরঃপীড়া বাবদে মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধিতেছিল;—ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল, তোমার সে খবরে কাজ কি শুনি?

মিস্ত্রী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, দেখলেন মশায়, মাগীর ছোট মন? কে বাঙ্গালীর মেয়েটা রঙিনে যাচ্চে—খবরটা নিতেও দোষ?

টগর শিরঃপীড়া ভুলিয়া পাগড়ীটা ফেলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। সে দুটি গোলচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মশাই, টগর বোষ্টমীর হাত দিয়ে ওর মত কত গণ্ডা মিস্ত্রী মানুষ হয়ে গেল,—এখন ও আমাকে চোখে ধূলো দেবে? আরে তুই ডাক্তার, না বদ্যি যে, যাই একটু জল আনতে গেছি, অম্‌নি ছুটে দেখতে গেছিস্? কেন, কে ও? ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি মিস্তিরি! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি ত, তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!

নন্দ মিস্ত্রীও গরম হইয়া কহিল, তোর কি আমি পোষা বাঁদর যে, যে-দিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি, সেই দিকে যাবো? আমার ইচ্ছা হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আস্‌ব,—তুই যা পারিস্, তা করিস্। বলিয়া ফলারে মন দিল।

টগরও শুধু একটা 'আচ্ছা' বলিয়া তাহার পাগড়ী বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও প্রস্থান করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে গেলাম, এমনি করিয়া ইহারা বিশ বৎসর কাটাইয়াছে! অনেক পোড় খাইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্যকার বন্ধন নাই, সেখানে এতটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠকিতেই হইবে; হয় অহর্নিশি সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখিতে হইবে, না হয়, যৌবনের মত নন্দ মিস্ত্রীও

একদিন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ করিয়া টগরের এই বিদ্বেষ, ডাক্তারবাবুর এমন কুৎসিত তীব্র কটাক্ষ—সে কে, এবং কি? টগর কহিয়াছিল, এই কাজ করিয়া সে নিজে চুল পাকাইয়াছে,—তাহার চক্ষে ধূলি দিবে, এমন মেয়েমানুষ আছে কোথায়?

ডাক্তারবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কাণ্ড নিত্য দেখিয়া তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টি আসিয়াছে;—আজ ভুল করিলে এমন চোখ তিনি উপড়াইয়া ফেলিতে রাজী আছেন।

এম্‌নিই বটে। অপরকে বিচার করিতে বসিয়া কোন মানুষকেই কখনো বলিতে শুনি নাই, সে অন্তর্য্যামী নয়, কিংবা তাহার ভ্রম-প্রমাদ কখনো হয়। সবাই কহে, মানুষ চিনিতে তাহার জোড়া নাই এবং এ বিষয়ে সে একটি পাকা জহুরী। অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে, তাহাই ত জানি না। তবে আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্নদাদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে, ভাল ভাবিয়া নির্ব্বোধ হওয়াতেও যে মোটের উপর বুদ্ধির দামটা বেশীই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। তাই এই দুটি পরম বিজ্ঞ নরনারীর উপদেশ অভ্রান্ত বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, অত্যন্ত forward, তা বটে! এই কথাটাই শুধু আমাকে থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে আবার ডাক পড়িল। এইবার এই স্ত্রীলোকটির পরিচয় পাইলাম। নাম শুনিলাম, অভয়া। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, বাড়ী বালুচরের কাছে। যে ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সে গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হয়। নাম রোহিণী সিংহ।

ঔষধে রোহিণীবাবুর যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া অভয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। অথচ স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার মনের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কঠোর সমালোচনার ভাবই বরাবর জাগ্রত ছিল। তথাপি এই স্ত্রীলোকটির

সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি বা অশোভন প্রগল্‌ভতা ধরিতে পারিলাম না।

অভয়ার মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য্য শক্তি! ইহারই মধ্যে শুধু যে সে আমার নাম-ধাম জানিয়া লইল, তাহা নয়, তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া দিব, তাহাও আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইল। তাহার স্বামী আট বৎসর পূর্ব্বে বর্ম্মায় চাকুরী করিতে আসিয়াছিল। বছর দুই তাহার চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই ছয় বৎসর আর কোন উদ্দেশ নাই। দেশে আত্মীয়-স্বজন আর কেহ নাই। মা ছিলেন, তিনিও মাসখানেক পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করায়, অভিভাবক-হীন হইয়া বাপের বাড়ীতে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ায়, রোহিণীদাদাকে রাজী করিয়া বর্ম্মায় চলিয়াছে। একটুখানি চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এতটুকু চেষ্টা না ক'রে কোনমতে দেশের বাড়ীতে প'ড়ে থাকলেই কি আমার ভাল কাজ হ'ত? তা ছাড়া, এ বয়সে দুর্নাম কিনতেই বা কতক্ষণ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি এতকাল আপনার খোঁজ নেন না, কিছু জানেন?

না, কিচ্ছু জানিনে।

তার পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন, তা জানেন?

জানি। রেঙ্গুনেই ছিলেন, বর্ম্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন; কিন্তু কত চিঠি দিয়েছি, কখনো জবাব পাইনি। অথচ একটা চিঠিও কোনদিন আমার ফিরে আসেনি।

প্রতি পত্রই যে অভয়ার স্বামী পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু কেন যে জবাব দেয় নাই, তাহার সম্ভাব্য হেতু এইমাত্র ডাক্তারবাবুর কাছেই শুনিয়াছিলাম। অনেক বাঙালীই সেখানে গিয়া, কোন সুন্দরী ব্রহ্মরমণী লইয়া আবার নূতন করিয়া ঘর-সংসার পাতে। এমনও অনেক আছে, যাহারা সারাজীবনে আর কখনো দেশে ফিরিয়াও যায় না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অভয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বেঁচে নেই, তাই কি আপনার মনে হয়?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, বরং ঠিক তার উল্টো। তিনি যে বেঁচে আছেন, এ কথা আমি শপথ ক'রে বলতে পারি।

খপ্‌ করিয়া অভয়া আমার পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাকলেই হ'ল।

আমি পুনরায় মৌন হইয়া রহিলাম। অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি কি ভাবছেন, আমি জানি।

জানেন?

জানিনে? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ভাবতে পারলেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয়নি? তা' হোক, আমি ভয় করিনে,—আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর করতে পারব।

তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমার মনের কথা অনুমান করিতে এই বুদ্ধিমতী নারীর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। কহিল, আপনি ভাবচেন, আমি ঘর করতে রাজী হলেই ত হ'ল না; আমার সতীন রাজী হবে কি না, এই ত?

বাস্তবিক, অবাক্ হয়ে গেলাম। বলিলাম, বেশ তাই যদি হয়, ত কি করবেন?

এইবার অভয়ার চোখ দুটি ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। আমার মুখের প্রতি সহজ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, সে বিপদে আপনি একটু আমাকে সাহায্য করবেন শ্রীকান্তবাবু। আমার রোহিণীদাদা বড্ড শাদাসিধে ভালমানুষ, তাঁর দ্বারা তখন ত কোন উপকারই হবে না।

সম্মত হইয়া বলিলাম, সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই করব; কিন্তু এ-সব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ ত প্রায় হয়ই না, বরং অকাজই বেড়ে যায়।

সে কথা সত্যি, বলিয়া অভয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন বেলা ১১।১২ টার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখেচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতেই একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন্—কেরেন্টিন্! খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine.

তখন প্লেগের ভয়ে বর্ম্মা গভর্ণমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। সহর হইতে ৮।১০ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈরী করা হইয়াছে—ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্ব্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর তবে ইহারা সহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় সহরে থাকে এবং সে Port Health officer-এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা।

ডাক্তারবাবু আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, শ্রীকান্তবাবু, একখানা চিঠি যোগাড় না করে আপনার আসা উচিত ছিল না ; Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে, কসাই-খানার গরু-ছাগল ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে, ছোট-লোকেরা সইতে পারে। শুধু ভদ্রলোকদেরই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। একে ত মুটে নেই, নিজের সমস্ত জিনিষ নিজে কাঁধে ক'রে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে ওঠাতে হয়,—ততদূরে বয়ে নিয়ে যেতে হয় ; তার পরে সমস্ত জিনিষপত্র সেখানে খুলে ছড়িয়ে ষ্টীমে ফুটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে' ফেলে মশাই,—এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবধি থাকে না।

অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলাম, এর কি কোন প্রতীকার নেই ডাক্তারবাবু ?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'না। তবে ডাক্তার সাহেব জাহাজে উঠলে একবার আপনার জন্য বলে দেখব, তাঁর কেরাণীবাবুটি যদি আপনার ভার নিতে রাজি—' কিন্তু কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে নিজেও লজ্জায় মরিয়া যাই। একটা গোলমাল শুনিয়া দু'জনেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার ৬।৭ জন খালাসীকে এলোপাথাড়ি লাথি মারিতেছে এবং বুটের চোটে যে যেখানে পারিতেছে, পলায়ন করিতেছে। এই ইংরাজ যুবক অত্যন্ত উদ্ধত বলিয়া বোধ করি ডাক্তারবাবুর সহিত ইতিপূর্ব্বে কোনদিন বচসা হইয়া থাকিবে, আজও

কলহ হইয়া গেল। ডাক্তারবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার এইরূপ ব্যবহার নিতান্ত গর্হিত—একদিন এ জন্য দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি।

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন ?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, এভাবে লাথি মারা ভারি অন্যায়।

লোকটা জবাব দিল, মার ছাড়া ক্যাট্‌ল সিধা হয় ?

ডাক্তারবাবু একটু স্বদেশী, তাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এরা জানোয়ার নয়, গরীব মানুষ। আমাদের দেশী লোকেরা নম্র, এবং শান্ত বলিয়াই কাপ্তেন সাহেবের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করে না, এবং তুমিও অত্যাচার করিতে সাহস কর।

হঠাৎ সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাক্তারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, Look, Doctor, there's your countrymen, you ought to be proud of them !

চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উঁচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই লোকগুলা দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছে। সাহেব একগাল হাসিয়া ডাক্তারবাবুর মুখের উপর দু' হাতের বুড়া আঙ্গুল দুটা নাড়িয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া শিস দিতে দিতে প্রস্থান করিল। জয়ের গর্ব্ব তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর মুখখানা লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে কালো হইয়া গেল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া ক্ষিপ্র ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া ব্যাটারা, দাঁত বার ক'রে হাস্‌চিস্ যে !

এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একযোগে হাসি বন্ধ করিয়া চড়াকণ্ঠে জবাব দিল, তুমি ডাক্তারবাবু, ব্যাটা বলবার কে ? কারো কর্জ্জ ক'রে খায়ে হাসতেছি মোরা ?

আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁর ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তিনি চৌকির উপর ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুধু বলিলেন, উঃ—!

আর দ্বিতীয় কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। হওয়াও অসম্ভব ছিল!

বেলা এগারটার সময় Quarantine-এর কাছাকাছি একটা ছোট ষ্টীমার আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। এইখানি করিয়াই নাকি সমস্ত ডেকের যাত্রীদের সেই ভয়ানক স্থানে লইয়া যাইবে। জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদার ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে।—আমার তাড়া ছিল না, কারণ ডাক্তার-বাবুর লোক এইমাত্র জানাইয়া গেছে যে, আমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রী ও খালাসীদের চেঁচাচেঁচি, দৌড়ঝাঁপ কতকটা অন্যমনস্কের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, অভয়া দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, আপনি এখানে যে?

অভয়া কহিল, কৈ, আপনি জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলেন না?

বলিলাম, না—আমার এখানে একটু দেরী আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে না, একেবারে সহরে গিয়েই নামব।

অভয়া কহিল,—না, শীগ্‌গির গুছিয়ে নিন্।

বলিলাম, আমার এখনও ঢের সময় আছে।

অভয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে হবে না। আমাকে ছেড়ে আপনি কিছুতে যেতে পারবেন না।

অবাক্ হইয়া বলিলাম, সে কি কথা! আমার ত ওখানে যাওয়া হ'তে পারে না।

অভয়া বলিল, তাহ'লে আমারও না। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তবু কিছুতেই এমন নিরাশ্রয় হয়ে ও জায়গায় যাব না! ওখানকার সব কথা শুনেছি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দুটি টল্-টল্ করিয়া উঠিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কে যে, এমন জোর করিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে আমাকে ধীরে-ধীরে জড়াইয়া তুলিতেছে!

সে আচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমাকে একলা ফেলে চ'লে যাবেন,—এত নিষ্ঠুর আপনি হ'তে পারেন, আমি ভাবতে পারিনে। উঠুন,

নীচে চলুন। আপনি না থাকলে ওই রোগা মানুষটিকে নিয়ে আমি একলা মেয়েমানুষ কি ক'রব বলুন ত ?

নিজের জিনিষপত্র লইয়া যখন ছোট ষ্টীমারে উঠিলাম, তখন ডাক্তারবাবু উপরের ডেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না না, আপনাকে যেতে হবে না। ফিরুন, ফিরুন,—আপনার হুকুম হয়েছে—আপনি—

আমিও হাত নাড়িয়া চেঁচাইয়া কহিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর একটা হুকুমে আমাকে যেতেই হচ্চে।

সহসা বোধ করি, তাঁহার দৃষ্টি অভয়া ও রোহিণীর উপর পড়িল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে মিছে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন ?

তার জন্যে ক্ষমা চাইচি।

না না, তার দরকার নেই, আমি জানিতাম। Good bye, চল্লুম। বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিমুখে সরিয়া গেলেন।

পাঁচ

কেরেন্টিন্ কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য,—ভদ্রলোকের জন্য নহে; এবং যে-কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশী দেয় নাই, সে-ই কুলি। চা বাগানের আইনে কি বলে জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে; এবং কর্ত্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে কি জানেন, তা তাঁরাই জানেন; কিন্তু অফিসিয়েলি তাঁহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সকলেই কুলি ছিলাম। সাহেবেরা ইহাও জানেন যে, কুলির জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জাম এমন কিছু হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়, যাহা সে নিজে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ঘাট হইতে কেরেন্টিন্ যাত্রীদের জিনিষপত্র বহন করাইবার যে-কোন ব্যবস্থাই নাই, তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবারও কিছু

নাই। এই সকলই সত্য ; তথাপি আমরা তিনটি প্রাণী যে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে, এক অপরিচিত নদীকূলে, এক রাশ মোট-ঘাট সুমুখে লইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-ভাবে পরস্পরের মুখোমুখি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে শুধু আমাদের দুরদৃষ্ট। সহযাত্রীদের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। তাঁহারা যে যাঁহার লোটা-কম্বল পিঠে ফেলিয়া, এবং অপেক্ষাকৃত ভারী বোঝাগুলি তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে 'রোহিণীদাদা' একটা বিছানার পুঁটুলিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। জ্বর, পেটের অসুখ এবং চরম শ্রান্তি—এইগুলি এক করিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ যে, চলা ত ঢের দূরের কথা, বসাও অসম্ভব,—শুইয়া পড়িতে পারিলেই তিনি বাঁচেন। অভয়া স্ত্রীলোক। রহিলাম শুধু আমি, এবং নিজের ও পরের নানা আকারের ছোট-বড় বোচকা-বুচকিগুলি। অবস্থাটা আমার একবার ভাবিয়া দেখিবার মত বটে! অকারণ চলিয়াছি ত এক অজ্ঞাত অপ্রীতিকর স্থানে ; এক স্কন্ধে ভর দিয়াছেন এক নিঃসম্পর্কীয়া নিরুপায় নারী, অপর স্কন্ধে ঝুলিতেছেন তেম্নি অপরিচিত এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, মোট-ঘাটগুলা ত সব ফাউ! এই সকলের মধ্যে ভীষণ রৌদ্রে আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া এক অজানা জায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। চিত্রটি কল্পনা করিয়া, পাঠক-হিসাবে লোকের প্রচুর আমোদ বোধ হইতে পারে ; হয় ত কোন সহৃদয় পাঠক এই নিঃস্বার্থ পরোপকার-বৃত্তির প্রশংসা করিতেও পারেন ; কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই, এই হতভাগ্যের তৎকালে সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া মন বলিতেছিল, এত বড় গাধা ত্রিসংসারে কি আর কেউ আছে! কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, এ পরিচয় ত আমার গায়ে লেখা ছিল না ; তবে এক জাহাজ লোকের মধ্যে ভার বহিবার জন্য একদণ্ডেই অভয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল কি করিয়া? কিন্তু আমার চমক ভাঙিল তাহার হাসিতে। সে মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল। এই হাসির চেহারা দেখিয়া শুধু আমার চমক নয়, তাহার ভয়ানক কষ্টটাও এইবার চোখে

পড়িয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—এই পল্লীবাসিনী মেয়েটির কথায়। কোথায় লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় মাটীর সহিত মিশিয়া গিয়া ভিক্ষা চাহিবে, না হাসিয়া কহিল, খুব ঠকেছেন মনে করবেন না যেন। অনায়াসে যেতে পেরেও যে যান নি, তার নাম দান। এত বড় দান করবার সুযোগ জীবনে হয় ত খুব কমই পাবেন, তা ব'লে রাখচি। কিন্তু সে কথা যাক। জিনিষপত্তর এইখানেই প'ড়ে থাক্, চলুন, এঁকে যদি কোথাও ছায়ায় একটু শোয়াতে পারা যায়!

বোচকা-বুচকির মমতা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই আমি 'রোহিণী-দাদা'কে পিঠে করিয়া কেরেন্টিনের উদ্দেশে রওনা হইলাম। অভয়া ছোট একটি হাতবাক্স মাত্র হাতে লইয়া আমার অনুসরণ করিল, অন্যান্য জিনিষ-পত্র সেইখানেই পড়িয়া রহিল। অবশ্য, সে সকল আমাদের ক্ষোয়া যায় নাই, ঘণ্টা দুই পরে তাহাদের আনাইয়া লইবার উপায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ কাল্পনিক বিপদের চেয়ে ঢের সুসহ। প্রথম হইতে ইহা স্মরণ থাকিলে, অনেক দুশ্চিন্তার হাত এড়ান যায়। সুতরাং কিছু কিছু ক্লেশ ও অসুবিধা যদিও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কেরেন্টিনের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের দিনগুলি আমাদের এক প্রকার ভালই কাটিল। তা ছাড়া পয়সা খরচ করিতে পারিলে যমের বাড়ীতেও যখন বড়-কুটুম্বের আদর পাওয়া যায়, তখন এ তো মোটে কেরেন্টিন! জাহাজের ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ forward; কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই স্ত্রীলোকটি যে কিরূপ বেশ forward হইতে পারে, তাহা বোধ করি, তিনি কল্পনাও করেন নাই। রোহিণীবাবুকে যখন পিঠ হইতে নামাইয়া দিলাম, তখন অভয়া কহিল, হয়েচে, আর আপনাকে কিছু করতে হবে না শ্রীকান্তবাবু, এবার আপনি বিশ্রাম করুন, যা করবার, আমি করচি।

বিশ্রামের আমার যথার্থই আবশ্যক হইয়াছিল—পা-দুটা শ্রান্তিতে ভাঙিয়া পড়িতেছিল; তথাপি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, আপনি কি করবেন?

অভয়া জবাব দিল, কাজ কি কম রয়েচে? জিনিষগুলা আনতে হবে,

একটা ভাল ঘর যোগাড় ক'রে আপনাদের দু'জনের বিছানা তৈরি ক'রে দিতে হবে, রান্না ক'রে যা হোক দুটো দু'জনকে খাইয়ে দিয়ে তবে ত আমার ছুটি হবে, তবে ত একটু বসতে পাবো? না না, মাথা খান্, উঠবেন না; আমি এক্ষুণি সমস্ত ঠিকঠাক করে দিচ্চি। একটু হাসিয়া কহিল, ভাবচেন, মেয়েমানুষ হয়ে একা এ-সব যোগাড় ক'রবো কি কোরে, না? —তা' বৈ কি! আপনাদের যোগাড় করেছিল কে! সে আমি, না আর কেউ? বলিয়া সে ছোট বাক্সটি খুলিয়া গুটিকয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া কেরেন্টিনের অফিসঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে পারুক আর না পারুক, আমি ত আপাততঃ বসিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম! আধ-ঘণ্টার মধ্যেই একজন চাপরাশী আমাদের ডাকিতে আসিল। রোহিণীকে লইয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরটি ভালই বটে। মেমসাহেব ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া লোক দিয়া সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইতেছেন, জিনিষপত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে, দু'খানি খাটিয়ার উপর দু'জনের বিছানা পর্য্যন্ত তৈরী হইয়া গিয়াছে। একধারে নূতন হাঁড়ি, চাল, ডাল, আলু, ঘি, ময়দা কাঠ সমস্তই মজুদ! মাদ্রাজি ডাক্তারের সহিত অভয়া ভাঙ্গা হিন্দীতে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই কহিল, ততক্ষণ একটু শুয়ে পড় না গে, আমি মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে নিয়ে এ বেলার মত চারটি চালে-ডালে খিচুড়ি রেঁধে নিই। ওবেলা তখন দেখা যাবে। বলিয়া গামছা এবং কাপড় লইয়া, মেমসাহেবকে সেলাম করিয়া একজন খালাসীকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। অতএব ইহারই অভিভাবকতায় এখানের দিনগুলি যে আমাদের ভালই কাটিয়াছিল, তাহা বলায় নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় নাই।

এই অভয়াতে আমি দুটা জিনিষ শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় নিঃসম্পর্কীয় নর-নারীর ঘনিষ্ঠতা স্বতঃই দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায়; কিন্তু ইহা সে কোনদিন ঘটিবার সুযোগ দেয় নাই। ইহার ব্যবহারের মধ্যে কি যে একটা ছিল, যাহা প্রতিক্ষণেই স্মরণ করাইয়া দিত, আমরা এক-জায়গার যাত্রী মাত্র। কাহারও সহিত কাহারও সত্যকার সম্বন্ধ নাই;—দুদিন পরে হয়ত সারা জীবনের মধ্যেও আর কখন কাহারও

সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না। আর এমন আনন্দের পরিশ্রমও দেখি নাই। সারাদিন আমাদের সেবার জন্তেই ব্যস্ত, সমস্ত কাজ নিজেই করিতে চায়। সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলেই হাসিয়া বলিত, এ তো সমস্তই আমার নিজের কাজ। নইলে, রোহিণীদাদার-ই বা এ কষ্টের কি আবশ্যক ছিল, আপনারই বা কি মাথাব্যথা পড়েছিল এই জেলখানায় আসতে। আমার জন্তেই ত আপনাদের এত দুঃখ।

হয়ত খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু গল্প হইতেছে, অফিসের ঘণ্টায় দুটা বাজিতেই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আপনার চা তৈরি ক'রে আনি—দুটো বাজল।

মনে মনে বলিলাম, তোমার স্বামী যত পাপিষ্ঠই হোন, পুরুষমানুষ ত। যদি কখনো তাঁকে পাও, তোমার মূল্য তিনি বুঝিবেনই।

তারপরে একদিন মিয়াদ ফুরাইল। দাদাও ভাল হইলেন, আমরাও সরকারি ছাড়পত্র পাইয়া আর একবার পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া রেঙ্গুনে যাত্রা করিলাম। কথা ছিল, সহরের মোসাফিরখানায় দুই-এক দিনের জন্য আশ্রয় লইয়া একটা বাসা তাঁহাদের ঠিক করিয়া দিয়া, তবে আমি নিজের জায়গায় যাইব; এবং যেখানেই থাকি, তাঁহার স্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহাকে একটা সংবাদ পাঠাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

সহরে যেদিন পদার্পণ করিলাম, সে-দিনটি ব্রহ্মবাসীদের কি একটা পর্ব্বদিন। আর পর্ব্ব ত তাহাদের লাগিয়াই আছে। দলে-দলে ব্রহ্ম নর-নারী রেশমের পোষাক পরিয়া তাহাদের মন্দিরে চলিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, সুতরাং আনন্দ-উৎসবে তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা—সকল বয়সের স্ত্রীলোকই অপূর্ব্ব পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, হাসিয়া, গল্প করিয়া, গান গাহিয়া সমস্ত পথটা মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের বড় অধিকাংশই খুব ফর্সা; মেঘের মত চুলের বোঝা ত শতকরা নব্বই জন রমণীর হাঁটুর নীচে পড়ে। খোঁপায় ফুল, কানে ফুল, গলায় ফুলের মালা,—ঘোম্‌টার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইবার আগ্রহাতিশয্যে হোঁচট্ খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই,—দ্বিধাসঙ্কোচলেশহীন—যেন, ঝরণার মুক্ত প্রবাহের মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে

বহিয়া চলিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নিজেদের তুলনায় মনে মনে তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, এই ত চাই! এ নহিলে আবার জীবন! তাহাদের সৌভাগ্যটা সহসা যেন কাঁটার মত বুকে বাজিল। ভাবিলাম, এই যে ইহারা চতুর্দিকে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সে কি অবহেলার জিনিস? রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এ-দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! আমাদের মেয়েরাও যদি এমনি একদিন—হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া পিছনে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আজও আমার তেমনি স্পষ্ট মনে আছে। ঝগড়া বাধিয়াছে ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া লইয়া। গাড়োয়ান আমাদেরই হিন্দুস্থানী মুসলমান। সে কহিতেছে, চুক্তি হইয়াছিল আট আনা; আর তিন জন ভদ্রঘরের ব্রহ্মরমণী গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, না পাঁচ আনা। মিনিট দুই-তিন তর্কাতর্কির পরেই, বলং বলং বাহুবলম্। পথের ধারে একটা লোক মোটা-মোটা ইক্ষুদণ্ড খাড়া করিয়া বিক্রী করিতেছিল, অকস্মাৎ তিনজনেই ছুটিয়া গিয়া তিনগাছা হাতে তুলিয়া হতভাগা গাড়োয়ানকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। সে কি এলোপাথাড়ি মার! বেচারা স্ত্রীলোকের গায় হাত দিতেও পারে না—শুধু আত্মরক্ষা করিতে একে আটকায় ত ওর বাড়ি মাথায় পড়ে, ওকে আটকায় ত তার বাড়ি মাথায় পড়ে। চারিদিকে লোক জমিয়া গেল,—কিন্তু সে শুধু তামাসা দেখিতে। সে দুর্ভাগার কোথায় গেল টুপি-পাগড়ী, কোথায় গেল হাতের ছিপটি—আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রণে ভঙ্গ দিয়া পুলিশ! পুলিশ! পিয়াদা! পিয়াদা! চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

সবে বাঙ্‌লা দেশ হইতে আসিতেছি, তাও আবার পাড়াগাঁ হইতে। কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—কানে শুনিয়াছি, চোখে দেখি নাই। স্বাধীনতা পাইলে ভদ্র-ঘরের 'অবলা'রাও যে একটা জোয়ান-মদ্দ পুরুষ-মানুষকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর আক্রমণ করিয়া, লাঠি-পেটা করিতে পারে,—ক্রমশঃ এতখানি সবলা হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আমার কল্পনার

অতীত ছিল। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে কহিতে লাগিলাম, স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল কিম্বা মন্দ, সমাজে আনন্দের মাত্রা ইহাতে বাড়ে কিম্বা কমে—এ বিচার আর একদিন করিব; কিন্তু, আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল।

ছয়

অভয়া ও রোহিণীদাদাকে তাহাদের নূতন বাসায় নূতন ঘরকন্নার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন সকালে নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে রেঙ্গুনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম, সেদিন ওই দুটি লোকের সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে একেবারেই কোন গ্লানি স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু এই অপবিত্র চিন্তাটাকে বিদায় করিতেও আমার বেশি সময় লাগে নাই। কারণ, কোন দুটি বিশেষ বয়সের নর-নারীকে কোন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাওয়ামাত্রই একটা বিশেষ সম্বন্ধ কল্পনা করা যে কত বড় ভ্রান্তি—এ শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছিল; এবং ভবিষ্যতের জটিল সমস্যাও ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমার বাধে না। সুতরাং, শুদ্ধমাত্র নিজের ভারটাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেদিন প্রভাতকালে তাহাদের নূতন বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। এখনকার মত তখনকার দিনে নূতন বাঙ্গালী বর্ম্মা মুল্লুকে পদার্পণ করা-মাত্রই পুলিশের প্রকাশ্য এবং গুপ্ত কর্ম্মচারীর দল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, লাঞ্ছিত করিয়া, বিনা অপরাধে থানায় টানিয়া লইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া যন্ত্রণার একশেষ করিত না। মনের মধ্যে পাপ না থাকিলে তখনকার দিনে পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকেরই নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকার ছিল এবং এখনকার মত নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার নিরতিশয় অপমানকর গুরুভারও তখন নবাগত বঙ্গবাসীর ঘাড়ের উপর চাপানো হয় নাই। অতএব স্বচ্ছন্দচিত্তে কোনো একটা আশ্রয়ের অনু-

সন্ধানে সমস্ত সকালটাই সেদিন পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে পড়ে। একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মুটের মাথায় একঝাঁকা তরিতরকারী চাপাইয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, মশাই, নন্দ মিস্ত্রীর বাসাটা কোথায়, বলে দিতে পারেন?

লোকটা থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কোন্ নন্দ? রিবিট ঘরের নন্দ পাগড়ীকে খুঁজচেন?

বলিলাম, সে তো জানিনে মশাই—কোন্ ঘরের তিনি। শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী ব'লে।

লোকটা অসম্মান-সূচক একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, ওঃ—মিস্তিরী! অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কব্‌লায় মশায়! মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়। মর্কট সাহেব যখন আমারে বলেছিল,—হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত কাউকে দেখতে পাইনে!' তখন বড় সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশ'খানি। আরে, কাস্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম্ম? কেটে যে জোড়া দিতে পারি! তবে, কি জানেন মশাই—'

দেখিলাম, অজ্ঞাতে লোকটার এমন জায়গায় আঘাত করিয়া ফেলিয়াছি যে, মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম, 'তা হ'লে নন্দ ব'লে কোন লোককে আপনি জানেন না?'

শোন কথা! চল্লিশ বছর রেঙ্গুনে বাস, আমি জানিনে আবার কাকে? নন্দ কি একটা? তিনটে নন্দ আছে যে! নন্দ মিস্তিরী বললেন? আসছেন কোত্থেকে? বাংলা থেকে বুঝি? ওঃ—তাই বলুন—টগরের মানুষকে খুঁজচেন।

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হাঁ,—হাঁ, তিনিই বটে।

লোকটা কহিল, তাই বলুন। পরিচয় না পেলে চিনব কি ক'রে? আসুন আমার সঙ্গে। বরাতে ক'রে খাচ্চে মশাই, নইলে নন্দ পাগড়ী নাকি আবার একটা মিস্তিরী! মশাই আপনারা?

ব্রাহ্মণ শুনিয়া লোকটা পথের উপরেই প্রণাম করিল; সে দেবে

আপনার চাক্‌রী ক'রে ? তা সাহেবকে বলে দিতেও পারে একটা যোগাড় ক'রে ; কিন্তু দুটি মাসের মাইনে আগাম ঘুষ দিতে হবে। পারবেন ? তা হলে আঠারো আনা পাঁচ সিকে রোজ ধরতেও পারে। এর বেশী নয়!

জানাইলাম যে, আপাততঃ চাকরির উমেদারীতে যাইতেছি না, একটু আশ্রয় যোগাড় করিয়া দিবে, এই আশা আমাকে নন্দ মিস্ত্রী জাহাজের উপরেই দিয়াছিল।

শুনিয়া হরিপদ মিস্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মশাই ভদ্রলোক, কেন ভদ্রলোকদের মেসে যান না ?

কহিলাম, মেস কোথায়, সে ত চিনি না।

সেও চিনে না—তাহা সেও স্বীকার করিল। কিন্তু ও-বেলা সন্ধান করিয়া জানাইবে আশা দিয়া বলিল, কিন্তু এত বেলায় নন্দর সঙ্গে দেখা হবে না—সে কাজে গেছে—টগর খিল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ডাকাডাকি ক'রে তার ঘুম ভাঙালে আর রক্ষে থাকবে না মশাই!

সেটা খুব জানি। সুতরাং পথের মধ্যে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে সাহস দিয়া কহিল, নাই গেলেন সেখানে! অমন তোফা দা'ঠাকুরের হোটেল রয়েচে—চান করে সেবা করে এক ঘুম দিয়ে, বেলা পড়লে তখন দেখা যাবে।

হরিপদর সহিত গল্প করিতে করিতে দা'ঠাকুরের হোটেলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলের ডাইনিং-রুমে জন পনের লোক খাইতে বসিয়াছে।

ইংরাজিতে দুটা কথা আছে 'instinct' এবং 'prejudice ; কিন্তু আমাদের আছে শুধু সংস্কার। একটা যে আর একটা নয়, তাহা বুঝা কঠিন নয় ; কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদ, খাওয়া-ছোঁয়া বস্তুটা যে 'instinct' হিসাবে সংস্কার নয়, তাহা দা'ঠাকুরের এই হোটেলের সংস্রবে আজ প্রথম টের পাইলাম ; এবং সংস্কার হইলেও যে ইহা কত তুচ্ছ সংস্কার, ইহার বাঁধন মুক্ত হওয়া কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশের এই যে অসংখ্য জাতিভেদের শৃঙ্খল—তাহা দু'পায়ে পরিয়া ঝম্‌-ঝম্‌ করিয়া বিচরণ করার

মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কতখানি বিদ্যমান, সে আলোচনা এখন থাক; এ কথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি যে, যাঁহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে-প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং ইহার শাসন-পাশ ছিন্ন করিবার দুরূহতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাঁহারা একটা ভুল জিনিষ জানিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ যে-কোন দেশে খাওয়া-ছোঁয়ার বাচবিচার প্রচলিত নাই, তেমন দেশে পা দেওয়া মাত্রেই বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, এই ছাপ্পান্ন পুরুষের খাওয়া-ছোঁয়ার শেকল কি করিয়া না জানি রাতারাতিই খসিয়া গেছে। বিলাত গেলে জাতি যায়; একটা মুখ্য কারণ, নিষিদ্ধ মাংস আহার করিতে হয়। যে নিজের দেশেও কোন কালে মাংস খায় না, তাহারও যায়। কারণ, জাতি মারিবার মালিকেরা বলেন, সেও এই কথা,—না খেলেও সে ওই খাওয়াই ধ'রে নিতে হবে। নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। বর্ম্মা ত তিন চার দিনের পথ, অথচ দেখি, পনের আনা বাঙ্গালী ভদ্রলোকই—বোধ করি, ব্রাহ্মণই বেশী হইবেন, কারণ, এ যুগে তাঁহাদের লোভটাই সকলকে হার মানাইয়াছে—জাহাজের হোটেলে সস্তায় পেট ভরিয়া আহার করিয়া ডাঙ্গায় পদার্পণ করেন। সেখানে মুসলমান ও গোয়ানিজ পাচক ঠাকুরেরা কি রাঁধিয়া সার্ভ করিতেন, প্রশ্ন করা রূঢ় হইতে পারে। কিন্তু তাহারা যে হবিষ্যান্ন পাক করিয়া কলাপাতায় তাহাদিগকে পরিবেশন করে নাই, তাহা ভাটপাড়ার ভট্‌চায্যিদের পক্ষেও অনুমান করা বোধ করি কঠিন নয়। আমি ত সহযাত্রী। যাঁহারা নিতান্তই এই সকল খাইতে চাহেন না, তাঁহারা অন্ততঃ চা-রুটি, ফলটা-পাকড়টাও ছাড়েন না। অথচ, সেই একদম নিষিদ্ধ মাংস হইতে মর্ত্তমান রম্ভা পর্য্যন্ত সমস্তই একত্রে গাদাগাদি করিয়া জাহাজের কোল্ড-রুমে রাখা হইয়া থাকে এবং তাহা কাহারও অগোচর রাখার পদ্ধতিও জাহাজের নিয়ম-কানুনের মধ্যে দেখি নাই। তবে আরাম এইটুকু যে, বর্ম্মা-প্রবাসীর জাতি যাইবার আইনটা বোধ করি, কোন গতিকে শাস্ত্রকারের কোডি-সিলটা এড়াইয়া গেছে। না হইলে হয় ত আবার একটা ছোট-খাটো

ব্রাহ্মণ-সভার আবশ্যক হইত। যাক্, ভদ্রলোকের কথা আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। হোটেলে যাহারা সারি সারি পংক্তি-ভোজনে বসিয়া গেছে, তাহারা ভদ্রলোক নয়। অন্ততঃ আমরা বলি না। সকলেই কারিকর—ওয়ার্কশপে কাজ করে। সাড়ে দশটার ছুটিতে ভাত খাইতে আসিয়াছে। সহরের প্রান্তে মস্ত একটি মাঠের তিনদিকে নানা রকমের এবং নানা আকারের কারখানা এবং একধারে এই পল্লীর মধ্যে দা'ঠাকুরের হোটেল। এ এক বিচিত্র পল্লী। লাইন করিয়া গায়ে গায়ে মিশাইয়া জীর্ণ কাঠের ছোট ছোট কুটীর। ইহাতে চীনা আছে, বর্ম্মা আছে, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তৈলঙ্গী আছে, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু আছে, আর আছে আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালী। ইহাদেরই কাছে আমি প্রথম শিখিয়াছি যে, ছোট জাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে রাখার বদ্ অভ্যাসটা পরিত্যাগ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। যাহারা করে না, তাহারা যে পারে না বলিয়া করে না, তাহা নয়; যে জন্য করে না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিবাদ বাধিবে।

দা'ঠাকুর আসিয়া আমাকে সযত্নে গ্রহণ করিলেন; একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এই ঘরে থাকিয়া আমার কাছে আহার করুন, চাকরী-বাকরী হইলে পরে দাম চুকাইয়া দিবেন।

কহিলাম, আমাকে ত তুমি চেনো না, একমাস থাকিয়া এবং খাইয়া, দাম না দিয়াও ত চলিয়া যাইতে পারি?

দা'ঠাকুর নিজের কপালটা দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, এটা ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না মশাই?

বলিলাম, না, ওতে আমার লোভ নেই।

দা'ঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে এবার পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, তবেই দেখুন। বরাত মশাই, বরাত! এ ছাড়া আর পথ নেই, এই আমি সকলকে বলি।

বস্তুতঃ এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। এ সত্য তিনি যে নিজে কিরূপ অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হাতে-নাতে সপ্রমাণ করিবার জন্য মাস চার-পাঁচ পরে একদিন প্রাতঃকালে অনেকের গচ্ছিত টাকা-কড়ি, আংটি

ঘড়ি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শুধু তাহাদের নিরেট কপালগুলি শূন্য হোটেলের মেঝের উপর সজোরে ঠুকিবার জন্য বর্ম্মায় ফেলিয়া রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। যাই হোক্, কথাটা দাঁঠাকুরের শুনিতে মন্দ লাগিল না, এবং আমিও একজন তাঁর নূতন মক্কেল হইয়া একটা ভাঙ্গা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। রাত্রে একজন কাঁচা বয়সের বাঙ্গালী ঝি আমার ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া খাবার জায়গা করিয়া দিতে আসিল। অদূরে ডাইনিং-রুমে বহুলোকের আহারের কলরব শুনা যাইতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, আমাকেও সেখানে না দিয়া এখানে দিতেছ কেন?

সে কহিল, তারা যে 'নোয়াকাটা' বাবু, তাদের সঙ্গে কি আপনাকে দিতে পারি?

অর্থাৎ তাহারা ওয়ার্ক-মেন, আমি ভদ্রলোক। হাসিয়া বলিলাম, আমাকেও যে কি কাটতে হবে, সে ত' এখনো ঠিক হয় নি। যাই হোক, আজ দিচ্ছ দাও, কিন্তু কাল থেকে আমাকেও ঐ ঘরেই দিয়ো।

ঝি কহিল, আপনি বামুন মানুষ, আপনার সেখানে খেয়ে কাজ নেই।

কেন?

ঝি গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, সবাই বাঙ্গালী বটে, কিন্তু একজন 'ডোম' আছে।

ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুঁইয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি না জানি না; কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর সবাই?

ঝি কহিল, আর সবাই ভাল জাত। কায়েত আছে, কৈবর্ত্ত আছে, সদ্‌গোপ আছে, গয়লা আছে, কামার—

এরা কেউ আপত্তি করে না?

ঝি আবার একটু হাসিয়া বলিল, এই বিদেশে সাত সমুদ্দুর পারে এসে কি অত বামনাই করা চলে বাবু? তারা বলে দেশে ফিরে গঙ্গাস্তান ক'রে একটা অঙ্গ-প্রাচিত্তির করলেই হবে।

হয় ত হয়; কিন্তু আমি জানি, যে দুই-চারি জন মাঝে মাঝে দেশে আসে, তাহারা চল্‌তি মুখে কলিকাতার গঙ্গায় একবার গঙ্গাস্নানটা হয় ত করিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রাচিত্তির কোনকালেই করে না। বিদেশের আবহাওয়ার গুণে ইহা তাহারা বিশ্বাসই করে না।

দেখিলাম, হোটেলে মাত্র দুটি হুঁকা আছে; একটি ব্রাহ্মণের, অপরটি যাহারা ব্রাহ্মণ নয়, তাহাদের। আহারাদির পরে কৈবর্ত্তর হাত হইতে ডোম এবং ডোমের হাত হইতে কর্ম্মকারমশায় স্বচ্ছন্দে হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইয়া তামাক ইচ্ছা করিলেন। দ্বিধার লেশমাত্র নাই। দিন দুই পরে এই কর্ম্মকারটির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এতে তোমাদের জাত যায় না?

কর্ম্মকার কহিল, যায় না আর মশাই, যায় বই কি।

তবে?

ও কি আর প্রথমে ডোম বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল; বলেছিল, কৈবর্ত্ত। তার পরে সব জানাজানি হয়ে গেল।

তখন তোমরা কিছু বললে না?

কি আর বলব মশাই, কাজটা ত খুবই অন্যায় করেচে, সে ত' বলতেই হবে। তবে, লজ্জা পাবে, এই জন্য সবাই জেনেও চেপে গেল।

কিন্তু দেশে হলে কি হ'তো?

লোকটা যেন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, তা হলে কি আর কারো রক্ষে ছিল? তার পরে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিতে লাগিল, তবে কি জানেন বাবু, বামুনের কথা ধরিনে, তাঁরা হলেন বর্ণের গুরু, তাঁদের কথা আলাদা। নইলে, আর সবাই সমান; নবশাখই বলুন, আর হাড়ি-ডোমই বলুন, কিছুই কারও গায়ে লেখা থাকে না; সবাই ভগবানের সৃষ্টি, সবাই এক, সবাই পেটের জ্বালায় বিদেশে এসে লোহা পিটছে! আর যদি ধরেন বাবু, হরি মোড়ল ডোম হলে কি হয়, মদ খায় না, গাঁজা খায় না—আচার ব্যবহারে কার সাধ্য বলে, ও ভাল জাত নয়, ডোমের ছেলে। আর ঐ লক্ষ্মণ, ও ত' ভাল কায়েতের ছেলে, ওর দেখুন দিকি একবার ব্যবহারটা? ব্যাটা দু' দুবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে

গেছে। আমরা সবাই না থাকলে এতদিন ওকে জেলে মেথরের ভাত খেতে হ'তো যে!

লক্ষ্মণের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ছিল না, কিংবা হরি মোড়ল তাহার ডোমত্ব গোপন করিয়া কত বড় অন্যায় করিয়াছে, সে মীমাংসা করিবারও প্রবৃত্তি হইল না; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, যে দেশে ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত চর লাগাইয়া তাহার আজন্ম প্রতিবেশীর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও ইহারা একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর এত বড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে এবং শুধু তাই নয়, পাছে এই প্রবাসে তাহাকে লজ্জিত ও হীন হইয়া থাকিতে হয়, এই আশঙ্কায় সে কথা উত্থাপন পর্য্যন্ত করে নাই, এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! বিদেশী বুঝিবে না বটে, কিন্তু আমরা ত' বুঝিতে পারি, হৃদয়ের কতখানি প্রশস্ততা, মনের কত বড় ঔদার্য্য ইহার জন্য আবশ্যক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। মনে হইল, এই শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পল্লীটুকুর মধ্যে সারাজীবন বসিয়া কাটানো, মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এত বড় শত্রু বোধ করি কোন একটা জাতির আর নাই। যাক্। বহুদিন পর্য্যন্ত আমি ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কিন্তু আমার যে অক্ষর-পরিচয় আছে, এ সংবাদ যতদিন না তাহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, শুধু ততদিনই আমি ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি; তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের অংশ পাইয়াছি; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জানিয়াছে, আমি ভদ্রলোক, আমি ইংরাজি জানি, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা আমাকে পর করিয়া দিয়াছে। ইংরাজি-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে ইহারা আপদ্-বিপদের দিনে আসেও বটে, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তাহাও সত্য; কিন্তু বিশ্বাসও করে না, আপনার লোক বলিয়াও ভাবে না। আমি যে তাহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে-মনে ঘৃণা করি না, আড়ালে উপহাস করি না, দেশের এই কুসংস্কারটা তাহারা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

শুধু এই জন্যই আমার কত সৎসঙ্কল্পই যে ইহাদের মধ্যে বিফল হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, তাহার অবধি নাই। কিন্তু সে কথাও আজ থাক্। দেখিলাম, বাঙ্গালী মেয়েদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে বড় কম নাই। তাহাদের কুলের পরিচয় প্রকাশ না করাই ভাল; কিন্তু আজ তাহারা আর একভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া একেবারে খাঁটি গৃহস্থ-পরিবার হইয়া গেছে! পুরুষদের মনে-মনে হয় ত' আজও একটা সাবেক 'জাতের' স্মৃতি বজায় আছে, কিন্তু মেয়েরা দেশেও আসে না, দেশের সহিত আর কোন সংস্রবও রাখে না। তাহাদের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করিলে বলে, আমরা বাঙ্গালী; অর্থাৎ মুসলমান, খৃষ্টান্, বর্ম্মী নই, বাঙ্গালী হিন্দু। আপোষের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান স্বচ্ছন্দে চলে;—শুধু বাঙ্গালী হইলেই যথেষ্ট, এবং চট্টগ্রামী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া দুই হাত এক করিয়া দিলেই ব্যস্। বিধবা হইলে বিধবা বিবাহের রেওয়াজ নাই, বোধ করি, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে রাজী হন না বলিয়াই; কিন্তু বৈধব্যও ইহারা ভালবাসে না; আবার একটা ঘর-সংসার পাতাইয়া লয়—আবার ছেলে-মেয়ে হয়,—তাহারাও বলে, আমরা বাঙ্গালী। আবার তাহাদের বিবাহে সেই পুরোহিত আসিয়াই বৈদিক মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ দিয়া যান,—এবার কিন্তু আর এক তিল আপত্তি করেন না। স্বামী অত্যধিক দুঃখ-যন্ত্রণা দিলে ইহারা অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণটাও অত্যন্ত হওয়ার প্রয়োজন। অথচ ইহারা যথার্থই হিন্দু, এবং দুর্গাপূজা হইতে সুরু করিয়া ষষ্ঠী, মাকাল কোন পূজাই বাদ দেয় না।

সাত

পথে যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে এই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘটনাচক্রে তাহারা রহিয়া গেল সহরের একপ্রান্তে, আর আমার আশ্রয় মিলিল অন্য প্রান্তে। সুতরাং পনের

ষোল দিনের মধ্যে ওদিকে আর যাইতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সারাদিন চাক্‌রীর উমেদারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে এম্‌নি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া এ শক্তি আর থাকে না যে, কোথাও বাহির হই। ক্রমশঃ, যত দিন যাইতেছিল, আমারও ধারণা জন্মিতেছিল যে, এই সুদূর-বিদেশে আসিয়াও চাক্‌রী সংগ্রহ করা আমার পক্ষে ঠিক দেশের মতই সুকঠিন।

অভয়ার কথা মনে পড়িল। যে লোকটির উপর নির্ভর করিয়া সে স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সন্ধান না মিলিলে, সে লোকটির অবস্থা কি হইবে! বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইবার পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিলেও, ফিরিবার পথটিও যে ঠিক তেমনি প্রশস্ত পড়িয়া থাকে, বাংলা দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া এত বড় আশার কথা কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। নিজেদের অধিক দিন প্রতিপালন করিবার মত অর্থবলও যে সংগ্রহ করিয়া তাহারা পা বাড়ায় নাই, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। বাকী রহিল শুধু সেই রাস্তাটা, যাহা পনের আনা বাঙ্গালীর একমাত্র অবলম্বন; অর্থাৎ মাস-মাহিনায় পরের চাক্‌রী করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কোনমতে হাড়-মাংসগুলাকে একত্র রাখিয়া চলা। রোহিণীবাবুরও যে সে ছাড়া পথ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, এই রেঙ্গুনের বাজারে কেবলমাত্র নিজের উদরটা চালাইয়া লইবার মত চাক্‌রী যোগাড় করিতে আমার যখন এই হাল, তখন একটি স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া সেই হাবা-গোবা বেচারাগোছের অভয়ার দাদাটির যে কি অবস্থা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার পর্য্যন্ত যেন ভয় হইয়া উঠিল। স্থির করিলাম, কাল যেমন কহিয়াই হোক একবার গিয়া তাহাদের খবর লইয়া আসিব।

পরদিন অপরাহ্ণ-বেলায় প্রায় ক্রোশ-দুই পথ হাঁটিয়া তাহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট মোড়ার উপর রোহিণী-দাদা আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নব জলধরমণ্ডিত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ন্যায় গুরুগম্ভীর; কহিলেন শ্রীকান্তবাবু যে! ভাল ত'?

বলিলাম, আজ্ঞে, হাঁ।

যান ভেতরে গিয়ে বসুন।

সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আপনাদের খবর সব ভাল ত ?

হুঁ—ভেতরে যান না। তিনি ঘরেই আছেন।

তা যাচ্ছি—আপনিও আসুন।

না,—আমি এইখানেই একটু জিরুই। খেটে খেটে ত একরকম খুন হবার যো হয়েছি,—দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।

তিনি পরিশ্রমাধিক্যে যে মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার চেহারায় প্রকাশ না পাইলেও মনে-মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রোহিণী-দাদার মধ্যেও যে একখানি গাম্ভীর্য্য এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিল তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ত' বিশ্বাস করাই দুরূহ; কিন্তু ব্যাপার কি ? আমি নিজে ত' পথে পথে ঘুরিয়া আর পারি না। আমার এই দাদাটিও কি—

কবাটের আড়াল হইতে অভয়া তাহার হাসিমুখখানি বাহির করিয়া নিঃশব্দ-সঙ্কেতে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে কহিলাম, চলুন না রোহিণী-দা, ভিতরে গিয়ে দুটো গল্প করি গে।

রোহিণী-দা জবাব দিলেন, গল্প! এখন মরণ হলেই বাঁচি, তা' জানেন শ্রীকান্তবাবু ?

জানিতাম না—তাহা স্বীকার করিতেই হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু একটা প্রচণ্ড নিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, দুদিন পরেই জানতে পারবেন।

অভয়ার পুনশ্চ নীরব আহ্বানে আর বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা-কাটা-কাটি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি; সুমুখের-খানাই বড়, রোহিণীবাবু ইহাতে শয়ন করেন। একধারে দড়ির খাটের উপর তাঁহার শয্যা। প্রবেশ করিতেই চোখে পড়িল—মেঝের উপর আসন পাতা, একখানি রেকাবিতে লুচি ও তরকারি, একটু হালুয়া ও এক গ্লাস জল। গণনায় নিরূপণ করিয়া এ আয়োজন যে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে আমার জন্য করিয়া রাখা হয় নাই, তাহা

নিজেদের। সুতরাং এক মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলাম, একটা রাগারাগি চলিতেছিল। তাই রোহিণী-দার মুখ মেঘাচ্ছন্ন,—তাই তাঁর মরণ হইলেই তিনি বাঁচেন। নীরবে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। অভয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন? এতদিন পরে বুঝি গরীবদের মনে পড়ল?

খাবারের থালাটা দেখাইয়া কহিলাম, আমার কথা পরে হবে; কিন্তু এ কি?

অভয়া হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও কিছু না, আপনি কেমন আছেন, বলুন।

কেমন আছি, সে ত' নিজেই জানি না, পরকে বলিব কি করিয়া? একটু ভাবিয়া কহিলাম, একটা ডাক্তারের যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। 'রোহিণীবাবু যে বল্‌ছিলেন—' আমার মুখের কথা রহিয়া গেল। রোহিণী-দা তাঁহার ছেঁড়া চটিতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া পট্‌ পট্‌ শব্দে ঘরে ঢুকিয়া, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া, জলের গেলাসটা তুলিয়া লইয়া, এক নিশ্বাসে অর্দ্ধেকটা এবং বাকিটুকু দুই তিন চুমুকে জোর করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া, শূন্য গেলাসটা কাঠের মেঝের উপর ঠকাস্‌ করিয়া রাখিয়া দিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন,—যাক্‌, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই। আমার আপনার আর কে আছে এখানে যে, ফিরে গেলে খেতে দেবে।

আমি অবাক্‌ হইয়া অভয়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পলকের জন্য তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে সহাস্যে কহিল, ফিরে গেলে কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী সে কথা কানেও তুলিলেন না, বাহির হইয়া গেলেন; কিন্তু অর্দ্ধ-মিনিট না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সারাদিন আফিসে খেটে-খেটে ফিরেই গা-মাথা ঘুরছিল শ্রীকান্তবাবু,—তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারিনি, কিছু মনে করবেন না।

আমি বলিলাম, না।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আমার একটু বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারেন ?

তাঁহার মুখের ভঙ্গীতে আমি হাসিয়া ফেলিলাম; কহিলাম, কিন্তু সেখানে লুচি-মোহনভোগ হয় না।

রোহিণী-দা বলিলেন, দরকার কি! ক্ষুধার সময় একটু গুড় দিয়ে যদি কেউ জল দেয়, সেই যে অমৃত! এখানে তাই বা দেয় কে ?

আমি জিজ্ঞাসু মুখে অভয়ার মুখের প্রতি চাহিতেই, সে ধীরে ধীরে বলিল, মাথা ধ'রে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই খাবার তৈরি করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে, শ্রীকান্তবাবু!

আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, এই অপরাধ ?

অভয়া তেমনি শান্তভাবে কহিল, এ কি তুচ্ছ অপরাধ, শ্রীকান্তবাবু ?

তুচ্ছ বই কি।

অভয়া কহিল, আপনার কাছে হ'তে পারে; কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই বা মাপ করবেন কেন ? আমার মাথা ধরলে তাঁর কাজ চলে কি ক'রে ?

রোহিণী ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিয়া কহিলেন, তুমি গলগ্রহ, এ কথা আমি বলেচি ?

অভয়া বলিল, বল্‌বে কেন, হাজার রকমে দেখাচ্চ।

রোহিণী কহিলেন, দেখাচ্চি! ওঃ—তোমার মনে-মনে জিলিপির প্যাঁচ! তোমার মাথা ধরেছিল—আমাকে বলেছিলে ?

অভয়া কহিল, তোমাকে বলে লাভ কি ? তুমি কি বিশ্বাস করতে ?

রোহিণী আমার দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শুনুন, শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন। ওঁর জন্যে আমি দেশত্যাগী হলুম—বাড়ী ফেরবার পথ বন্ধ—আর ওঁর মুখের কথা শুনুন। ওঃ—

অভয়াও এবার সক্রোধে উত্তর দিল, আমার যা হবার হবে—তুমি যখন

ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও! আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সইবে? তোমার কে আমি? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে —

তাহার কথা শেষ না হইতেই রোহিণী প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, ছটো রেঁধে দেবার জন্যে—কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন! আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও ত তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটেলে,—বলিতে বলিতেই তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; তিনি কোঁচার খুঁটটা মুখে চাপা দিয়া দ্রুতবেগে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া বিবর্ণ মুখ হেঁট করিল—কি জানি, চোখের জল গোপন করিতে কি না; কিন্তু আমি একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম। কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে যে কলহ চলিতেছে, সে ত' চোখেই দেখিলাম; কিন্তু ইহার নিগূঢ় হেতুটা দৃষ্টির একান্ত অন্তরালে থাকিলেও, সে যে ক্ষুধা এবং খাবার তৈরির ত্রুটি হইতে বহু বহু দূর দিয়া বহিতেছে, তাহা বুঝিতে লেশমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। তবে কি স্বামী-অন্বেষণের গল্পটাও—

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে নিজেরই কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিলাম, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে,—এখন তাহলে আসি।

অভয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; কহিল, আবার কবে আসবেন?

অনেক দূর—

তা হলে একটু দাঁড়ান, বলিয়া অভয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটুক্‌রা কাগজ দিয়া বলিল, যে জন্যে আমার আসা, তা সমস্তই এতে সংক্ষেপে লিখে দিলুম। পড়ে দেখে যা ভাল বোধ হয় করবেন। আপনাকে এর বেশী আমি বলতে চাইনে। —বলিয়া আজ সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঠিকানাটা কি?

প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি সেই ছোট্ট কাগজখানি মুঠার মধ্যে গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দার সেই মোড়াটি এখন শূন্য—রোহিণী-দাদাকে আশে-পাশে কোথাও দেখিলাম না। বাসা পর্য্যন্ত

কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। অনতিদূরেই পথিপার্শ্বে একখানি ছোট চা'য়ের দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম এবং একবাটি চা লইয়া ল্যাম্পের আলোকে সেই লেখাটুকু চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলাম। পেন্সিলের লেখা, কিন্তু ঠিক পুরুষমানুষের মত হস্তাক্ষর! প্রথমেই সে তাহার স্বামীর নাম এবং তাঁহার পূর্ব্বেকার ঠিকানা দিয়া নীচে লিখিয়াছে, আজ যাহা মনে করিয়া গেলেন, সে আমি জানি; এবং বিপদে আপনার উপর আমি কতখানি নির্ভর করিয়াছি, সেও আপনি জানেন। তাই আপনার ঠিকানা জানিয়া লইলাম।

অভয়ার লেখাটুকু বারবার পড়িলাম; কিন্তু ওই কয়টা কথা ছাড়া আর একটা কথাও বেশী আন্দাজ করিতে পারিলাম না। আজ তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার চোখে দেখিয়া যে-কোন একটা বাহিরের লোক যে কি মনে করিবে, তাহা অভয়ার মত বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অনুমান করা একেবারেই কঠিন নয়। কিন্তু তথাপি সে সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে একবিন্দু ইঙ্গিত করিল না। তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা ত পূর্ব্বেই শুনিয়াছি; বিপদে আমার উপর নির্ভর করিতে ত তাহাকে বারংবার চোখেই দেখিয়াছি;—কিন্তু তার পরে? এখন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে সে চায় কি না, কিম্বা আর কোন বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল—কোনটার আভাস পর্য্যন্ত তাহার লেখার মধ্যে হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারিলাম না। কথায়-বার্ত্তায় অনুমান হয়, রোহিণী কোন একটা অফিসে চাক্‌রী যোগাড় করিয়াছে। কি করিয়া করিল, জানি না,—তবে খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তাটা আপাততঃ আমার মত তাহাদের নাই,—লুচিও জোটে। তথাপি যে কি রকম বিপদের সম্ভাবনাটা আমাকে শুনাইয়া রাখিল এবং শুনাইবার সার্থকতাই বা কি, তাহা অভয়াই জানে।

তথা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত পথটা শুধু ইহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না; শুধু এইটা আজ নিজের মধ্যে স্থির হইয়া গেল যে, অভয়ার স্বামী লোকটি যেই হোক এবং যেখানে যে-ভাবেই থাকুক, স্ত্রীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ইহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করার কৌতূহল আমাকে সংবরণ করিতেই হইবে।

পরদিন হইতে পুনরায় নিজের চাক্‌রীর উমেদারীতে লাগিয়া গেলাম; কিন্তু সহস্র চিন্তার মধ্যেও অভয়ার চিন্তাকে মনের ভিতর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না।

কিন্তু চিন্তা যাই করি না কেন, দিনের পর দিন সমভাবেই গড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অদৃষ্টবাদী দা'ঠাকুরের প্রফুল্ল মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাতের তরকারী প্রথমে পরিমাণে, এবং পরে সংখ্যায় বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু চাক্‌রী আমার সম্বন্ধে লেশমাত্র মত পরিবর্তন করিলেন না; যে চক্ষে প্রথম দিনটিতে দেখিয়াছিলেন, মাসাধিক কাল পরেও ঠিক সেই চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। কাহার পরে জানি না, কিন্তু ক্রমশঃ উৎকণ্ঠিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন ত জানিতাম না, চাকুরী পাবার যথেষ্ট প্রয়োজন না হইলে আর ইনি দেখা দেন না। এই জ্ঞানটি লাভ করিলাম হঠাৎ একদিন রোহিণীবাবুকে পথের মধ্যে দেখিয়া। তিনি বাজারে পথের ধারে তরি-তরকারী কিনিতেছিলেন। আমি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিলাম—যদিচ তাঁহার গায়ের জামা-কাপড় জুতা জীর্ণতার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে—তীক্ষ্ণ রৌদ্রে মাথায় একটা ছাতি পর্য্যন্ত নাই—কিন্তু, আহার্য্যদ্রব্যগুলি তিনি বড়লোকের মতই ক্রয় করিতেছেন; সেদিকে তাঁহার খোঁজাখুঁজি ও যাচাই-বাছাইয়ের অবধি নাই। হাঙ্গামা ও পরিশ্রম যতই হৌক, ভাল জিনিষটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে। চক্ষের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখে পড়িয়া গেল। এই সব কেনাকাটার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যগ্র-ব্যাকুল স্নেহ যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতেছে, এ যেন আমি সূর্য্যের আলোর মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কেন যে এই সকল লইয়া তাহার বাড়ী পৌঁছানো একান্তই চাই, কেন যে এই সকলের মূল্য দিবার জন্য চাক্‌রী তাহাকে পাইতেই হইল, এ সমস্যার মীমাংসা করিতে আর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। আজ বুঝিলাম, কেন সে এই জনারণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং আমি পাই নাই!

ঐ যে শীর্ণ লোকটি রেঙ্গুনের রাজপথ দিয়া, একরাশ মোট হাতে

লইয়া, শতচ্ছিন্ন মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে—আড়ালে থাকিয়া আমি তাহার পরিতৃপ্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃক্‌পাত করিবার তাহার যেন অবসরমাত্র নাই। হৃদয় তাহার যাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার কাছে জামা-কাপড়ের দৈন্য যেন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে! আর আমি? বস্ত্রের সামান্য মলিনতায় পতিপদেই যেন সঙ্কোচে জড়-সড় হইয়া উঠিতেছি; পথচারী একান্ত অপরিচিত লোকেরও দৃষ্টিপাতে লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছি।

রোহিণী-দা চলিয়া গেল,—আমি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না; এবং পরক্ষণেই লোকের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেন জানি না, এইবার অশ্রুজলে আমার দু'চক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে মুছিতে মুছিতে পথের একধার দিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম এবং নিজের মনেই বারবার বলিতে লাগিলাম, এই ভালবাসাটার মত এতবড় শক্তি, এতবড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না, এত বড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

তথাপি বহু-বহুযুগ-সঞ্চিত অন্ধ-সংস্কার আমার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল,—ভাল নয়, ইহা ভাল নয়! ইহা পবিত্র নয়,—শেষ পর্য্যন্ত ইহার ফল ভাল হয় না!

বাসায় আসিয়া একখানি বড় লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি, চাক্‌রীর দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। সেগুনকাষ্ঠের প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইঁহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

চাক্‌রী বস্তুটির সহিত সাবেক পরিচয় ছিল না; সুতরাং পাইলেও সন্দেহ রহিল, তাহা বজায় থাকিবে কি না। আমার যিনি সাহেব হইলেন, তিনি খাঁটি সাহেব হইলেও দেখিলাম, বেশ বাংলা জানেন। কারণ, কলিকাতার অফিস হইতে তিনি বদ্‌লি হইয়া বর্ম্মায় গিয়াছিলেন।

দুই সপ্তাহ চাক্‌রীর পরে ডাকিয়া কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু, তুমি ঐ টেবিলে আসিয়া কাজ কর,—মাহিনাও প্রায় আড়াই গুণ বেশী পাইবে।

প্রকাশ্যে এবং মনে মনে সাহেবকে একলক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া হাড়-

বাহির-করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাত মোড়া টেবিলটার উপর চড়িয়া বসিলাম। মানুষের যখন হয়, তখন এমনি করিয়াই হয়। হোটেলের দা-ঠাকুর নেহাৎ মিথ্যা বলেন না।

গাড়ী-ভাড়া করিয়া অভয়াকে সুসংবাদ দিতে গেলাম; রোহিণী-দা অফিস হইতে ফিরিয়া সেইমাত্র জলযোগে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিছক জল দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখিলাম না। বরঞ্চ যা দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, তা দিয়া পূর্ণ করিতে সংসারে আর যাহারই আপত্তি থাক্, আমার ত ছিল না। অতএব, অভয়ার প্রস্তাবে যে অসম্মত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। খাওয়া শেষ হইতেই রোহিণী-দা জামা গায়ে দিতে লাগিলেন। অভয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, তোমাকে বরাবর বলেচি রোহিণী-দা, এই শরীরে তুমি এত পরিশ্রম কোরো না, তুমি কি কিছুতেই শুনবে না? আচ্ছা, কি হবে আমাদের বেশী টাকায়? দিন ত বেশ চ'লে যাচ্চে।

রোহিণী-দা'র চক্ষু দিয়া স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। একটা বামুন পর্য্যন্ত রাখতে পারচিনে, খেটে-খেটে দু'বেলা আগুন-তাতে তোমার দেহ যে শুকিয়ে গেল! বলিয়া পান মুখে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অভয়া একটু ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন ত শ্রীকান্তবাবু, এর অন্যায়! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে বাড়ী এসে কোথায় একটু জিরুবেন, তা নয়, আবার রাত্রি নটা পর্য্যন্ত ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। আমি এত বলি, কিছুতে শুনবেন না। এই দুটি লোকের রান্নায় আবার একটা রাঁধুনি রাখার কি দরকার বলুন ত? ওঁর সবই যেন বাড়াবাড়ি, না? বলিয়া সে আর একদিকে চোখ ফিরাইল।

আমি নিঃশব্দে শুধু একটু হাসিলাম। না, কি হাঁ, এ জবাব দিবার সাধ্য আমার ছিল না,—আমার বিধাতা-পুরুষেরও ছিল কিনা সন্দেহ।

অভয়া উঠিয়া গিয়া একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। কয়েকদিন হইল, বর্ম্মা রেল কোম্পানীর অফিস হইতে ইহা আসিয়াছে।

বড় সাহেব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, অভয়ার স্বামী প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে কোম্পানীর চাক্‌রী হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গিয়াছে—তাঁহারা অবগত নহেন।

উভয়েই বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। অবশেষে অভয়াই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, এখন আপনি কি উপদেশ দেন?

আমি ধীরে-ধীরে কহিলাম, আমি কি উপদেশ দেব?

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্ত্তব্য স্থির ক'রে দিতে হবে। এ চিঠি পাওয়া পর্য্যন্ত আমি আপনার আশাতেই পথ চেয়ে আছি।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ কথা! আমার পরামর্শ লইয়া বাহির হইয়াছিলে কি না, তাই আমার উপদেশের জন্য পথ চাহিয়া আছ।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ী ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?

অভয়া কহিল, কিছুই না। বলেন, যেতে পারি! কিন্তু আমার ত সেখানে কেউ নেই।

রোহিণীবাবু কি বলেন?

তিনি বলেন, তিনি ফিরবেন না। অন্ততঃ দশ বছর ও-মুখো হবেন না।

আবার বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলাম, তিনি কি বরাবর আপনার ভার নিতে পারবেন?

অভয়া বলিল, পরের মনের কথা কি ক'রে জানব বলুন? তা ছাড়া, তিনি নিজেই বা জানবেন কি ক'রে? বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজেই কহিল,—একটা কথা। আমার জন্যে তিনি একবিন্দু দায়ী ন'ন। দোষ বলুন, ভুল বলুন, সমস্তই একা আমার।

গাড়োয়ান বাহির হইতে চীৎকার করিল, বাবু, আর কত দেরী হবে?

আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। এই অবস্থা-সঙ্কটের ভিতর হইতে সহসা পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অভয়া যে যথার্থই অকূল পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে,আমার মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না সত্য, কিন্তু নারীর এত রকমের উল্টা-পাল্টা অবস্থা আমি

দেখিয়াছি যে, বাহির হইতে এই দুটা চোখের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করা কত বড় অন্যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিলাম।

গাড়োয়ানের পুনশ্চ আহ্বানে আর আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি শীঘ্রই আর একদিন আসব। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম। অভয়া কোন কথা কহিল না, নিশ্চল মূর্তির মত মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল; কিন্তু দশ হাত না যাইতেই মনে পড়িল, ছড়িটা ভুলিয়া আসিয়াছি। তাড়াতাড়ি গাড়ী থামাইয়া ফিরিয়া বাড়ী ঢুকিতেই চোখে পড়িল—ঠিক দ্বারের সম্মুখেই অভয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, শরবিদ্ধ পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় আছাড় খাইয়া যেন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে।

কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা দিব, আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তেমনি নীরবে ফিরিয়া গেলাম। অভয়া যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনি কাঁদিতেই লাগিল। একবার জানিতেও পারিল না,—তাহার এই নিগূঢ় অপরিসীম বেদনার একজন নির্ব্বাক্ সাক্ষী এ জগতে বিদ্যমান রহিল।

আট

রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ আমি বিস্মৃত হই না। পাটনায় একখানা চিঠি পাঠাইবার কথা, আসিয়া পর্য্যন্ত আমার মনে ছিল, কিন্তু একে ত সংসারে যত শক্ত কাজ আছে, চিঠি লেখাকে আমি কারও চেয়ে কম মনে করি না। তারপরে, লিখিবই বা কি? আজ কিন্তু অভয়ার কান্না আমার বুকের মধ্যে এমনি ভারী হইয়া উঠিল যে, তার কতকটা বাহির করিয়া না দিলে যেন বাঁচি না, এমনি বোধ হইতে লাগিল। তাই বাসায় পৌঁছিয়াই কাগজ-কলম যোগাড় করিয়া বাইজীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। আর সে ছাড়া আমার দুঃখের অংশ লইবার লোক ছিলই বা কে! ঘণ্টা

দুই-তিন পরে সাহিত্যচর্চ্চা সাঙ্গ করিয়া যখন কলম রাখিলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে; কিন্তু পাছে সকাল বেলায় দিনের আলোকে এ চিঠি পাঠাইতে লজ্জা করে, তাই মেজাজ গরম থাকিতে-থাকিতেই তাহা সেই রাত্রেই ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

একজন ভদ্র নারীর নিদারুণ বেদনার গোপন ইতিহাস আর একজন রমণীর কাছে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য কি না, এ সন্দেহ আমার ছিল; কিন্তু অভয়ার এই পরম এবং চরম সঙ্কটের কালে, যে রাজলক্ষ্মী একদিন পিয়ারী বাইজীরও মর্ম্মান্তিক তৃষ্ণা দমন করিয়াছে, সে কি হিতোপদেশ দেয়, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রশ্নটা উল্টা দিক্ দিয়া একবারও ভাবিলাম না। অভয়ার স্বামীর উদ্দেশ না পাওয়ার সমস্যাই বারবার মনে উঠিয়াছে; কিন্তু পাওয়ার মধ্যেও যে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে, এ চিন্তা একটি-বারও মনে উদয় হইল না। আর এ গোলযোগ আবিষ্কার করিবার ভারটা যে বিধাতা-পুরুষ আমার উপরেই নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! দি-চার-পাঁচ পরে আমার একজন বর্ম্মা কেরাণী টেবিলের উপর একটি ফাইল রাখিয়া গেল—উপরেই নীল পেন্সিলে বড় সাহেবের মন্তব্য। তিনি 'কেস'টা আমাকে নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিয়াছেন। ব্যাপারটা আগাগোড়া পড়িয়া মিনিট কয়েক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরাণীকে সেখানকার সাহেব ম্যানেজার কাঠ-চুরির অভিযোগে সস্‌পেণ্ড করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরাণীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী। ইহারও চার-পাঁচ-পাতা জোড়া কৈফিয়ৎ ছিল। বর্ম্মা রেলওয়ে হইতে যে কোন্ গুরুতর অপরাধে চাক্‌রী গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। খানিক পরেই আমার সেই কেরাণীটি আসিয়া জানাইল, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহে। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিশ্চয় জানিতাম, প্রোম হইতে তিনি কেসের তদ্বির করিতে স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং কয়েক মিনিট পরেই ভদ্রলোক সশরীরে

আসিয়া যখন দেখা দিলেন, তখন অনায়াসে চিনিলাম, ইনিই অভয়ার স্বামী। লোকটার প্রতি চাহিবামাত্রই সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরণে হ্যাট-কোট,—কিন্তু যেমন পুরোনো, তেমনি নোঙরা। সমস্ত কালো মুখখানা শক্ত গোঁফদাড়িতে সমাচ্ছন্ন। নীচেকার ঠোঁটটা বোধ করি দেড় ইঞ্চি পুরু। তাহার উপর, এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে, কথা কহিলে ভয় করে, পাছে বা ছিট্‌কাইয়া গায়ে পড়ে।

পতি নারীর দেবতা,—তাহার ইহকাল-পরকাল ; সবই জানি। কিন্তু, এই মূর্ত্তিমান ইতরটার পাশে অভয়াকে কল্পনা করিতে আমার দেহ-মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অভয়া আর যাই হোক্, সে সুশ্রী এবং সে মার্জ্জিতরুচি ভদ্রমহিলা ; কিন্তু এই মহিষটা যে বর্ম্মার কোন্ গভীর জঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, তাহা, যে দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন।

তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে নালিশটা কি সত্য ? প্রত্যুত্তরে লোকটা মিনিট দশেক অনর্গল বকিয়া গেল। তাহার ভাবার্থ এই যে, সে একেবারে নির্দ্দোষ ; তবে সে থাকায় প্রোম অফিসের সাহেব দুই হাতে লুঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্রোশ। কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া একজন আপনার লোক ভর্ত্তি করাই তাঁহার অভিসন্ধি। একবিন্দু বিশ্বাস করিলাম না। বলিলাম, এ চাক্‌রী গেলেই বা আপনার মত কর্ম্মদক্ষ লোকের বর্ম্মা মুলুকে কাজের ভাবনা কি ? রেলওয়ের চাক্‌রী গেলে কয়দিনই বা আপনাকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল ?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া পরে কহিল, যা বল্‌ছেন তা নেহাৎ মিথ্যা বলতে পারিনে। কিন্তু কি জানেন মশাই, ফ্যামিলীম্যান, অনেক-গুলি কাচ্চাবাচ্চা—

আপনি কি বর্ম্মার মেয়ে বিয়ে করেছেন নাকি ?

লোকটা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, সাহেব ব্যাটা রিপোর্টে লিখেচে বুঝি ? এই থেকেই বুঝবেন শালার রাগ।

বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি নরম হইয়া কহিল, আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তাতেই বা দোষ কি?

লোকটা উৎসাহিত হইয়া কহিল, যা বলেচেন মশাই। আমি তো তাই সবাইকে বলি, যা কোর্‌ব তা বোল্ডলি স্বীকার কোর্‌ব। আমার অমন ভেতরে এক বাইরে আর নাই। আর পুরুষ মানুষ—বুঝলেন না? যা' বোল্‌ব, তা স্পষ্ট বোল্‌ব মশাই, আমার ঢাক্‌-ঢাক্‌ নেই। আর দেশেও ত কেউ কোথাও নেই—আর এখানেই যখন চিরকাল চাক্‌রী ক'রে খেতে হবে—বুঝলেন না মশাই? আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, সমস্ত বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার দেশে কি কেউ নেই?

লোকটা অম্লান-মুখে কহিল, আজ্ঞে না, কেউ কোথাও নেই,—কাকস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই স্থৃযি-মামার দেশে আসতে পারতাম? মশাই বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা যে-সে ঘরের ছেলে নই, আমরাও একটা জমীদার!—এখনো আমার দেশের বাড়ীটার পানে চাইলে আপনার চোখ ঠিক্‌রে যাবে। কিন্তু অল্প বয়সে সবাই ম'রে হেজে গেল, —বল্‌লাম, দূর হোক্‌ গে, বিষয়-আশয় ঘর-বাড়ী কার জন্য? সমস্ত জ্ঞাত-গুষ্ঠীদের বিলিয়ে দিয়ে বর্ম্মায় চ'লে এলাম।

একটু স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি অভয়াকে চেনেন?

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তাকে জানলেন কি ক'রে?

বলিলাম, এমন ত হ'তে পারে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে খাওয়া-পরার জন্যে এ অফিসে দরখাস্ত করেচে। লোকটা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-কণ্ঠে কহিল—ওঃ, তাই বলুন! তা' স্বীকার করচি, এক সময়ে সে আমার স্ত্রী ছিল বটে—

এখন?

কেউ নয়। তাকে ত্যাগ ক'রে এসেচি।

তার অপরাধ?

লোকটা বিমর্ষতার ভাণ করিয়া বলিল, কি জানেন, ফ্যামিলী সিক্রেট

বলা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যখন আমার আত্মীয়ের সামিল, তখন বলতে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্ত্রীলোক। তাই ত মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হলাম। নইলে সাধ ক'রে কি কেউ কখনো এমন দেশ পা' দিয়ে মাড়ায়! আপনিই বলুন না—এ কি সোজা মনের ঘেন্না!

জবাব দিব কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল! গোড়া হইতেই এই ঘোর মিথ্যাবাদীটার একটা কথাও বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু এখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, এ যেমন নীচ তেমনি নিষ্ঠুর।

অভয়ার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তবুও শপথ করিয়া বলিতে পারি—যে অপবাদ স্বামী হইয়া এই পাষণ্ড নিঃসঙ্কোচে দিল,—পর হইয়াও আমি তাহা উচ্চারণ করিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিলাম, তার এই অপরাধের কথা আপনি আসবার সময় ত ব'লে আসেন নি! এখানে এসেও কিছুদিন যখন চিঠিপত্র এবং টাকাকড়ি পাঠিয়েছিলেন, তখনও ত লিখে জানান নি?

মহাপাপিষ্ঠ স্বচ্ছন্দে তাহার বিরাট্ স্থূল ওষ্ঠাধর হাস্যে বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—এই নিন্ কথা! জানেন ত মশাই, আমরা ভদ্রলোক, শুধু চুপি-চুপি সহ্য করতেই পারি—ছোটলোকের মত নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক ত আর ঢাক-পিটে প্রচার করতে পারিনে। থাক্ গে, সে-সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন মশাই,—এ সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আনলেও পাপ হয়। তা হ'লে কেসটা ত আপনিই ডিস্পোজ করবেন? যাক্, বাঁচা গেল; কিন্তু তাও বলে রাখচি, সাহেব ব্যাটাকে অমনি-অমনি ছাড়া হবে না। বেশ এমন একটু দিয়ে দিতে হবে, বাছাধন যাতে আর কখনো আমার পেছুনে না লাগেন। আমারও মুরুব্বির জোর আছে, এটা যেন তিনি বোঝেন। বুঝলেন না? আচ্ছা, আমি বলি, হারামজাদাকে হেড-অফিসে টেনে আনা যায় না?

আমি বলিলাম, না।

লোকটা হাসির ছটায় ফাইলটা একটুখানি সুমুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, নিন্, তামাসা রাখুন। বড় সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি আমি না নিয়েই এসেছি ভাবেন? তা মরুক গে, আর একবার

আমার সঙ্গে লেগে যেন তিনি দেখেন। আচ্ছা, বড় সাহেবের অর্ডারটা আজই বার ক'রে আমার হাতে দিতে পারা যায় না? ন'টার গাড়ীতেই চ'লে যেতুম, রাত্তিরটা কষ্ট পেতে হোতো না। কি বলেন?

হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ, খোসামোদ জিনিষটা এমন যে সমস্ত দুরভিসন্ধি জানিয়া বুঝিয়াও,—ক্ষুণ্ণ করিতে ক্লেশ বোধ হয়। উল্টা কথাটা মুখের উপর শুনাইয়া দিতে বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল; কিন্তু সে বাধা মানিলাম না। নিজেকে শক্ত করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, বড় সাহেবের হুকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নেই। আপনি আর কোথাও চাক্‌রীর চেষ্টা দেখবেন।

এক মুহূর্ত্তে লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, তার মানে?

তার মানে, আপনাকে ডিস্‌মিস্ করবার নোটই আমি দেব। আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধে হবে না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল,—হাত জোড় করিয়া কহিল,—বাঙালী হয়ে বাঙালীকে মারবেন না বাবু; ছেলেপুলে নিয়ে আমি মারা যাবো।

সে দেখবার ভার আমার ওপরে নেই। তা ছাড়া, আপনাকে আমি জানিনে, আপনার সাহেবের বিরুদ্ধেও আমি যেতে পারব না।

লোকটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বুঝিল, কথাগুলা পরিহাস নয়। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরেই অকস্মাৎ হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেরাণী, দরওয়ান, পিয়ন—যে যেখানে ছিল, এই অভাবনীয় ব্যাপারে অবাক্ হইয়া গেল। আমি নিজেও কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলাম, অভয়া আপনার জন্যেই বর্ম্মায় এসেছে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলিনে; কিন্তু, আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে,—তার কাছ থেকে চিঠি আনতে পারেন—আপনার চাক্‌রী আমি বজায় রাখবার চেষ্টা দেখব। না হ'লে আর আমার সঙ্গে দেখা ক'রে লজ্জা দেবেন না—আমি মিছে কথা বলিনে!

এই নীচ-প্রকৃতির লোকগুলা যে অত্যন্ত ভীরু হয়, তাহা জানিতাম। সে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় আছে?

কাল এম্‌নি সময়ে আসবেন, তার ঠিকানা বলে দেব।

লোকটা আর কোন কথা না কহিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আমার মুখ হইতে অভয়া নিঃশব্দে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আঁচল দিয়া শুধু চোখ মুছিল, কিছুই বলিল না। আমার ক্রোধেরও সে কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে আবার আমিই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তাঁকে মাপ করতে পারবে?

অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে যাবে?

সে তেম্‌নি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল।

বর্ম্মা মেয়েদের স্বভাব যে কি, সে ত তুমি প্রথম দিনেই টের পেয়েচ, তবু সেখানে যাবার সাহস হবে?

এবার অভয়া মুখ তুলিতে, দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর ধারা বহিতেছে। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, না গেলে আর আমার উপায় কি বলুন?

কথাটা শুনিয়া খুসি হইব কি চোখের জল ফেলিব,—ভাবিয়া পাইলাম না; কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। বাসায় ফিরিবার সমস্ত পথটা এই একটা কথাই পুনঃ পুনঃ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু, কোন দিকে চাহিয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বুকের ভিতরটা—তা' সে কাহার উপর জানি না, একদিকে যেমন নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া-জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনই এক নিরাশ্রয়া রমণীর ততোধিক নিরুপায় প্রশ্নে ব্যথিত, ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। পরদিন অভয়ার ঠিকানার জন্য যখন লোকটা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পর্য্যন্ত পারিলাম না।

আমার মনের ভাব বুঝিয়া, আজ সে বেশী কথা না কহিয়া, শুধু ঠিকানা লিখিয়া লইয়াই বিনীতভাবে প্রস্থান করিল। কিন্তু, তাহার পরের দিন আবার যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহার চোখ-মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেছে। নমস্কার করিয়া অভয়ার একছত্র লেখা আমার টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া বলিল, আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, তা মুখে ব'লে কি হবে,—যতদিন বাঁচব, আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

অভয়ার লেখাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম, আপনি কাজ করুন গে, বড় সাহেব এবার মাপ করেছেন।

সে হাসিমুখে কহিল, "বড় সাহেবের ভাবনা আর আমি ভাবিনে, শুধু আপনি ক্ষমা করলেই আমি বর্ত্তে যাই—আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধ করেচি!" এই বলিয়া আবার সে বকিতে সুরু করিয়া দিল—তেমনি নির্জ্জলা মিথ্যা এবং চাটুবাক্য এবং মাঝে-মাঝে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেও লাগিল। অত কথা শুনিবার ধৈর্য্য কাহারও থাকে না—সে শাস্তি আপনাদের দিব না। আমি শুধু তাহার মোট বক্তব্যটা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি। তা এই যে, সে স্ত্রীর নামে যে অপবাদ দিয়াছিল, তাহা একেবারেই মিথ্যা। সে কেবল লজ্জার দায়েই দিয়াছিল; না হইলে, অমন সতীলক্ষ্মী কি আর আছে! এবং মনে মনে অভয়াকে সে চিরকালই প্রাণের অধিক ভালবাসে। তবে এখানে এই যে আবার একটা উপসর্গ জুটিয়াছে, তাহাতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, শুধু বর্ম্মাদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করিয়াছে (কিছু সত্য থাকিতেও পারে)। কিন্তু আজ রাত্রেই যখন সে তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে লইয়া যাইতেছে, তখন সে বেটীকে দূর করিতে কতক্ষণ। আর ছেলেপিলে? আহা! বেটাদের যেমন শ্রীছাঁদ, তেমনি স্বভাব! তারা কি কাজে লাগবে? সময়ে দুটো খেতে-পরতে দেবে, না মরলে একগণ্ডুষ জলের প্রত্যাশা আছে। গিয়াই সমস্ত একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবে,—তবে তাহার নাম, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন? সে

বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল, বিলক্ষণ! যতদিন চোখে দেখিনি, ততদিন কোনরকমে না হয় ছিলাম; কিন্তু, চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল করতে পারি? একলা এত দূরে এত কষ্ট সয়ে সে যে শুধু আমার জন্যেই এসেচে! একবার ভেবে দেখুন দেখি, ব্যাপারটা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাকে কি একসঙ্গে রাখবেন?

আজ্ঞে, না। এখন গ্রামের পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের ওখানেই রাখব। তাঁর স্ত্রীর কাছে বেশ থাকবে। কিন্তু শুধু দুদিন—আর না। তার জন্যেই একটা বাসা ঠিক ক'রে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবো!

অভয়ার স্বামী প্রস্থান করিলে, আমিও আমার দিনের কাজে মন দিবার জন্য সুমুখের ফাইলটা টানিয়া লইলাম।

নীচেই অভয়ার সেই লেখাটুক পুনরায় চোখে পড়িল। তার পরে কতবার যে সেই দুই ছত্র পড়িয়াছি এবং আরও কতবার যে পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না। পিয়ন বলিতেছিল, বাবুজী, আপনার বাসায় কি আজ কাগজ-পত্র কিছু দিয়ে আসতে হবে? চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, তখন সুমুখের ঘড়িতে সাড়ে চারিটা বাজিয়া গেছে, এবং কেরাণীর দল দিনের কর্ম্ম সমাপন করিয়া যে যাহার বাড়ী প্রস্থান করিয়াছে।

নয়

আবার অভয়ার স্বামীর পত্র পাইলাম। পূর্ব্ববৎ সমস্ত চিঠিময় কৃতজ্ঞতা ছড়াইয়া দিয়া, এবার যে সে কি সঙ্কটে পড়িয়াছে, তাহাই সসম্ভ্রমে ও সবিস্তারে নিবেদন করিয়া, আমার উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সে একটা বড় বাড়ী ভাড়া লইয়াছে; এবং তাহার একদিকে তাহার 'বর্ম্মা'-স্ত্রীপুত্রকে আনিয়া, অন্যদিকে অভয়াকে আনিবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতেছে; কিন্তু কোনমতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিতেছে না। সহধর্ম্মিণীর এবম্প্রকার অবাধ্যতায় সে অতিশয় মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছে। ইহা

যে শুধু কলিকালের ফল, এবং সত্যযুগে যে এরূপ ঘটিত না,—বড় বড় মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত যে—দৃষ্টান্ত সমেত তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া সে লিখিয়াছে, 'হায়! সে আর্য্য-ললনা কৈ? সে সীতা-সাবিত্রী কোথায়? যে আর্য্যনারী স্বামীর পদ-যুগল বক্ষে ধারণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, স্বামি-সহ অক্ষয় স্বর্গলাভ করিতেন, তাঁরা কোথায়? যে হিন্দুমহিলা হাস্যবদনে তাহার কুষ্ঠ-গলিত স্বামী-দেবতাকে স্কন্ধে করিয়া বারাঙ্গনার গৃহে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল, কোথায় সেই পতিব্রতা রমণী! কোথায় সেই স্বামিভক্তি! হায় ভারতবর্ষ! তুমি কি একেবারেই অধঃপথে গিয়াছ! আর কি আমরা সে সকল চক্ষে দেখিব না? আর কি আমরা—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় দুই-পাতা-জোড়া বিলাপ! কিন্তু অভয়া পতিদেবতাকে এই পর্য্যন্ত মনোবেদনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আরও আছে। সে লিখিয়াছে, শুধু যে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী এখনও পরের বাটীতে বাস করিতেছে, তাই নয়; সে আজ পরম বন্ধু পোষ্ট-মাষ্টারের কাছে জ্ঞাত হইয়াছে যে, কে একটা রোহিণী তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে এবং টাকা পাঠাইয়াছে। ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্য্যন্ত যে ইজ্জত নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানানো অসাধ্য।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হাসি সামলাইতে না পারিলেও রোহিণীর ব্যবহারে রাগ কম হইল না। আবার তাহাকে চিঠি লেখাই বা কেন, টাকা পাঠানোই বা কেন? যে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করিতে এত দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বুঝিয়া হোক্, না বুঝিয়া হোক্, আবার তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন কি? আর অভয়াই বা এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে কিসের জন্য? সে কি চায়, তাহার স্বামী যাহাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়াছে, ছেলেমেয়ে হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া শুধু তাহাকে লইয়াই সংসার করে? কেন, বর্ম্মাদের মেয়ে কি মেয়ে নয়? তার কি সুখ-দুঃখ মান-অপমান নাই? ন্যায়-অন্যায়ের আইন কি তাহার জন্য আলাদা করিয়া তৈরি হইয়াছে? আর তাই যদি, তবে সেখানে তাহার যাওয়াই বা কেন? সব ঝঞ্ঝাট এখান হইতে স্পষ্ট করিয়া চুকাইয়া দিলেই ত হইত!

সেই পর্য্যন্ত রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। সে যে অযথা

ক্লেশ পাইতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিয়াই, বোধ করি, সেদিকে পা বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ ছুটির পূর্ব্বেই গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময়ে অভয়ার পত্র আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া লেখা রোহিণীর কথাতেই ভরা। যেন সর্ব্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি,—সে যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল, কত অপটু, কত অসহায়—এই একটা কথাই ছত্রে-ছত্রে অক্ষরে-অক্ষরে এমনি মর্ম্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে যে, অতি বড় সরল-চিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য্য বুঝিতে ভুল করিবে মনে হইল না। নিজের সুখ-দুঃখের কথা প্রায় কিছুই নাই। তবে, নানা কারণে এখনও সে যে সেই-খানেই আছে, যেখানে আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিল, তাহা পত্রের শেষে জানাইয়াছে।

পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কি না, এ বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই, তাহার আবশ্যকতা দেখি না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ সতীধর্ম্মের একটা অপূর্ব্বতা, দুঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্রভেদী বিরাট মহিমা—যাহা আমার অন্নদা-দিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে এবং চোখে না দেখিলে যাহার সৌন্দর্য্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ করিয়াছে,—আমার সেই যে অব্যক্ত উপলব্ধি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

জানি, সবাই অন্নদা-দিদি নয়, সেই কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ধৈর্য্য বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত অত বড় বুকও সকল নারীর থাকে না; এবং যাহা নাই, তাহার জন্য অহরহ শোক প্রকাশ করা গ্রন্থকারমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য কি না, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি নাই; কিন্তু তবুও সমস্ত চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। রাগ করিয়াই গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম এবং সেই অপদার্থ, পরস্ত্রীতে আসক্ত রোহিণীকে বেশ করিয়া যে দু'কথা শুনাইয়া আসিব, তাহাই মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার বাসার অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া, কপাট ঠেলিয়া যখন তাহার বাটিতে প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বালানো হইয়াছে,

কি হয় নাই ; অর্থাৎ দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিতেছে মাত্র।

সেটা মাহ ভাদরও নয়, ভরা বাদরও নয়,—কিন্তু শূন্য-মন্দিরের চেহারা যদি কিছু থাকে তো, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এ ছাড়া আর কি, সে তো আজও জানি না। সব কয়টা ঘরেই দরজা হাঁ-হাঁ করিতেছে, শুধু রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়া ধুঁয়া বাহির হইতেছে। ডানদিকে একটু আগাইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম উনুন জ্বলিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী বঁটি পাতিয়া একটি বেগুন দুখানা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কানে যায় নাই ; কারণ, কর্ণেন্দ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি তখন আর যেখানেই থাকুন, বেগুনের উপরে যে একাগ্র হইয়া ছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। আরও একটা কথা এমনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কিন্তু, নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে-একে সেই ঘর দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্ত পাপ-পুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া বারান্দার মোড়াটার উপর বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বোধ করি, আলো জ্বালিবার জন্যই রোহিণী বাহির হইয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল,—কে ও ?

সাড়া দিয়া বলিলাম, আমি শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্তবাবু ? ওঃ—বলিয়া সে দ্রুতপদে কাছে আসিল এবং ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া আমাকে ভিতরে আনিয়া বসাইল। তাহার পরে কাহারো মুখে কথা নাই—দু'জনেই চুপ-চাপ। আমিই প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম, রোহিণী-দা, আর কেন এখানে ? চলুন আমার সঙ্গে।

রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

বলিলাম, এখানে আপনার কষ্ট হচ্চে, তাই।

রোহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিল, কষ্ট আর কি!

তা বটে! কিন্তু এ সকল বিষয়ে ত আলোচনা করা যায় না। কতই না তিরস্কার করিব, কতই না সৎপরামর্শ দিব, ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম;—সব ভাসিয়া গেল। এত বড় ভালবাসাকে অপমান করিতে পারি,—নীতি-শাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশী পড়ি নাই। কোথায় গেল আমার ক্রোধ, কোথায় গেল আমার বিদ্বেষ! সমস্ত সাধুসঙ্কল্প যে কোথায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার উদ্দেশও পাইলাম না!

রোহিণী কহিল যে সে প্রাইভেট টিউশানিটা ছাড়িয়া দিয়াছে; কারণ, তাহাতে শরীর খারাপ করে। তাহার অফিসটাও ভাল নয়,—বড় খাটুনি। না হইলে আর কষ্ট কি!

চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ, এই রোহিণীর মুখেই কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক উল্টা কথা শুনিয়াছিলাম। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—আর এই রাঁধা-বাড়া, অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে এসে ভারী বিরক্তিকর। কি বলেন শ্রীকান্তবাবু?

বলিব আর কি! আগুন নিবিয়া গেলে শুধু জলে যে ইঞ্জিন চলে না, এ তো জানা কথা।

তথাপি সে এই বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হইল না। কল্পনার ত কেহ সীমানির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না, সুতরাং সে কথা ধরি না। কিন্তু অসম্ভব আশা যে কোন ভাবেই তাহার মনের মধ্যে আশ্রয় পায় নাই, তাহা তাহার কয়টা কথা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তবুও যে কেন সে এই দুঃখের আগার পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্য্যামীর অগোচর ছিল না যে, যে হতভাগ্যের গৃহের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাকে এই শূন্য ঘরের পুঞ্জীভূত বেদনা যদি খাড়া রাখিতে না পারে ত ধূলিসাৎ হইতে নিবারণ করিবার সাধ্য সংসারে আর কাহারও নাই।

বাসায় পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এক কোণে বিছানা পাতিয়া কে একজন আগা-গোড়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করায় কহিল, ভদ্দর লোক।

তাই আমার ঘরে!

আহারাদির পরে এই ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রাম জেলায়। বছর-চারেক পরে নিরুদ্দিষ্ট ছোট ভাইয়ের সন্ধান মিলিয়াছে, তাহাকেই ঘরে ফিরাইবার জন্য নিজে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মশাই গল্পে শুনি, আগে কামরূপের মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের 'ভেড়া' করিয়া ধরিয়া রাখিত। কি জানি, সে-কালে তাহারা কি করিত; কিন্তু এ-কালে বর্ম্মা-মেয়েদের ক্ষমতা যে তার চেয়ে এক তিল কম নয়, সে আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাইয়াছি।

আরও অনেক কথা কহিয়া, তিনি ছোট ভাইকে উদ্ধার করিতে আমার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে আমি কোমর বাঁধিয়া লাগিব, কথা দিলাম। কেন তাহা বলাই বাহুল্য, পরদিন সকালে সন্ধান করিয়া ছোট ভাইয়ের বর্ম্মা-শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, বড় ভাই আড়ালে রাস্তার উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ছোট ভাই উপস্থিত ছিলেন না, সাইকেল করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাড়ীতে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী নাই, শুধু স্ত্রী তাহার একটি ছোট বোন লইয়া এবং জন দুই দাসী লইয়া বাস করে। ইহাদের জীবিকা বর্ম্মা-চুরুট তৈরি করা। তখন সকালে সবাই এই কাজেই ব্যাপৃত ছিল। আমাকে বাঙালী দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ তাহার স্বামীর বন্ধু ভাবিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। ব্রহ্ম-রমণীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী; কিন্তু পুরুষেরা তেমনি অলস। ঘরের কাজ-কর্ম্ম হইতে স্থুরু করিয়া বাহিরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সমস্তই মেয়েদের হাতে। তাই লেখাপড়া তাহাদের না শিখিলেই নয়। কিন্তু পুরুষদের আলাদা কথা। শিখিলে ভাল, না শিখিলেও লজ্জায় সারা হইতে হয় না। নিষ্কর্ম্মা পুরুষ স্ত্রীর উপার্জ্জনের অন্ন বাড়ীতে ধ্বংস করিয়া বাহিরে তাহারই পয়সায় বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইলে, লোকে আশ্চর্য্য হয় না। স্ত্রীরাও ছি ছি করিয়া ঘ্যান-ঘ্যান প্যান-প্যান করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা আবশ্যক মনে করে না। বরঞ্চ ইহাই কতকটা যেন তাহাদের সমাজে স্বাভাবিক আচার বলিয়া স্থির হইয়া গেছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই 'বাবুসাহেব' দ্বিচক্রযানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ইংরাজী পোষাক, হাতে দু'তিনটা আংটি, ঘড়ি, চেন; কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে হয় না,—অথচ অবস্থাও দেখিলাম বেশ স্বচ্ছন্দ! তাঁহার বর্ম্মা-গৃহিণী হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি এবং ছড়িটা হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল। ছোট বোন চুরুট, দেশলাই প্রভৃতি আনিয়া দিল, দাসী চায়ের সরঞ্জাম এবং অপরে পানের বাটা আনাইয়া দিল। বাঃ—লোকটাকে যে সবাই মিলিয়া একেবারে রাজার হালে রাখিয়াছে! লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয়, চারু-টারু এমনি কি একটা যেন হইবে। যাক্ গে, আমরা না হয় তাঁকে শুধু 'বাবু' বলিয়াই ডাকিব।

বাবু প্রশ্ন করলেন—আমি কে?

বলিলাম, আমি তাঁর দাদার বন্ধু।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, আপনি ত 'কলকেতিয়া', কিন্তু আমার দাদা ত কখনো সেখানে যাননি। বন্ধুত্ব হ'ল ক্যামনে?

কেমন করিয়া বন্ধুত্ব হইল, কোথায় হইল, কোথায় আছেন, ইত্যাদি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্যটাও জানাইলাম এবং তিনি যে ভ্রাতৃরত্নের দর্শনাভিলাষে উদ্গ্রীব হইয়া আছেন, তাহাও নিবেদন করিলাম।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটেলে বাবুটির পদধূলি পড়িল এবং উভয় ভ্রাতায় বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই দুই ভাইয়ের কি যে মিল হইয়া গেল,—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, বাবুটি 'দাদা' বলিয়া ডাক দিয়া যখন-তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ফিস্-ফিস্ মন্ত্রণা, আলাপ-আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়ার আর অবধি রহিল না। একদিন অপরাহ্নে দাদাকে ও আমাকে চা-বিস্কুট ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিয়া গেলেন।

সেইদিন তাঁহার বর্ম্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী এবং ভদ্র। ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই অবধি বোধ করি এক দিনের জন্যেও তাহাকে

দুঃখ দেয় নাই। দিন চারেক পরে দাদাটি একগাল হাসিয়া কানে-কানে জানাইলেন যে, পরশু সকালের জাহাজে তাঁহারা বাড়ী যাইতেছেন। শুনিয়া কেমন একটা ভয় হইল; জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাই আবার ফিরে আসবেন ত?

দাদা বললেন, আবার! রাম রাম ব'লে একবার জাহাজে চড়তে পারলে হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটিকে জানিয়েছেন?

দাদা কহিলেন, বাপ রে! তাহ'লে আর রক্ষা থাকবে! বেটীর যে যেখানে আছে, রক্তবীজের মত এসে ছেঁকে ধরবে। বলিয়া চোখ দুটো মিটমিট করিয়া সাহাস্যে কহিলেন, ফ্রেঞ্চ লিভ মশাই, ফ্রেঞ্চ লিভ,—এ আর বুঝলেন না?

অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল; কহিলাম, মেয়েটি তা হ'লে ভারি কষ্ট পাবে।

আমার কথা শুনিয়া দাদা ত একেবারে হাসিয়াই আকুল। কোনমতে হাসি থামিলে বলিতে লাগিলেন, শোন কথা একবার! বর্ম্মা বেটীদের আবার কষ্ট! এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না,—না আছে এঁটো-কাঁটার বিচার, না আছে একটা জাত-জন্ম। বেটীরা সব নেপ্পি (একপ্রকার পচা মাছ যাহাকে 'ঙাপি' বলে) খায়, মশাই, নেপ্পি খায়! গন্ধের চোটে ভূত-পেত্নী পালায়! এ ব্যাটা-বেটীদের আবার কষ্ট! একটা যাবে, আর একটা পাকড়াবে—ছোট জাত ব্যাটারা—

থামুন মশাই, থামুন। আপনার ভাইটিকে যে এই চার বছর ধ'রে রাজার হালে খাওয়াচ্চে পরাচ্চে, আর কিছু না হোক, তারও ত একটা কৃতজ্ঞতা আছে।

দাদার মুখ গম্ভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি যে অবাক করলেন মশাই। পুরুষ-বাচ্চা, বিদেশে-বিভুঁয়ে এসে বয়সের দোষে না হয় একটা সখ করেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করে বলুন? আমার ত আর জানতে বাকী নেই, এর না হয় একটু জানাজানি হয়েই পড়েছে—তাই ব'লে বুঝি চিরকালটা এম্‌নি করেই

বেড়াতে হবে? ভাল হয়ে সংসারধর্ম্ম ক'রে পাঁচ জনের একজন হ'তে হবে না? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোকে হোটেলে ঢুকে যে মুর্গী পর্য্যন্ত খেয়ে আসে। কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না করলে চলে? আপনিই বিচার করুন না, কথাটা সত্যি বলচি না মিথ্যে বলচি।

বস্তুতঃই এ বিচার করিবার মত বুদ্ধি আমাকে ভগবান্ দেন নাই, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। অফিসের বেলা হইতেছিল, স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু, অফিস হইতে ফিরিলে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ভেবে দেখলাম, আপনার পরামর্শই ভাল মশাই। এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি, শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে না কি—ব'লে যাওয়াই ভাল। এ বেটীরা আর পারে না কি! না আছে লজ্জা-সরম, না আছে একটা ধর্ম্মজ্ঞান। জানোয়ার বললেই ত চলে!"

বলিলাম, হাঁ, সেই ভাল।

কিন্তু কথাটি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আছে। ষড়যন্ত্র সত্যই ছিল। কিন্তু সে যে এত নীচ, এত নিষ্ঠুর, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে বলিয়াও ভাবিতে পারি না।

চট্টগ্রামের জাহাজ রবিবারে ছাড়ে। অফিস বন্ধ, সকালবেলাটায় করিই বা কি; তাই তাঁকে see off করিতে জাহাজ ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম; জাহাজ তখন জেঠিতে ভিড়িয়াছে। যাহারা যাইবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুই শ্রেণীর লোকেরাই ছুটাছুটি, হাঁকাহাঁকিতে কে বা কাহার কথা শুনে—এমনি ব্যাপার। এদিকে-ওদিকে চাহিতেই সেই বর্ম্মা-মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। একধারে সে ছোট বোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা রাত্রির কান্নায় তাহার চোখ দুটি ঠিক জবাফুলের মত রাঙা। ছোটবাবু মহাব্যস্ত। তাঁহার দু'চাকার গাড়ী লইয়া, তোরঙ্গ-বিছানা লইয়া আরও কত কি যে লটবহর লইয়া কুলিদের সহিত দৌড়-ধাপ করিয়া ফিরিতেছেন,—তাঁহার মুহূর্ত্ত অবসর নাই।

ক্রমে সমস্ত জিনিষ-পত্র জাহাজে উঠিল, যাত্রীরা সবাই ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে উঠিল, অ-যাত্রীরা নামিয়া আসিল, সুমুখের দিকে নোঙর-তোলা চলিতে লাগিল,—এইবার ছোটবাবু তাঁহার দ্রব্যসম্ভারের হেফাজত করিয়া জায়গা ঠিক করিয়া তাঁহার বর্ম্মা-স্ত্রীর কাছে বিদায়ের ছলে সংসারের নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কের অভিনয় করিতে জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী,—সে অধিকার তাঁহার ছিল।

আমি অনেক সময়ে ভাবি, ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে! সে মন্ত্র-পড়া স্ত্রী নাই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী! সে ত কন্যা-ভগিনী জননীর জাতি! তাহারই আশ্রয়ে সে ত এই সুদীর্ঘকাল স্বামীর সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে! তাহার বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য সমস্ত অমৃত সে ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল! তবে কিসের লোভে সে এই অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকেই এত বড় নির্দ্দয় বিদ্রূপ ও হাসির পাত্রী করিয়া ফেলিয়া গেল! লোকটা এক হাতে রুমাল দিয়া নিজের দুচক্ষু আবৃত করিয়া এবং অপর হাতে তাহার বর্ম্মা-স্ত্রীর গলা ধরিয়া কান্নার সুরে কি সব বলিতেছে এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে।

আশপাশে অনেকগুলি বাঙালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে; কেহ বা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমটা কথাগুলা বুঝিতে, পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিতেই সকল কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। লোকটা রোদনের কণ্ঠে বর্ম্মা-ভাষায় এবং বাঙলা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙলাটা কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শোনায়—"একমাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আসিব, সে আমিই জানি। ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী-প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী-প্রদর্শন করিয়া চলিলাম।"

এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপরিচিত বাঙালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই; কিন্তু মেয়েটি ত বাঙলা বুঝে না, শুধু কান্নার

সুরেই তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটা টানিয়া টানিয়া, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল—"মোটে পাঁচশো' টাকা তামাক কিনতে দিলি,—আর যে তোর কিছু নেই—পেট ভরল না—অমনি তোর বাড়ীটাও বিক্রী করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পারতাম, তবে ত বুঝতাম, একটা দাঁও মারা গেল! এ যে কিছুই হ'ল না রে! কিছুই হ'ল না।"

আশেপাশের লোকগুলা অবরুদ্ধ হাস্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু যাহাকে লইয়া এত আমোদ, তাহার চক্ষু-কর্ণ তখন দুঃখের বাষ্পে একেবারে সমাচ্ছন্ন! মনে হইতে লাগিল, বুঝি বেদনার ভরে ভাঙ্গিয়া পড়ে বা!

খালাসীরা উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, "বাবু, সিঁড়ি তোলা হচ্ছে।"

লোকটা গলা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির হাতে সাবেক কালের একটি ভাল চুনির আংটি ছিল, সেইটির উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ওরে, দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই। যেমন করে হোক্, দু'শ আড়াইশ টাকা দাম হবে—এটাই বা ছাড়ি কেন!"

মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া প্রিয়তমের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল। 'যা লাভ!' বলিয়া লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া উঠিল। জাহাজ জেঠি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল এবং মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাঁটু গাড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অনেকেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেহ বা কহিল, আচ্ছা ছেলে! কেহ বা বলিল, বাহাদুর ছোকরা! অনেকেই বলিতে গেল, কি মজাটাই করলে! হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধ'রে গেল! এমনি কত কি মন্তব্য। শুধু আমি কেবল সেই সকলের হাসি-তামাসার পাত্রী বোকা মেয়েটার অপরিসীম দুঃখের নিঃশব্দ সাক্ষীর মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছোট বোনটি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশে দাঁড়াইয়া দিদির হাত ধরিয়া

টানিতেছিল। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, সে আস্তে আস্তে কহিল, "বাবুজী এসেছেন, দিদি, ওঠো।"

মুখ তুলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্না তাহার বাঁধ ভাঙিয়া পড়িল। আমার সান্ত্বনা দিবার কি-ই বা ছিল! তবুও সেদিন তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাহারই পিছনে পিছনে তাহারই গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। সমস্ত পথটা সে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু এই কথাই বলিতে লাগিল, "বাবুজী, বাড়ী আমার আজ খালি হইয়া গেছে! কি করিয়া সেখানে আমি গিয়া ঢুকিব, এক মাসের জন্য তামাক কিনতে গেছেন—এই একটা মাস আমি কি করিয়া কাটাইব! বিদেশে না জানি কত কষ্টই হবে, কেন আমি যাইতে দিলাম! রেঙ্গুনের বাজারে তামাক কিনিয়া ত এতদিন আমাদের চলিতেছিল;—কেন তবে বেশী লাভের আশায় এত দূরে তাঁকে পাঠাইলাম! দুঃখে আমার বুক ফাটিতেছে। বাবুজী, আমি পরের মেলেই তাঁর কাছে চলিয়া যাইব।" এমনি কত কি!

আমি একটি কথারও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চোখের জল গোপন করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি কহিতে লাগিল, "বাবুজী, তোমাদের জাতের লোক যত ভালবাসিতে পারে, এমন আমাদের জাতের লোক নয়। তোমাদের মত দয়ামায়া আর কোন দেশের লোকের নাই।"

একটু থামিয়া আবার বার-দুই-তিন চোখ মুছিয়া কহিতে লাগিল, "বাবুকে ভালবাসিয়া যখন দু'জনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম, কত লোক আমাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু আমি কারও কথা শুনি নাই। এখনও কত মেয়ে আমাকে হিংসা করে।"

চৌমাথার কাছে আসিয়া আমি বাসায় যাইতে চাহিলে, সে ব্যাকুল হইয়া দুই হাত দিয়া গাড়ীর দরজা আটকাইয়া বলিল, "না বাবুজী, তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়া এক পিয়ালা চা' খাইয়া আসিবে চল।"

আপত্তি করিতে পারিলাম না। গাড়ী চলিতে লাগিল। সে হঠাৎ

প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা বাবুজী, রংপুর কতদূর? তুমি কখনো গিয়াছ? সে কেমন জায়গা? অসুখ করিলে ডাক্তার মিলে ত?"

বাহিরের দিকে চাহিয়া জবাব দিলাম, হাঁ মিলে বই কি।

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ফয়া ভাল রাখুন। তাঁর দাদাও সঙ্গে আছেন, তিনি খুব ভাল লোক, ছোট ভাইকে প্রাণ দিয়া দেখিবেন। তোমাদের যে মায়ার শরীর! আমার কোন ভাবনা নাই, না বাবুজী?"

চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ মহাপাতকের কতখানি অংশ আমার নিজের? আলস্য বশতঃই হোক, বা চক্ষুলজ্জাতেই হোক বা হতবুদ্ধি হইয়াই হোক, এই যে মুখ বুজিয়া এতবড় অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলাম, কথাটি কহিলাম না, ইহার অপরাধ হইতে কি আমি অব্যাহতি পাইব? আর তাই যদি হইবে ত, মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারি না কেন? তাহার চোখের প্রতি চাহিতে সাহস হয় না কিসের জন্য?

চা-বিস্কুট খাইয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের লক্ষ কোটি তুচ্ছ ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস শুনিয়া যখন বাটীর বাহির হইলাম, তখন বেলা আর বেশী নাই। ঘরে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। দিনের শেষে কর্ম্ম-অন্তে সবাই বাসায় ফিরিয়াছে—দা'ঠাকুরের হোটেল তখন নানাবিধ কলহাস্যে মুখরিত। এই সমস্ত গোলমাল যেন বিষের মত মনে হইতে লাগিল।

একাকী পথে-পথে ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সমস্যার মীমাংসা হইত কি করিয়া? বর্ম্মাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কিছু একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। বিবাহের ভদ্র অনুষ্ঠানও আছে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মত যে-কোন নর-নারী তিনদিন একত্রে বাস করিয়া তিনদিন এক পাত্র হইতে ভোজন করিলেও সে বিবাহ। সমাজ তাহাদের অস্বীকার করে না। সে হিসাবে মেয়েটিকে কোনমতেই ছোট করিয়া দেখা যায় না। আবার 'বাবুটির' দিক দিয়া হিন্দু-আইন-কানুনে এটা কিছুই নয়। এই স্ত্রী লইয়া সে দেশে গিয়া বাস করিতেও পারে না। হিন্দু-সমাজ তাহাদের গ্রহণ না হয় নাই করিল, কিন্তু আপামর-সাধারণ যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, সেও সারাজীবন সহ্য করা কঠিন। হয় চিরকাল প্রবাসে নির্ব্বাসিতের

ন্যায় বাস করা, না হয়, এই দাদাটি ছোট ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করিল, তাহাই ঠিক। অথচ 'ধর্ম্ম' কথাটার যদি কোন অর্থ থাকে ত,—সে হিন্দুরই হৌক, বা আর কোন জাতিরই হৌক, এতবড় একটা নৃশংস ব্যাপার যে কি করিয়া ঠিক হইতে পারে, সে ত আমার বুদ্ধির অতীত। এই সকল কথা না হয় সময়মত চিন্তা করিয়া দেখিব, কিন্তু এই যে কাপুরুষটা আজ বিনাদোষে এই অনন্যনির্ভর নারীর পরম স্নেহের উপর বেদনার বোঝা চাপাইয়া, তাহাকে মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া পলায়ন করিল, এই আক্রোশটাই আমাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল।

পথের একধার দিয়া চলিয়াছি ত চলিয়াছি। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন অভয়ার পত্র পড়িবার জন্য যে চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দোকানদারটি বোধ করি, আমাকে চিনিতে পারিয়া ডাক দিয়া কহিল, বাবুসাব, আইয়ে।

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, এ সেই দোকান এবং ওই রোহিণীর বাসা। বিনা বাক্যে তাহার আহ্বানের মর্য্যাদা রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া এক পিয়ালা চা পান করিয়া বাহির হইলাম। রোহিণীর দরজায় ঘা দিয়া দেখিলাম, ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া বার দুই নাড়া দিতেই কবাট খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে অভয়া।

তুমি যে?

অভয়ার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; এবং কোন জবাব না দিয়াই সে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু লজ্জার যে মূর্ত্তি সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই রহিল না। অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইতেছিলাম,—অকস্মাৎ আমার দুই কানের মধ্যে যেন দু'রকম কান্নার সুর একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। একটা সেই পাপিষ্ঠের, অপরটা সেই বর্ম্মা মেয়েটির। চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মনে মনে বলিলাম, না, এমন করিয়া আমার যাওয়া হইবে না। নাই নাই,—এমন বলিতে নাই, এমন

করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়,—এসব অভ্যাসমত অনেক শুনিয়াছি, অনেক শুনাইয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—এ সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া, তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই!

দশ

হঠাৎ অভয়া দ্বার খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ-সংস্কারের ধাক্কাটা প্রথমে সামলাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলুম, শ্রীকান্তবাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা ব'লে ভাববেন না যেন।

তাহার সাহস দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম! অভয়া কহিল, আপনার বাসায় ফিরে যেতে আজ একটু দেরী হবে। রোহিণীবাবু এলেন ব'লে। আজ দু'জনেই আমরা আপনার আসামী। বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, আমরা তার দণ্ড নেব।

রোহিণীকে 'বাবু' বলিতে এই প্রথম শুনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ফিরে এলেন কবে?

অভয়া কহিল, পরশু। কি হয়েছিল, জানতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হচ্চে। বলিয়া সে নিজের দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, এমন আরও অনেক আছে, যা' আপনাকে দেখাতে পারলুম না!

যে সকল দৃশ্যে মানুষের পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে, ইহা তাহারই একটা। অভয়া আমার স্তব্ধ কঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমিষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল এবং এইবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, কিন্তু ফিরে আসার এই আমার একমাত্র কারণ নয়, শ্রীকান্তবাবু,

আমার সতীধর্ম্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার। তিনি যে স্বামী, আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, এ তারই একটু চিহ্ন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিতে লাগিল, আমি যে স্ত্রী হয়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতদূর এসে তাঁর শান্তি-ভঙ্গ করেচি—মেয়েমানুষের এতবড় স্পর্দ্ধা পুরুষমানুষে সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি। তিনি অনেক রকমে ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন, কেন রোহিণীর সঙ্গে এসেছি। বললুম, স্বামীর ভিটে যে কি, সে আমি আজও জানিনে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন—দেশে খেতে পরতে দেয়, এমন কেউ নেই; তোমাকে বারবার চিঠি লিখে জবাব পাইনি। তিনি একগাছা বেত তুলে নিয়ে বললেন, 'আজ তার জবাব দিচ্চি'।—এই বলিয়া অভয়া তাহার প্রহৃত দক্ষিণ-বাহুটা আর একবার স্পর্শ করিল।

সেই নিরতিশয় হীন অমানুষ বর্ব্বরটার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু, যে অন্ধ-সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবামাত্রই ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল! আমিও ত তাহার অতীত নই! সুতরাং 'বেশ করিয়াছ' এ কথাও বলিতে পারিলাম না, 'অপরাধ করিয়াছ' এমন কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সঙ্কটের কালে যখন নিজের বিবেক ও সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলাম, চ'লে আসাটা যে অন্যায়, এ কথা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু—

অভয়া কহিল, এই 'কিন্তু'টার বিচারই ত আপনার কাছে চাইছি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তাঁর বর্ম্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে কিন্তু স্বামী যখন শুদ্ধমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে, তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বা'র ক'রে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইছি।

আমি কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম ; সে আমার মুখের প্রতি স্থির-দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় কহিল, অধিকার ছাড়া ত কর্তব্য থাকে না শ্রীকান্তবাবু, এটা ত খুব মোটা কথা। তিনিও ত আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন! কিন্তু, সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে ত এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বা'র হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ ব'লে আমারি উপরে? শ্রীকান্তবাবু, আপনি একটা 'কিন্তু' পর্য্যন্ত বলেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ, সেখান থেকে চ'লে আসাটা আমার অন্যায় হয়নি, কিন্তু—এই 'কিন্তু'টার অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেচে, তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই তার নারীজন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল,—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এতবড় অন্যায়, এতবড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই;—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী কদাচারী স্বামী, বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যেই কি ভগবান্ মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাতে, সব ধর্ম্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে,—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু?

আমাকে মৌন দেখিয়া অভয়া বলিল, জবাব দিন না শ্রীকান্তবাবু?

বলিলাম, আমার জবাবে কি যায় আসে? আমায় মতামতের জন্য ত আপনি অপেক্ষা করেন নি?

অভয়া কহিল, কিন্তু তার ত সময় ছিল না!

কহিলাম, তা' হবে। কিন্তু আপনি যখন আমাকে দেখে পালিয়ে

গেলেন, তখন আমিও চ'লে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার ফিরে এলুম কেন জানেন?

—না।

ফিরে আসবার কারণ, আজ আমার ভারি মন খারাপ হয়ে আছে। আপনাদের চেয়ে ঢের বেশী নিষ্ঠুর আচরণ একটি মেয়ের উপর হ'তে আজই সকালে দেখেচি। এই বলিয়া জাহাজ-ঘাটের সেই বর্ম্মা-মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটির কি উপায় হবে, আপনি ব'লে দিতে পারেন?

অভয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বলতে পারিনে।

কহিলাম, আপনাকে আরও ছুটি মেয়ের ইতিহাস আজ শোনাব। একটি আমার অন্নদা-দিদি, অপরটির নাম পিয়ারী বাইজী। দুঃখের ইতিহাসে এদের কারুর স্থান আপনার নীচে নয়।

অভয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অন্নদা-দিদির সমস্ত কথা আগাগোড়া বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, অভয়া কাঠের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া বসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, তারপরে?

বলিলাম, তার পরে আর জানিনে! এইবার পিয়ারী বাইজীর কথা শুনুন। তার নাম যখন রাজলক্ষ্মী ছিল, তখন থেকে একজনকে সে ভালবাসত। কি রকম ভালবাসা জানেন? রোহিণীবাবু আপনাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি। এ আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি বলেই তুলনা দিতে পারলুম। তারপরে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন দু'জনে দেখা হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়, পিয়ারী বাইজী। কিন্তু, রাজলক্ষ্মী যে মরেনি, পিয়ারীর মধ্যে চিরদিনের জন্যে অমর হয়েছিল, সেইদিন তার প্রমাণ হয়ে যায়।

অভয়া উৎসুক হইয়া বলিল, তারপরে?

পরের ঘটনা একটি একটি করিয়া সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম,

তারপরে এমন একদিন এসে পড়ল, যেদিন পিয়ারী তার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে দিলে।

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, তারপরে কি হ'ল জানেন?

জানি। তারপরে আর নেই।

অভয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি কি এই বলতে চান যে, আমি একা নই—এমনি দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে আসচে এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব?

আমি কহিলাম, আমি কিছুই বলতে চাইনে। শুধু এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচার-ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন করাও যায় না, গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।

কেন হয় না, বলতে পারেন?

না, তাও পারিনে। তা ছাড়া আজ আমার মন এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে যে, এই সব জটিল সমস্যার মীমাংসা করবার সাধ্যই নেই। আপনার প্রশ্ন আমি আর একদিন ভেবে দেখব। তবে আজ শুধু আপনাকে এই কথাটি ব'লে যেতে পারি যে, আমার জীবনে আমি যে ক'টি বড় নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েছি, সবাই তাঁরা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হয়ে আছেন। আমার অন্নদা-দিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ ক'রেই বলতে পারি। সে ভার অসহ্য হলেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভাবলেও হয়ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আর সেই রাজলক্ষ্মী! তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়, সে তো আমি চোখে দেখেই এসেছি। এই দুঃখের জোরেই আজ সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে।

অভয়া চমকাইয়া কহিল, তবে আপনিই কি তাঁর—

বলিলাম, তা না হ'লে সে এত স্বচ্ছন্দে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না, হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখতেই চাইত।

অভয়া বলিল, তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে, আপনাকে তাঁর হারাবার ভয় নেই।

আমি বলিলাম, শুধু তাই নয়,—রাজলক্ষ্মী জানে, আমাকে তার হারাবার যো নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাইরে একটা সম্বন্ধ আছে, আমার বিশ্বাস, সে তাই পেয়েছে ব'লে আমাকেও এখন আর তার দরকার নেই। দেখুন, আমি নিজেও বড় এ জীবনে কম দুঃখ পাইনি। তার থেকে এই বুঝেছি, দুঃখ জিনিষটা অভাবও নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।

অভয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি আপনার কথা বুঝেছি শ্রীকান্তবাবু! অন্নদা-দিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন; কিন্তু, আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেয়েছি আমি অপমান,—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেছি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাকতে আপনি বলেন?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া অভয়া পুনরায় বলিল, এঁদের সঙ্গে আমার জীবনের কোথাও মিল নেই শ্রীকান্তবাবু। সংসারে সব নর-নারীই এক ছাঁচে তৈরী নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমার জীবনটাই একবার ভাল ক'রে আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি। আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হ'ল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আর আমার নিজের নয়। তবু তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত প'ড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠে সার্থক হোতো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারাজীবন ব'য়ে বেড়ানোই কি আমার নারীজন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই? এমন লোকের

সমস্ত জীবনটা পঙ্গু ক'রে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।

হাত তুলিয়া অভয়া চোখের কোণ দুটা মুছিয়া ফেলিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকেই জোর ক'রে সারাজীবন সত্য ব'লে খাড়া রাখবার জন্যে এই এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব ? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন, তিনি কি তাতেই খুসি হবেন ? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুসি ব'লে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ব'লে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয় ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু, তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। তা' হ'লে তারা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল, মুহূর্ত্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এম্‌নিই বটে। সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয়, যেন ইহারা সজীব ; যেন ইহাদের রক্ত-মাংস আছে ; যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে ;—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর ! মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।

অভয়া সহসা একটা সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিল ; কহিল, আপনি নিজে কি আমাদের অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন শ্রীকান্তবাবু ? আর আমাদের বাড়ীতে আসবেন না ?

উত্তর দিতে আমাকে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইল। তারপরে বলিলাম, অন্তর্য্যামীর কাছে আপনারা হয় ত নিষ্পাপ,—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন ; কিন্তু, মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখতে পায় না,—তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব ক'রে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজকর্ম্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙ্গে যায়।

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, যে ধর্ম্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন ?

ইহার কি জবাব, ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষে নিতে হবে পরের কাছে ? তাতে কি গৌরব বাড়ে শ্রীকান্তবাবু ?

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর কহিল, যাক্, আপনারা জায়গা নাই দিন, আমার সান্ত্বনা এই যে, জগতে আজও একটা বড় জাত আছে, যারা প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারে।

তাহার কথায় একটু আহত হইয়া কহিলাম, সকল ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়াই কি ভাল কাজ ব'লে মেনে নিতে হবে ?

অভয়া বলিল, তার প্রমাণ ত হাতে-হাতে রয়েছে শ্রীকান্তবাবু। পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই বেশীদিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। এই যদি সত্য হয়, তা হ'লে কি তারা অন্যায়টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন-দিন বড় হয়ে উঠছে, আর আপনারা ন্যায়ধর্ম্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বলতে হবে ? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেছি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখেছি, মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে যাচ্ছে। শুনেছি, এমন গ্রাম নাকি নেই, যেখানে এক ঘর মুসলমানও বাস করেনি, যেখানে একটা মসজিদও তৈরী হয়নি। আমরা হয় ত চোখে দেখে যেতে পাবো

না, কিন্তু এমন দিন শীঘ্র আসবে, যেদিন আমাদের দেশের মত এই বর্ম্মা দেশটাও একটা মুসলমান-প্রধান স্থান হয়ে উঠবে। আজ সকালেই জাহাজ ঘাটে যে অন্যায় দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন ত, কোন মুসলমান বড় ভাইয়েরই কি ধর্ম্ম এবং সমাজের ভয়ে এই ষড়যন্ত্র, এই হীনতার আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছারখার ক'রে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হ'তো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে অগ্রজের সম্মান ও মর্য্যাদা নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতো! কোন্‌টাতে সত্যকার ধর্ম্ম বজায় থাকতো শ্রীকান্তবাবু?

গভীর শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আপনি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আপনি এত কথা জানলেন কি ক'রে? আমার ত মনে হয় না, এত বড় প্রশস্ত হৃদয় আমাদের পুরুষমানুষের মধ্যেও বেশী আছে। আপনি যার মা হবেন, তাকে দুর্ভাগা ব'লে ভাবতে অন্ততঃ আমি কোনমতেই পারব না।

অভয়া ম্লানমুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, তা হলে শ্রীকান্তবাবু, আমাকে সমাজ থেকে বা'র ক'রে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশী পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন দিক্ দিয়েই সমাজে ক্ষতি পৌঁছুবে না?

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাবো না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়েই আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব। আমার একটি সন্তানকেও যদি কোনদিন মানুষের মত মানুষ ক'রে তুলতে পারি, সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্থক হবে, এই আশা নিয়েই আমি বেঁচে থাকব। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসেবটাই জগতে বড়, এ আমাকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

এগার

মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিয়া এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। দা'ঠাকুরের হোটেলে একটা হরিসংকীর্ত্তনের দল ছিল; তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে-মাঝে তথায় আসিতেন। কিন্তু কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন, জানিতাম না। এইমাত্র শুনিয়াছিলাম,—তাঁর নাকি অনেক টাকা, এবং সকল দিক্ দিয়াই তিনি অত্যন্ত হিসাবী। কেন জানি না, আমার প্রতি তিনি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া একদিন নিভৃতে কহিলেন, দেখুন শ্রীকান্তবাবু, আপনার বয়স অল্প,—জীবনে যদি উন্নতি করতে চান ত আপনাকে এমন গুটিকয়েক সৎপরামর্শ দিতে পারি, যাহার মূল্য এক লক্ষ টাকা। আমি নিজে যাঁহার কাছে এই উপদেশ পাইয়াছিলাম, তিনি সংসারে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, শুনিলে হয় ত অবাক হইয়া যাইবেন; কিন্তু সত্য। পঞ্চাশটি টাকা মাত্র ত মাহিনা পাইতেন; কিন্তু মরিবার সময় বাড়ী-ঘর, পুকুর-বাগান, জমি-জিরাত ছাড়া প্রায় দুটি হাজার টাকা নগদ রাখিয়া গিয়াছিলেন। বলুন ত, এ কি সোজা কথা! আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে আমি নিজেও ত—

কিন্তু নিজের কথাটা এইখানেই চাপিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি মাহিনা-পত্র ত মোটাই পান শুনি; কপাল আপনার খুব ভাল,—বর্ম্মায় এসেই ত এমন কারও হয় না; কিন্তু অপব্যয়টা কিরূপ করিতেছেন, বলুন দেখি! ভিতরে-ভিতরে সন্ধান লইয়া দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়। দেখতেই ত পান, আমি কোন লোকের কথায় থাকি না; কিন্তু, আমার কথামত, বেশী নয়, দুটো বৎসর চলুন দেখি! আমি বল্‌চি আপনাকে, দেশে ফিরে গিয়ে চাই কি বিবাহ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন।

এই সৌভাগ্যের জন্য অন্তরে আমি এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি—এ তথ্য তিনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন, জানি না; তবে কি না, তিনি ভিতরে-ভিতরে সন্ধান লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন কথায় থাকেন না—তাহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যাই হোক, তাঁহার উন্নতির বীজ-মন্ত্রস্বরূপ সৎপরামর্শের জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। তিনি কহিলেন, দেখুন, দানটান করার কথা ছাড়িয়া দিন,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করিতে হয়,—এক কোমর মাটি খুঁড়িলেও একটা পয়সা মিলে না। সে কথা বলি না; নিজের মুখে-রক্ত-ওঠা কড়ি,—আজকালকার দুনিয়ায় এমন পাগল আর কেই বা আছে। নিজের ছেলে-পুলে, পরিবারের জন্য রেখেথুয়ে তবে ত? সে কথা ছেড়েই দিন, তা নয়; কিন্তু দেখুন, যার সংসারে দেখবেন টানাটানি, কদাচ তেমন লোককে আমল দিবেন না। বেশী নয়, দু'চার দিন আসা-যাওয়া করিয়াই নিজের সংসারের কষ্টের কথা তুলিয়া দু'টাকা চাহিয়া বসিবে। দিলে ত গেলই, তা' ছাড়া বাহিরের ঝগড়া ঘরে টানিয়া আনা। দু' দু'টাকার মায়া কিছু আর সত্যিই কেহ ছাড়িতে পারে না,—তাগাদা করিতেই হয়। তখন হাঁটাহাঁটি, ঝগড়া-ঝাঁটি,—কেন আমার তাতে আবশ্যক কি, বলুন দেখি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সত্যই ত!

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, আপনি ভদ্রসন্তান, তাই কথাটা চট্ করিয়া বুঝিলেন; কিন্তু এই ছোটলোক লোহা-কাটা ব্যাটাদের বুঝাও দেখি! হারামজাদা ব্যাটারা সাত জন্মেও বুঝিবে না। ব্যাটাদের নিজের এক পয়সা নাই, তবু পরের কাছে কর্জ্জ করিয়া আর একজনকে টাকা আনিয়া দিবে,—এই ছোটলোক ব্যাটারা এমন আহাম্মুক!

একটু চুপ করিয়া কহিলেন, তবেই দেখুন, কদাচ কাহাকেও টাকা ধার দিতে নাই। বলে, বড় কষ্ট! কষ্ট তা আমার কি বাপু! আর যদি সত্যই কষ্ট, ত দু'ভরি সোনা আনিয়া রাখিয়া যাও না, দিচ্চি দশ টাকা ধার! কি বলেন?

বলিলাম, ঠিক ত!

তিনি বলিলেন, ঠিক নয় আবার! একশ' বার ঠিক! আর দেখুন, ঝগড়া-বিবাদের স্থানে কখনো যাইবেন না। একজন খুন হয়ে গেলেও না। প্রয়োজন কি আমার? ছাড়াতে গেলেও হয় ত দু' এক ঘা নিজের গায়েই লাগিবে; তা' ছাড়া, এক পক্ষ সাক্ষী মানিয়া বসিবে। তখন

করো ছুটাছুটি আদালতে। বরঞ্চ, থামিয়া গেলে ইচ্ছা হয় একবার ঘুরিয়া এসো, দুটো ভাল-মন্দ পরামর্শ দাও—পাঁচজনের কাছে নাম হইবে। কি বলেন ?

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর এই লোকের ব্যামো-স্যামোয়—আমি ত মশাই, পাড়া মাড়াই না ; তখ্খনি বলিয়া বসিবে, দাদা, মরি,—এ বিপদে দু'টাকা দিয়ে সাহায্য কর। মশাই, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না—তাকে টাকা দেওয়া, আর জলে ফেলে দেওয়া এক,—বরঞ্চ জলে ফেলে দেওয়াও ভাল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে না। না হয় ত বলিবে, এসো রাত্রি জাগিতে। আচ্ছা মশাই, আমি যাবো তার অসুখে রাত্রি জাগিতে, কিন্তু এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমার কিছু একটা—মা শীতলা না-করুন, এই নাক-কান মল্‌চি মা! বলিয়া জিভ কাটিয়া তিনি নাকে একবার হাত ঠেকাইয়া নিজের হাতে নিজের দুই কান মলিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমরা সবাই তাঁর চরণেই ত পড়িয়া আছি—কিন্তু বলুন দেখি, সে বিপদে আমায় দেখে কে ?

এবার আমি আর সায় দিতেও পারিলাম না। আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি মনে-মনে বোধ করি একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিলেন, দেখুন দেখি সাহেবদের ? তারা কখ্খনো ওরূপ স্থানে যায় কি ? কখ্খনো না। নিজের একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে বস্! হয়ে গেল! তাই তাদের উন্নতিটা একবার চেয়ে দেখুন দেখি! তারপরে ভাল হইলে, আবার যেমন মেলা-মেশা, সব তেমনি। মশাই, কারুর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কখনো যাইতে নাই।

অফিসের বেলা হইতেছে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এই প্রাজ্ঞের সাধু পরামর্শের বলে এতটা বয়সে যে খুব বেশী মানসিক উন্নতি হওয়া আমার সম্ভবপর, তাহা নহে। এমন কি, মনের মধ্যে খুব বেশী আন্দোলনও উঠিল না। কারণ, এরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব পল্লীগ্রামেও অনুভব করি নাই ; এবং অপরাপর দুর্নাম তাঁহাদের যতই থাকুক, পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করেন, এ অপবাদও শুনি নাই ; এবং এ পরামর্শ যে সুপরামর্শ, তাহা সামাজিক জীবনে তত না হোক, পারিবারিক জীবনে, জীবন-যাত্রার কার্য্যে যে অবিসংবাদী সাধু উপায়, তাহা দেশের লোক মানিয়া লইয়াছে।

বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের কোন ছেলে যদি অক্ষরে-অক্ষরে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলে, তাহাতে বাপ-মা অসন্তুষ্ট হন,—বাঙ্গালী পিতা-মাতার বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যা বদ্‌নাম রটনা করিতে পুলিসের সি-আই-ডির লোকেরও বোধ করি বিবেকে বাধে। সে যাই হোক, কিন্তু এই প্রাজ্ঞতার ভিতরে যে কত বড় অপরাধ ছিল, সপ্তাহ দুই গত না হইতেই, ভগবান ইহারই সাহায্যে আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন।

সেই অবধি অভয়ার বাড়ীর দিকে আর যাই নাই। তাহার সমস্ত অবস্থার সহিত তাহার কথাগুলা মিলাইয়া লইয়া, আগাগোড়া জিনিষটা জ্ঞানের দ্বারা এক রকম করিয়া দেখিতে পারিতাম—সে কথা সত্য। তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ, আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত ইহাও ঠিক; কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদা-দিদি এ কাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়াও বরঞ্চ তাঁর বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্ত্তেও, যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই,—তাহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না। আমি জানিতাম, তিনি ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্ত্তব্যের যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন,—সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলেখেলা?

অভয়ার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। তখন ভাল করিয়া সেটা তলাইয়া বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন সে কহিয়াছিল, "শ্রীকান্ত-বাবু, দুঃখভোগ করার মধ্যে একটা মারাত্মক মোহ আছে। মানুষে বহুযুগের জীবনযাত্রায় এটা দেখিয়াছে যে, কোন বড় ফলই বড় রকম দুঃখভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না। তার জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা আজ এই ভ্রমটাকে একেবারে সত্য বলিয়া জানিয়াছে যে, জীবনের মানদণ্ডে একদিকে যত বেশী দুঃখের ভার চাপানো যায়, আর একদিকে তত বড়

দুঃখের বোঝা গাদা হইয়া উঠিতে থাকে। তাই ত মানুষ যখন সংসারে সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটুকুও স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করিয়া, তপস্যা করিতেছি মনে করিয়া, নিরাহারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে তাহার জন্য কোথাও না কোথাও চতুর্গুণ আহার্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—এ বিষয়ে না তাহার নিজের, না আর কাহারও মনে তিলার্দ্ধ সংশয় উত্থিত হয়। এই জন্যই সন্ন্যাসী যখন নিদারুণ শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া, মাটিতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া থাকে, তখন তাহার দুঃখভোগের কঠোরতা দেখিয়া, দর্শকের দল শুধু যে দুঃখই ভোগ করে তাহা নয়,—একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ভবিষ্যৎ আরামের অসম্ভব বৃহৎ হিসাব খতাইয়া প্রলুব্ধ চিত্ত তাহাদের ঈর্ষাকুল হইয়া উঠে এবং ওই পা-উঁচু ব্যক্তিটাই যে সংসারে ধন্য এবং নরদেহ ধারণ করিয়া সেই যে সত্যকার কাজ করিতেছে এবং তাহারা কিছুই করিতেছে না, বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে,—এই বলিয়া নিজেদের সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে মন খারাপ করিয়া বাড়ী যায়। শ্রীকান্তবাবু, সুখের জন্য দুঃখ স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উল্টাইয়া লইয়া যেমন করিয়া হোক কতকগুলা দুঃখ ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিয়া স্কন্ধে ভর করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইহকালেও সত্য নয়, পরকালেও সত্য নয়।

আমি বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য—

অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বিধবার আচরণ বলুন,—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দুবিসর্গ সম্বন্ধ নাই। বিধবার চালচলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায়, আমি তাহা মানি না। বস্তুতঃ ওটা ত কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা—যে কেহ তাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। বিধবার চালচলনটাই সেজন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।"

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, "বেশ, না হয় তাই। তাদের আচরণটাকে ব্রহ্মচর্য্য না হয় নাই বলিলেন। নামে কি আসে যায়?"

অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "নামই ত সব, শ্রীকান্তবাবু। কথা ছাড়া আর দুনিয়ায় আছে কি? ভুল নামের ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির,

চিন্তার, জ্ঞানের ধারা যে কত বড় ভুলের মধ্যে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না? ওই নামের ভুলেই ত সকল দেশে, সকল যুগে বিধবার চাল-চলনটাকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে ভেবে এসেচে। ইহাই নিরর্থক ত্যাগের নিষ্ফল মহিমা, শ্রীকান্তবাবু—একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ভুল; মানুষের ইহ-পরকাল পণ্ড ক'রে দেবার এতবড় ছায়াবাজি আর নেই।"

তখন আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তর্ক করিয়া পরাস্ত করা তাহাকে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। প্রথম যখন জাহাজে পরিচয় হয়, তখন ডাক্তারবাবু শুধু তাহার বাহিরটাই দেখিয়া তামাসা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মেয়েটি ভারি forward'; কিন্তু তখন দু'জনের কেহই ভাবি নাই, এই forward কথাটার অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে! এই মেয়েটি যে তাহার সমস্ত অন্তরটাকে পর্য্যন্ত কিরূপ অকুণ্ঠিত তেজে বাহিরে টানিয়া আনিয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে পারে, লোকের মতামত গ্রাহ্য করে না,—তখন তাহার ধারণাও আমাদের ছিল না। অভয়া ত শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ করিবার জন্যই কথাকাটাকাটি করিত না,—সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত। তাহার মত এক রকম—কাজ আর এক রকম ছিল না বলিয়াই বোধ করি, অনেক সময়ে তাহার মুখের উপর জবাব খুঁজিয়া পাইতাম না,—কেমন এক রকম থতমত খাইয়া যাইতাম; অথচ, বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, এই ত বেশ উত্তর ছিল! যাই হোক্, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের দ্বিধা ঘুচে নাই, এ কথা ঠিক। যতই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতাম, —এ ছাড়া অভয়ার আর কি গতি ছিল, ততই মন যেন তাহারই বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। যতই নিজেকে বলিতাম, তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই—ততই যেন অব্যক্ত বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া উঠিত। আমার মনে পড়ে, এমনি একটা কুণ্ঠিত অপ্রসন্ন মন লইয়াই আমার দিন কাটিতেছিল বলিয়া না পারিতাম তাহার কাছে যাইতে, না পারিতাম তাহাকে একেবারে দূরে ফেলিয়া দিতে।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন সহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল। হায় রে! তাহাকে সমুদ্র-পারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ কোটী যন্ত্র-তন্ত্র, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা—সমস্তই এক মুহূর্ত্তে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ সহরের চৌদ্দ-আনা লোক হয় চাক্‌রীজীবী, না হয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পালাইবারও যো নাই,—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁচোবাজী ছাড়িয়া দিল। ভয়ে এ পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পোঁটলা-পাঁটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পলায়, আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই সব লইয়া এ-পাড়ায় ছুটিয়া আসে! 'ইঁদুর' বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্ব্বেই লোকে ছুটিতে সুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলা যেন সব গাছের ফলের মত প্লেগের আবহাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে,—কে যে কখন টুপ্ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তাই নাই।

সে দিনটা ছিল শনিবার। কি একটা সামান্য কাজের জন্য সকালেই বাহির হইয়াছি। সহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছি, দেখি, অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটীর দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছেন প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্ত্তী।

হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই।

তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, দু'-মিনিটের জন্য একবার উপরে আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ।

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল। আমি তাই ত মাঝে মাঝে ভাবি, মানুষের প্রত্যেক চলাফেরাটি পর্য্যন্ত কি একেবারে ঠিক করা! নইলে আমার কাজও গুরুতর ছিল না, এ গলিটার মধ্যেও আর কখনো প্রবেশ করি নাই। আজ সকালেই বা এখানে আসিয়া হাজির হইলাম কেন?

কাছে গিয়া বলিলাম, অনেকদিন ত আমাদের ও-দিকে যান নি,—আপনি কি এই বাড়ীতেই থাকেন?

তিনি বলিলেন,—না মশাই, আমি দিন-বারো-তেরো এসেচি। একে ত মাসখানেক থেকে ডিসেণ্ট্রিতে ভুগছি, তার ওপর আমাদের পাড়ায় হ'ল প্লেগ! কি করি মশাই, উঠতে পারিনে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বললাম, বেশ করেছেন।

তিনি বললেন, বেশ করলে কি হবে মশাই, আমার combined hand ব্যাটা ভয়ানক বজ্জাত। বলে, থাকবো না, চলে যাবো। দিন দেখি ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ধম্‌কে।

একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই combined hand বস্তুটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ, যাঁহাদের জানা নাই যে, পয়সার জন্য হিন্দুস্থানী জাতটা পারে না এমন কাজ সংসারে নাই, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজী কথাটার মানে হইতেছে ছুবে, চোবে, তেওয়ারী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল, এখানে যাহারা চৌকার ধারে গেলেই লাফাইয়া উঠে, তাহারাই সেখানে রসুই করে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের অফিসে যাইবার সময় জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তা বাবুরা যে জাতই হোক। অবশ্য দু'টাকা বেশী মাহিনা দিয়া তবেই এই ত্রিবেদী-চতুর্ব্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বামুনের function combined করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙ্গালী বামুনদের আজিও এ কাজে রাজী করা যায় নাই, গিয়াছে শুধু ওই উহাদেরই। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পয়সা পাইলে কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে হিন্দুস্থানীর এক মুহূর্ত্তে বিলম্ব হয় না। (মুর্গী রাঁধাইতে আরও চার-আনা, আট আনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ, মূল্যের দ্বারাই সমস্ত পরিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রের এই বচনার্দ্ধের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত আস্থা রাখিতে আজ পর্য্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে ত এই হিন্দুস্থানীরা—এ কথা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।)

কিন্তু মনোহরবাবুর এই combined handকে আমি কেন ধমক্

দিতে যাইব, আর সে-ই বা কিজন্য আমার ধমক্ শুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। এই হ্যাণ্ডটি মনোহরবাবুর নূতন। এতকাল তিনি নিজের combined hand নিজেই ছিলেন, শুধু ডিসেন্‌টির খাতিরে অল্পদিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনোহরবাবু বলিতে লাগিলেন, মশাই, আপনি কি সহজ লোক! সহরশুদ্ধ লোক আপনার কথায় মরে-বাঁচে, তা কি আর জানিনে ভাবছেন। বেশী নয়, একটি ছত্র যদি লাটসাহেবকে লিখে দেন ত ওর চৌদ্দবচ্ছর জেল হয়ে যাবে, সে কি আমি শুনিনি? দিন ত ব্যাটাকে বেশ কোরে শাসিত কোরে।

কথা শুনিয়া আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম। যে লাটসাহেবের নামটা পর্য্যন্ত শুনি নাই, তাঁহাকে বেশী নয়, মাত্র একটা ছত্র চিঠি লিখিলেই চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের সম্ভাবনা,—আমার এত বড় অদ্ভুত শক্তির কথা এত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারম্বার অনুযোগ ও পীড়াপীড়িতে অগত্যা সেই হতভাগ্য combined hand-কে শাসন করিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকূপের ন্যায় অন্ধকার।

সে আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রভুর মুখে আমার ক্ষমতার বহর শুনিয়া এখন কাঁদ-কাঁদ হইয়া হাতজোড় করিয়া জানাইল যে, এ বাড়ীতে 'দেও' আছে, এখানে সে কোন মতেই থাকিতে পারিবে না। কহিল, নানা প্রকারের 'ছায়া' রাত্রিদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাবু যদি আর কোন বাড়ীতে যান ত সে অনায়াসে চাকরী করিতে পারে, কিন্তু এ বাড়ীতে—

যে অন্ধকার ঘর, তা 'ছায়া'র আর অপরাধ কি! কিন্তু ছায়ার জন্য নয়; একটা বিশ্রী পচাগন্ধ ঢুকিয়া পর্য্যন্তই আমার নাকে লাগিতেছিল; জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দুর্গন্ধ কিসের রে?

Combined hand কহিল, কোই চুহা-উহা সড়ল্ হোগা।

চমকাইয়া উঠিলাম। চুহা কি রে? এ ঘরে ম'রে নাকি?

সে হাতটা উল্টাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টা করিয়া মরা ইঁদুর সে বাহিরের গলিতে ফেলিয়া দেয়।

কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পচা

ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গেল না ; কিন্তু তবুও আমার গা-টা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল ; এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালানো তাহার উচিত নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহরবাবু খাটের উপর বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ বাড়ীর গুণের কথা বলিতে লাগিলেন,—এমন অল্প ভাড়ায় সহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ী আর নাই ; এমন বাড়ীওয়ালাও আর নাই, এবং এরূপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না। পাশের ঘরে যে চার-পাঁচজন মাদ্রাজী খৃষ্টান 'মেস্' করিয়া বাস করে, তাহারা যেমন শিষ্ট-শান্ত, তেমনি অমায়িক। একটু ভাল হইলেই এই বামুন ব্যাটাকে তাড়াইয়া দিবেন, তাহাও জানাইলেন। হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন ?

বলিলাম, না।

তিনি বলিলেন, আমিও না ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য মশাই, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি সিঁড়ি থেকে প'ড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি, ডান-পায়ের কুঁচকি ফুলে উঠেছে! সত্যি মিথ্যে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না মশাই, তাড়সে জ্বর পর্য্যন্ত হয়েছে।

শুনিয়াই আমার মুখ কালি হইয়া গেল। তার পরে কুঁচকিও দেখিলাম, গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিটখানেক আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া শেষে বলিলাম, ডাক্তার ডাকতে পাঠাননি কেন, শীঘ্র পাঠান!

তিনি কহিলেন, মশাই, যে দেশ,—এখানে ডাক্তারের ফি ত কম নয়। আনলেই ত চার পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল! তা ছাড়া আবার ওষুধ! সে ধরুন প্রায় দু'টার ধাক্কা!

বলিলাম, তা হোক্, ডাকতে পাঠান।

কে যাবে মশাই ? তেওয়ারী ব্যাটা ত চেনেই না। তা ছাড়া ও গেলে রাঁধবেই বা কে ?

আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি, বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে নিজেই বাহির হইয়া গেলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন,—ইনি আপনার কে ?

বলিলাম, কেউ না। এবং কি করিয়া আজ সকালে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাও খুলিয়া বলিলাম।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, এঁর কোন আত্মীয় এখানে আছে ?

বলিলাম, জানি না। বোধ হয়, কেউ নেই।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি ; মাথায় বরফ দেওয়াও দরকার ; কিন্তু সবচেয়ে দরকার এঁকে প্লেগ-হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনি থাকবেন না এ ঘরে—আর দেখুন, আমাকে ফিস্ দেবার দরকার নাই।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি বহু সঙ্কোচের পর হাসপাতালের প্রস্তাব করিতেই, মনোহর কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে, সেখানে গেলে কেউ কখনো ফিরে না—এমনি কত কি।

ঔষধ আনিতে পাঠাইবার জন্য তেওয়ারীর সন্ধান করিয়া দেখি, combined hand তাহার লোটা-কম্বল লইয়া ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছে। সে বোধ করি, ডাক্তারের সহিত আমার আলোচনা দ্বারের অন্তরাল হইতে শুনিতেছিল। হিন্দুস্থানী আর কিছু না বুঝুক, পিলেগ কথাটা ভারি বুঝে।

তখন আমাকেই যাইতে হইল ঔষধ আনিতে। বরফ, আইসব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই কিনিয়া হাজির করিলাম। তাহার পরে রহিলাম, আমি আর তিনি,—তিনি আর আমি। একবার আমি দিই তাহার মাথায় আইসব্যাগ তুলিয়া,—একবার সে দেয় আমার মাথায় আইসব্যাগ তুলিয়া। এই ভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া বেলা দুটো বাজিয়া গেলে, তবে সে নিস্তেজ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মাঝে মাঝে তাহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে সে বেশ জ্ঞানের কথাও বলে। অপরাহ্নের কাছাকাছি সে ক্ষণকালের জন্য সচেতনভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আমি আর বাঁচব না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন সে বহু চেষ্টায় কোমর হইতে চাবি

লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, আমার তোরঙ্গের মধ্যে তিনশ গিনি আছে—আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা আমার বাক্স খুঁজলেই পাবেন।

আমার একটা সাহস ছিল, পাশের মেস্‌টা। তাহাদের সাড়া-শব্দ, চাপা কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর একবার তাহাদের একটু বেশী রকম নড়া-চড়ার গোলমাল আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল; কিছুক্ষণ পরেই যেন মনে হইল, তাহারা দরজায় তালা বন্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছে! বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাই বটে—সত্যই দ্বারে তালা ঝুলিতেছে, বুঝিলাম, তাহারা বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তবুও কেমন মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

এদিকে আমার ঘরের লোকটি উত্তরোত্তর যে সকল কাণ্ড করিতে লাগিলেন, সে সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি, তাহা রাত্রে একাকী বসিয়া উপভোগ করিবার মত বস্তু নয়। ওদিকে রাত্রি বারোটা বাজিতে চলিল, কিন্তু পাশের ঘর খোলার সাড়াও পাই না, শব্দও পাই না। মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া দেখি, তালা তেমনি ঝুলিতেছে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল যে, কাঠের দেওয়ালের একটা ফুটা দিয়া ও-ঘরের তীব্র আলো এ ঘরে আসিতেছে। কৌতূহলবেশে সেই ছিদ্রপথে চোখ দিয়া তীব্র আলোকের যে হেতুটা দেখিলাম, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া গেল! সুমুখের খাটের উপর দু'জন যুবা পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রা দিতেছে, তার শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোমবাতি জ্বলিয়া-জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, রোমান ক্যাথোলিক্‌রা মৃতের শিয়রে আলো জ্বালিয়া দেয়। সুতরাং এ দুজনের ঘুম যে হাজার ডাকাডাকিতেও আর ভাঙিবে না, এবং এমন হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় লোক দুটির এত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার হেতুটা যে কি, সমস্তই একমুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলাম।

এ ঘরেও আমাদের মনোহরবাবু প্রায় আরও ঘণ্টা দুই ছট্‌ফট্‌ করিয়া তবে ঘুমাইলেন। যাক, বাঁচা গেল।

কিন্তু তামাসা এই যে, যিনি জানাশুনা লোকের পীড়ার সংবাদে পাড়া মাড়াইতে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁরই মৃতদেহটা এবং গিনি-পোরা বাক্সটা পাহারা দিবার জন্য ভগবান আমাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা' যেন দিলেন, কিন্তু বাকী রাত্রিটুকু আমার যেভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্যও নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। তবে, মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, এ বোধ করি, কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।

পরদিন death certificate লইতে, পুলিশ ডাকিতে, টেলিফোন করিতে, গিনির সুব্যবস্থা করিতে এবং মড়া বিদায় করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। যাক্, মনোহর ত ঠেলাগাড়ী চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্গেই রওনা হইয়া পড়িলেন,—আমিও বাসায় ফিরিলাম। আগের দিন একাদশী করিয়াছি—আজও অপরাহ্ণ। বাসায় ফিরিয়া মনে হইল, আমার ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে, এবং ব্যথা করিতেছে। কি জানি, সমস্ত রাত্রি নিজেই টিপিয়া-টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলাম কিংবা সত্য-সত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্গে যাইতে হইবে—হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পরে যাই হোক্, সম্প্রতি জ্ঞান থাকিতে থাকিতে নিজের বিলি-ব্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে। যেহেতু, মনোহরের ন্যায় আইসব্যাগ লইয়া টানাটানি করাটা সঙ্গতও নয়, শোভনও নয়। স্থির করিতে দেরী হইল না। কারণ, চক্ষের পলকে দেখিতে পাইলাম, এত বড় বিশ্রী ব্যামোর ভার কোন পুণ্যাত্মা সাধু লোকের উপর নিক্ষেপ করিতে গেলে, নিশ্চয়ই আমার গুরুতর পাপ হইবে। ভাল লোককে বিব্রত করা কর্ত্তব্য নহে,—অশাস্ত্রীয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই! বরঞ্চ সেই যে রেঙ্গুনের আর এক প্রান্তে অভয়া বলিয়া একটা মহাপাপিষ্ঠা পতিতা নারী আছে—একদিন যাহাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি,—তাহারই কাঁধের উপর এই মারাত্মক পীড়ার বিশ্রী বোঝাটা ঘৃণাভরে নামাইয়া দিয়া আসি গে, মরিতে হয়, সে মরুক। হয় ত তাহাতে কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও হইয়া

যাইতে পারে। এই বলিয়া চাকরকে গাড়ী আনিতে হুকুম করিয়া দিলাম।

বার

সেদিন যখন মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে লইয়া অভয়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন মরণের চেয়ে মরার লজ্জাই আমাকে বেশী ভয় দেখাইয়াছিল।

অভয়ার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল; কিন্তু সেই পাংশু ওষ্ঠাধর ফুটিয়া শুধু এই ক'টি কথা বাহির হইল,—তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশী? দুই চক্ষু আমার জলে ভাসিয়া গেল; তবুও বলিলাম, আমি ত চললুম। পথের কষ্ট আমাকে নিতেই হবে, সে নিবারণ করবার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু, যাবার মুখে তোমাদের এই নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে এত বড় একটা বিপদ ঢেলে দিয়ে যেতে আর আমার মন কিছুতেই সরচে না, অভয়া! এখনও গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনও জ্ঞান আছে—এখনও ভদ্রভাবে প্লেগ-হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারি। তুমি শুধু একটি মুহূর্তের জন্য মনটা শক্ত ক'রে বল, আচ্ছা যাও। অভয়া কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এইবার নিজের চোখ মুছিল। আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিল, তোমাকে যাও বলতে যদি পারতুম, তা হ'লে নতুন ক'রে ঘরসংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হ'লো।

কিন্তু খুব সম্ভব, সে আমার প্লেগ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল! দিন দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু অভয়া আমাকে আর হোটেলে ফিরিতে দিল না।

আফিসে যাইব, কি আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একদিন আফিসের পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া

গেল। খুলিয়া দেখিলাম, পিয়ারীর চিঠি। বর্ম্মায় আসার পরে এই তাহার পত্র। আমাকে জবাব না দিলেও, আমি কখনো-কখনো তাহাকে চিঠি লিখিতাম। আসিবার সময় এই সর্ত্তই সে আমাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল। পত্রের প্রথমেই সে ইহারই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, আমি মরিলে তুমি খবর পাইবে। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে আমার এমন সংবাদই থাকিতে পারে না, যাহা তোমরা না জানিলেই নয়। কিন্তু আমার ত তা নয়। আমার সমস্ত প্রাণটা যে ঐ বিদেশেই সারাদিন পড়িয়া থাকে, সে কথা এত বড় সত্য যে, তুমিও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারো নাই। তাই জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে চিঠি দিয়া তোমাকে বলিতে হয় যে, তুমি ভাল আছো।

আমি এই মাসের মধ্যেই বঙ্কুর বিবাহ দিতে চাই। তুমি মত দাও। পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে যে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, তোমার এ কথা অস্বীকার করি না। বঙ্কুর সে ক্ষমতা হয় নাই; তথাপি কেন যে তোমার সম্মতি চাহিতেছি, সে আমাকে আর একবার চোখে না দেখিলে তুমি বুঝিবে না। যেমন করিয়া পারো, এস। আমার মাথার দিব্য রহিল।

পত্রের শেষের দিকে অভয়ার কথা ছিল। অভয়া যখন ফিরিয়া আসিয়া কহিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসে, তাহারই ঘর করিতে একটা পশুকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং এই লইয়া সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে স্পর্দ্ধার সহিত তর্ক করিয়াছিল, সেদিন আমি এমনি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পিয়ারীকে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়াছে, তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত, আমার অনুরোধে একবার দেখা করিয়া বলিও যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটী নমস্কার জানাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড়, জানি না, জানার আবশ্যকও নাই; তিনি শুদ্ধমাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য। আজ আমার গুরুদেবের শ্রীমুখের কথাগুলি বার-বার মনে পড়িতেছে। আমার কাশীর বাড়ীতে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়া গেছে, গুরুদেব আসন গ্রহণ করিয়া

স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতেছেন, আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিয়া উঠিল। তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, বাবা, আমি মন্তর নেব না। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মাথার উপর তাঁর ডান হাতটি রাখিয়া বলিলেন, কেন মা, নেবে না? বলিলাম, আমি মহাপাপিষ্ঠা—তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, তা হ'লে ত আরও বেশী দরকার, মা।

কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিলাম, আমি লজ্জায় আমার সত্যি পরিচয় দিইনি, দিলে এ বাড়ীর চৌকাঠও আপনি মাড়াইতে চাইতেন না। গুরুদেব স্মিতমুখে বলিলেন, তবুও মাড়াতুম, তবুও দীক্ষা দিতুম। পিয়ারীর বাড়ী না হয় নাই মাড়ালুম; কিন্তু আমার রাজলক্ষ্মী মায়ের বাড়ীতে কেন আসব না মা?

আমি চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলাম, কিন্তু আমার মায়ের গুরু যে বলেছিলেন, আমাকে দীক্ষা দিলে পতিত হতে হবে। সে কথা কি সত্যি নয়? গুরুদেব হাসিলেন। বলিলেন, সত্যি বলেই ত তিনি দিতে পারেন নি মা। কিন্তু সে ভয় যার নেই, সে কেন দেবে না? বলিলাম, ভয় নেই কেন? তিনি পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, এক বাড়ীর মধ্যে যে রোগের বীজ একজনকে মেরে ফেলে, আর একজনকে তা' স্পর্শ করে না,—কেন বল্‌তে পারো? কহিলাম, স্পর্শ হয় ত করে, কিন্তু যে সবল, সে কাটিয়া উঠে, যে দুর্ব্বল, সে-ই মারা যায়।

গুরুদেব আমার মাথার উপর আবার তাঁর হাতটি রাখিয়া বলিলেন, এই কথাটিই কোন দিন ভুলো না মা। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাৎ ক'রে দেয়, সেই অপরাধই আর একজন হয়ত স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চ'লে যায়। তাই সমস্ত বিধি-নিষেধই সকলকে এক দড়িতে বাঁধতে পারে না। সঙ্কোচের সহিত আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, যা অন্যায়, যা অধর্ম্ম, তা' কি সবল-দুর্ব্বল উভয়ের কাছেই সমান অন্যায় অধর্ম্ম নয়? না হ'লে সে কি অবিচার নয়?

গুরুদেব বলিলেন, না মা; বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, তাদের ফল সমান নয়। তা হ'লে সংসারে সবলে-দুর্ব্বলে কোন প্রভেদ থাকত না। যে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একত্রিশ বছরের লোককে মারতে না পারে, ত কাকে দোষ দেবে মা? কিন্তু আজই যদি আমার কথা বুঝতে না পার ত, অন্ততঃ এটি স্মরণ রেখো যে, যাদের ভিতরে আগুন জ্বলছে, আর যাদের শুধু ছাই জমা হয়ে আছে—তাদের কর্ম্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। গেলে তা ভুল হয়।

শ্রীকান্ত-দা, তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার গুরুদেবের সেই অন্তরের আগুনের কথাই মনে পড়িতেছে। অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে,—তাঁর ভিতরে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইয়াছি। তাঁর কর্ম্মের বিচার একটু সাবধানে করিও। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাট্‌খারা লইয়া তাঁর পাপ-পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া দিয়া বসিও না।

চিঠিখানা অভয়ার হাতে দিয়া বলিলাম, রাজলক্ষ্মী তোমাকে শত সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে,—এই নাও।

অভয়া দুই তিনবার করিয়া লেখাটুকু পড়িয়া কোনোমতে তাহা আমার বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। সংসারের চক্ষে তাহার যে নারীত্ব আজ লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাহারই উপরে শত-যোজনদূর হইতে যে অপরিচিতা নারী আজ অযাচিত সম্মানের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই অপরিসীম আনন্দ-বেদনাকে সে পুরুষের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া লইয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অভয়া বেশ করিয়া চোখ মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াই কহিল, শ্রীকান্ত-দাদা—

বাধা দিয়া বলিলাম, ও আবার কি! দাদা হলুম কবে?

আজ থেকে!

না, না, দাদা নয়—দাদা নয়। সবাই মিলে সব দিক্ থেকে আমার রাস্তা বন্ধ করো না।

অভয়া হাসিয়া কহিল, মনে মনে বুঝি এই সব মতলব আঁটা হচ্ছে?

কেন, আমি কি মানুষ নই ?

অভয়া কহিল, বিষম মানুষ দেখি যে ! রোহিণীবাবু বেচারা অসুখের সময় আশ্রয় দিলেন, এখন ভাল হয়ে বুঝি তার এই পুরস্কার ঠিক করেছ ? কিন্তু আমার ভারি ভুল হয়ে গেছে। সে সময় যদি অসুখ ব'লে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিতুম, আজ তা' হ'লে তাঁকে দেখতে পেতুম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আশ্চর্য্য নয় বটে।

অভয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তুমি মাসখানেক ছুটি নিয়ে একবার যাও শ্রীকান্ত-দাদা। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তাঁর বড় দরকার পড়েছে।

কেমন করিয়া যেন নিজেও এ কথা বুঝিতেছিলাম, আমাকে আজ তার বড় প্রয়োজন। পরদিনই অফিসে চিঠি লিখিয়া আরও এক মাসের ছুটি লইলাম এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।

যাবার সময় অভয়া নমস্কার করিয়া কহিল, শ্রীকান্ত-দাদা, একটা কথা দাও।

কি কথা দিদি ?

সংসারের সকল সমস্যাই পুরুষমানুষে মীমাংসা ক'রে দিতে পারে না। যদি কোথাও ঠেকে, চিঠি লিখে আমার মত নেবে বল ?

স্বীকার করিয়া জাহাজ-ঘাটের উদ্দেশ্যে গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। অভয়া গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আর একবার নমস্কার করিল ; বলিল, রোহিণীবাবুকে দিয়ে আমি কালই সেখানে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি। কিন্তু জাহাজের ওপরে ক'টা দিন শরীরের দিকে একটু নজর রেখো শ্রীকান্ত-দাদা ; আর তোমার কাছে আমি কিছু চাইনে।

আচ্ছা, বলিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, অভয়ার দু'টি চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

তের

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িল। দেখিলাম, জেটির উপর বঙ্কু দাঁড়াইয়া আছে। সে সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মা রাস্তার উপর গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন। আপনি নেমে যান, আমি জিনিষ-পত্র নিয়ে পরে যাচ্ছি। বাহিরে আসিতেই আর একটা লোক গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, রতন যে! ভাল ত?

রতন একগাল হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্ব্বাদে। আসুন। বলিয়া পথ দেখাইয়া গাড়ীর কাছে আনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, এসো। রতন, তোরা বাবা আর একটা গাড়ী ক'রে পেছনে আসিস্,—দুটো বাজে, এখনও ওঁর নাওয়া-খাওয়া হয়নি, আমরা বাসায় চললুম, গাড়োয়ানকে যেতে ব'লে দে।

আমি উঠিয়া বসিলাম। রতন 'যে আজ্ঞে' বলিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে হাঁকিতে ইঙ্গিত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া কহিল, জাহাজে কষ্ট হয় নি ত?

না।

বড্ড অসুখ করেছিল নাকি?

অসুখ করেছিল বটে, বড্ড নয়। কিন্তু তোমাকে ত ভাল দেখাচ্ছে না। বাড়ী থেকে কবে এলে?

পরশু অভয়ার কাছ থেকে তোমার আসবার খবর পেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেই আসতেই ত হ'তো—দু'দিন আগেই এলুম। এখানে তোমার কত কাজ আছে, জানো?

কহিলাম, কাজের কথা পরে শুনবো। কিন্তু তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?

রাজলক্ষ্মী হাসিল। এই হাসি যে কত দিন দেখি নাই, তাহা এই হাসিটি দেখিয়াই শুধু আজ মনে পড়িল; এবং সঙ্গে সঙ্গে কতবড় যে

একটা অদম্য স্পৃহা নিঃশব্দে দমন করিয়া ফেলিলাম, তাহা অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেহ জানিল না। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা তাহাকে লুকাইতে পারিলাম না, সে বিস্মিতের মত ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দেখাচ্ছে আমাকে, রোগা ?

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। রোগা ? হাঁ, রোগা একটু বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। মনে হইল, সে যেন কত দেশ-দেশান্তর পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া, এইমাত্র ফিরিয়া আসিল,—এম্‌নি ক্লান্ত, এম্‌নি পরিশ্রান্ত। নিজের ভার নিজে বহিবার তাহার আর শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই,—এখন কেবল নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার একটু জায়গা অন্বেষণ করিতেছে। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, কৈ, বললে না যে ?

কহিলাম, নাই শুনলে।

রাজলক্ষ্মী ছেলেমানুষের মত মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না, বল। লোকে যে বলে, আমি একেবারে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছি। সত্যি ?

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, সত্যি। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি মানুষকে এমনি অপ্রভিত ক'রে দাও যে,—আচ্ছা, বেশ ত! ভালই ত! শ্রী নিয়ে আমার কি-ই বা হবে! তোমার সঙ্গে আমার সুশ্রী-বিশ্রী দেখা-দেখির ত সম্পর্ক নয় যে, সেজন্যে আমাকে ভেবে মরতে হবে!

আমি বলিলাম, সে ঠিক, ভেবে মরবার কিছুমাত্র হেতু নেই। একে ত লোকে ও-কথা তোমাকে বলে না, তা' ছাড়া বললেও তুমি বিশ্বাস কর না! মনে মনে জানো যে—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি অন্তর্য্যামী কি না, তাই সকলের মনের কথা জেনে নিয়েছ! আমি কখনো ও-কথা ভাবিনে। তুমি নিজেই সত্যি ক'রে বল ত, সেই শিকার করতে গিয়ে আমাকে যেমন দেখেছিলে, তেম্‌নি কি এখনো দেখতে আছি না কি ? তার চেয়ে কত কুচ্ছিত হয়ে গেছি।'

আমি কহিলাম, না, বরঞ্চ তার চেয়ে ভাল দেখতে হয়েছ।

দেখাইয়া কহিল, এই সিঁড়ি,—তোমার ঘর তেতলায়। একটু শুয়ে পড় গে, আমি যাচ্ছি। বলিয়া সে নিজে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতে দেখিলাম, এ ঘর আমার জন্যই বটে। পাটনার বাড়ী হইতে আমার বইগুলি, আমার গুড়গুড়িটি পর্য্যন্ত আনিতে পিয়ারী বিস্মৃত হয় নাই। একখানি দামী সূর্য্যাস্তের ছবি আমার বড় ভাল লাগিত। সেখানি সে নিজের ঘর হইতে খুলিয়া আমার শোবার ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। সেই ছবিটি পর্য্যন্ত সে কলিকাতায় সঙ্গে আনিয়াছে এবং ঠিক তেম্নি করিয়া দেয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে। আমার লিখিবার সাজ-সরঞ্জাম, আমার কাপড়, আমার সেই লাল মখমলের চটি জুতাটি পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি সযত্নে সাজানো রহিয়াছে। একখানি আরাম-চৌকি আমি সর্ব্বদা সেখানে ব্যবহার করিতাম। সেটি বোধ করি আনা সম্ভব হয় নাই, তাই নূতন একখানি সেইভাবে জানালার ধারে পাতা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহারি উপরে গিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন, ভাঁটার নদীতে আবার জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে।

স্নানাহার সারিয়া ক্লান্তিবশতঃ দুপুর-বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙিতে দেখিলাম, পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ণ-রৌদ্র আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী এক হাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া লইতেছে। কহিল, ঘামে বালিস-বিছানা ভিজে গেছে। পশ্চিম খোলা—এ ঘরটা ভারি গরম। কাল দোতলায় আমার পাশের ঘরে তোমার বিছানা ক'রে দেব। বলিয়া আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া পাখাটা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রতন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, বাবুর চা নিয়ে আসব ?

হাঁ, নিয়ে আয়। আর বঙ্কু বাড়ী থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস্।

আমি আবার চোখ বুজিলাম। খানিক পরেই বাহিরে চটিজুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কে, বঙ্কু ? একবার এদিকে আয় দিকি !

তাহার পায়ের শব্দে বুঝিলাম, সে অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। পিয়ারী তেম্‌নি বাতাস করিতে করিতে বলিল, ওই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একটু বোস্‌। কি কি আন্‌তে হবে, একটা ফৰ্দ্দ কোরে দরওয়ান সঙ্গে কোরে একবার বাজারে যা বাবা। কিছু নেই।

দেখিলাম, এ একটা মস্ত নূতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে ছাড়া, সে ইতিপূর্ব্বে কোন দিন আমার বিছানার এত কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু তা না হয় একদিন সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু, এই যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর-বাকর, এমনকি, বঙ্কুর সম্মুখে অবধি দর্পভরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমার সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বঙ্কুই পাছে কিছু মনে করে বলিয়া পাটনার বাটী হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। তাহার সহিত আজিকার আচরণের কতই না প্রভেদ!

জিনিষপত্রের ফৰ্দ্দ করিয়া বঙ্কু প্রস্থান করিল। রতনও চা ও তামাক দিয়া নীচে চলিয়া গেল। পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, একটা কথা জিজ্ঞেসা করি তোমাকে,—আচ্ছা, রোহিণীবাবু আর অভয়ার মধ্যে কে বেশী ভালবাসে, বলতে পারো?

হাসিয়া বলিলাম, যে তোমাকে পেয়ে বসেছে,—সেই অভয়াই নিশ্চয়ই বেশী ভালবাসে। রাজলক্ষ্মীও হাসিল। কহিল, সে আমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি কি ক'রে জানলে?

বলিলাম, যেমন ক'রেই জানি, সত্যি কিনা বল ত?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তা সে যাই হোক্‌, বেশী ভালবাসেন কিন্তু রোহিণীবাবু। বাস্তবিক এত ভালবেসেছিলেন বলেই এত বড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে, এতো তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল না। অথচ, সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েছে বল দেখি?

তহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, বরঞ্চ

আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত ; এবং সে হিসাবে যা কিছু ইহার কঠিন দুঃখ, যা কিছু ত্যাগ, সে অভয়াকে করতে হয়েছে। রোহিণীবাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষমানুষ,—এ অভ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কিছুই ভুলিনি ! পুরুষমানুষ বলতে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত করছ, সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্যে নয়। সখ ফুরালে, কিংবা হালে পানি না পেলে ফেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্য-গণ্য ভদ্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে,—এই ত বল্‌চো ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে ? তুমি পারো ? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখো দিকি। তার নিন্দিত জীবন ঘরের কোণে নিরালায় কাটাবার জো নেই, তাকে সংসারের মাঝখানে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নেমে আসতে হবে, অবিচার ও অপযশের বোঝা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে, তার একান্ত স্নেহের পাত্রী, তার ভাবী সন্তানের জননীকে বিরুদ্ধ সমাজের সমস্ত অমর্য্যাদা ও অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে,—সে কি সোজা দুঃখ তুমি মনে কর ? আবার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, সে যে অনায়াসে এই দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে স'রে যেতে পারে, তার এই সর্ব্বনেশে বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্র আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুভারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। দুঃখের মানদণ্ডে এই আত্মোৎসর্গের সঙ্গে ওজন সমান রাখতে যে প্রেমের দরকার, পুরুষমানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, এ কোন মেয়েমানুষেরই সাধ্য নয় তা পূর্ণ ক'রে দেয়।

কথাটা এ দিক্ হইতে কোন দিন এমন করিয়া ভাবি নাই। রোহিণীর সেই সাদা-সিধা চুপচাপ ভাব, তার পরে অভয়া যখন তাহার স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল, তখন তাহার সেই শান্ত মুখের উপর অপরিসীম বেদনা নিঃশব্দে বহন করিবার যে ছবি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহাই চক্ষের পলকে রেখায়-রেখায় আমার মনের মধ্যে উঠিল। কিন্তু মুখে বলিলাম,—চিঠিতে কিন্তু একা অভয়ার উদ্দেশেই পুষ্পাঞ্জলি পাঠিয়েছিলে। রাজলক্ষ্মী

কহিল, তাঁর প্রাপ্য আজও তাঁকে দিই। কেন না, আমার বিশ্বাস, যা কিছু পাপ, যা কিছু অপরাধ, সে তাঁর অন্তরের তেজে দগ্ধ হয়ে তাঁকে শুদ্ধ, নির্ম্মল ক'রে দিয়েছে। তা নইলে ত আজ তিনি নিতান্ত সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই তুচ্ছ, হীন হয়ে যেতেন।

হীন কেন ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ। স্বামি-পরিত্যাগের পাপের কি সীমা আছে না কি ? সে পাপ ধ্বংস করবার মত আগুন তাঁর মধ্যে না থাকলে ত আজ তিনি—

কহিলাম, আগুনের কথা থাক্। কিন্তু তাঁর স্বামীটি যে কি পদার্থ, সে একবার ভেবে দেখ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, পুরুষমানুষ চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল, চিরকালই কিছু কিছু অত্যাচারী ; কিন্তু তাই ব'লে ত স্ত্রীর স্বপক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটতে পারে না ? মেয়েমানুষকে সহ্য করতেই হয়, নইলে ত সংসার চলতে পারে না !

কথা শুনিয়া আমার সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। মনে মনে কহিলাম, মেয়েমানুষের এ সেই সনাতন দাসত্বের সংস্কার ! একটু অসহিষ্ণু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ তা হ'লে তুমি আগুন আগুন কি বকছিলে ?

রাজলক্ষ্মী সহাস্য-মুখে কহিল, কি বকছিলুম শুনবে ? আজই ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে পাটনার ঠিকানায় লেখা অভয়ার চিঠি পেয়েছি। আগুনটা কি জানো ? সেদিন প্লেগ ব'লে যখন তাঁর সবে-পাতা সুখের ঘর করার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যে বস্তুটি নির্ভয়ে নির্ব্বিচারে তোমাকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল, আমি তাকেই বলচি তাঁর আগুন। তখন সুখের খেয়াল আর তাঁতে ছিল না। কর্ত্তব্য ব'লে বুঝলে যে তেজ মানুষকে সুমুখের দিকেই ঠেলে দ্বিধায় পিছতে দেয় না, আমি তাকেই এতক্ষণ আগুন আগুন ব'লে বকে মরছিলুম। আগুনের এক নাম সর্ব্বভুক্ জানো না ? সে সুখ-দুঃখ দুই-ই টেনে নেয়,—তার বাচ-বিচার নেই। তিনি আর একটা কথা কি লিখেছেন জানো ? তিনি রোহিণীবাবুকে সার্থক

ক'রে তুলতে চান। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, নিজের জীবনের সার্থকতার ভিতর দিয়েই শুধু সংসারে অপরের জীবনে সার্থকতা পৌঁছাতে পারে। আর ব্যর্থ হ'তে শুধু একটা জীবন একাকীই ব্যর্থ হয় না, সে আরও অনেকগুলো জীবনকে নানাদিক্ দিয়ে নিষ্ফল ক'রে দিয়ে তবে যায়। খুব সত্যি না?—বলিয়া সে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তারপরে দুইজনেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৌন হইয়া রহিলাম। বোধ করি, সে কথার অভাবেই এখন আমার মাথার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া রুক্ষ নিরর্থক চিরিয়া-চিরিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার এ আচরণও একেবারে নূতন। সহসা কহিল, তিনি খুব শিক্ষিত, না? নইলে এত তেজ হয় না!

বলিলাম, হাঁ, যথার্থই তিনি শিক্ষিতা রমণী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু একটা কথা তিনি আমাকে লুকিয়েছেন। তাঁর মা হবার লোভটা কিন্তু চিঠির মধ্যে বারবার চাপা দিতে গেছেন।

বলিলাম, এ লোভ তাঁর আছে নাকি? কৈ, আমি ত শুনিনি?

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, বাঃ—এ লোভ আবার কোন্ মেয়েমানুষের নেই! কিন্তু তাই ব'লে বুঝি পুরুষমানুষের কাছে ব'লে বেড়াতে হবে? তুমি ত বেশ।

কহিলাম, তা হ'লে তোমারও আছে না কি?

যাও—বলিয়া সে অকস্মাৎ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই আরক্ত মুখ লুকাইবার জন্য শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন অস্তোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই আরক্ত আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপরূপ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কানের হীরার দুল দুটিতে নানাবর্ণের দ্যুতি ঝিক্মিক্ করিয়া খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই আত্মসংবরণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কেন, আমার কি ছেলেমেয়ে নেই যে লোভ হবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি, ছেলের বিয়ে দিতে এসেছি,—একটি দুটি নাতি-নাত্নি হবে, তাদের নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব,—আমার অভাব কি বল ত?

চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথা লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মী কহিল, বন্ধুর বিয়ের ত এখনো ১০।১২ দিন দেরী আছে; চল, কাশীতে তোমাকে আমার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

হাসিয়া বলিলাম, আমি কি একটা দেখাবার জিনিষ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে বিচারের ভার যারা দেখে তাদের, তোমার নয়।

কহিলাম, তা'ও যদি হয়, কিন্তু এতে আমারই বা লাভ কি, তোমার গুরুদেবেরই বা লাভ কি?

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, লাভ তোমাদের নয়, লাভ আমার। না হয় শুধু আমার জন্যেই চল।

সুতরাং সম্মত হইলাম। সম্মুখে একটা দীর্ঘকালব্যাপী অকাল থাকায় এই সময়টায় চারিদিকে যেন বিবাহের বন্যা নামিয়াছিল। যখন-তখন ব্যাণ্ডের কর্ণেট এবং ব্যাগ-পাইপের বাঁশী বিবিধ প্রকার বাদ্যভাণ্ড সহযোগে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিবার যোগাড় করিয়াছিল। আমাদের ষ্টেশনযাত্রার পথেও এম্‌নি কয়েকটা উন্মত্ত শব্দের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিয়া গেল। তেজটা একটু কমিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমার মতে যদি সবাই চলে, তা হ'লে ত গরীবদের আর বিয়ে করাও হয় না, ঘরসংসার করাও চলে না? তা হলে সৃষ্টি থাকে কি ক'রে?

তাহার অসামান্য গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, সৃষ্টিরক্ষার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার আবশ্যক নেই। কারণ, আমার মতে চলবার লোক পৃথিবীতে আর বেশী নেই। অন্ততঃ আমাদের এ দেশে ত নেই বললেই চলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না থাকাই ত ভাল। বড়লোকেরাই শুধু মানুষ, আর গরীব ব'লে কি তারা সংসারে ভেসে এসেছে? তাদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-কন্নার সাধ-আহ্লাদ নেই?

কহিলাম, সাধ-আহ্লাদ থাকলেই যে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে, তার কি কোন অর্থ আছে?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, কেন নাই, আমাকে বুঝিয়ে দাও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, দরিদ্র-নির্ব্বিশেষেই আমার এ মত নয়, আমার মত শুধু দরিদ্র ভদ্র-গৃহস্থের সম্বন্ধেই, এবং তার কারণও তুমি জান বলেই আমার বিশ্বাস।

রাজলক্ষ্মী জিদের স্বরে কহিল, তোমার ও মত ভুল।

আমার কেমন জিদ চাপিয়া গেল, বলিয়া ফেলিলাম, হাজার ভুল হলেও তোমার মুখে সে কথা শোভা পায় না। বঙ্কুর বাপ যখন তোমাদের দুই বোনকেই একসঙ্গে মাত্র বাহাত্তোরটি টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, সেদিন এখনো এত পুরোনো হয়নি যে, তোমার মনে নেই। তবে না কি সে লোকটার নেহাৎ পেশা বলেই রক্ষে; নইলে, ধর, যদি সে তোমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দুটি একটি ছেলেপুলে হো'ত,—একবার ভেবে দেখ দিকি অবস্থাটা। রাজলক্ষ্মীর চোখের দৃষ্টিতে কলহ ঘনাইয়া উঠিল, কহিল, ভগবান্ যাদের পাঠাতেন, তাদের তিনিই দেখতেন। তুমি নাস্তিক বলেই কেবল বিশ্বাস কর না।

আমিও জবাব দিলাম, আমি নাস্তিক হই না হই, আস্তিকের ভগবানের দরকার কি শুধু এইজন্য? এই সব ছেলে মানুষ করতে?

রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, না হয় তিনিই নাই দেখতেন। কিন্তু তোমার মত আমি অত ভীতু নই। আমি দোর-দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হো'ত।

আমি আর তর্ক করিলাম না। আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অপ্রিয় ধারায় নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলাম।

আমাদের গাড়ী ক্রমশঃ সরকারী এবং বে-সরকারী আফিস-কোয়ার্টার ছাড়াইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সে দিনটা ছিল শনিবার। বেলা দুটার পর অধিকাংশ আফিসের কেরাণী ছুটি পাইয়া আড়াইটার ট্রেন ধরিতে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু খাদ্য-সামগ্রী। কাহারও হাতে দুইটা বড় চিংড়ি, কাহারও রুমালে

বাঁধা একটু পাঁটার মাংস, কাহারও হাতে পাড়াগাঁয়ে দুষ্প্রাপ্য কিছু-কিছু তরি-তরকারী এবং ফল-মূল; সাত দিনের পরে গৃহে পৌঁছিয়া উৎসুক ছেলে-মেয়ের মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখিতে প্রায় সকলেই সামর্থ্যমত অল্প-স্বল্প মিষ্টান্ন কিনিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ছুটিতেছে। প্রত্যেকেরই মুখের উপর আনন্দ ও ট্রেন ধরিবার উৎকণ্ঠা একসঙ্গে এম্‌নি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজলক্ষ্মী আমার হাতটা টানিয়া অত্যন্ত কৌতূহল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, কেন এঁরা সব এমন ভাবে ইষ্টিসনের দিকে ছুটছেন? আজ কি?

আমি ফিরিয়া কহিলাম, আজ শনিবার। এঁরা সব আফিসের কেরাণী, রবিবারের ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছেন।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, তাই বটে। আর দেখ, সবাই একটা-না-একটা কিছু খাবার জিনিষ নিয়ে যাচ্ছেন। পাড়াগাঁয়ে ত এ সব পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয়, ছেলে-মেয়েদের হাতে দেবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, না?

আমি কহিলাম, হাঁ।

তাহার কল্পনা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, আঃ— ছেলেমেয়েগুলোর আজ কি ফুর্ত্তি! কেউ চেঁচামেচি করবে, কেউ গলা জড়িয়ে বাপের কোলে উঠতে চাইবে, কেউ মাকে খবর দিতে রান্নাঘরে দৌড়বে—বাড়ীতে বাড়ীতে আজ যেন একটা কাণ্ড বেধে যাবে, না? বলিতে-বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি সায় দিয়া বলিলাম, খুব সম্ভব বটে।

রাজলক্ষ্মী গাড়ীর জানালা দিয়া আবার কিছুক্ষণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হাঁ-গা, এঁদের মাইনে কত?

বলিলাম, কেরাণীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিশ, ত্রিশ, কুড়ি— এমনি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বাড়ীতে ত এঁদের মা আছেন, ভাই বোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে—

আমি যোগ করিয়া দিলাম, তুই একটি বিধবা বোন আছে, কাজকর্ম্ম, লোক-লৌকিকতা, ভদ্রতা আছে, কলকাতার বাসাখরচ আছে, অবিচ্ছিন্ন রোগের খরচ,—বাঙালী কেরাণী-জীবনের সমস্তই নির্ভর করে এই ত্রিশটি টাকার উপর।

রাজলক্ষ্মীর যেন দম আটকাইয়া আসিতেছিল। সে এমনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি জান না। এঁদের বাড়ীতে সব বিষয়-আশয় আছে। নিশ্চয় আছে।

তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরাশ করিতে আমার বেদনা বোধ হইল, তথাপি বলিলাম, এঁদের ঘরকন্নার ইতিহাস আমি ঘনিষ্ঠভাবেই জানি। আমি নিঃসংশয়ে জানি, এঁদের চৌদ্দ-আনা লোকেরই কিছু নেই। চাকরী গেলে হয় ভিক্ষা, না হয় সমস্ত পরিবারের সঙ্গে উপোস করতে হয়। এঁদের ছেলেমেয়েদের কথা শুনবে ?

রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ তুই হাত তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না না, শুনব না—আমি চাইনে শুনতে।

সে যে প্রাণপণে অশ্রুসংবরণ করিয়া আছে, সে তাহার চোখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম ; তাই আর কিছু না বলিয়া পুনরায় পথের দিকে মুখ ফিরাইলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না। এতক্ষণ অবধি বোধ করি, সে নিজের সঙ্গে ওকালতি করিয়া শেষে নিজের কৌতূহলের কাছেই পরাজয় মানিয়া, আমার জামার খুঁট ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া চাহিতেই সে করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, বল ওঁদের ছেলে-পুলের কথা। কিন্তু তোমার তুটি পায়ে পড়ি, মিছিমিছি বাড়িয়ে বোলো না। দোহাই তোমার !

তাহার মিনতি করার ভঙ্গী দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলাম না ; বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম, বাড়িয়ে বলা ত দূরের কথা, তুমি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তোমাকে শোনাতাম না, যদি না তুমি একটু আগে নিজের সম্বন্ধে ভিক্ষে ক'রে ছেলে মানুষ করার কথা বলতে। ভগবান যাদের পাঠান, তিনিই তাদের সুব্যবস্থার ভার নেন, এ একটা কথা বটে। অস্বীকার করলে নাস্তিক ব'লে হয় ত আবার

আমাকে গালমন্দ করবে ; কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব বাপ-মায়ের উপর কতটা, আর ভগবানের উপর কতটা, এ দুই সমস্যার মীমাংসা তুমি নিজেই কোরো, আমি যা জানি, তাই শুধু বোলবো, কেমন ?

সে নীরবে আমার দিকে জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিলাম, ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব তার মায়ের ওপরেই থাকে ব'লে আমার মনে হয়। ভগবানের উপর অচলা ভক্তি, তাঁর দয়ার প্রতিও আমার অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু, তবুও মায়ের বদলে তাঁর নিজেরই এই ভারটা নেবার উপায় আছে কি না—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ, চালাকি কোরো না—সে আমিও জানি।

জানো ? যাক, তা হ'লে একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হ'ল। কিন্তু ত্রিশ-টাকা-ঘরের জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আসতে কেন যে বিলম্ব হয় না, সে জানতে হ'লে কোন ত্রিশ-টাকা-ঘরের প্রসূতির আহারের সময়ে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে যখন পারবে না, তখন, এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা না হয় মেনেই নাও।

রাজলক্ষ্মী ম্লানমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, পাড়াগাঁয়ে যে গো-দুগ্ধের একান্ত অভাব, এ কথাটাও তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কহিল, এ আমি নিজেও জানি। ঘরে গরু থাকে ত ভাল, নইলে আজকাল মাথা খুঁড়ে মলেও কোন পল্লীগ্রামে একফোঁটা দুধ পাবার জো নেই। গরুই নেই, তার আবার দুধ !

বলিলাম, যাক, আরও একটা সমস্যার সমাধান হ'ল। তখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল স্বদেশী খাঁটি পানা-পুকুরের জল, আর বিদেশী কৌটাভরা খাঁটি বার্লির গুঁড়ো। কিন্তু তখনও দুর্ভাগাটার অদৃষ্টে হয় ত এক-আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্যও জোটে, কিন্তু সে সৌভাগ্য এসব ঘরে বেশীদিন থাকার আইন নেই। মাস চারেকের মধ্যেই আর একটি নূতন আগন্তুক তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুগ্ধের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ ক'রে দেয়। এ বোধ করি তুমি—

রাজলক্ষ্মী লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া বলিয়া উঠিল,—হাঁ হাঁ, জানি, জানি। এ আর আমাকে ব্যাখ্যা কোরে বোঝাতে হবে না। তুমি তারপরে বল।

কহিলাম, তারপরে ছোঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়ার জ্বরে। তখন বাপের দায়িত্ব হচ্ছে বিদেশী কুইনিন ও বার্লির গুঁড়ো যোগানো এবং মায়ের ঘাড়ে পড়ে—ঐ যে বল্‌লুম, আঁতুড়ে গিয়ে পুনরায় ভর্ত্তি নেবার মুলতুবির ফুরসুতে—ঐগুলো খাঁটি দিশী জলে গুলে তাকে গেলানো। তারপরে যথাসময়ে সূতিকাগৃহের হাঙ্গামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে ক'রে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিনকতক চ্যাচানো।

রাজলক্ষ্মী নীলবর্ণ হইয়া কহিল, চ্যাচানো কেন?

বলিলাম, ওটা মায়ের স্বভাব ব'লে। এমন কি, কেরাণীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, যখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ করতে ছেলেটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন।

বাছা রে!

এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়াই কথা কহিতেছিলাম, অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম, তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। অতিশয় ক্লেশ বোধ করিলাম। মনে হইল, এ বেচারাকে নিরর্থক দুঃখ দিয়া আমার লাভ কি? অধিকাংশ ধনীর মত ইহারও না হয় জগতের এই বিরাট দুঃখের দিক্‌টা অগোচরেই থাকিত! বাঙ্গালার ক্ষুদ্র চাকুরীজীবী প্রকাণ্ড দরিদ্র গৃহস্থ-পরিবার যে শুধু খাদ্যাভাবেই ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া প্রতিদিন শূন্য হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য বড়লোকের মত এও না হয় এ-কথাটা নাই জানিত। কি এমন তাহাতে বেশী ক্ষতি হইত! ঠিক এমনি সময়ে রাজলক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে অবরুদ্ধ স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হোক্ কেরাণী, তবু তারা তোমার চেয়ে ঢের ভাল। তুমি ত পাষাণ! তোমার নিজের কোন দুঃখ নেই ব'লে এদের দুঃখ-কষ্ট এমন আহ্লাদ ক'রে বর্ণনা ক'রছ। আমার কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে।

বলিয়া সে অঞ্চলে ঘন-ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ, তাহাতে লাভ হইত না। বরঞ্চ সবিনয়ে কহিলাম,

এদের সুখের ভাগটাও ত আমার কপালে জোটে না। বাড়ী পৌঁছুতে এঁদের আগ্রহটাও ত ভেবে দেখবার বিষয়। রাজলক্ষ্মীর মুখ হাসি ও কান্নায় মুহূর্ত্তেই দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমিও ত তাই বলছি। আজ বাবা আসছে ব'লে ছেলেপুলেরা সব পথ চেয়ে আছে। কিসের কষ্ট? ওঁদের মাইনে হয়'ত কম, তেম্‌নি বাবুয়ানীও নেই। কিন্তু, তাই ব'লে কি পঁচিশ ত্রিশ টাকা,—এত কম? কখ্‌খনো নয়! অন্ততঃ একশ দেড়শ টাকা, আমি নিশ্চয় বলছি।

বলিলাম, হ'তেও পারে। আমি হয় ত ঠিক জানিনে।

উৎসাহ পাইয়া রাজলক্ষ্মীর লোভ বাড়িয়া গেল। অতিশয় ক্ষুদ্র কেরাণীর জন্যও মাসে দেড়শ টাকা মাহিনা তাহার মনঃপূত হইল না। কহিল, শুধু কি ওই মাইনেটিই ওঁদের ভরসা তুমি মনে কর? উপরিও ত কত পান!

কহিলাম, উপরিটা কি? প্যালা?

আর সে কথা কহিল না, মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বাহিরের দিকেই চোখ রাখিয়া বলিল, তোমাকে যতই দেখছি, ততই তোমার ওপর থেকে আমার মন চ'লে যাচ্ছে। তুমি ছাড়া আর আমার গতি নেই জানো বলেই আমাকে তুমি এমন ক'রে বেঁধো!

এতদিনের পরে আজ বোধ করি এই প্রথম তাহার হাত দুটি জোড় করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটা বলিতেও চাহিলাম, কিন্তু গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের ধারে দাঁড়াইল। একটা স্বতন্ত্র গাড়ী রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কু কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই আসিয়াছিল। সে রতনকে কোচবাক্সে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম; যে কথাটা মুখে আসিয়া পাড়িয়াছিল, আবার তাহা নীরবে অন্তরের ভিতরে গিয়া লুকাইল।

আড়াইটার লোকাল ছাড়ে-ছাড়ে। আমাদের ট্রেন পরে। এমন সময়ে একটি প্রৌঢ়-গোছের দরিদ্র ভদ্রলোক এক হাতে নানাজাতীয় তরি-

তরকারীর পুঁটুলি এবং অন্য হাতে দাঁতশুদ্ধ একটি মাটির পাখী লইয়া, শুধু প্লাটফরমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য-ভাবে ছুটিতে গিয়া রাজলক্ষ্মীর গায়ে আসিয়া পড়িল। মাটির পুতুল মাটিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল। লোকটা হায় হায় করিয়া বোধ করি কুড়াইতে যাইতেছিল, পাঁড়েজী হুঙ্কার ছাড়িয়া একলম্ফে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল এবং বঙ্কু ছড়ি তুলিয়া বুড়ো, কাণা ইত্যাদি বলিয়া মারে আর কি! আমি একটু দূরে অন্যমনস্ক ছিলাম, শশব্যস্তে রণস্থলে আসিয়া পড়িলাম। লোকটি ভয়ে এবং লজ্জায় বার-বার করিয়া বলিতে লাগিল, দেখতে পাইনি, মা, আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—

আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, যা হবার হয়েছে, আপনি শীঘ্র যান—আপনার ট্রেন ছেড়ে দিল ব'লে।

লোকটি তবুও তাহার পুতুলের টুক্‌রা কয়টা কুড়াইবার জন্য বারকয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দৌড় দিল, কিন্তু অধিক দূর ছুটিতে হইল না, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন ফিরিয়া আসিয়া সে আর এক দফা ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়া সেই ভাঙা অংশগুলি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, ওতে আর কি হবে?

লোকটি কহিল, কিছুই না মশাই। মেয়েটার অসুখ—গেল সোমবার বাড়ী থেকে আসবার সময় ব'লে দিলে, আমার জন্যে একটি পাখী পুতুল কিনে এনো না। কিনতে গেলুম, ব্যাটা গরজ বুঝে দর হাঁকলে কি না—দু' আনা—তার একটি পয়সা কম নয়। তাই সই। মরি-বাঁচি ক'রে আট-আটটা পয়সা ফেলে দিয়ে নিলুম; কিন্তু এম্‌নি অদেষ্ট দেখুন না যে, দোড়-গোড়ায় এনে ভেঙে গেল। রোগা মেয়েটার হাতে দিতে পারলুম না। বেটী কেঁদে বলবে, বাবা আনলে না। যা হোক্, টুক্‌রোগুলো নিয়ে যাই, দেখিয়ে বল্‌ব, মা, এ মাসের মাইনেটা পেলে আগে তোর পুতুল কিনে তবে আমার অন্য কাজ। বলিয়া সমস্তগুলি কুড়াইয়া সযত্নে চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর বোধ হয় বড্ড লেগেছে—আমি দেখতে পাইনি—লোকসানকে লোকসানও হ'লো, গাড়ীটাও পেলুম না,—পেলে তবুও রোগা মেয়েটাকে আধঘণ্টা আগে গিয়ে দেখতে পেতুম। বলিতে

বলিতে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্লাটফরমের দিকে প্রস্থান করিল। বঙ্কু পাঁড়েজীকে লইয়া কি একটা প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া গেল ; আমি হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, শ্রাবণের ধারার মত রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব লেগেছে না কি ? কোথায় লাগল ?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিয়া চুপি-চুপি কহিল, হ্যাঁ, খুবই লেগেছে—কিন্তু সে এমন জায়গায় যে, তোমার মত পাষাণের দেখবারও যো নেই, বোঝবারও যো নেই।

চৌদ্দ

শ্রীমান্ বঙ্কুকে কেন যে বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গাড়ী রিজার্ভ করিতে হইয়াছিল, এই খবরটা যখন তাহার কাছে আমি লইতেছিলাম, তখন রাজলক্ষ্মী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। এখন সে একটু অন্যত্র যাইতে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই আমাকে শুনাইয়া দিল যে, নিজের জন্য বাজে খরচ করিতে সে যত নারাজ, ততই তাহার ভাগ্যে এই সকল বিড়ম্বনা ঘটে। সে কহিল, সেকেণ্ড ক্লাস ফার্ষ্ট ক্লাসে গেলেই যদি ওদের তৃপ্তি হয়, বেশ ত, তাও ত আমাদের জন্যে মেয়েদের গাড়ী ছিল! কেন রেল-কোম্পানীকে মিছে এতগুলো টাকা বেশী দেওয়া।

বঙ্কুর কৈফিয়তের সঙ্গে তাহার মায়ের এই মিতব্যয়-নিষ্ঠার বিশেষ কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম না ; কিন্তু সে কথা মেয়েদের বলিতে গেলে কলহ বাধে। অতএব চুপ করিয়া শুধু শুনিয়া গেলাম, কিছুই বলিলাম না।

প্লাটফরমে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া সেই ভদ্রলোকটি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখ দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাবেন ?

লোটি কহিলেন, বর্দ্ধমানে।

একটু অগ্রসর হইতেই রাজলক্ষ্মী আমাকে চুপি-চুপি বলিল, তা হ'লে ত উনি অনায়াসে আমাদের গাড়ীতে যেতে পারেন? ভাড়াও লাগবে না—তাই কেন ওঁকে বল না?

বলিলাম, টিকিট নিশ্চয়ই কেনা হয়ে গেছে—ভাড়ার টাকা ওঁর বাঁচবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা' হোক্ না কেন, ভিড়ের কষ্টটা ত বাঁচবে।

কহিলাম,—ওঁদের অভ্যাস আছে, ভিড়ের কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।

রাজলক্ষ্মী তখন জিদ্ করিয়া বলিল, না না, তুমি ওঁকে বল। আমরা তিনজনে কথাবার্তায় এতটা পথ বেশ যেতে পারব।

বুঝিলাম, এক্ষণে সে নিজের ভুলটা টের পাইয়াছে। বন্ধু এবং নিজের চাকর-বাকরদের চোখের উপর আমার সঙ্গে একাকী একটা আলাদা গাড়ীতে উঠার দৃষ্টি-কটুত্বটা এখন সে কোনমতে একটুখানি ফিকা করিয়া লইতে চায়। তথাপি ইহাকেই আরও একটু চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য তাচ্ছিল্যের ভাবে কহিলাম, কাজ কি একটা বাজে লোককে গাড়ীতে ঢুকিয়ে? তুমি যত পার, আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো,—বেশ সময় কেটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, সে আমি জানি। আমাকে জব্দ করবার এত বড় সুযোগ হাতে পেয়ে কি তুমি ছাড়তে পারো!—এই বলিয়া সে চুপ করিল।

কিন্তু ট্রেন ষ্টেশনে লাগিতেই আমি তাঁকে গিয়া কহিলাম, আপনি কেন আমাদের গাড়ীতেই আসুন না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, ভিড়ের দুঃখটা আপনার বাঁচবে।

বলা বাহুল্য, তাঁহাকে রাজী করাইতে ক্লেশ পাইতে হইল না, অনুরোধমাত্রই তিনি তাঁহার পুঁটুলি লইয়া আমাদের গাড়ীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

ট্রেন গোটা দুই ষ্টেশন পার না হইতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার সহিত চমৎকার কথাবার্তা জুড়িয়া দিল, এবং আরও কয়েকটা ষ্টেশন উত্তীর্ণ

হইবার মধ্যেই তাঁহার ঘরের খবর, পাড়ার খবর, এমন কি আশপাশের গ্রামগুলার খবর পর্য্যন্ত সে খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর গুরুদেব কাশীতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া বাস করেন, তাহাদের জন্য সে কলিকাতা হইতে অনেক জিনিষপত্র লইয়া যাইতেছিল। বর্দ্ধমানের কাছাকাছি আসিয়া, তোরঙ্গ খুলিয়া, সে তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া, একখানি সবুজ রঙের রেশমের শাড়ী বাহির করিয়া বলিল, সরলাকে তার পুতুলের বদলে এই কাপড়খানি দেবেন।

ভদ্রলোক প্রথমে অবাক হইলেন, পরে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি কহিলেন, না না, মা, সরলাকে আমি আসছে বারে পুতুল কিনে দেব,—আপনি কাপড় রেখে দিন। তা' ছাড়া এ যে বড্ড দামী কাপড় মা!

রাজলক্ষ্মী বস্ত্রখানি তাঁহার পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশী দাম নয়! আর দাম যাই হোক্, এখানি তার হাতে দিয়ে বলবেন, তার মাসী তাকে ভাল হয়ে পরতে দিয়েছে।

ভদ্রলোকের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। আধঘণ্টার আলাপে একজন অপরিচিত লোকের পীড়িত কন্যাকে এমন একখানি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দেওয়া জীবনে বোধ করি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করুন, সে ভাল হয়ে উঠুক, কিন্তু গরীবের ঘরে এত দামী কাপড় নিয়ে সে কি করবে মা? আপনি তুলে রেখে দিন। বলিয়া তিনি আমার প্রতিও একবার চাহিলেন। আমি কহিলাম, তার মাসী যখন তাকে পরতে দিচ্ছে, তখন নিয়ে গিয়ে আপনার দেওয়াই উচিত।—বলিয়া হাসিয়া কহিলাম, সরলার ভাগ্য ভাল। আমাদের এমন একটা মাসী পিসী থাকলে বেঁচে যেতুম মশাই! এইবার কিন্তু আপনার মেয়েটি চটপট সেরে উঠবে দেখবেন।

ভদ্রলোকের সমস্ত মুখে কৃতজ্ঞতা তখন উছলিয়া পড়িতে লাগিল; তিনি আর আপত্তি না করিয়া কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন। আবার দুজনের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সংসারের কথা, সমাজের কথা, সুখ-দুঃখের কথা,—কত কি। আমি শুধু জানালার বাহিরে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম; এবং যে প্রশ্ন নিজেকে নিজে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি,

এই ক্ষুদ্র ঘটনার সূত্র ধরিয়া আবার সেই প্রশ্ন মনে উঠিল, এ যাত্রার সমাপ্তি কোথায়?

একখানা দশ-বারো টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে কঠিনও নয়, নূতনও নয়। তাহার দাসী-চাকরেরা হয়ত এ কথা লইয়া একবার চিন্তা পর্য্যন্তও করিত না। কিন্তু আমার চিন্তা আলাদা। এই দেওয়া জিনিষটা যে দান করার হিসাবে তাহার কাছে কিছুই নয়,—সে আমিও জানি এবং কাহারও চেয়ে কম জানি না; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম, তাহার হৃদয়ের ধারাটা যে দিক্ লক্ষ্য করিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিতে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান হইবে কোথায় এবং কি করিয়া?

সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।

রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম। তাহার পিয়ারী বাইজী যে তাহার অপরিণত যৌবনের সমস্ত দুর্দ্দাম আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম। আজ সে নামটা উচ্চারণ করিলেও সে যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে। আমার সমস্যাও হইয়াছিল ইহাই।

সর্ব্বস্ব দিয়া সংসার উপভোগ করিবার সেই উত্তপ্ত আবেগ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে নাই; আজ সে শান্ত, স্থির। তাহার কামনা বাসনা আজ তাহারই মধ্যে এমন ডুব মারিয়াছে যে, বাহির হইতে হঠাৎ সন্দেহ হয়, তাহারা আছে কি নাই। তাহাই এই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল, আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্য নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এমন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন পাটনায় তাহার যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া

গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলি মনে হইতে লাগিল, তত বড় আগুনকে ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ এক-মাত্র বঙ্কুই তাহার কাছে পর্য্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখ-দুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছে।

বর্দ্ধমানে ভদ্রলোক নামিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আমি জানালা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কান্নাটা কার কল্যাণে হলো? সরলা, না তার মায়ের?

রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলে?

বলিলাম, কাজে কাজেই। মানুষ নিজে কথা না কইলেই পরের কথা তার কানে এসে ঢোকে। সংসারে কম কথার লোকের জন্যে ভগবান এই শাস্তির সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন। ফাঁকি দেবার যো নেই। সে যাক্, কিন্তু চোখের জল কার জন্যে ঝরছিল, শুনতে পাইনে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার চোখের জল কার জন্যে ঝরে, শুনে তোমার লাভ নেই।

কহিলাম, লাভের আশা করিনে—শুধু লোকসান বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বাঁচি। সরলা কিংবা তাহার মায়ের জন্যে যত ইচ্ছে চোখের জল ঝরুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার বাপের জন্যে ঝরাটা আমি পছন্দ করিনে।

রাজলক্ষ্মী শুধু একটা হুঁ বলিয়াই জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে করিয়াছিলাম, এমন একটা রসিকতা নিষ্ফল হইবে না। ইহা অনেক নিরুদ্ধ উৎসের বাধা মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু সে ত হইলই না, বরঞ্চ যদি বা সে এতক্ষণ এই দিকেই চাহিয়াছিল, রসিকতা শুনিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কিন্তু বহুক্ষণ মৌন ছিলাম—কথা কহিবার জন্য ভিতরে ভিতরে একটা

আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল ; তাই বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার কথা কহিলাম। বলিলাম, বর্দ্ধমান থেকে কিছু খাবার কিনে নিলে হতো।

রাজলক্ষ্মী কোন উত্তরই দিল না, তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, পরের শোকে এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আর ঘরের লোকের দুঃখে যে কানই দাও না! এ বিলেত-ফেরতের বিছে শিখলে কোথায় ?

রাজলক্ষ্মী এবার ধীরে ধীরে কহিল, বিলেত-ফেরতের উপর যে তোমার ভারি ভক্তি দেখি।

বলিলাম, হাঁ, তাঁরা ভক্তির পাত্র যে।

কেন, তারা তোমাদের করলে কি ?

এখনো কিছু করেনি, কিন্তু পাছে কিছু করে, এই ভয়েই আগে থেকে ভক্তি করি।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ তোমাদের অন্যায়। তোমরা তাদের দল থেকে, জাত থেকে, সমাজ থেকে, সবদিক থেকেই বার ক'রে দিয়েছ। তবু যদি তারা তোমাদের জন্যে এতটুকুও করে, তাতেই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কহিলাম, আমরা ঢের বেশী কৃতজ্ঞ হতুম, যদি তারা সেই রাগে পূরাপূরি মুসলমান কিংবা খৃষ্টান হয়ে যেত। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে, তারা ব্রাহ্ম-সমাজকে নষ্ট করছে, যারা হিন্দু বলে মনে করে, তারা হিন্দু-সমাজকে ত্যক্ত ক'রে মারচে। ওরা নিজেরা কি, যদি তাই আগে ঠিক ক'রে নিয়ে পরের জন্য কাঁদতে বসতো, তাতে হয় ত ওদের নিজেদের মঙ্গল হ'তো, যাদের জন্যে কাঁদে, তাদেরও হয় ত এটুকু উপকার হ'তো।'

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু আমার ত তা মনে হয় না।

বলিলাম, না হলেও তেমন ক্ষতি নেই কিন্তু যে জন্যে সম্প্রতি আটকাচ্ছে সে অন্য কথা। কই—তার তো কোন জবাব দাও না।

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, ওগো, সেজন্যে আটকাবে না। আগে তোমার ক্ষিদে পাক, তারপর চিন্তা ক'রে দেখা যাবে।

বলিলাম, তখন চিন্তা ক'রে যে-কোনও ষ্টেশন থেকে যা মেলে খাবার কিনে গিলতে দেবে—এই ত? কিন্তু সে হবে না, তা ব'লে রাখছি।

জবাব শুনিয়া সে আমার মুখের প্রতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া আবার একটু হাসিয়া বলিল, এ আমি পারি, তোমার বিশ্বাস হয়?

বলিলাম, বেশ, এতটুকু বিশ্বাসও তোমার ওপর থাকবে না?

তা বটে! বলিয়া সে পুনরায় জানালার বাহিরে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পরের ষ্টেশনে রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া খাবারের জায়গাটা চাহিয়া এবং তাহাকে তামাক দিতে হুকুম করিয়া সমস্ত খাদ্যসামগ্রী সাজাইয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল। দেখিলাম, এ বিষয়ে একবিন্দু ভুল-চুক কোথাও নাই; আমি যাহা কিছু ভালবাসি, সমস্ত খুঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বেঞ্চের উপর রতন বিছানা পাতিয়া দিল। পরিপাটী ভোজন সমাধা করিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া আরামে চোখ বুজিবার উপক্রম করিতেছি, রাজলক্ষ্মী কহিল, খাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে যা রতন। যা পারিস খেগে যা—আর তোদের গাড়ীতে অন্য কেউ যদি খায় দিস্।

কিন্তু রতনের অত্যন্ত লজ্জা এবং সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া, একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কই, তুমি খেলে না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, আমার ক্ষিদে নেই, যা না রতন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গাড়ী ছেড়ে দেবে যে!

রতন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কহিল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু, মোচনমান কুলিতে খাবারটা ছুঁয়ে ফেলেছে। কত বলছি, মা, ইষ্টিসান থেকে কিছু কিনে এনে দিই, কিন্তু কিছুতেই না। বলিয়া সে আমার মুখের প্রতি সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঠিক যেন আমারই অনুমতি ভিক্ষা করিল।

কিন্তু আমার কথা কহিবার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—তুই যাবি, না, দাঁড়িয়ে তর্ক করবি ?

রতন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারের পাত্রটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ট্রেন ছাড়িলে রাজলক্ষ্মী আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। মাথার চুলের মধ্যে ধীরে-ধীরে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে কহিল, আচ্ছা দেখ—

বাধা দিয়া কহিলাম, পরে দেখব অখন। কিন্তু—

সেও আমাকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমার 'কিন্তু' দিয়ে লেকচার দিতে হবে না, আমি বুঝেছি। আমি মুসলমানকে ঘৃণাও করিনে, সে ছুঁলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়, তাও মনে করিনে। করলে নিজের হাতে তোমাকে খেতে দিতুন না।

কিন্তু নিজে খেলে না কেন ?

মেয়েমানুষের খেতে নেই।

কেন ?

কেন আবার কি ? মেয়েমানুষের খাওয়া নিষেধ।

কিন্তু পুরুষমানুষের নিষেধ নেই ?

রাজলক্ষ্মী আমার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, না; পুরুষমানুষের জন্যে আবার বাঁধাবাঁধি আইনকানুন কিসের জন্যে ? তারা যা ইচ্ছে খাক্, যা ইচ্ছে পরুক, যেমন ক'রে হোক সুখে থাক, আমরা আচার পালন ক'রে গেলেই হ'লো। আমরা শত কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু তোমরা পার কি ? এই যে সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই ক্ষিদেয় অন্ধকার দেখছিলে!

বলিলাম, তা হ'তে পারে, কিন্তু কষ্ট সইতে না-পারাটা আমাদেরও গৌরবের কথা নয়।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, এতে এতটুকু তোমাদের অগৌরব নেই। তোমরা ত আমাদের মত দাসীর জাত নয় যে, কষ্ট সহ্য করতে যাবে। লজ্জার কথা আমাদেরই, যদি না পারি।

কহিলাম, এ ন্যায়-শাস্ত্র তোমাকে শেখালে কে ? কাশীর গুরুদেব ?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের অত্যন্ত সন্নিকটে ঝুঁকিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার যা কিছু শিক্ষা, সে তোমারই কাছে! তোমার চেয়ে বড় গুরু আর আমার নেই।

বলিলাম, তা হ'লে গুরুর কাছে ঠিক উল্টোটিই শিখে রেখেছ। আমি কোনদিন বলিনে যে, তোমরা দাসীর জাত। বরঞ্চ এই কথাই চিরদিন মনে করি যে, তোমরা তা নও। তোমরা কোন দিক থেকে আমাদের চেয়ে এক তিল ছোট নও।

রাজলক্ষ্মীর চোখ দুটি সহসা ছল-ছল করিয়া উঠিল; বলিল, সে আমি জানি। আর জানি বলেই ত এ কথা তোমার কাছে শিখতে পেরেছি। তোমার মত সবাই যদি এমনি ক'রে ভাবতে পারতো, তা হ'লে পৃথিবী-শুদ্ধ সমস্ত মেয়ের মুখেই এ কথা শুনতে পেতে। কে বড়, কে ছোট, এই সমস্যাই কখন উঠত না।

অর্থাৎ, এ সত্য নির্ব্বিচারে সবাই মেনে নিত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

আমি তখন হাসিয়া বলিলাম, ভাগ্যে পৃথিবীশুদ্ধ মেয়েরা তোমার সঙ্গে একমত নয়, তাই রক্ষা। কিন্তু আপনাদের এত হীন মনে করতে তোমার লজ্জা করে না?

আমার উপহাস রাজলক্ষ্মী লক্ষ্য করিল কি না সন্দেহ; অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, কিন্তু এর মধ্যে ত কোন হীনতা নেই।

আমি কহিলাম, তা বটে। আমরা প্রভু, তোমরা দাসী, এই সংস্কারটাই এ দেশের মেয়েদের মনে এমনি বদ্ধমূল যে, এর হীনতাটাও আর তোমাদের চোখে পড়ে না। বোধকরি এই পাপেই পৃথিবীর সকল দেশের মেয়েদের চেয়ে তোমরাই আজ সত্যি-সত্যি ছোট হয়ে গেছ।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ শক্ত হইয়া বসিয়া, দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়। তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে ক'রে ছোট হয়ে যায়নি, তোমরাই তাদের ছোট মনে ক'রে ছোট ক'রে দিয়েছ, নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ। এই সত্যি কথা।

কথাটা অকস্মাৎ যেন নূতন করিয়া বাজিল। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি যেটুকু ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিক অনেকখানি সত্য ইহাতে লুকাইয়া আছে, যাহা আজ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি সেই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে তামাসা করছিলে। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে, সে তো জানো না?

জানি না, তাহা স্বীকার করিতেই সে কহিতে লাগিল, জানো না, তার কারণ আছে। কোন জিনিষ জানবার জন্য যতক্ষণ না মানুষের বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যাকুলতা ওঠে, ততক্ষণ সবই তার চোখে ঝাপ্‌সা হয়ে থাকে। এতদিন তোমার মুখে শুনে ভাবতুম, সত্যি যদি আমাদের দেশের লোকের দুঃখ এত বেশী, সত্যিই যদি আমাদের সমাজ এত ভয়ানক অন্ধ, তবে তার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকেই বা কি ক'রে, তাকে মেনে চলেই বা কি ক'রে!

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, আর তুমি বা এত বুঝবে কি ক'রে? কখনো এদের মধ্যে থাকোনি, কখনো এদের সুখদুঃখ ভোগ করোনি; তাই বাইরে থেকে বাইরের সমাজের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভাবতে, এদের বুঝি কষ্টের আর অবধি নেই। যে বড়লোক জমীদার পোলাও খেয়ে থাকে, সে তার কোন দরিদ্র প্রজাকে পান্তা ভাত খেতে দেখে যদি ভাবে, এর দুঃখের আর সীমা নেই—তার যেমন ভুল হয়, তোমারও তেমনি ভুল হয়েছে।

বলিলাম, তোমার তর্কটা যদিচ ন্যায়-শাস্ত্রের আইনে হচ্ছে না, তবুও জিজ্ঞাসা করি, কি ক'রে জানলে, দেশের সম্বন্ধে আমার এর চেয়ে বেশী জ্ঞান নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কি ক'রে থাকবে? তোমার মত স্বার্থপর লোক আর সংসারে আছে না কি? যে কেবল নিজের আরামের জন্যে পালিয়ে বেড়ায়, সে ঘরের খবর জানবে কোথা থেকে! তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশী নিন্দে ক'রে বেড়ায়, যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না।

তোমরা না জানো ভাল ক'রে পরের সমাজ, না জানো ভাল ক'রে নিজেদের সমাজ।

বলিলাম, তারপর ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, তারপরে এই যেমন বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে ম'রে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে ব'লে তাদের মত দুঃখী, তাদের মত পীড়িত, তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়েরা নয়। কিন্তু দিনকতক আমাদের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা কর দেখি! নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা করো—যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে,—কিন্তু তার আগে নয়।

কহিলাম, তারপরে ?

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, তুমি আমাকে তামাসা করছ, তা জানি। কিন্তু তামাসা করবার কথা আমি বলিনি। বাড়ীর গিন্নী সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়। অনেক সময় চাকরের চেয়েও। অনেক সময়ে চাকরদের চেয়েও বেশী খাটতে হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের বরঞ্চ অমনি দাসীর মতই থাকতে দাও, কিন্তু অন্য দেশের রাণী করে তোলবার চেষ্টা ক'রো না, আমি এই কথাটাই তোমাকে বলছি!

বলিলাম, তর্কশাস্ত্রের মাথায় পা দিয়ে ডোবাবার জো ক'রে তুলেছ বটে, কিন্তু, আমিও যে শাস্ত্রমতে তর্ক করবার ঠিক বাগ পাচ্ছিনে, তা মানছি।

সে কহিল, তর্ক করবার কিচ্ছু নেই।

বলিলাম, থাকলেও সে শক্তি নেই, ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু তোমার কথাটা একরকম বুঝতে পেরেছি।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাদের দেশে যে জন্যই হোক, ছোট-বড় উঁচু-নীচু সকলের মধ্যেই টাকার লোভটা ভয়ানক বেড়ে গেছে। কেউ আর অল্পে সন্তুষ্ট হ'তে জানে না,—চায়ও না। এতে যে কত অনিষ্ট হয়েছে, সে আমিই টের পেয়েছি।

কহিলাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু তুমি টের পেলে কেমন ক'রে ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, টাকার লোভেই ত আমাদের এই দশা, কিন্তু আগেকার কালে বোধ হয় এত লোভ ছিল না।

বলিলাম, এ ইতিহাসটা ঠিক জানিনে।

সে কহিতে লাগিল, কখ্খনো ছিল না। সেকালে কখ্খনো মায়ে টাকার লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না। তখন ধর্ম্মভয় ছিল। আজ ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে ? পথের ভিক্ষুক যে, সেও বোধ হয় আজ আমার চেয়ে ঢের বেশী সুখী।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার সত্যিই এত কষ্ট ?

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, আঁচল দিয়া চোখদুটি একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, আমার কথা আমার অন্তর্য্যামীই জানেন।

অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। গাড়ীর গতি মন্দীভূত হইয়া ক্রমশঃ একটা ছোট ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। খানিক পরে আবার চলিতে সুরু করিলে বলিলাম, কি করলে তোমার বাকী জীবনটা সুখে কাটে, আমাকে বলতে পারো ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ভেবে দেখেছি। আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চ'লে যায়, কিচ্ছু না থাকে—একেবারে নিরাশ্রয়, তা হ'লেই—

আবার দু'জনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার কথাটা এতই স্পষ্ট যে সবাই বুঝিতে পারে, আমারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কথা তোমার কবে থেকে মনে হয়েছে ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেদিন অভয়ার কথা শুনেছি সেইদিন থেকে।

বলিলাম, কিন্তু, তাদের জীবনযাত্রা ত এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে তারা যে কত দুঃখ পেতে পারে, এ ত তুমি জান না !

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, জানিনে সত্যি ; কিন্তু যত দুঃখই তারা

পাক, আমার মত দুঃখ যে তারা কোনদিন পাবে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, লক্ষ্মী, তোমার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি ক'রে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কি তোমাকে তাই বলছি? আর সম্ভ্রমই ত মানুষের আসল জিনিষ। সে-ই যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে ত্যাগের কথা মুখে আনছো কেন? তোমাকে ত আমি কিছুই ত্যাগ করতে বলিনি।

বলিলাম, বলনি বটে, কিন্তু পারি। সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্ভ্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জ্জন দিতে পারি।

রাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, আমার জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জ্জন দিতে হবে না। কিন্তু, তুমি কি মনে কর, শুধু তোমাদেরই সম্ভ্রম আছে, আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যেই কত শত সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধূলোর মত ফেলে দিয়েছে, সে কথা তুমি জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক, আর কথায় কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবে-ছিলুম, তা' ভুল। তুমি ঘুমোও,—এ সম্বন্ধে আর আমিও কোনদিন কথা কইব না, তুমিও ক'য়ো না। বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে বসিল।

পরদিন যথাসময়ে কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম এবং পিয়ারীর বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উপরের দুইখানি ঘর ভিন্ন প্রায় সমস্ত বাড়ীটাই নানা বয়সের বিধবা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ।

পিয়ারী কহিল, এঁরা সব আমার ভাড়াটে। বলিয়া মুখ ফিরিয়া একটু হাসিল।

বলিলাম, হাসলে যে? ভাড়া আদায় হয় না বুঝি?

পিয়ারী কহিল, না। বরঞ্চ কিছু কিছু দিতে হয়।

তার মানে?

পিয়ারী এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তার মানে ভবিষ্যতের আশায় আমাকেই খাওয়া-পরা দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়। বেঁচে থাকলে তবে ত পরে দেবে। এটা আর বুঝতে পার না?

আমিও হাসিয়া বলিলাম, পারি বইকি। এমনি ধারা ভবিষ্যতের আশায় কত লোককেই যে তোমাকে নিঃশব্দে অন্নবস্ত্র যোগাতে হয়, আমি তাই শুধু ভাবি।

তা ছাড়া দু'-একজন আমার কুটুম্বও আছেন।

তাই নাকি? কিন্তু জানলে কি ক'রে?

পিয়ারী একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, মায়ের সঙ্গে এসে এই কাশীতেই যে আমার মরণ হয়েছিল, সে বুঝি তোমার মনে নেই? তখন অসময়ে যাঁরা আমার সদ্‌গতি করেছিলেন, তাঁদের সে উপকার ত প্রাণ থাকতে ভোলা যায় না কি না!

চুপ করিয়া রহিলাম। পিয়ারী বলিতে লাগিল, বড় দয়ার শরীর এঁদের। তাই কাছে এনে একটু কড়া নজরে রেখেছি, লোকের আর বেশী উপকার করবার সুযোগ না পান।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমার বুকের ভেতরটায় কি আছে, আমার মাঝে মাঝে চিরে দেখতে ইচ্ছে করে রাজলক্ষ্মী।

ম'লে দেখো। আচ্ছা, ঘরে গিয়ে একটুখানি শোও গে যাও। আমার খাবার তৈরী হ'লে তোমাকে তুলব অখন।—বলিয়া সে হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার হৃদয়ের আজ যে বিশেষ কোন নূতন পরিচয় পাইলাম, তাহা নহে, কিন্তু আমার নিজের হৃদয়ে এই সামান্য কাহিনীটা একটা নূতন আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল।

রাত্রে পিয়ারী কহিল, তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়ে এতদূর নিয়ে

এলুম। গুরুদেব তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে তোমাকে দেখাতে পারলুম না।

বলিলাম, সেজন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ত?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

কহিলাম, আমার সঙ্গে যাবার কি কোন আবশ্যক আছে? না থাকে ত আমি একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আসতে চাই।

পিয়ারী বলিল, বন্ধুর বিয়ের ত এখনো কিছু দেরী আছে, চল না, আমিও প্রয়াগে একবার স্নান ক'রে আসি।

একটু মুস্কিলে পড়িলাম। আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক খুড়া সেখানে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন; মনে করিয়াছিলাম, তাঁর বাসায় গিয়াই উঠিব। তা'ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও সেইখানেই থাকিতেন।

পিয়ারী চক্ষের নিমেষে আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, আমি সঙ্গে থাকলে হয় ত কেউ দেখে ফেলতেও পারে, না?

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, বাস্তবিক, দুর্নাম জিনিষটা এমনি যে, লোকে মিথ্যে দুর্নামেও ভয় না ক'রে পারে না।

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তা বটে। আর বছর আরাতে ত তোমাকে একরকম কোলে নিয়েই আমার দিনরাত কাটত। ভাগ্যি সে অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলে নাই! সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনাশোনা বন্ধু-টন্ধু ছিল না?

অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা। মানুষ হিসেবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।

পিয়ারী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, খোঁটা! তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলেই বুঝি তখন গিয়েছিলুম? দ্যাখো, মানুষকে ব্যথা দেবারও একটা সীমা আছে—সেটা ডিঙিয়ে যেয়ো না।

একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল, কলঙ্কই বটে! কিন্তু আমি

হ'লে এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে দেখাতুম, কিন্তু এমন কথা মুখ দিয়ে বার ক'রতে পারতুম না।

বলিলাম, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ,—কিন্তু আমি যে অত্যন্ত ছোট মানুষ, রাজলক্ষ্মি! তোমার সঙ্গে যে আমার তুলনাই হয় না।

রাজলক্ষ্মী দৃপ্তস্বরে কহিল, প্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েছি, তোমার গরজে দিইনি। সেজন্যে তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হ'তে হবে না। কিন্তু ছোট মানুষ ব'লে যে তোমাকে ভাবতে পারিনে। তা হ'লে ত বাঁচতুম, গলায় দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়াতে পারতুম। বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী চা' দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল। ডাকিয়া বলিলাম, কথাবার্ত্তা বন্ধ না কি?

যে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, কিছু বলবে?

বলিলাম, চল, প্রয়াগ থেকে একবার ঘুরে আসি গে।

বেশ ত, যাও না।

তুমিও চল।

অনুগ্রহ নাকি?

চাও না?

না। যদি সময় হয়, চেয়ে নেব, এখন না। বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়া শুধু একটা মস্ত নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

দুপুরবেলা খাবার সময় হাসিয়া কহিলাম, আচ্ছা লক্ষ্মি, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে কি তুমি থাকতে পারো যে এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা ক'রচ?

রাজলক্ষ্মী শান্তগম্ভীর মুখে বলিল, সামনে থাকলে কেউ পারে না, আমিও পারব না। তা ছাড়া, সে আমার ইচ্ছেও নয়।

তবে ইচ্ছেটা কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কাল থেকেই ভাবছি, এই টানা-হেঁচড়া আর

না থামালেই নয়। তুমিও এক রকম স্পষ্টই জানিয়েছ, আমিও এক রকম ক'রে তা বুঝেছি। ভুল আমারই হয়েছে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার করছি। কিন্তু—

তাহাকে সহসা থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু কিছুই না। কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে যেচে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে মরছি—বলিয়া সে হঠাৎ মুখখানা যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ছেলেই বা কি ভাবছে, চাকর-বাকরেরাই বা কি মনে করছে! ছি ছি, এ যেন একটা হাসির ব্যাপার ক'রে তুলেছি।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বুড়ো বয়সে এ সব কি আমার সাজে! তুমি এলাহাবাদে যেতে চাইছিলে, তাই যাও। তবে পারো যদি, বর্ম্মা যাবার আগে একবার দেখা ক'রে যেয়ো। বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুধারও অন্তর্ধান হইল। তাহার মুখ দেখিয়া আজ আমার প্রথম জ্ঞান হইল, এ সব মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। সে সত্য-সত্যই কি একটা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে।

বিকালবেলায় আজ হিন্দুস্থানী দাসী জলখাবার প্রভৃতি লইয়া আসিলে একটু আশ্চর্য্য হইয়াই পিয়ারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম; এবং প্রত্যুত্তরে অধিকতর বিস্মিত হইয়া অবগত হইলাম, পিয়ারী বাড়ী নাই, সে সাজসজ্জা করিয়া, জুড়ীগাড়ী চড়িয়া কোথায় গিয়াছে। জুড়ীগাড়ীই বা কোথা হইতে আসিল, বেশভূষা করিয়াই বা তাহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন হইল, কিছুই বুঝিলাম না। তবে তাহার নিজের মুখের কথাটাই মনে পড়িল বটে যে, সে এই কাশীতেই একদিন মরিয়াছিল।

কিছুই বুঝিলাম না সত্য, তবুও সমস্ত মনটাই যেন এই সংবাদে বিস্বাদ হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইল, ঘরে-ঘরে আলো জ্বলিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী ফিরিল না।

চাদর কাঁধে ফেলিয়া একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে-পথে ঘুরিয়া কত কি দেখিয়া-শুনিয়া রাত্রি দশটার পর বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, পিয়ারী তখনও ফিরে নাই। ব্যাপার কি ? কেমন যেন একটা ভয় ভয় করিতে লাগিল। রতনকে ডাকিয়া সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া এ

সম্বন্ধে তত্ত্ব লইব কি না ভাবিতেছি, একটা ভারী জুড়ীর শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ফিটন আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্ব্বাঙ্গের জড়োয়া অলঙ্কার ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভদ্রলোক গাড়ীতে বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা মৃদুকণ্ঠে বোধ করি পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন,—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা বাঙ্গালী কি বিহারী, তাহাও চিনিতে পারিলাম না—চাবুক খাইয়া জুড়ী ঘোড়া চক্ষের পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

পনের

রাজলক্ষ্মী আমার তত্ত্ব লইতে সেই সাজেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী গলায় কহিলাম, ওরে পাষণ্ড রোহিণি! তুই গোবিন্দলালকে চিনিস্ না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিস্তল থাকিত! কিংবা একখানা তলোয়ার।

রাজলক্ষ্মী শুষ্ককণ্ঠে কহিল, তা হ'লে কি করতে?—খুন?

হাসিয়া বলিলাম, না ভাই পিয়ারী, আমার অত বড় নবাবী সখ নেই। তা' ছাড়া এই বিংশ শতাব্দীতে এমন নিষ্ঠুর রাক্ষসাধম কে আছে যে, সংসারের এই এত বড় একটা আনন্দের খনি পাথর দিয়ে বন্ধ ক'রে দেবে? বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ করি, হে বাইজীকুলরাণি! তুমি দীর্ঘজীবিনী হও,—তোমার রূপ ত্রিলোকজয়ী হোক্, তোমার কণ্ঠ বীণানিন্দিত হোক এবং ঐ দুটি চরণকমলের নৃত্য উর্ব্বশী-তিলোত্তমার গর্ব্ব খর্ব্ব করুক্,—আমি দূর হইতে তোমার জয়গান করিয়া ধন্য হই।

পিয়ারী কহিল, এ সকল কথার অর্থ?

বলিলাম, অর্থমনর্থং। সে যাক। আমি এই একটার ট্রেনে বিদায়

হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাঙ্গালীর পরমতীর্থ চাকুরীস্থান—অর্থাৎ বর্ম্মা। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা ক'রে যাবো।

আমি কোথায় গিয়েছিলুম, তাও শোনা তুমি আবশ্যক মনে করো না?

কিছু না, কিছু না।

এই ছুতো পেয়ে কি তুমি একেবারে চ'লে যাচ্ছো?

বলিলাম, পাপ মুখে এখনো বলতে পারিনে। এ গোলোক-ধাঁধা যদি পার হ'তে পারি, তবেই।

পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমার ওপর যা-ইচ্ছে-তাই অত্যাচার করতে পারো?

কহিলাম, যা ইচ্ছে? একেবারেই না। রবঞ্চ, জ্ঞানে-অজ্ঞানে অত্যাচার যদি বিন্দুমাত্রও কখনো ক'রে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।

তার মানে আজ রাত্রেই তুমি চ'লে যাবে?

হাঁ।

আমাকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেবার তোমার অধিকার আছে?

না, তিলমাত্র নেই। কিন্তু আমার যাওয়াকেই যদি শাস্তি দেওয়া মনে কর, তা হ'লে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

পিয়ারী হঠাৎ জবাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আমি কোথায় গিয়েছিলুম, কেন গিয়েছিলুম শুনবে না?

না। আমার মত নিয়ে যাওনি যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা ছাড়া আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পিয়ারী আহত ফণিনীর ন্যায় সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, আমারও শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বাঁদী নই যে, কোথায় যাবো, না যাবো, তারও অনুমতি নিতে হবে! যাবে যাও!—বলিয়া রূপ ও অলঙ্কারের একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সদর দরজায় একখানা গাড়ী থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

কহিল, এ কি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? আমাকে একলা ফেলে রেখে চ'লে যাবে, চাকর বাকরেরাই বা কি ভাববে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ রাখবে না?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমার চাকরদের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া ক'রো,—আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।

তা না হয় হ'লো, কিন্তু ফিরে গিয়ে বন্ধুকেই বা আমি কি জবাব দেব?

এই জবাব দেবে যে, তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

এ কি কেউ কখনও বিশ্বাস করে?

যাতে বিশ্বাস করে, সেই রকম কিছু একটা বানিয়ে ব'লো।

পিয়ারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, যদি অন্যায়ই একটা ক'রে থাকি, তার কি মাপ নেই? তুমি ক্ষমা না করলে আমাকে আর কে ক'রবে?

বলিলাম, পিয়ারী, এগুলো যে দাসী-বাঁদীদের মত কথা হচ্ছে। তোমার মুখে ও মানাচ্ছে না।

এই বিদ্রূপের, সহসা পিয়ারী কোন উত্তর দিতে পারিল না, আরক্তমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে প্রাণপণে আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বাহির হইতে গাড়োয়ান উচ্চৈঃস্বরে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই এবার পিয়ারী ধপ্ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো করতেই পারিনে, তা' জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজে হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ী লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিয়ো না। আজ এমন ক'রে তুমি চ'লে গেলে আমি কারও কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

হাতের ব্যাগটা রাখিয়া দিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, আচ্ছা, আজ তোমায়-আমায় একটা শেষ বোঝা-পড়া হয়ে যাক। তোমার আজকের আচরণ আমি মাপ করলুম। কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেছি, দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া আর চলবে না।

পিয়ারী তাহার একান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ আমার মুখের প্রতি তুলিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কেন ?

কহিলাম, অপ্রিয় সত্য সহ্য করতে পারবে ?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটে বলিল, পারবো।

কিন্তু ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিছু ব্যথা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠে না। আমাকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হইল। কিন্তু আজ যে কোনমতেই আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করব না, তাহা স্থির করিয়াছিলাম। তাই অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলাম, লক্ষ্মি, তোমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা করা যত কঠিনই হোক, আমি করলুম। কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকের উপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিষ আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো, শ্রদ্ধা করতে পারো, আমার জন্য অনেক দুঃখ সইতে পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ, এ রকম কাজ আমি মাঝে-মাঝে করবই ?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু মৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, তারপর ?

কহিলাম, তারপরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙে পড়বে। সেদিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও,—তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

পিয়ারী বহুক্ষণ নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তারপরে যখন মুখ তুলিলাম, দেখিলাম, দু'চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে! আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কি কখনো কোন ছোট কাজে আমি প্রবৃত্তি দিয়েছি ?

এই বিগলিত অশ্রুধারা আমার সংযমের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল ; কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতে দিলাম না। শান্ত ও দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, না, কোনদিন নয়। তুমি নিজে ছোট নয়,

ছোট কাজ তুমি নিজেও কখনো করতে পার না, অপরকেও করতে দিতে পারো না।

একটু থামিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিনবে না, তারা চিনবে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে আমি কত ছোট হয়ে যাবো, সে কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? সে তুমি কেমন ক'রে বাধা দেবে বলো ত?

রাজলক্ষ্মী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না।

বলিলাম, ভগবানের চক্ষে না হ'তে পারে, কিন্তু সংসারের চক্ষুও ত উপেক্ষা করবার বস্তু নয়, লক্ষ্মি!

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু তাঁর চক্ষুকেই ত সকলের আগে মানা উচিত?

কহিলাম, এক হিসাবে সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর চক্ষু ত সর্ব্বদা দেখা যায় না। যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি, রাজলক্ষ্মি! তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায়!

সেই ভয়ে আমাকে তুমি জন্মের মত ত্যাগ ক'রে চলে যাবে?

কহিলাম, আবার দেখা হবে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, বর্ম্মা যাবার পূর্ব্বে আমি আর একবার দেখা কোরে যাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রু-বিকৃত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাবে যাও। কিন্তু তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ ক'রে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম্ম, এ কথা আমি কখনো মানবো না।—বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এখনো সময় আছে, এখনো হয় ত একটার ট্রেন ধরিতে পারি। নিঃশব্দে ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

বক্‌শিসের লোভে গাড়ী প্রাণপণে ছুটিয়া ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পশ্চিমের ট্রেন প্লাটফর্ম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। খবর লইয়া জানিলাম, আধঘণ্টা পরেই একটা ট্রেন কলিকাতা অভিমুখে

রওনা হইবে। ভাবিলাম, সে-ই ভাল, গ্রামের মুখ বহুদিন দেখি নাই,—সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়াই বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব।

সুতরাং পশ্চিমের পরিবর্ত্তে পূবের টিকিট কিনিয়াই অর্দ্ধঘণ্টা পরে এক বিপরীতগামী বাষ্পীয়শকটে উঠিয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া গেলাম।

বহুকাল পরে আবার একদিন অপরাহ্ণ-বেলায় গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। আমার বাড়ীটা তখন আমাদের আত্মীয়-আত্মীয়া ও তাঁহাদের আত্মীয়-আত্মীয়ায় পরিপূর্ণ। সমস্ত ঘর-দুয়ার জুড়িয়া তাঁহারা আরামে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, ছুঁচটি রাখিবার স্থান নাই।

আমার আকস্মিক আগমন ও বাস করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে মুখ কালি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! এ তো সুখের কথা, আহ্লাদের কথা! এইবার একটি বিয়ে থা ক'রে সংসারী হ' শ্রীকান্ত, আমরা দেখে চক্ষু জুড়োাই।

বলিলাম, সেই জন্যই তো এসেছি। এখন আপাততঃ আমার মায়ের ঘরটা ছেড়ে দাও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুই।

আমার বাবার এক মাতুল-কন্যা তথায় স্বামিপুত্র লইয়া কিছুদিন হইতে বাস করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন, তাই ত!

বলিলাম, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বাইরের ঘরেই না হয় থাকব—। ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এককোণে চূণ এবং এককোণে সুরকি গাদা করা আছে। তাহারও মালিক বলিলেন, তাই ত! এগুলো দেখে শুনে কোথাও একটু সরাতে হবে দেখছি। তা' ঘরটা ত ছোট নয়, ততক্ষণ না হয়, এই ধারে একটা তক্তপোষ পেতে—কি বলিস শ্রীকান্ত?

বলিলাম, আচ্ছা, রাত্রির মত না হয় তাই হোক।

বস্তুতঃ এম্‌নি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে হোক একটু শুইতে পাইলেই যেন বাঁচি, এমনি মনে হইতেছিল। বর্ষায় সেই অসুখ হইতে শরীর আমার কোনদিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে নাই, ভিতরে-ভিতরে একটা গ্লানি প্রায়ই অনুভব করিতাম। তাই সন্ধ্যার পর হইতে মাথাটা যখন টিপ্‌-টিপ্‌ করিতে লাগিল, তখন বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম না।

রাঙাদিদি আসিয়া বলিলেন, "ওটা গরমে। ভাত খেয়ে ঘুমোলেই সেরে যাবে।"

তথাস্তু। তাই হইল। গুরুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গরম কাটাইতে অন্ন আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল—বেশ একটু জ্বর লইয়া।

রাঙাদিদি আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, কিছু না। ওটা ম্যালোয়ারী। ওতে ভাত খাওয়া চলে।

কিন্তু আজ আর সায় দিতে পারিলাম না। বলিলাম, না রাঙাদি, আমি এখনো তোমাদের ম্যালোয়ারী রাজার প্রজা নই। তাঁর দোহাই পেড়ে অত্যাচার হয় ত আমার সইবে না। আজ আমার একাদশী।

সমস্ত দিনরাত্রি গেল, পরদিন গেল, তাহার পরের দিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া মনে-মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। গোবিন্দ ডাক্তার এ-বেলা ও-বেলা আসিতে লাগিলেন, নাড়ী টিপিয়া, জিভ দেখিয়া, পেট ঠুকিয়া ভাল ভাল মুখরোচক সুস্বাদু ঔষধ যোগাইয়া মাত্র 'কেনা দাম'-টুকু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহ গড়াইয়া গেল। বাবার মাতুল—আমার ঠাকুর্দ্দাদা আসিয়া বলিলেন, তাই ত ভায়া, আমি বলি কি, সেখানে খবর দেওয়া যাক—তোমার পিসীমা আসুক। জ্বরটা কেমন যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ না করিলেও বুঝিলাম, ঠাকুর্দ্দাদা একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। এমনিভাবে আরও চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বরের কিছুই হইল না। সেদিন সকালে গোবিন্দ ডাক্তার আসিয়া যথারীতি ঔষধ দিয়া তিনি দিনের বক্রী 'কেনা দাম'-টুকু প্রার্থনা করিলেন। শয্যা হইতে কোন মতে হাত বাড়াইয়া ব্যাগ খুলিলাম—মনিব্যাগ নাই। শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ব্যাগ উপুড় করিয়া ফেলিয়া তন্ন-তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু যাহা নাই, তাহা পাওয়া গেল না।

গোবিন্দ ডাক্তার ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ব্যস্ত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—কিছু গিয়াছে কি না।

বলিলাম, আজ্ঞে না, যায়নি কিছুই।

কিন্তু তাহার ঔষধের মূল্য যখন দিতে পারিলাম না, তখন তিনি সমস্তই বুঝিয়া লইলেন। স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিল কত?

যৎসামান্য।

চাবিটা একটু সাবধানে রাখতে হয় বাবাজী। যাক্, তুমি আমার পর নয়, দামের জন্যে ভেবো না, ভাল হও, তারপরে যখন সুবিধে হবে, পাঠিয়ে দিয়ো, চিকিৎসার ত্রুটি হবে না।—এই বলিয়া ডাক্তারবাবু পর হইয়াও পরমাত্মীয়ের অধিক সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম, এ কথা কেউ যেন না শোনে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে বোঝা যাবে।

পাড়াগাঁয়ে বিশ্বাসের উপর টাকা ধার দেওয়ার প্রথা নাই। টাকা কেন, শুধু হাতে একটা সিকি ধার চাহিলেও সবাই বুঝিবে, লোকটা নিছক তামাসা করিতেছে। কারণ, সংসারে এমন নির্ব্বোধও কেহ আছে, শুধু হাতে ধার চায়, এ কথা পাড়াগাঁয়ের লোক ভাবিতেই পারে না; সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করিলাম না। প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম, এ কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইব না। একটু সুস্থ হইলে যাহা হয় করিব,—সম্ভবতঃ, অভয়াকে লিখিয়া টাকা আনাইব, মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সে সময় মিলিল না। সহসা যন্ত্রের সুর তারা হইতে উদারায় নামিয়া পড়িতেই বুঝিলাম, যেমন করিয়াই হৌক, আমার বিপদটা বাটীর ভিতরে আর অবিদিত নাই।

অবস্থাটা সংক্ষেপে জানাইয়া রাজলক্ষ্মীকে একখানা চিঠি লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজেকে এত হীন—এত অপমানিত মনে হইতে লাগিল যে, কোনমতেই পাঠাইতে পারিলাম না, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। পরদিন এমনি কাটিল। কিন্তু তাহার পরে আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। সে-দিন কোন দিকে আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে একপ্রকার মরীয়া হইয়াই কিছু টাকার জন্য রাজলক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া খানদুই পত্র লিখিয়া পাটনা ও কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

সে যে টাকা পাঠাইবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তথাপি সেদিন সকাল হইতেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত সংশয়ে ডাক-পিয়নের অপেক্ষায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া পথের উপর দৃষ্টি পাতিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

সময় বহিয়া গেল। আজ আর তাহার আশা নাই, মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে দূরে একখানা গাড়ীর শব্দে চকিত হইয়া বালিসে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী আসিয়া ঠিক সুমুখেই থামিল। দেখি, কোচম্যানের পার্শ্বে বসিয়া রতন। সে নীচে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেই যাহা চোখে পড়িল, তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করা কঠিন।

প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই গ্রামের পথের উপর রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।

রতন কহিল, ঐ যে বাবু!

রাজলক্ষ্মী শুধু একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র। গাড়োয়ান কহিল, মা, দেরী হবে ত? ঘোড়া খুলে দিই?

একটু দাঁড়াও—বলিয়া সে অবিচলিত ধীর-পদক্ষেপে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, হাত দিয়া আমার কপালের ও বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, এখন আর জ্বর নেই। ও-বেলায় সাতটার গাড়ীতে যাওয়া চলবে কি? ঘোড়া খুলে দিতে ব'লব?

আমি অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ছিলাম। কহিলাম, এ দু'দিন জ্বরটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু আমাকে কি আজই নিয়ে যেতে চাও?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না হয় আজ থাক। রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই, হিম লাগতে পারে, কা'ল সকালেই যাবো।

এতক্ষণে যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, এ গ্রামে, এ পাড়ার মধ্যে তুমি ঢুকলে কোন্ সাহসে? তুমি কি মনে কর, তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না?

রাজলক্ষ্মী সহজেই কহিল, বেশ যা হোক। এইখানে মানুষ হ'লাম, আর এখানে আমাকে চিনতে পারবে না? যে দেখবে, সে-ই চিনবে।

তবে?

কি ক'রব বল? আমার কপাল, নইলে তুমি এসে এখানে অসুখে পড়বে কেন?

এলে কেন? টাকা চেয়েছিলাম, টাকা পাঠিয়ে দিলেই হ'তো।

তা কি কখনো হয়? এত অসুখ শুনে কি শুধু টাকা পাঠিয়েই স্থির থাকতে পারি?

বললাম, তুমি না হয় স্থির হ'লে, কিন্তু আমাকে যে ভয়ানক অস্থির ক'রে তুললে। এখনি সবাই এসে পড়বে, তখন তুমিই বা মুখ দেখাবে কি ক'রে, আমিই বা জবাব দেব কি!

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে শুধু আর একবার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল, জবাব আর কি দেবে—আমার অদৃষ্ট!

তাহার উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্যে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছ? এখানে মুখ দেখাতেও তোমার বাধলো না?

রাজলক্ষ্মী তেমনি উদাসকণ্ঠে উত্তর দিল,—লজ্জা-সরম আমার যা-কিছু, এখন সব তুমি।

ইহার পরে আর বলিবই বা কি! শুনিবই বা কি! চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধুর বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

এখন কোথা থেকে আসছো? কলকাতা থেকে?

না, পাটনা থেকে। সেইখানেই তোমার চিঠি পেয়েছি।

আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়? পাটনায়?

রাজলক্ষ্মী একটু ভাবিয়া কহিল, একবার ত তোমাকে যেতেই হবে। আগে কলকাতায় যাই চল, সেখানে দেখিয়ে শুনিয়ে ভাল হ'লে—তারপর—

প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু তারপরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন, শুনি ?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "দানপত্র ত সেখানেই রেজেষ্ট্রী করতে হবে। লেখাপড়া সব একরকম ক'রে রেখেই এসেছি বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া ত হ'তে পারবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের দানপত্র ? কাকে কি দিলে ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ী দুটো ত বঙ্কুকেই দিয়েছি। শুধু কাশীর বাড়ীটা গুরুদেবকে দেব ভেবেছি। আর কোম্পানীর কাগজ, গয়না-টয়না-গুলো ত আমার বুদ্ধিবিবেচনামত একরকম ভাগ ক'রে এসেছি, এখন শুধু তুমি বললেই—

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কহিলাম, তা হ'লে তোমার নিজের রইল কি ? বঙ্কু যদি তোমার ভার না নেয় ? এখন তার নিজের সংসার হ'লো, যদি সে শেষে তোমাকেই খেতে না দেয় ?

আমি কি তাই চাইছি নাকি ? নিজের সমস্ত দান ক'রে কি অবশেষে তারই হাত-তোলা খেয়ে থাকবো ? তুমি ত বেশ।

ধৈর্য্য আর সংবরণ করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলাম, হরিশ্চন্দ্রের মত এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে দিলে কে ? খাবে কি ? বুড়ো বয়সে কার গলগ্রহ হ'তে যাবে ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমাকে রাগ করতে হবে না, তুমি শোও। আমাকে এ বুদ্ধি যে দিয়েছে, সে-ই আমাকে খেতে দেবে। আমি হাজার বুড়ো হলেও সে কখনও আমাকে গলগ্রহ ভাববে না। তুমি মিথ্যে মাথা গরম ক'রো না—স্থির হয়ে শোও।

স্থির হইয়াই শুইয়া পড়িলাম। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যকররঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল,—এমনি অপরূপ শোভায়-সৌন্দর্য্যে যেন বিশ্বভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রিসংসারের মধ্যে রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ, হিংসা-দ্বেষ কোথাও যেন আর কিছু নেই।

এই নির্ব্বাক নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইয়া যে উভয়ের কতক্ষণ কাটিয়াছিল, বোধ করি, কেহই হিসাব করি নাই, সহসা দ্বারের বাহিরে মানুষের গলা শুনিয়া দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম এবং রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবু প্রসন্ন ঠাকুর্দ্দাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু সহসা তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর্দ্দা যখন দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, তখন খবরটা তাঁহার কানে গিয়াছিল বটে, কে একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে গাড়ী করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক হইতে পারে, তাহা বোধ করি, কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই। সেইজন্যই বোধ হয়, এখন পর্য্যন্ত বাড়ীর মেয়েরা কেহ বাহিরে আসে নাই।

ঠাকুর্দ্দা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, ছোটখুড়ো, আমারও যেন মনে হচ্ছে, এঁকে কোথায় দেখেছি!

আমি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমিষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল, শ্রীকান্ত, এই সর্ব্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যই এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

একবার আমার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে কাজ নাই, আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব, এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটু চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেছ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুর্দ্দা, ডাক্তারবাবু এঁদের প্রণাম কর।

পলকের জন্য দু'জনের চোখোচোখি হইল, তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

তৃতীয় পৰ্ব্ব

এক

একদিন যে ভ্রমণ-কাহিনীর মাঝখানে অকস্মাৎ যবনিকা টানিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম, আবার একদিন তাহাকেই নিজের হাতে উদ্‌ঘাটিত করিবার আর আমার প্রবৃত্তি ছিল না। আমার সেই পল্লীগ্রামের যিনি ঠাকুর্দ্দাদা,—তিনি যখন আমার সেই নাটকীয় উক্তির প্রত্যুত্তরে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন, এবং রাজলক্ষ্মীর ভূমিষ্ঠ প্রণামের প্রত্যুত্তরে শুধু যেভাবে শশব্যস্তে দুই পা হটিয়া গিয়া বলিলেন, তাই নাকি ? আহা, বেশ বেশ—বেঁচে বর্ত্তে থাকো ! বলিয়া সকৌতুকে ডাক্তারটিকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন রাজলক্ষ্মীর মুখের যে ছবি দেখিয়াছিলাম সে ভুলিবার বস্তু নয়, ভুলিও নাই ; কিন্তু ভাবিয়াছিলাম সে আমারই একান্ত আমার—বহির্জগতে তাহার যেন কোন প্রকাশ কোন দিনই না থাকে—কিন্তু এখন ভাবিতেছি এ ভালই হইল যে সেই বহুদিবসের বন্ধ দুয়ার আবার আমাকে আসিয়াই খুলিতে হইল। যে অজানা রহস্যের উদ্দেশে বাহিরের ক্রুদ্ধ সংশয় অবিচারের রূপ ধরিয়া নিরন্তর ধাক্কা দিতেছে, এ ভালই হইল যে সেই অবরুদ্ধ দ্বার নিজের হাতেই অর্গলমুক্ত করিবার অবকাশ পাইলাম।

ঠাকুর্দ্দাদা চলিয়া গেলেন, রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তার পরে মুখ তুলিয়া একটুখানি নিষ্ফল হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, পায়ের ধূলো নিতে গিয়ে আমি তাঁকে ছুঁয়ে ফেলতুম না ; কিন্তু কেন তুমি ও কথা বলতে গেলে ? তার ত কোন দরকার ছিল না ! এ শুধু—

বাস্তবিক, এ শুধুই কেবল আপনাদের আপনি অপমান করিলাম। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাজারের বাইজী অপেক্ষা বিধবা-বিবাহের পত্নী যে ইঁহাদের কাছে উচ্চ আসন পায় না—সুতরাং নীচেই নামিলাম, কাহাকেও এতটুকু তুলিতে পারিলাম না, এই কথাটাই বলিতে গিয়া রাজলক্ষ্মী আর শেষ করিতে পারিল না।

সমস্তই বুঝিলাম। আর এই অবমানিতার সম্মুখে বড় কথার আস্ফালন

করিয়া কথা বাড়াইতে প্রবৃত্তি হইল না। যেমন নিঃশব্দে পড়িয়া ছিলাম, তেমনি নীরবেই পড়িয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মীও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর একটা কথাও কহিল না, ঠিক যেন আপনার ভাবনার মধ্যে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল, তার পরে সহসা অত্যন্ত কাছে কোথাও ডাক শুনিয়া যেন চমক ভাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রতনকে ডাকিয়া কহিল, গাড়ীটা শীগ্‌গির ঠিক করতে বলে দে, রতন, নইলে সেই রাত্রি এগারোটার ট্রেণে আবার যেতে হবে ; কিন্তু সে হলে কিছুতেই চলবে না— ভারি হিম লাগবে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই রতন আমার ব্যাগটা লইয়া গাড়ীর মাথায় তুলিয়া দিল, এবং আমার শোবার বিছানাটা বাঁধিয়া লইবার ইঙ্গিত জানাইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে আর আমি একটা কথাও কহি নাই, এখনও কোন প্রশ্ন করিলাম না। কোথায় যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

দিন-কয়েক পূর্ব্বেই এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আজ আবার তেমনি এক সায়াহ্ন-বেলায় নীরবে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলাম। সেদিনও কেহ আদর করিয়া গ্রহণ করে নাই, আজিও কেহ সস্নেহে বিদায় দিতে অগ্রসর হইয়া আসিল না। সেদিনও এমনিই ঘরে ঘরে তখন শাঁখ বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমনিই বসু-মল্লিকদের গোপাল-মন্দির হইতে আরতির কাঁসর-ঘণ্টার রব অস্পষ্ট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। তথাপি, সেদিনের সঙ্গে আজিকার প্রভেদটা যে কত বড়, সে কেবল আকাশের দেবতারাই দেখিতে লাগিলেন।

বাঙ্গলার এক নগণ্য পল্লীর জীর্ণ ভগ্ন গৃহের প্রতি মমতা আমার কোন কালেই ছিল না, ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়াকে ইতিপূর্ব্বে আমি ক্ষতিকর বলিয়া কোনদিনই বিবেচনা করি নাই, কিন্তু আজ যখন নিতান্ত অনাদরের মধ্য দিয়াই এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, কোন দিন, কোন ছলে, ইহাতে আবার কখনো প্রবেশ করিব তাহার কল্পনাকে পর্য্যন্ত যখন মনে স্থান দিতে পারিলাম না, তখনই এই অস্বাস্থ্যকর সামান্য গ্রামখানি একেবারে সকল দিক দিয়া আমার চোখের উপর অসামান্য হইয়া দেখা দিল। এবং যে গৃহ হইতে

এইমাত্র নির্ব্বাসিত হইয়া আসিলাম, আমার সেই পিতৃ-পিতামহের জীর্ণ মলিন আবাসখানির প্রতি আজ যেন আর লোভের অবধি রহিল না।

রাজলক্ষ্মী নীরবে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখের আসনটি গ্রহণ করিল, এবং বোধ হয় কদাচিৎ কোন পরিচিত পথিকের অশোভন কৌতূহল হইতে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিতেই গাড়ীর এক কোণে মাথা রাখিয়া দুইচক্ষু মুদ্রিত করিল।

রেল ষ্টেসনের উদ্দেশে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্য্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গেছেন। আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য-পথের দুই ধারে যদৃচ্ছা বর্দ্ধিত বঁইচি, শিয়াকুল এবং বেতের বন সঙ্কীর্ণ পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছে, এবং মাথার উপর আম-কাঁটালের ঘন সারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আঁধার যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া গাড়ী যখন অত্যন্ত সাবধানে অত্যন্ত মন্থর গমনে চলিতে লাগিল, আমি তখন দু'চক্ষু মেলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন আমার পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেদিন এই পথই বরযাত্রীদের কোলাহল ও পায়ে পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীরা তাঁহাদের মৃতদেহ নদীতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা আমার একদিন বধূবেশে গৃহ-প্রবেশ করিয়াছিলেন,—এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, তখন ধূলাবালির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম। তখনও এই পথ এমন নির্জ্জন, এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি, ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম্ম ছিল—তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই। দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ীর চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্নায় ভরা ধূলাবালির

পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহুকোটী অকৃতী সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই,—আর কোনদিন তোমার সেবায়, তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কিনা জানি না, কিন্তু আজ এই নির্ব্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্ত্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী তেমনি স্থির হইয়া আছে। আঁধার কোণের মধ্যে তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু অনুভব করিলাম, সে চোখ মুদিয়া যেন চিন্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া গেছে। মনে মনে বলিলাম, তাই যাক্। আজ হইতে নিজের চিন্তা-তরণীর হালখানা যখন তাহারই হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন এই অজানা নদীর কোথায় ঘূর্ণী, কোথায় চড়া, সে-ই খুঁজিয়া বাহির করুক।

এ জীবনে নিজের মনটাকে আমি নানা দিকে নানা অবস্থায় যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। ইহার ধাতটা আমি চিনি। অত্যন্ত কিছুই ইহার সহে না। অত্যন্ত সুখ, অত্যন্ত স্বাস্থ্য, অত্যন্ত ভাল থাকা, ইহাকে চিরদিন পীড়িত করে। কেহ অত্যন্ত ভালবাসিতেছে জানিবামাত্রই যে মন অহরহ পালাই পালাই করে, সে মন যে আজ কত দুঃখে হাল ছাড়িয়াছে, তাহা এ মনের স্রষ্টিকর্ত্তা ছাড়া আর কে জানিবে!

বাহিরের কালো আকাশের প্রতি একবার দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম, ভিতরের অদৃশ্য-প্রায় নিশ্চল প্রতিমার দিকেও একবার চক্ষু ফিরাইলাম, তাহার পরে জোড়হাতে আবার যে কাহাকে নমস্কার করিলাম জানি না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম ইহার আকর্ষণের দুঃসহ বেগ আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আনিয়াছে,—বহুবার বহু-পথে পলাইয়াছি, কিন্তু গোলক-ধাঁধার মত সকল পথই যখন বারম্বার আমাকে ইহারই হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন আর আমি বিদ্রোহ করিব না,—এইবার আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিলাম। এতকাল জীবনটাকে নিজের হাতে রাখিয়াই বা কি পাইয়াছি? কতটুকু সার্থক করিয়াছি? তবে, আজ যদি সে এমন হাতেই পড়িয়া থাকে, যে নিজের জীবনটাকে এমন আকণ্ঠ-মগ্ন পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারিয়াছে, সে কিছুতেই আর একটা জীবনকে তাহারই মধ্যে আবার ডুবাইয়া দিবে না।

কিন্তু এ সকল ত গেল আমার নিজের পক্ষ হইতে; কিন্তু অন্য পক্ষের আচরণ ঠিক আবার সেই পূর্ব্বেকার মত সুরু হইল। সমস্ত পথের মধ্যে একটাও কথা হইল না, এমনকি ষ্টেসনে পোঁছিয়াও কেহ আমাকে কোন প্রশ্ন করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। অল্প সময়েই কলিকাতা যাইবার গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল কিন্তু রতন টিকিট কেনার কাজ ফেলিয়া যাত্রীশালার ক্ষুদ্র এক কোণে আমার জন্য শয্যা রচনায় প্রবৃত্ত হইল। অতএব, বুঝা গেল এদিকে নয়, আমাদিগকে ভোরের ট্রেণে পশ্চিমে রওনা হইতে হইবে। কিন্তু, সেটা পাটনায় কিম্বা কাশীতে কিম্বা আর কোথাও, তাহা জানা না গেলেও এটা বেশ বুঝা গেল, এ-বিষয়ে আমার মতামত একেবারেই অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী অন্যত্র চাহিয়া অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়া ছিল, রতন হাতের কাজ শেষ করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, মা, খবর পেলাম একটু এগিয়ে গেলে ভাল খাবার সব রকমই পাওয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া কয়েকটা টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিল, বেশ ত, তাই যা না। কিন্তু দুধটা একটু দেখেশুনে নিস, বাসিটাসি আনিসনে যেন।

রতন কহিল, মা, তোমার নিজের জন্যে কিছু—

না, আমার জন্যে চাইনে।

এই 'না' যে কিরূপ তাহা আমরা সবাই জানি, এবং সকলের চেয়ে বেশি জানে বোধ হয়, রতন নিজে। তবুও সে বার-দুই পা ঘষিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কাল থেকেই ত এক রকম—

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কহিল, তুই কি শুনতে পাস্‌নে রতন? কালা হয়েছিস্‌?

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রতন চলিয়া গেল। কারণ, ইহার পরেও তর্ক করিতে পারে, এমন প্রবল পক্ষ ত আমি কাহাকেও দেখি না। আর প্রয়োজনই বা কি? রাজলক্ষ্মী মুখে স্বীকার না করিলেও আমি জানি রেলগাড়ীতে বা রেলের সম্পর্কিত কাহারও হাতে কিছু খাইতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। নিরর্থক কঠোর উপবাস করিতে ইহার জোড়া কোথাও দেখি নাই বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। কতদিন কত জিনিস ইহার বাটিতে

আসিতে দেখিয়াছি, দাসী-চাকরে খাইয়াছে, দরিদ্র প্রতিবেশীর ঘরে বিতরিত হইয়াছে, পচিয়া নষ্ট হইয়া ফেলা গিয়াছে, কিন্তু এ-সকল যাহার জন্য—সে মুখেও দিত না। জিজ্ঞাসা করিলে, তামাসা করিলে হাসিয়া বলিত, হাঁ, আমার আবার আচার! আমার আবার খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার! আমি ত সব খাই!

আচ্ছা, চোখের সামনে তার পরীক্ষা দাও?

পরীক্ষা? এখন? ওরে বাসরে! তা হ'লে আর বাঁচতে হবে! এই বলিয়া, সে না বাঁচিবার কোন কারণ না দেখাইয়াই অত্যন্ত জরুরি গৃহকর্ম্মের অছিলায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। সে মাছ-মাংস দুধ-ঘি খায় না আমি ক্রমশঃ জানিয়াছিলাম, কিন্তু এই না-খাওয়াটাই তাহার পক্ষে এত অশোভন, এত লজ্জার যে, ইহার উল্লেখেই সে যে লজ্জায় কোথায় পলাইবে খুঁজিয়া পাইত না। তাই সহজে আর খাওয়া লইয়া অনুরোধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। রতন ম্লানমুখে চলিয়া গেল, তখনও কথা কহিলাম না, খানিক পরে ঘটিতে গরম দুধ এবং ঠোঙায় মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী আমার জন্য দুধ ও কিছু খাবার রাখিয়া রতনের হাতে যখন সমস্তটা তুলিয়া দিল, তখনও কিছু বলিলাম না, এবং রতনের করুণ চক্ষের নীরব মিনতিও স্পষ্ট বুঝিয়া তেমনি নির্ব্বাক রহিলাম।

আজ কারণে অকারণে, কথায় কথায়, তাহার না-খাওয়াটাই আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। কিন্তু একদিন ঠিক এরূপ ছিল না। তখন উপহাস পরিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া কঠিন কটাক্ষও কম করি নাই। কিন্তু যত দিন গিয়াছে, ইহার আর একটা দিকও ভাবিয়া দেখিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছি। রতন চলিয়া গেলে আমার সেই কথাগুলাই আবার মনে পড়িতে লাগিল।

কবে, এবং কি ভাবিয়া যে সে এই কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল আমি জানি না। তখনও আমি ইহার জীবনের মধ্যে আসিয়া পড়ি নাই; কিন্তু প্রথম যখন সে অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য বস্তুর মাঝখানে বসিয়া স্বেচ্ছায় দিনের পর দিন গোপনে, নিঃশব্দে, আপনাকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছিল, সে কত কঠিন! কিরূপ দুঃসাধ্য! কলুষ ও সর্ব্ববিধ আবিলতার কেন্দ্র হইতে আপনাকে এই তপস্যার পথে অগ্রসর করিতে কতই না সে নীরবে সহিয়াছে! আজ এ বস্তু তাহার পক্ষে এমন সহজ, এমন স্বাভাবিক যে, আমাদের চক্ষে পর্য্যন্ত ইহার

গুরুত্ব নাই, বিশেষত্ব নাই, ইহার মূল্য যে কি তাহাও ঠিক জানি না, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে তাহার এই কঠিন সাধনার সবটুকুই কি একেবারে বিফল, একেবারে পণ্ডশ্রম হইয়া গেছে? আপনাকে বঞ্চিত করিবার এই যে শিক্ষা, এই যে অভ্যাস, এই যে পাইয়া ত্যাগ করিবার শক্তি, এ যদি না জীবনের মধ্যে তাহার অলক্ষ্যে সঞ্চিত হইয়া উঠিতে পাইত, আজ কি এমনি স্বচ্ছন্দে, এমনি অবলীলাক্রমে সে আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারিত! কোথাও কি কোন বন্ধনেই টান ধরিত না! সে ভালবাসিয়াছে। এমন কত লোকেই ত ভালবাসে, কিন্তু সর্ব্বত্যাগের দ্বারা তাহাকে এমন নিষ্পাপ, এমন একান্ত করিয়া লওয়া কি সংসারে এতই সুলভ?

যাত্রাশালায় আর কোন লোক ছিল না, রতনও বোধ করি কোথাও একটু অন্তরাল খুঁজিয়া লইয়া পড়িয়াছিল; দেখিলাম একটা মিট্‌মিটে আলোর নীচে রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিতেই সে চমকিয়া মুখ তুলিল, কহিল, তুমি ঘুমোওনি?

না, কিন্তু এই ধূলোবালির ওপর একলাটি চুপচাপ না থেকে আমার বিছানায় গিয়ে বসবে চল। এই বলিয়া তাহাকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়াই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলাম; কিন্তু নিজের কাছে আনিয়া আর কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, কেবল আস্তে আস্তে তাহার একটা হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এমনি গেল। আমার সন্দেহ যে অমূলক নয়, সে কেবল হঠাৎ তাহার চোখের কোণে হাত দিয়া অনুভব করিলাম। ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিয়া কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই রাজলক্ষ্মী আমার প্রসারিত পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চাপিয়া রহিল, কোনমতেই তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আনিতে পারিলাম না।

আবার তেম্‌নি নীরবে সময় কাটিতে লাগিল। সহসা এক সময় বলিয়া উঠিলাম, একটা কথা এখনো তোমাকে জানানো হয়নি, লক্ষ্মি!

সে চুপিচুপি কহিল, কি কথা?

ইহাই বলিতে গিয়া সংস্কারবশে প্রথমটা একটু বাধিল, কিন্তু থামিলাম না, কহিলাম, আজ থেকে নিজেকে তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিলাম, এর ভালমন্দের ভার এখন সম্পূর্ণ তোমার।

বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম সেই স্তিমিত আলোকে সে আমার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া আছে। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব ? তুমি বাঁয়া-তবলা বাজাতেও পারবে না, সারেঙ্গী বাজাতেও পারবে না। আর—

বলিলাম, আর-টা কি ? পান-তামাক জোগানো ? না, সেটা কিছুতেই পেরে উঠবো না।

কিন্তু আগের দুটো ?

বলিলাম, ভরসা দিলে পারলেও পারি। বলিয়া নিজেও একটু হাসিলাম।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি পারো ?

বলিলাম, আশা করতে ত দোষ নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। তারপরে নিঃশব্দে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ছাখো, মাঝে মাঝে তাই যেন আমার মনে হ'তো ; আবার ভাবতাম, যে মানুষ নিষ্ঠুরের মত বন্দুক নিয়ে কেবল জানোয়ার মেরে বেড়াতেই ভালবাসে, সে এর কি ধার ধারে ? এর ভেতরের এত বড় বেদনাকে অনুভব করাই কি তার সাধ্য ? বরঞ্চ শিকার করার মত আঘাত দিতে পারাতেই যেন তার বড় আনন্দ। তোমার দেওয়া অনেক দুঃখই কেবল এই ভেবে আমি সইতে পেরেছি।

এবার চুপ করিয়া থাকার পালা আমার। তাহার অভিযোগের মূলে যুক্তি লইয়া বিচার চলিতেও পারিত, সাফাই দিবার নজিরেরও হয় ত অভাব হইত না, কিন্তু সমস্ত বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইল। তাহার সত্য অনুভূতির কাছে মনে মনে আমাকে হার মানিতে হইল। কথাটাকে সে ঠিকমত বলিতেও পারে নাই, কিন্তু সঙ্গীতের যে অন্তরতম মূর্ত্তিটি কেবল ব্যথার ভিতর দিয়াই কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করে, সেই করুণায় অভিনিষিক্ত সদাজাগ্রত চৈতন্যই যেন রাজলক্ষ্মীর ঐ দু'টা কথার ইঙ্গিতে রূপ ধরিয়া দেখা দিল। এবং তাহার সংযম, তাহার ত্যাগ, তাহার হৃদয়ের শুচিতা, আবার একবার যেন আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহাকেই স্মরণ করাইয়া দিল।

তথাপি, একটা কথা তাহাকে বলিতেও পারিতাম। বলিতে পারিতাম, মানুষের একান্ত বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলা যে কি করিয়া একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস

করে, সে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। না হইলে আমি স্বহস্তে জীবহত্যা করিতে পারি, এতবড় পরমাশ্চর্য্য নিজের কাছে আর আমার কি আছে? যে একটা পিপীলিকার মৃত্যু পর্য্যন্ত সহিতে পারে না, রক্তমাখা যূপকাষ্ঠের চেহারা যাহার আহার-নিদ্রা কিছুদিনের মত ঘুচাইয়া দিতে পারে, যে পাড়ার অনাথ আশ্রয়হীন কুকুর বেড়ালের জন্য ছেলেবেলা কতদিন নিঃশব্দে উপবাস করিয়াছে,—তাহার বনের পশু, গাছের পাখীর প্রতি লক্ষ্য যে কি করিয়া স্থির হয়, এ ত কিছুতেই ভাবিয়া পাই না! আর একি শুধু কেবল আমিই এম্‌নি? যে রাজলক্ষ্মীর অন্তর বাহির আমার কাছে আজ আলোর ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেছে, সে কেমন করিয়া এতদিন বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া পিয়ারীর জীবনযাপন করিতে পারিল!

এই কথাটাই মনে আনিয়াও মুখে আনিতে পারিলাম না। কেবল তাহাকে ব্যথা দিব না বলিয়াই নয়, ভাবিলাম কি হইবে বলিয়া? দেব ও দানবে অনুক্ষণ কাঁধ মিলাইয়া মানুষকে যে কোথায় কোন্ ঠিকানায় অবিশ্রাম বহিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কি আমি জানি? কি করিয়া যে ভোগী একদিনে ত্যাগী হইয়া বাহির হইয়া যায়, নির্ম্মম নিষ্ঠুর একমুহূর্ত্তে করুণায় গলিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে, এ রহস্যের কতটুকু সন্ধান পাই? কোন্ নিভৃত কন্দরে যে মানবাত্মার গোপন সাধনা অকস্মাৎ একদিন সিদ্ধিতে ফুটিয়া উঠে, তাহার কি সংবাদ রাখি? ক্ষীণ আলোকে রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিলাম, এ যদি আমার ব্যথা দিবার শক্তিটাকেই কেবল দেখিতে পাইয়া থাকে এবং ব্যথা গ্রহণ করিবার অক্ষমতাকে স্নেহের প্রশ্রয়ে এতদিন ক্ষমা করিয়াই চলিয়া থাকে ত অভিমান করিবার আমার কি-ই বা আছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

বলিলাম, তবু ত' এ নিষ্ঠুরের জন্যই সর্ব্বত্যাগ করলে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, সর্ব্বত্যাগ আর কই? নিজেকে ত তুমি নিঃস্বত্ব হয়েই আজ আমাকে দিয়ে দিলে, সে ত আর চাইনে বলে ত্যাগ করতে পারলাম না।

বলিলাম, হাঁ, নিঃস্বত্ব হয়েই দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে ত তুমি আপনি দেখতে পাবে না—তাই, সে উল্লেখ আমি করবো না।

দুই

বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া আমাকে যে বেশ শক্ত করিয়াই ধরিয়াছিল তাহা পশ্চিমের সহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বুঝা গেল। পাটনা ষ্টেসন হইতে রাজলক্ষ্মীর বাড়ীতে আমি অনেকটা অচেতন অবস্থাতেই নীত হইলাম। ইহার পরের মাসটা আমাকে জ্বর, ডাক্তার এবং রাজলক্ষ্মী প্রায় অনুক্ষণ ঘেরিয়া রহিল।

জ্বর যখন ছাড়িল, তখন ডাক্তারবাবু বেশ স্পষ্ট করিয়াই গৃহস্বামিনীকে জানাইয়া দিলেন যে, যদিও এই সহরটা পশ্চিমেরই অন্তর্গত এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়াও খ্যাতি আছে, তথাপি তাঁহার পরামর্শ এই যে, রোগীকে অচিরে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক।

আবার একবার বাঁধাছাঁদা সুরু হইয়া গেল, কিন্তু এবার কিছু ঘটা করিয়া। রতনকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এবার কোথায় যাওয়া হবে রতন ?

দেখিলাম, এই নব-অভিযানের সে একেবারেই বিপক্ষে। সে খোলা দরজার প্রতি নজর রাখিয়া আভাসে-ইঙ্গিতে এবং ফিস্‌ফিস্ করিয়া যাহা কহিল, তাহাতে আমিও যেন দমিয়া গেলাম। রতন কহিল, বীরভূম জেলার এই ছোট গ্রামখানির নাম গঙ্গামাটি। ইহার পত্তনি যখন কেনা হয়, তখন সে একবার মাত্র মোক্তারজী কিষণলালের সহিত সেখানে গিয়াছিল। মা নিজে কখনও যান নাই—একবার গেলে পলাইয়া আসিতে পথ পাইবেন না। গ্রামে ভদ্র-পরিবার নাই বলিলেই হয়,—কেবল ছোটজাতে ভরা—তাদের না ছোঁয়া যায়, না আসে তারা কোন কাজে।

রাজলক্ষ্মী কেন যে এই সব ছোটজাতির মধ্যে গিয়া বাস করিতে চাহিতেছে, তাহার হেতু যেন কতকটা বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গামাটি কোথায় ?

রতন জানাইল, সাঁইথিয়া না কি এমনি একটা ইষ্টিসান হইতে প্রায় দশ-বারো ক্রোশ গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। পথ যেমন দুর্গম, তেমনি ভয়ানক। চারিদিকে মাঠ আর মাঠ। তাতে না হয় ফসল, না আছে এক ফোঁটা জল। কাঁকুরে মাটি, কোথাও রাঙা, আবার কোথাও যেন পুড়িয়া কালো হইয়া আছে। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আমাকেই বিশেষ লক্ষ্য

করিয়া পুনশ্চ কহিল, বাবু, মানুষে যে সেখানে কি সুখে থাকে আমি ত ভেবে পাইনে! আর যারা এই সব সোনার জায়গা ছেড়ে সে দেশে যেতে চায় তাদের আর কি বলবো!

মনে মনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিলাম। এই সকল সোনার স্থান ত্যাগ করিয়া কেন যে সেই মরুভূমির মধ্যে নির্ব্বান্ধব ছোটলোকের দেশে রাজলক্ষ্মী আমাকে লইয়া চলিয়াছে, তাহা ইহাকে বলাও যায় না, বুঝানোও চলে না।

শেষে বলিলাম, বোধ হয় আমার অসুখের জন্যই যেতে হচ্ছে রতন। এখানে থাকলে ভাল হবার আশা কম এ ভয় সব ডাক্তারেই দেখাচ্ছেন।

রতন বলিল, কিন্তু অসুখ কি কারও হয় না বাবু? সারাবার জন্যে কি তাদের সব ঐ গঙ্গামাটিতেই যেতে হয়?

মনে মনে বলিলাম, জানি না, তাদের সব কোন্ মাটিতে যাইতে হয়। হয় ত তাদের পীড়া সোজা, হয় ত তাদের সাধারণ মাটির উপরেই সারে; কিন্তু আমাদের ব্যাধি সহজও নয়, সাধারণও নয়; ইহার জন্য হয় ত ওই গঙ্গামাটিরই একান্ত প্রয়োজন।

রতন কহিতে লাগিল, মায়ের খরচের হিসেব-পত্রও আমরা কেউ কোনদিন ভেবে পেলাম না। সেখানে না আছে ঘর-দোর, না আছে কিছু। একজন গমস্তা আছে, তার কাছে হাজার-দুই টাকা পাঠানো হয়েছে, একটা মেটে বাড়ী তৈরী করবার জন্য। দেখুন দেখি বাবু, এ কি সব অনাছিষ্টি কাণ্ড-কারখানা! চাকর বলে' যেন আর আমরা কেউ মানুষ নয়!

তাহার ক্ষোভ এবং বিরক্তি দেখিয়া বলিলাম, নাই গেলে রতন অমন জায়গায়! জোর করে' ত তোমাকে কেউ কোথাও নিয়ে যেতে পারে না?

আমার কথায় রতন কোন সান্ত্বনা লাভ করিল না। কহিল, মা পারেন। কি জানি কি যাদু-মন্ত্র জানেন, যদি বলেন তোমাদের সব যমের বাড়ী যেতে হবে, এতগুলো লোকের মধ্যে আমাদের এমন সাহস কারও নেই যে বলে, না। এই বলিয়া সে মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেল।

কথাটা রতন নিতান্তই রাগ করিয়া বলিয়া গেল, কিন্তু আমাকে সে যেন অকস্মাৎ একটা নূতন তথ্যের সম্বাদ দিয়া গেল। কেবল আমিই নয়, সকলেরই

ঐ একই দশা! ওই যাদু-মন্ত্রের কথাটাই ভাবিতে লাগিলাম। মন্ত্র-তন্ত্রে যে সত্যই বিশ্বাস করি তাহা নয় কিন্তু এই একবাড়ী লোকের মধ্যে কাহারও যখন এতটুকু শক্তি নাই যে যমের-বাড়ী যাইবার আদেশটাকে পর্য্যন্ত তাহার অবহেলা করে, তখন সে বস্তুটাই বা কি!

ইহার সমস্ত সংস্রব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আমি কি না করিয়াছি! বিবাদ করিয়া বিদায় লইয়াছি, সন্ন্যাসী হইয়া দেখিয়াছি, এমন কি দেশত্যাগ করিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি—জীবনে আর না দেখা হয়; কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই একটা গোল বস্তুর উপর সরল রেখা টানিবার মত বারম্বার কেবল ব্যর্থ হইয়াই গিয়াছে। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া নিজের দুর্ব্বলতার কাছেই পরাজিত হইলাম, এই কথাটা মনে করিয়া অবশেষে যখন আত্মসমর্পণ করিলাম, তখন রতন আসিয়া আজ আমাকে এই খবরটা দিয়া গেল,—রাজলক্ষ্মী যাদু-মন্ত্র জানে!

তাই বটে! অথচ, এই রতনকেই জেরা করিলে জানা যাইবে সে নিজেও ইহা বিশ্বাস করে না।

হঠাৎ দেখি মস্ত একটা পাথরের বাটিতে কি কতকগুলো লইয়া এই পথেই রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া নীচে চলিয়াছে। ডাকিয়া কহিলাম, শোনো, সবাই বলে তুমি নাকি যাদু-মন্ত্র জানো?

সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, কি জানি?

বলিলাম, যাদু-মন্ত্র!

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, জানি। বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ আমার গায়ের জামাটা ঠাওর করিয়া দেখিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ওটা কালকের সেই বাসি জামাটা না?

নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, সেইটাই বটে; কিন্তু থাক্, বেশ ফর্সা আছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ফর্সার কথা নয়, পরিষ্কারের কথা বলছি। তারপরে একটুখানি হাসিয়া বলিল, বাইরের ওই দেখান ফর্সাটা নিয়েই চিরকাল গেলে! ওটা তাচ্ছিল্য করতেও আমি বলিনে, কিন্তু যে-ভেতরটা ঘামে ঘামে নোঙ্‌রা হয়ে ওঠে সেটা দেখতে শিখবে কবে? এই বলিয়া সে রতনকে ডাকা

দিল। কেহই জবাব দিল না। কারণ, কর্ত্রীর এই প্রকার উচ্চ মধুর আহ্বানের সাড়া দেওয়া এবাড়ীর বিধি নয়, বরঞ্চ, মিনিট পাঁচ-ছয় গা ঢাকা দিয়া থাকাই নিয়ম।

রাজলক্ষ্মী তখন হাতের পাত্রটা নামাইয়া রাখিয়া পাশের ঘর হইতে একটা কাচা জামা আনিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, তোমার মন্ত্রী রতনকে ব'লো যতক্ষণ সে যাদু-মন্ত্র না শিখছে ততক্ষণ যেন এই দরকারী কাগজগুলো হাত দিয়েই করে। এই বলিয়া সে পাথরের বাটীটা তুলিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেল।

জামাটা বদলাইতে গিয়া দেখিলাম তাহার ভিতরটা যথার্থই মলিন হইয়া গেছে। হইবার কথা, এবং আমিও যে আর কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহাও নয়, কিন্তু আমার মনটা ছিল নাকি ভাবিবার দিকেই, তাই অতি তুচ্ছ খোলসটার অন্তর-বাহিরের বৈসাদৃশ্যই আমাকে আবার নূতন আঘাত দিল।

রাজলক্ষ্মীর শুচি-বায়ুগ্রস্ততা অনেক সময়েই আমাদের কাছে নিরর্থক, পীড়াদায়ক, এমনকি অত্যাচার বলিয়াও ঠেকিয়াছে, এবং এখনই যে তাহার সমস্তটাই এক মুহূর্ত্তে মন হইতে ধুইয়া মুছিয়া গেল, তাহাও সত্য নহে, কিন্তু এই শেষ শ্লেষটুকুর মধ্যে যে বস্তুটা আমি এতদিন মন দিয়া দেখি নাই, তাহাই দেখিতে পাইলাম। যেখানে এই অদ্ভুত মানুষটির ব্যক্ত ও অব্যক্ত জীবনের ধারা দু'টা একান্ত প্রতিকূলে বহিয়া চলিয়াছে, ঠিক সেই স্থানটাতেই আজ গিয়া আমার চক্ষু পড়িল। একদিন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম, শৈশবে রাজলক্ষ্মী যাহাকে ভালবাসিয়াছিল তাহাকেই পিয়ারী তাহার উন্মাদ যৌবনের কোন অতৃপ্ত লালসার পঙ্ক হইতে এমন করিয়া অতি সহজে সহস্রদল-বিকশিত পদ্মের মত চক্ষের নিমেষে বাহির করিয়া দিল! আজ মনে হইল সে ত পিয়ারী নয়—সে রাজলক্ষ্মীই বটে! রাজলক্ষ্মী ও পিয়ারী এই দু'টি নামের মধ্যে যে তাহার নারী-জীবনের কত বড় ইঙ্গিত গোপন ছিল, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই বলিয়াই, মাঝে মাঝে সংশয়ে ভাবিয়াছি একের মধ্যে আর একজন এতকাল কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল! কিন্তু মানুষ যে এমনিই! তাই ত সে মানুষ!

পিয়ারীর সমগ্র ইতিহাস আমি জানিও না, জানিতেও ইচ্ছা করি না, রাজলক্ষ্মীরই যে সমস্ত ইতিবৃত্ত জানি তাও নয়, শুধু এইটুকুই জানি দু'জনের মর্ম্মে ও কর্ম্মে চিরদিন কোন মিল, কোন সামঞ্জস্যই ছিল না, চিরদিনই উভয়ে পরস্পরের উল্টা স্রোতে বহিয়া গেছে! তাই একের নিভৃত সরসীতে যখন শুদ্ধ সুন্দর প্রেমের কমল ধীরে ধীরে অনুক্ষণ দলের পর দল মেলিয়াছে, তখন অপরের দুর্দ্দান্ত জীবনের ঘূর্ণীবায়ু সেখানে ব্যাঘাত করিবে কি, প্রবেশের পথই পায় নাই! তাই ত তাহার একটা পাপড়িও খসে নাই, এতটুকু ধূলা-বালিও উড়িয়া গিয়া আজও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শীতের সন্ধ্যা অচিরে গাঢ় হইয়া আসিল, আমি কিন্তু সেইখানে বসিয়া ভাবিতেই লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম, মানুষ ত কেবল তাহার দেহটাই নয়! পিয়ারী নাই, সে মরিয়াছে। কিন্তু একদিন যদি সে তার ওই দেহটার গায়ে কিছু কালি দিয়াই থাকে ত সেইটুকুই কি কেবল বড় করিয়া দেখিব, আর যে রাজলক্ষ্মী তাহার সহস্র কোটি দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া আজ তাহার অকলঙ্ক শুভ্রতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে মুখ ফিরাইয়া বিদায় দিব! মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, কেবল তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুল-ভ্রান্তি দিয়া মানুষের বিচার করিব, আর যে দেবতা সকল দুঃখ, সকল ব্যথা, সকল অপমান, নিঃশব্দে বহন করিয়াও আজ সস্মিত-মুখে তাহারই মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাঁহাকে বসিতে দিবার কোথাও আসন পাতিয়া দিব না? সেই কি মানুষের সত্যকার বিচার হইবে? আমার মন যেন আজ তাহার সকল শক্তি দিয়া বলিতে লাগিল, না না, কখনই না! এ কখনই না! এমন যে হইতেই পারে না। সে বেশীদিন নয়, নিজেকে দুর্ব্বল, শ্রান্ত ও পরাজিত ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীর হাতে একদিন আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন সেই পরাভূতের আত্মত্যাগের মধ্যে বড় একটা দীনতা ছিল। আমার মন যেন ইহা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু আজ আমার সেই মন যেন সহসা সবলে, এই কথাটাই বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ও দান দানই নয়, ও ফাঁকি। যে পিয়ারীকে তুমি জানিতে না, সে তোমার জানার বাহিরেই পড়িয়া থাক্; কিন্তু যে রাজলক্ষ্মী একদিন তোমারই ছিল, আজ তাহাকেই তুমি সকল চিত্ত দিয়া গ্রহণ কর, এবং যাঁহার

হাত দিয়া সংসারে সকল সার্থকতা নিরন্তর ঝরিতেছে, ইহারও শেষ সার্থকতা তাঁহারই হাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও।

নূতন চাকরটা আলো আনিতেছিল তাহাকে বিদায় দিয়া অন্ধকারেই বসিয়া রহিলাম, এবং মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীর সকল ভাল সকল মন্দের সহিত আজ তাহাকে নিলাম। এইটুকুই আমি পারি, কেবল এইটুকু আমার হাতে; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত যাঁহার হাতে, সেই অতিরিক্তের বোঝা তাঁহাকেই দিলাম। এই বলিয়া সেই অন্ধকারেই খাটের বাজুর উপর নীরবে মাথা রাখিলাম।

পূর্ব্বের মত পরদিনও যথারীতি আয়োজন চলিল, এবং তাহার পরের দিনও সারাদিনব্যাপী উদ্যমের অবধি রহিল না। সেদিন দুপুর-বেলায় প্রকাণ্ড একটা সিন্দুকে থালা-ঘটী-বাটি-গাড়ু-গেলাস-বক্‌নো-পিলসুজ অপর্য্যাপ্ত ভরা হইতেছিল। আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়া ও-সমস্ত দেখিতেছিলাম। এক সময়ে ইসারায় কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব হচ্ছে কি? তুমি কি আর ফিরে আসতে চাও না নাকি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, ফিরে কোথায় আসব শুনি?

আমার মনে পড়িল এ বাড়ী সে বঙ্কুকে দান করিয়াছে। কহিলাম, কিন্তু ধর যদি সে জায়গা তোমার বেশি দিন ভাল না লাগে?

রাজলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার জন্যে তোমার মন খারাপ করবার দরকার নেই। তোমার ভাল না লাগলে চলে এসো, আমি তাতে বাধা দেব না।

তাহার কথার ভঙ্গিতে আমি আঘাত পাইয়া চুপ করিলাম। এটা আমি বহুবার দেখিয়াছি, সে আমার এই ধরণের কোন প্রশ্নই যেন সরল চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না। আমিও যে কাহাকেও অকপটে ভালবাসিতে পারি, কিংবা তাহার সংস্রবে স্থির হইয়া বাস করিতে পারি, ইহা কিছুতেই যেন তাহার মনের সঙ্গে গাঁথিয়া এক হইয়া উঠিতে চায় না। সংশয়ের আলোড়নে অবিশ্বাস এক মুহূর্ত্তেই এমন উগ্র হইয়া বাহিরে আসে যে, তাহার জ্বালা বহুক্ষণ অবধি উভয়ের মনেই রি রি করিয়া জ্বলিতে থাকে। এই অবিশ্বাসের আগুন যে কবে নিবিবে এবং কেমন করিয়া নিবিবে, আমি তাহার কোন কিনারাই ভাবিয়া

পাই না। সেও ইহারই সন্ধানে অবিশ্রাম ঘুরিতেছে, এবং গঙ্গামাটি এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করিয়া দিবে কি না, সে তথ্য যাঁহার হাতে তিনি অলক্ষ্যে চুপ করিয়াই আছেন।

সর্ব্ববিধ আয়োজনে আরও দিন-চারেক কাটিল এবং আরও দিন-দুই গেল শুভক্ষণের প্রতীক্ষায়। তার পরে একদিন সকালে অপরিচিত গঙ্গামাটির উদ্দেশে আমরা সত্যসত্যই যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথটা আমার ভাল কাটিল না—মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। আর সকলের চেয়ে খারাপ কাটিল বোধ করি রতনের। সে মুখখানা অসম্ভব ভারী করিয়া গাড়ীর এক কোণে চুপ-চাপ বসিয়া রহিল; ষ্টেসনের পর ষ্টেসন গেল, কোন কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কথা। স্থানটা জানা কি অজানা, ভাল কি মন্দ, স্বাস্থ্যকর কিংবা ম্যালেরিয়ায় ভরা সেদিকে আমার খেয়ালই ছিল না; আমি ভাবিতেছিলাম, যদিচ জীবনটা এতদিন আমার নিরুপদ্রবে কাটে নাই, ইহার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুল-চুক, অনেক দুঃখ-দৈন্যই গিয়াছে, তবুও সে-সব আমার অত্যন্ত পরিচিত। এই দীর্ঘ দিনে তাহাদের সহিত মোকাবেলা ত বটেই, বরঞ্চ এক প্রকারের স্নেহই জন্মিয়া গিয়াছে। তাহাদের জন্য আমিও কাহাকেও দোষ দিই না, আমাকেও আর বড় কেহ দোষ দিয়া সময় নষ্ট করে না, কিন্তু এই যে কোথায় কি একটা নূতনত্বের মধ্যে নিশ্চিত চলিয়াছি, এই নিশ্চয়তাই আমাকে বিকল করিয়াছে। আজ নয় কাল বলিয়া আর দেরী করিবার রাস্তা নাই। অথচ ইহার না জানি ভাল, না জানি মন্দ। তাই ইহার ভাল-মন্দ কোনটাই আজ আর কোন মতেই ভাল লাগে না। গাড়ী যতই দ্রুতবেগে গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে চলিয়াছে, ততই এই অজ্ঞাত রহস্যের বোঝা আমার বুকের উপর চাপিয়া চাপিয়া বসিতেছে। কত কি যে মনে হইতে লাগিল, তাহার অবধি নাই। মনে হইল, অচির ভবিষ্যতে হয় ত আমাকেই কেন্দ্র করিয়া একটা বিশ্রী দল গড়িয়া উঠিবে, তাহাদের না পারিব লইতে, না পারিব ফেলিতে। তখন কি হইবে, আর কি যে হইবে না, ভাবিতেও সমস্ত মনটা যেন হিম হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী জানালার বাহিরে দু'চক্ষু মেলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। সহসা মনে হইল ইহাকে আমি কোন দিন ভালবাসি নাই। তবু

ইহাকেই আমার ভালবাসিতেই হইবে; কোথাও কোন দিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এতবড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে! অথচ, একটা দিন পূর্ব্বেও এই দ্বিধার যাঁতা-কল হইতে আত্মরক্ষা করিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। তখন মনে মনে সবলে বলিয়াছিলাম, তোমার সকল ভাল-মন্দের সঙ্গেই তোমাকে নিলাম লক্ষ্মী! অথচ, আজ আমার মন এমন বিক্ষিপ্ত এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! তাই ভাবি, সংসার করিব বলায় এবং সত্যকার করায় কত বড়ই না ব্যবধান!

সাঁইথিয়া স্টেসনে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল, তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছে। রাজলক্ষ্মীর গমস্তা কাশীরাম স্বয়ং স্টেসনে আসিতে পারেন নাই, সেদিকের ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু জন-দুই লোক পাঠাইয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহার রোকায় অবগত হওয়া গেল যে, ঈশ্বরেচ্ছায় 'অত্র' অর্থাৎ তিনি এবং তাঁহার গঙ্গামাটির সমস্ত কুশল। আদেশ মত বাহিরে খান-চারেক গো-যান অপেক্ষা করিতেছে—তাহার দুইখানি খোলা এবং দুইখানি ছই দেওয়া। একখানিতে পুরু করিয়া খড়, আর খেজুর পাতার চাটাই বিছানো—সেখানি স্বয়ং কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর। অপরখানিতে সামান্য কিছু খড় আছে বটে, কিন্তু চাটাই নাই। সেখানি ভৃত্যাদি অনুচরগণের জন্য। খোলা দুইখানিতে মালপত্র বোঝাই হইবে, এবং যদ্যাপিস্যাৎ সঙ্কুলান না হয় ত, পাইকদিগকে হুকুম করিলে বাজার হইতে আরও একটা যোগাড় করিয়া আনিবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রা করাই বিধেয়। কারণ অন্যথা কর্ত্রীঠাকুরাণীর সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এবং এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত করাইতেছেন যে পথে ভয়াদি কিছু নাই—স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারেন।

কর্ত্রীঠাকুরাণী রোকা পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন মাত্র। এবং যে ইহা দিল, তাহাকে ভয়াদির কোন প্রশ্ন না করিয়া কেবল প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বাবা, কাছাকাছি একটা পুকুর-টুকুর আছে দেখিয়ে দিতে পার, একটা ডুব দিয়ে আসি?

আছে বইকি মা'ঠান। উই যে হোথাকে—

তা' হলে চল ত বাবা দেখিয়ে দেবে; এই বলিয়া সে তাহাকে এবং রতনকে

সঙ্গে লইয়া কোথাকার কোন্ অজানা পুকুরে স্নানাহ্নিক করিতে চলিয়া গেল। অসুখ প্রভৃতির ভয় দেখান নিরর্থক বলিয়া আমি প্রতিবাদও করিলাম না। বিশেষতঃ ইহাতেই যদি বা সে কিছু খায়, বাধা দিলে সেটাও তাহার আজিকার মত বন্ধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু আজ সে মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। গোরুর গাড়ীতে জিনিস-পত্র বোঝাই চলিতেছিল, সামান্য দুই-একটা বিছানা খুলিয়া গাড়ীতে পাতা হইতেছে। আমাকে সে কহিল, তুমি কেন এই বেলা কিছু খেয়ে নাও না? সমস্তই ত আনা হয়েছে।

বলিলাম, দাও।

গাছতলায় আসন পাতিয়া একটা কলাপাতে সে সমস্ত গুছাইয়া দিতেছে, আমি নিস্পৃহ চক্ষে কেবলমাত্র তাহার প্রতি চাহিয়া আছি, এমন সময়ে এক মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাকিল, নারায়ণ!

রাজলক্ষ্মী তাহার ঝুঁটি-করা ভিজা চুলের উপর বাঁ হাতের পিছন দিয়া আঁচলটা আর একটুখানি টানিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আসুন।

অকস্মাৎ এই নিঃসঙ্কোচ নিমন্ত্রণের শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম এক সাধু দাঁড়াইয়া। অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তাহার বয়স বেশী নয়, বোধ হয় কুড়ি-একুশের মধ্যেই, কিন্তু যেমন সুকুমার তেমন সুশ্রী! চেহারাটা কৃশতার দিকেই —হয়ত, একটু দীর্ঘকায় বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু রঙ্ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। চোখ মুখ, ভ্রূ ও কপালের গঠন নিখুঁত বলিলেই হয়। বাস্তবিক পুরুষের এত রূপ আর আমি কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। তাহার পরিধানের গেরুয়া বস্ত্রখানি স্থানে স্থানে ছিন্ন—গ্রন্থি-বাঁধা। গায়ের গেরুয়া পাঞ্জাবীরও যেমন জীর্ণদশা, পায়ের পাঞ্জাবী জুতা জোড়াটিও প্রায় তদ্রূপ। হারাইলে দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু নাই। রাজলক্ষ্মী ভূমিষ্ট প্রণাম করিয়া আসন পাতিয়া দিল। মুখ তুলিয়া কহিল, আমি ততক্ষণ খাবার ঠিক করি, আপনাকে মুখ হাত ধোবার জল দিক?

সাধু কহিলেন, তা দিক, কিন্তু আপনার কাছে আমি অন্য প্রয়োজনে এসেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আচ্ছা, আপনি খেতে বসুন, সে পরে হবে এখন। বাড়ী ফেরবার টিকিট চাই ত? সে আমি কিনে দেব। এই বলিয়া সে মুখ ফিরিয়া হাসি গোপন করিল।

সাধুজী গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, না, সে প্রয়োজন নেই। আমি খবর নিয়েছি আপনারা গঙ্গামাটি যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে একটা ভারী বাক্স আছে, সেটা যদি কতকটা পথ আপনাদের গাড়ীতে তুলে নেন। আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আর বেশী কথা কি? কিন্তু আপনি নিজে?

আমি হেঁটেই যেতে পারব। বেশী দূর নয়, ক্রোশ ছয়-সাত হবে।

রাজলক্ষ্মী আর কিছু না বলিয়া রতনকে ডাকিয়া জল দিতে বলিল, এবং নিজে পরিপাটী করিয়া সাধুজীর খাবার সাজাইতে নিযুক্ত হইল। এই কাজটি রাজলক্ষ্মীর নিজস্ব বস্তু, ইহাতে তাহার জোড়া পাওয়া ভার।

সাধু খাইতে বসিলেন, আমিও বসিলাম। রাজলক্ষ্মী খাবারের হাঁড়ি লইয়া পাশেই রহিল। মিনিট-দুই পরে রাজলক্ষ্মী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সাধুজী, আপনার নামটি?

সাধু খাইতে খাইতে কহিলেন, বজ্রানন্দ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাপ্‌রে বাপ্! ডাক নামটি?

তাহার কথার ধরণে চাহিয়া দেখিলাম তাহার সমস্ত মুখখানি চাপা হাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে হাসিল না, আমিও আহারে মন দিলাম। সাধুজী বলিলেন, সে নামের সঙ্গে আর ত কোন সম্বন্ধ নেই! নিজেরও না, পরেরও না।

রাজলক্ষ্মী সহজেই সায় দিয়া কহিল, তা বটে। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সাধুজী, আপনি বাড়ী থেকে পালিয়েছেন কত দিন?

প্রশ্নটি অত্যন্ত অভদ্র। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর মুখে হাসি নাই বটে, কিন্তু যে পিয়ারীর মুখখানি আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, এখন রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমিষে আমার তাহাকেই মনে পড়িয়া গেল। সেই পুরানো দিনের সমস্ত সরসতা তাহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে যেন সজীব হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে!

সাধু একটা ঢোক গিলিয়া কহিলেন, আপনার এ কৌতূহল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না, ভাল মানুষটির মত মাথা নাড়িয়া কহিল, তা সত্যি। তবে, একবার নাকি ভারি ভুগতে হয়েছে তাই,—এই বলিয়া সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, হাঁ গা, বলত তোমার সেই উট আর টাট্টু-ঘোড়ার গল্পটি? সাধুজীকে একবার শুনিয়ে দাও ত—আহা হা! ষাট! ষাট! কে বুঝি বাড়ীতে নাম করছে।

সাধুজী বোধ হয় হাসি চাপিতে গিয়াই একটা বিষম খাইলেন। এতক্ষণ আমার সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই, কর্ত্রীঠাকুরাণীর আড়ালে কতকটা অনুচরের মতই ছিলাম। এখন সাধুজী বিষম সামলাইয়া যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সহিত আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি তাহ'লে একবার সন্ন্যাসী—

আমার মুখে লুচি ছিল, বেশী কথার যো ছিল না, তাই ডান হাতের চারটে আঙুল তুলিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম,—উঁহু হুঁ; একবার নয়, একবার নয়—

এবার সাধুজীর গাম্ভীর্য্য আর বজায় রহিল না, সে এবং রাজলক্ষ্মী দু'জনেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে সাধু কহিলেন, ফিরলেন কেন?

লুচির ডেলাটা তখনও গিলিতে পারি নাই, শুধু রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া দিলাম।

রাজলক্ষ্মী তর্জ্জন করিয়া উঠিল, বলিল, হাঁ, তাই বই কি! আচ্ছা একবার না হয় আমারি জন্যে,—তাও ঠিক সত্যি নয়; আসলে ভয়ানক অসুখে পড়েই,—কিন্তু আর তিন বার?

কহিলাম, সেও প্রায় কাছাকাছি,—মশার কামড়ে। ওটা কিছুতেই চামড়ায় সইল না। আচ্ছা—

সাধু হাসিয়া কহিলেন, আমাকে আপনি বজ্রানন্দ বলেই ডাকবেন। আপনার নামটি—

আমার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী জবাব দিল। কহিল, ওঁর নামে কি হবে? উনি বয়সে অনেক বড়, ওঁকে দাদা বলেই ডাকবেন। আর আমাকেও বৌদিদি

বলে ডাকলে রাগ ক'রব না। আর আমিই কোন না বয়সে তোমার বছর-পাঁচেকের বড় হব!

সাধুজীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আমিও এতটা প্রত্যাশা করি নাই। বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম এ সেই পিয়ারী! সেই স্বচ্ছ, সহজ, স্নেহাতুরা আনন্দময়ী! সেই যে আমাকে কোনমতেই শ্মশানে যাইতে দিতে চাহে নাই, এবং কিছুতেই রাজসংসর্গে টিকিতে দিল না,—এ সেই। এই যে ছেলেটি তাহার কোথাকার স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে,—সেখানকার সমস্ত অজানা বেদনা রাজলক্ষ্মীর বুক জুড়িয়া টান ধরিয়াছে। কোনমতে ইহাকে সে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চায়।

সাধু বেচারা লজ্জার ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া কহিল, দেখুন, দাদা বলতে আমার তত আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসীদের ওসব ব'লে ডাকতে নেই।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র অপ্রতিভ হইল না। কহিল, নেই কেন? দাদার বৌকে সন্ন্যাসীরা কিছু মাসী বলেও ডাকে না, পিসি বলেও ডাকে না,—ও ছাড়া আমাকে তুমি আর কি ব'লে ডাকবে শুনি?

ছেলেটি নিরুপায় হইয়া শেষে সলজ্জ হাসিমুখে কহিল, আচ্ছা, বেশ। ছ-সাত ঘণ্টা আরও আছি আপনার সঙ্গে। এর মধ্যে যদি দরকার হয় ত তাই বলেই ডাকব।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তাহ'লে ডাক না একবার!

সাধু হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দরকার হ'লে ডাকব বলেছি—মিছিমিছি ডাকাডাকি উচিত নয়। রাজলক্ষ্মী তাহার পাতে আরও গোটা চারেক সন্দেশ ও বরফি দিয়া কহিল, বেশ, তা' হলেই আমার হবে কিন্তু নিজের দরকারে যে কি বলে তোমাকে ডাকব' ঠাউরে পাচ্ছি নে। আমাকে দেখাইয়া কহিল, ওঁকে ত ডাকতুম সন্ন্যাসীঠাকুর ব'লে। সে আর হয় না, ঘুলিয়ে যাবে। তোমাকে না হয় ডাকব সাধুঠাকুরপো ব'লে, কি বল?

সাধুজী আর তর্ক করিলেন না, অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, বেশ, তাই ভাল।

তিনি এদিকে যাই হোন, দেখিলাম আহারাদির ব্যাপারে তাঁহার রসবোধ

আছে। পশ্চিমের উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের তিনি কদর বুঝেন এবং কোনটির কিছুমাত্র অমর্য্যাদা করিলেন না। একজন সযত্নে পরম স্নেহে একটির পরে একটি দিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আর একজন নিঃশব্দে নিঃসঙ্কোচে গলাধঃকরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি কিন্তু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। মনে মনে বুঝিলাম সাধুজী পূর্ব্বে যাহাই করুন, সম্প্রতি এরূপ উপাদেয় ভোজ্য এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবা করিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ত্রুটি একটা বেলার মধ্যে সংশোধন করিবার প্রয়াস করিতে দেখিলে দর্শকের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং রাজলক্ষ্মী আরও গোটা-কয়েক পেঁড়া এবং বর্‌ফি সাধুজীর পাতে দিতেই অজ্ঞাতসারে আমার নাক এবং মুখ দিয়া একসঙ্গে এতবড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, রাজলক্ষ্মী এবং তাহার নূতন কুটুম্ব দু'জনেই চকিত হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি রোগা মানুষ, তুমি উঠে হাতমুখ ধোওগে না। আমার সঙ্গে বসে থাকবার দরকার কি ?

সাধুজী একবার আমার প্রতি একবার রাজলক্ষ্মীর প্রতি এবং তাহার পরে হাঁড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, দীর্ঘশ্বাস প'ড়বার কথাই বটে। কিছুই যে আর রইল না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আরও অনেক আছে। বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ঠিক এমনি সময়ে রতন পিছনে আসিয়া বলিল, মা, চিঁড়ে ত ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু দুধ কি দই কিছুই তোমার জন্যে পাওয়া গেল না।

সাধু বেচারা অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, আপনাদের আতিথ্যের উপর ভয়ানক অত্যাচার করলুম, বলিয়া সহসা উঠিবার উপক্রম করিতেই রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আমার মাথা খাবে ঠাকুরপো যদি ওঠো। মাইরি বলছি আমি সমস্ত ছড়িয়ে ফেলে দেব।

সাধু ক্ষণকাল বিস্ময়ে বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিলেন যে, এ কেমন স্ত্রীলোক যে একদণ্ডের পরিচয়েই এত বড় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল! রাজলক্ষ্মীর পিয়ারীর ইতিহাসটা না জানিলে বিস্ময়ের কথাই বটে! তারপরে তিনি একটুখানি

হাসিয়া বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, খেতে আমার কিছুই বাধে না, কিন্তু আপনারও ত কিছু খাওয়া চাই। আমার মাথা খেয়ে ত আর সত্যি সত্যি পেট ভরবে না।

রাজলক্ষ্মী জিভ কাটিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, ছি ছি, অমন কথা মেয়ে-মানুষকে বলতে নেই ভাই। আমি এ সব খাইনে, আমার সহ্য হয় না। চাকরদের খাবার ঢের আছে, আজ রাতটা বইত নয়, যা হোক একমুঠো চিঁড়ে-টিড়ে খেয়ে একটু জল খেলেই আমার চলে যাবে; কিন্তু ক্ষিদে থাকতে তুমি যদি উঠে যাও, তাহ'লে তাও আমার খাওয়া হবে না ঠাকুরপো। বিশ্বাস না হয় ওঁকে জিজ্ঞাসা কর। বলিয়া সে আমাকে আপীল করিল। কাজেই এতক্ষণে আমাকে কথা কহিতে হইল। বলিলাম, এ যে সত্যি সে আমি হলফ নিয়ে বলতে রাজী আছি। সাধুজী, মিথ্যে তর্ক ক'রে লাভ নেই ভায়া, পার হাঁড়িটা উপুড় না হওয়া পর্য্যন্ত সেবাটা যেমন চলছে চলুক, নইলে ও আর কোন কাজেই আসবে না। খাবারটা ট্রেণে এসেছে,—সুতরাং অনাহারে মারা গেলেও ওঁকে তার একবিন্দু খাওয়ান যাবে না। এটা ঠিক কথা।

সাধু কহিলেন, কিন্তু এসব খাবার ত গাড়িতে ছোঁয়া যায় না।

আমি বললাম, যে মীমাংসা আমি এতদিনে শেষ ক'রে উঠতে পারলাম না ভায়া, তা' তুমি কি এক আসনেই নিষ্পত্তি করতে পারবে? তার চেয়ে বরঞ্চ কাজ সেরে উঠে পড়, নইলে সূয্যি ডুব দিলে হয়ত' চিঁড়ে জলও গলা দিয়ে গলবার পথ পাবে না। বলি ঘণ্টা-কয়েক আরও ত তুমি সঙ্গে আছ, শাস্ত্রের বিচার পার ত' পথে যেতে যেতেই বুঝিয়ো,—তা'তে কাজ না হোক, অন্ততঃ অকাজ বাড়বে না। এখন যা হচ্ছে তাই চলুক।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহ'লে সমস্ত দিনই উনি কিছু খাননি?

বলিলাম, না। তা ছাড়া' কালও কি নাকি একটা ছিল, শুনছি দুটো ফল-মূল ছাড়া কালও আর কিছু ওঁর মুখে যায়নি।

রতন পিছনেই ছিল, ঘাড় নাড়িয়া কি যেন একটা বলিতে গিয়া—বোধ হয় মনিবের গোপন চোখের ইঙ্গিতে—হঠাৎ থামিয়া গেল।

সাধু রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, এতে আপনার কষ্ট হয় না?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু হাসিল, কিন্তু আমি কহিলাম, সেটা প্রত্যক্ষ এবং

অনুমান কোনটাতেই জানা যাবে না। তবে চোখ যা দেখেছি তাতে আরও দু-একটা দিন বোধ হয় যোগ করা যেতে পারে।

রাজলক্ষ্মী প্রতিবাদ করিয়া কহিল, তুমি দেখেছ চোখে? কখ্খনো না।

ইহার আমিও জবাব দিলাম না, সাধুজীও আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। বেলার দিকে লক্ষ্য করিয়া নীরবে ভোজন শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

রতন এবং সঙ্গের দু'জনের আহার সমাধা হইতে বেলা গেল। রাজলক্ষ্মী নিজের ব্যবস্থা কি করিল সে-ই জানে, আমরা গঙ্গামাটির উদ্দেশে যখন যাত্রা করিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ তখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, কিন্তু অন্ধকারও কোথাও কিছু ছিল না। মালবোঝাই গাড়ী দুইটা সকলের পিছনে, রাজলক্ষ্মীর গাড়ী মাঝখানে এবং আমার গাড়ীটা ভাল বলিয়া সকলের অগ্রে। সাধুজীকে ডাকিয়া কহিলাম, ভায়া, হাঁটার ত আর কমতি নেই, আজকের মত না হয় আমার এটাতেই পদার্পণ কর না?

সাধু কহিলেন, সঙ্গেই ত রইলেন, না পারলে না হয় উঠেই ব'সব—কিন্তু এখন একটু হাঁটি।

রাজলক্ষ্মী মুখ বাড়াইয়া বলিল, তাহ'লে আমার বডিগার্ড হয়ে চল ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে কইতে যাই। এই বলিয়া সে সাধুজীকে নিজের গাড়ীর কাছে ডাকিয়া লইল। সম্মুখেই আমি। মাঝে মাঝে গাড়ী, গরু এবং গাড়োয়ানের সম্মিলিত উপদ্রবে তাঁহাদের আলাপের কিছু কিছু অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেও অধিকাংশই শুনিতে শুনিতে গেলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ী তোমার এদিকে নয়, আমাদের দেশের দিকেই, সে তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আজ কোথায় চলেছ সত্যি বল ত ভাই?

সাধু কহিলেন, গোপালপুরে।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের গঙ্গামাটি থেকে সেটা কতদূর?

সাধু জবাব দিলেন, আপনার গঙ্গামাটিও জানিনে, আমার গোপালপুরও চিনিনে, তবে সম্ভবতঃ ও দু'টো কাছাকাছিই হবে। অন্ততঃ, তাই ত শুনলাম।

তাহ'লে এত রাত্রে গ্রামই বা কি ক'রে ঠাওরাবে, যাঁর ওখানে যাচ্ছ, তাঁর বাড়ীই বা কি ক'রে খুঁজে পাবে ?

সাধুজী একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, গ্রামটা ঠাওরান শক্ত হবে না, কারণ পথের উপরেই নাকি একটা শুকনো পুকুর আছে, তার দক্ষিণ দিয়ে কোশ-খানেক হাঁটলেই পাওয়া যাবে। আর বাড়ী খোঁজবার দুঃখ পোহাতে হবে না, কারণ সমস্তই অচেনা। তবে গাছতলা একটা পাওয়া যাবেই এ আশা আছে।

রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিল, এই শীতের রাত্রে গাছতলায় ? ওই সামান্য কম্বলটি মাত্র অবলম্বন ক'রে ? সে আমি কিছুতেই সইতে পার'ব না ঠাকুরপো !

তাহার উদ্বেগ আমাকে পর্য্যন্ত যেন আঘাত করিল। সাধু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, কিন্তু আমাদের ত ঘর-বাড়ী নেই, আমরা ত গাছতলাতেই থাকি দিদি।

এবার রাজলক্ষ্মীও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে দিদির চোখের সামনে নয়। রাত্রে ভাইকে আমরা নিরাশ্রয়ের মধ্যে পাঠাইনে। আজ আমার সঙ্গে চল, কাল তোমাকে আমি নিজে উদ্যোগ করে পাঠিয়ে দেব।

সাধু চুপ করিয়া রহিলেন। রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, তাহাকে না জানাইয়া যেন কোন জিনিস গাড়ী হইতে স্থানান্তরিত না করা হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাসীঠাকুরের বাক্সটা আজ রাত্রির মত আটক করা হইল।

আমি বলিলাম, তা হ'লে ঠাণ্ডায় কষ্ট নাই ক'রলে ভায়া, এস না অ[illegible] গাড়ীতে ?

সাধু একটু ভাবিয়া কহিলেন, থাক্ এখন। দিদির সঙ্গে একটু কথা কইতে কইতে যাই।

আমিও ভাবিলাম, তা বটে ! নূতন সম্বন্ধটা অস্বীকারের দিকেই সাধুজীর মনে মনে লড়াই চলিতেছিল আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম ; তবুও শেষ রক্ষা হইল না। হঠাৎ এক সময়ে যখন তিনি অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন, তখন অনেকবার মনে হইল একটু সাবধান করিয়া দিয়া বলি, ঠাকুর, পালালেই কিন্তু ভাল ক'রতে। শেষে আমার দশা না হয় ! অথচ, চুপ করিয়া রহিলাম।

দু'জনের কথাবার্ত্তা অবাধে চলিতে লাগিল। গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে এবং তন্দ্রার ঝোঁকে মাঝে মাঝে তাঁহাদের আলাপের সূত্র হারাইতে থাকিলেও কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া চলিতে চলিতে আমারও সময়টা মন্দ কাটিল না।

বোধ করি একটু তন্দ্রামগ্নই হইয়াছিলাম, সহসা শুনিলাম প্রশ্ন হইল, হাঁ আনন্দ, তোমার ওই বাক্সটিতে কি আছে ভাই ?

উত্তর আসিল, গোটা-কয়েক বই আর ওষুধপত্র আছে দিদি।

ওষুধ কেন ? তুমি কি ডাক্তার ?

আমি সন্ন্যাসী! আচ্ছা, আপনি কি শোনেন নি দিদি, আপনাদের ওদিকে কি রকম কলেরা হচ্ছে!

কই না! সে কথা ত আমাদের গমস্তা আমাকে জানাননি। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কলেরা সারাতে পার ?

সাধুজী একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, সারাবার মালিক ত আমরা নই দিদি, আমরা শুধু ওষুধ দিয়ে চেষ্টা ক'রতে পারি ; কিন্তু এও দরকার, এও তাঁরই হুকুম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ন্যাসীতেও ওষুধ দেয় বটে, কিন্তু ওষুধ দেবার জন্যই ত সন্ন্যাসী হতে হয় না। আচ্ছা, আনন্দ, তুমি কি কেবল এই জন্যেই সন্ন্যাসী হয়েছ ভাই ?

সাধু কহিলেন, সে ঠিক জানিনে দিদি। তবে দেশের সেবা করাও আমাদের একটা ব্রত বটে।

আমাদের ? তবে বুঝি তোমাদের একটা দল আছে ঠাকুরপো ?

সাধু জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। রাজলক্ষ্মী পুনশ্চ কহিল, কিন্তু সেবা করার জন্যে ত সন্ন্যাসী হবার দরকার হয় না, ভাই। তোমাকে এ মতি-বুদ্ধি কে দিলে বল ত ?

সাধুজী এ প্রশ্নেরও বোধ হয় উত্তর দিলেন না, কারণ কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই কাহারও শুনিতে পাইলাম না। মিনিট দশেক পরে কানে গেল, সাধুজী কহিতেছেন, দিদি, আমি ছোট্ট সন্ন্যাসী, আমাকে ও-নাম না দিলেও চলে। কেবল নিজের কতকগুলো ভার ফেলে দিয়ে তার জায়গায় অপরের বোঝা তুলে নিয়েছি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল না, সাধু বলিতে লাগিলেন, আমি প্রথম থেকেই দেখতে পেয়েছি আপনি আমাকে ক্রমাগত ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করছেন। কেন জানিনে বোধ হয় দিদি বলেই। কিন্তু এই যাদের ভার নিতে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, এরা যে কত দুর্ব্বল, কত রুগ্ন, কিরূপ নিরুপায়, এবং সংখ্যায় কত, এ যদি একবার জানেন ত ও-কথা আর মনেও আনতে পারবেন না।

ইহারও রাজলক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না; কিন্তু আমি বুঝিলাম, যে প্রসঙ্গ উঠিল, এইবার উভয়ের মন এবং মতের মিল হইতে বিলম্ব হইবে না। সাধুজীও ঠিক জায়গাতেই আঘাত করিলেন। দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, ইহার সুখ, ইহার দুঃখ, ইহার অভাব আমি নিজেও নিতান্ত কম জানি না; কিন্তু এই সন্ন্যাসীটি যেই হোন, তিনি এই বয়সেই আমার চেয়ে ঢের বেশী ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছেন এবং ঢের বড় হৃদয় দিয়া তাহাদিগকে নিজের করিয়া লইয়াছেন। শুনিতে শুনিতে চোখের ঘুম জলে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল, এবং বুকের ভিতরটা ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে, ব্যথায় যেন মথিত হইয়া যাইতে লাগিল। ও-গাড়ীর অন্ধকার কোণে একাকী বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা প্রশ্নও করিল না, একটা কথাতেও কথা যোগ করিল না। তাহার নীরবতায় সাধুজী কি ভাবিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু এই একান্ত স্তব্ধতার পরিপূর্ণ অর্থ আমার কাছে গোপন রহিল না।

দেশ বলিতে যেথায় দেশের চৌদ্দ-আনা নর-নারী বাস করেন, সেই পল্লী-গ্রামের কাহিনীই সাধু বিবৃত করিতে লাগিলেন। দেশে জল নাই, প্রাণ নাই, স্বাস্থ্য নাই,—জঙ্গলের আবর্জ্জনায় যেথায় মুক্ত আলো ও বায়ুর পথ রুদ্ধ, যেথায় জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, ধর্ম্ম যেথায় বিকৃত, পথভ্রষ্ট, মৃতকল্প, জন্ম-ভূমির সেই দুঃখের বিবরণ ছাপার অক্ষরেও পড়িয়াছি, নিজের চোখেও দেখিয়াছি; কিন্তু এই না-থাকা যে কত বড় না-থাকা, মনে হইল আজিকার পূর্ব্বে তাহা যেন জানিতামই না। দেশের এই দৈন্য যে কিরূপ ভয়ঙ্কর দীনতা আজিকার পূর্ব্বে তাহার ধারণাই যেন আমার ছিল না। শুষ্ক শূন্য বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়া আমরা চলিয়াছি; পথের ধূলা শিশিরে ভিজিয়া ভারী হইয়াছে—তাহারই উপর দিয়া গাড়ির চাকা এবং গরুর ক্ষুরের শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়,—

আকাশে জ্যোৎস্না পাণ্ডুর হইয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারই ভিতর দিয়া শীতের এই স্তব্ধ নিশীথে আমরা অজানার দিকে ধীর মন্থর গতিতে অবিশ্রাম চলিয়াছি ; অনুচরদিগের মধ্যে কে জাগিয়া, আর কে নাই, জানা গেল না,—সবাই শীত-বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নীরব। কেবল একা সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গ লইয়াছে,—এবং এই পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝে তাহারই মুখ দিয়া কেবল দেশের অজ্ঞাত ভাই ভগিনীর অসহ্য বেদনার ইতিহাস যেন ঝলকে ঝলকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে! এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক, এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা-রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল!

সহসা সাধু রাজলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মনে হয় তোমাকে যেন আমি চিনতে পেরেছি দিদি। মনে হয় তোমাদের মত মেয়েদের নিয়ে গিয়ে একবার তোমাদেরই ভাই-বোনেদের নিজের চোখে দেখাই।

রাজলক্ষ্মী প্রথমে কথা বলিতে পারিল না, তার পরে ভাঙা গলায় কহিল, আমার কি সে সুযোগ হ'তে পারে আনন্দ? আমি যে মেয়েমানুষ, এ কথা কি ক'রে ভুলব ভাই?

সাধু কহিলেন, কেন হতে পারে না দিদি? আর তুমি মেয়েমানুষ এই কথাটাই যদি ভোলো ত কষ্ট করে তোমাকে ও-সব দেখিয়ে আমার কি লাভ হবে?

চার

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, গঙ্গামাটি কি তোমাদের জমিদারী দিদি?

রাজলক্ষ্মী একটু হাসিয়া কহিল, দেখছ কি ভাই, আমরা একটা মস্ত জমিদার।

এবার উত্তর দিতে গিয়া সাধুও একটুখানি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,

মস্ত জমিদারী কিন্তু মস্ত সৌভাগ্য নয়, দিদি! তাঁহার কথায়, তাঁহার পার্থিব অবস্থা সম্বন্ধে আমার একপ্রকার সন্দেহ জন্মিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে দিক দিয়া গেল না। সে সরলভাবে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, সে কথা সত্যি আনন্দ। ও সব যত দূর হয়ে যায় ততই ভাল।

আচ্ছা দিদি, উনি ভাল হয়ে গেলেই তোমরা আবার সহরে ফিরে যাবে?

ফিরে যাব। কিন্তু আজ সে ত অনেক দূরের কথা, ভাই!

সাধু কহিলেন, পার ত আর ফিরো না দিদি। এই সব দরিদ্র দুর্ভাগাগুলোকে তোমরা ফেলে চলে' গেছ বলেই এদের দুঃখ কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে। যখন কাছে ছিলে, তখনও যে এদের কষ্ট তোমরা দাওনি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নির্ম্মম দুঃখ তাদের দিতে পারনি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েছ, দুঃখের ভাগও তেমনি নিয়েছ। দিদি, দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ-দৈন্য বোধ করি এমন কাণায় কাণায় ভর্ত্তি হয়ে উঠে না। আর এই কাণায় কাণায় বলতে যে কি বুঝায়, তোমাদের সহর-বাসের সর্ব্বপ্রকার আহার-বিহারের যোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখতে পার দিদি—

হাঁ আনন্দ, বাড়ীর জন্যে তোমার মন কেমন করে না?

সাধু সংক্ষেপে কহিলেন, না। সে বেচারা বুঝিল না, কিন্তু আমি বুঝিলাম রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিল, কেবল সহিতে পারিতেছিল না বলিয়াই।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন?

সাধু কহিলেন, কিন্তু বাড়ী ত এখন আর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী আবার অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আনন্দ, এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

সাধু হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাস্‌রে! সন্ন্যাসীর অত লোভ! না দিদি, আমি কেবল পরের দুঃখের ভার নিতে একটু চেয়েছি, তাই শুধু পেয়েছি।

রাজলক্ষ্মী আবার নীরব হইয়া রহিল। সাধু কহিলেন, উনি বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু এইবার একটু তাঁর গাড়ীতে গিয়ে বসিগে, আচ্ছা

দিদি, কখনো দু'চার দিন যদি তোমাদের অতিথি হই, উনি কি রাগ করবেন ?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, উনি-টি কে ? তোমার দাদা ?

সাধুজীও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, না হয় তাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আর আমি রাগ ক'রব কি না জিজ্ঞেস করলে না ? আচ্ছা, চল ত একবার গঙ্গামাটিতে, তার পরে তার বিচার হবে।

সাধুজী কি বলিলেন, শুনিতে পাইলাম না, বোধ করি কিছুই বলিলেন না। ক্ষণেক পরে আমার গাড়ীতে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, দাদা, আপনি কি জেগে আছেন ?

আমি জাগিয়াই ছিলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না। তখন আমারই পার্শ্বে সাধুজী একটুখানি স্থান করিয়া লইয়া তাঁহার ছেঁড়া কম্বলখানি গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। একবার ইচ্ছা হইল একটুখানি সরিয়া গিয়া বেচারাকে আর একটু জায়গা দিই, কিন্তু পাছে নড়া-চড়া করতে গেলে, তাঁহার সন্দেহ জন্মে আমি জাগিয়া আছি, কিম্বা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেছে এবং এই গভীর নিশীথে আর একদফা দেশের সুগভীর সমস্যা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই ভয়ে করুণা প্রকাশের চেষ্টা মাত্র করিলাম না।

গঙ্গামাটিতে গাড়ী কখন প্রবেশ করিল আমি জানিতে পারি নাই, জানিলাম যখন গাড়ী থামিল আসিয়া আমাদের নূতন বাটীর দ্বারপ্রান্তে। তখন সকাল হইয়াছে। গোটা-চারেক গো-যানের বিবিধ এবং বিচিত্র কোলাহলে চতুষ্পার্শ্বে ভিড় বড় কম জমে নাই। রতনের কল্যাণে পূর্ব্বাহ্ণেই শুনিয়াছিলাম এটা নাকি মুখ্যতঃ ছোট জাতির গ্রাম। দেখিলাম রাগ করিয়া কথাটা সে নিতান্ত মিথ্যা কহে নাই। এই শীতের ভোরেও পঞ্চাশ-ষাটটি নানা বয়সের ছেলে-মেয়ে উলঙ্গ এবং অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বোধ করি এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া তামাসা দেখিতে জমা হইয়াছে। পশ্চাতে বাপ-মায়ের দলও যথাযোগ্য ভাবে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। ইহাদের আকৃতি ও পোষাক-পরিচ্ছদে ইহাদের কৌলীন্য সম্বন্ধে আর যাহার মনে যাই থাক্, রতনের মনের মধ্যে বোধ হয় সংশয়ের বাষ্পও রহিল না। তাহার ঘুম-ভাঙ্গা মুখ এক নিমেষেই বিরক্তি ও ক্রোধে ভীমরুলের চাকের মতন ভীষণ হইয়া উঠিল। কর্ত্রীকে দর্শন করিবার অতি-ব্যগ্রতায় গোটাকয়েক ছেলে-মেয়ে কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘেঁসিয়া

আসিতেছিল, রতন এমন একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া তাহাদের তাড়া করিল যে গাড়োয়ান দু'জন সুমুখে না থাকিলে সেইখানেই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিত। রতন কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিল না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, যত সব ছোট-জেতের মরণ! দেখছেন বাবু, ছোটলোক ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা—যেন রথ-দোল দেখতে এসেচে! আমাদের মত সব ভদ্দরলোক কি এখানে থাকতে পারে বাবু?—এখুনি সব ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে একাকার ক'রে দেবে।

'ছোঁয়া-ছুঁয়ি' কথাটা সর্ব্বাগ্রে কানে গেল রাজলক্ষ্মীর। তাহার মুখখানি যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

সাধুজী নিজের বাক্স নামাইতে ব্যস্ত ছিলেন, কাজটা সমাধা করিয়া তিনি একটা লোটা বাহির করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, এবং কাছাকাছি যে ছেলেটাকে পাইলেন অকস্মাৎ তাহারাই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, ওরে ছেলে, যা ত ভাই এখানে কোথা ভাল পুকুর-টুকুর আছে—এক ঘটি জল নিয়ে আয়,—চা খেতে হবে। বলিয়া পাত্রটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া, সম্মুখের একজন প্রৌঢ় গোছের লোককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মোড়লের পো, কাছাকাছি কার গরু আছে দেখিয়ে দাও ত দাদা, এক ছটাক দুধ চেয়ে আনি। গাঁয়ের টাট্‌কা খাঁটি জিনিস—চায়ের রঙ্‌টা যা দাঁড়াবে দিদি, বলিয়া তিনি একবার আমার ও একবার তাঁহার দিদির মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দিদি কিন্তু এ উৎসাহে কিছুমাত্র যোগ দিলেন না। অপ্রসন্ন মুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, রতন, যা ত বাবা ঘটিটা মেজে একটু জল নিয়ে আয়।

রতনের মেজাজের খবরটা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। তার উপর এই শীতের সকালে যখন কে-একটা অচেনা সাধুর জন্য কোথাকার একটা নিরুদ্দেশ জলাশয় উদ্দেশ করিয়া জল আনিবার ভার পড়িল, তখন আর সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। এক মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহার চেয়েও ছোট, সেই হতভাগ্য বালকটার উপর। তাহাকে সে একটা প্রকাণ্ড ধমক দিয়া কহিয়া উঠিল, নচ্ছার পাজি ব্যাটা! ঘটি ছুঁলি কেন তুই? চল্‌ হারামজাদা, ঘটি মেজে জলে ডুবিয়ে দিবি! বলিয়া সে কেবল চোখ-মুখের ভঙ্গিতেই ছেলেটাকে যেন গলাধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া লইয়া গেল।

তাহার কাণ্ড দেখিয়া সাধু হাসিলেন, আমিও হাসিলাম। রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, গ্রামটা যে তোলপাড় ক'রে তুললে আনন্দ! সাধুদের বুঝি রাত না পোহাতেই চা চাই?

সাধু বলিলেন, গৃহীদের রাত পোহায়নি বলে বুঝি আমাদেরও পোহাবে না? বেশ ত! কিন্তু দুধের যোগাড় যে করা চাই। আচ্ছা বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে দেখা যাক্ কাঠ-কুটো, উনুন-টুনুন আছে কিনা! ওহে কর্ত্তা, চল না দাদা, কার ঘরে গরু আছে একটু দেখিয়ে দেবে। দিদি, কালকের সেই হাঁড়িটায় বরফি কিছু ছিল না? না, গাড়ীর মধ্যে অন্ধকারে তাকে শেষ করেছেন?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, পাড়ার যে দু'চার জন মেয়ে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, তাহারাও মুখ ফিরাইল।

এমন সময় গমস্তা কাশীরাম কুশারী মহাশয় হন্তদন্ত-ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাহার তিন-চারজন লোক, কাহারো মাথায় ঝুড়িভরা শাক-সব্জি ও তরি-তরকারী, কাহারো হাতে ঘটিভরা দুধ, কাহারো হাতে একটা বৃহদায়তন রোহিত মৎস্য। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সামান্য একটু বিলম্বের জন্য বহুবিধ কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। লোকটিকে আমার ভাল বলিয়াই মনে হইল। বয়স পঞ্চাশের উপরে গিয়াছে। কিছু কৃশ, দাঁড়ি গোঁফ কামানো—রঙটি ফর্সার দিকেই। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম; তিনিও প্রতি নমস্কার করিলেন; কিন্তু সাধুজী এ-সকল প্রচলিত ভদ্রতার ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি তরকারীর ঝুড়িটা স্বহস্তে নামাইয়া লইয়া তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন; দুধ যে খাঁটি সে বিষয়ে নিঃসংশয় মত দিলেন এবং মৎস্যটির ওজন কত তাহা অনুমান করিয়া ইহার আস্বাদ-সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকেই আশান্বিত করিয়া তুলিলেন।

এই সাধু মহারাজের শুভাগমন সম্বন্ধে গমস্তা মহাশয় পূর্ব্বাহ্ণে কোন সম্বাদ পান নাই; তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী কহিল, সন্ন্যাসী দেখে ভয় পাবেন না কুশারীমশাই, ওটি আমার ভাই। একটু হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর বারবার গেরুয়া ছাড়ানো যেন আমার একটা কাজ হয়ে উঠেছে।

কথাটা সাধুজীর কানে গেল। কহিলেন, এ কাজটা তত সহজ হবে না, দিদি। বলিয়া আমার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া তিনি একটুখানি হাসিলেন। ইহার অর্থ আমিও বুঝিলাম, রাজলক্ষ্মীও বুঝিল। সে কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে দেখা যাবে।

বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল কুশারী মহাশয় বন্দোবস্ত বড় মন্দ করেন নাই। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া তিনি নিজে সরিয়া গিয়া পুরাতন কাছারি-গৃহটিকেই কিছু কিছু সংস্কার এবং পরিবর্ত্তন করিয়া দিব্য বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন ; ভিতরে রান্না এবং ভাঁড়ার-ঘর ছাড়া শোবার ঘর, দু'টি। ঘরগুলি মাটির, খড় দিয়া ছাওয়া, কিন্তু বেশ উঁচু এবং বড়। বাহিরে বসিবার ঘরখানিও চমৎকার পরিপাটি। প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, পরিষ্কার এবং মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা। একধারে একটি ছোট কূপ এবং তাহারই অদূরে গোটা দুই-তিন টগর ও শেফালি বৃক্ষ। আর একদিকে অনেকগুলি ছোট বড় তুলসী গাছের সারি, এবং গোটা-চারেক যূঁই ও মল্লিকা ফুলের ঝাড়। সবসুদ্ধ জায়গাটা দেখিয়া যেন তৃপ্তিবোধ হইল।

সকলের চেয়ে উৎসাহ দেখা গেল সন্ন্যাসী-ভায়ার। যাহা কিছু তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতেই উচ্চকণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—যেন এমন আর কখনও দেখেন নাই। আমি কলরব না তুলিলেও মনে মনে খুসিই হইয়াছিলাম। রাজলক্ষ্মী তাহার ভাইয়ের জন্য রান্নাঘরে চা তৈরি করিতেছিল, অতএব মুখের ভাব তাহার চোখে দেখা গেল না বটে, কিন্তু মনের ভাব তাহার কাহারও কাছে অবিদিত ছিল না। কেবল দলে ভিড়িল না রতন। সে মুখখানা তেমনি ভারী করিয়াই একটি খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

চা প্রস্তুত হইল। সাধুজী কল্যকার অবশিষ্ট মিষ্টান্নযোগে পেয়ালা দুই চা নিঃশব্দে পান করিয়া উঠিলেন, এবং আমাকে কহিলেন, চলুন না, গ্রামখানা একবার দেখে আসা যাক। বাঁধটাও দূরে নয়, অমনি স্নানটাও সেরে আসা যাবে। দিদি, আসুন না জমিদারী পরিদর্শন ক'রে আসবেন। বোধ হয় ভদ্রলোক বড় কেউ নেই,—লজ্জা ক'রবার বিশেষ আবশ্যক হবে না। সম্পত্তিটি ভাল, দেখে লোভ হচ্ছে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, তা' জানি। সন্ন্যাসীদের স্বভাবই ওই।

আমাদের সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ এবং আরও একজন চাকর আসিয়াছিল, তাহারা রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, না মহারাজ, অমন টাটকা মাছের মুড়ো তোমাকে দিয়ে ভরসা হয় না, নেয়ে এসে রান্নাটা আমিই চড়িয়ে দেব। এই বলিয়া সে আমাদের সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রতন কোন কথায় বা কাজে যোগদান করে নাই। আমরা বাহির হইতেছি, এমন সময়ে সে অত্যন্ত ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল, মা, ঐ যে বাঁধ না পুকুর, কি একটা পোড়া দেশের লোকে বলে, ওতে যেন আপনি নাব্‌বেন না। ভয়ানক জোঁক আছে,—এক একটা নাকি এক হাত ক'রে!

মুহূর্ত্তে রাজলক্ষ্মীর মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া গেল,—বলিস কি রতন, এদিকে কি বড্ড জোঁক নাকি?

রতন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তাই ত শুনে এলুম।

সাধু তাড়া দিয়া উঠিলেন,—আজ্ঞে হাঁ, শুনে এলে বৈ কি! ব্যাটা নাপ্‌তে ভেবে ভেবে আচ্ছা ফন্দি বার করেছে। ইহার মনের ভাব এবং জাতির পরিচয় সাধু পূর্ব্বাহ্নেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন; হাসিয়া কহিলেন, দিদি, ওর কথা শুনবেন না, আসুন। জোঁক আছে কি না সে পরীক্ষা না হয় আমাদের দিয়েই হয়ে যাবে।

তাঁহার দিদি কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেন না, জোঁকের নামে একেবারে অচল হইয়া কহিলেন, আমি বলি আজ না হয় থাক্, আনন্দ। নতুন জায়গা, বেশ না জেনে-শুনে অমন দুঃসাহস করা ভাল হবে না। রতন, তুই না হয় ওঠ্‌ বাবা, এইখানেই দু-ঘড়া জল কুয়ো থেকে তুলে দে। আমাকে আদেশ হইল,—তুমি রোগা মানুষ, তুমি যেন আর কোথাকার কোন জলে নেয়ে এসো না। বাড়ীতেই দু-ঘটি জল মাথায় দিয়ে আজকের মত নিরস্ত হও।

সাধু হাসিয়া বলিলেন, আর আমিই কি এত অবহেলার দিদি যে আমাকেই কেবল সেই জোঁকের পুকুরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন?

কথাটা বেশি কিছু না, কিন্তু এইটুকুতেই রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু যেন হঠাৎ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। সে ক্ষণকাল নীরবে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে যেন অভিষিক্ত করিয়া কহিল, তুমি যে ভাই মানুষের হাতের বাইরে। যে বাপ-

মায়ের কথা শোনেনি, সে কি একটা কোথাকার অজানা-অচেনা বোনেরই কথা রাখবে ?

সাধু প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া সহসা একটু থামিয়া কহিলেন, এই অজানা অচেনা কথাটি বলবেন না দিদি। আপনাদের সবাইকে চিন্‌ব বলেই ত ঘর ছেড়ে আসা, নইলে আমার কি দরকার ছিল বলুন ত ? এই বলিয়া তিনি একটু দ্রুত-পদেই বাহির হইয়া গেলেন, এবং আমিও পিছু-পিছু তাঁহার সঙ্গ লইলাম।

দুইজনে এইবার বেশ করিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া গ্রামখানিকে দেখিয়া লইলাম। গ্রামখানি ছোট, এবং আমরা যাহাদের ছোট জাত বলি তাহাদেরই। বস্তুতঃ, ঘর-দুই বারুজীবী এবং একঘর কর্ম্মকার ব্যতীত গঙ্গামাটিতে জলাচরণীয় কেহ নাই। সমস্তই ডোম এবং বাউরিদের বাস। বাউরিরা বেতের কাজ এবং মজুরি করে, এবং ডোমেরা চাঙ্গারি, কুলা, চুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পোড়ামাটি গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। গ্রামের উত্তর দিকে যে জল-নিকাশের বড় নালা আছে, তাহারই ওপারে পোড়ামাটি। শোনা গেল ও-গ্রামখানা বড় এবং উহাতে অনেক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির বাস আছে। আমাদের কুশারী মশায়ের বাটিও ওই পোড়ামাটিতেই; কিন্তু পরের কথা পরে হইবে, আপাততঃ নিজেদের গ্রামের যে অবস্থা চোখে দেখা গেল তাহাতে দৃষ্টি জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। বেচারীরা ঘরগুলিকে প্রাণপণে ছোট করিতে ত্রুটি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মত খড়, এই সোনার বাঙলা দেশে তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এক ছটাক জমি জায়গা প্রায় কাহারও নাই, কেবলমাত্র চাঙ্গারি-চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরের সৎ-গৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি তা ভাবিয়া পাইলাম না। তবুও এমন করিয়াই এই অশুচি অস্পৃশ্যদের দিন চলিতেছে এবং হয় ত' এমনি করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনদিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই। পথের কুকুর যেমন জন্মিয়া গোটা-কয়েক বৎসর যেমন তেমন ভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে, তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলারও ইহার অধিক দেশের কাছে এক বিন্দু দাবি-

দাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ব্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনায় কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই। কিন্তু সাধু যে আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন আমি জানিতাম না। তিনি হঠাৎ কহিলেন, দাদা, এই হচ্ছে দেশের সত্যিকার ছবি। কিন্তু মন খারাপ করবার দরকার নেই। আপনি ভাবছেন এসব বুঝি এদের অহরহ দুঃখ দেয়, কিন্তু তা মোটেই নয়।

আমি ক্ষুব্ধ এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, এটা কি রকম কথা হ'ল সাধুজী?

সাধুজী বলিলেন, আমাদের মত যদি সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দাদা, তা হ'লে বুঝতেন আমি প্রায় সত্যি কথাটাই বলেছি। দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন ত? কিন্তু সে বালাই কি আমরা আর এদের রেখেছি? বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙড়ে বার করে দিয়েছি। এর বেশি চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্দ্ধা বলে মনে করে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না আমাদের বাপ-পিতামহরা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন! এই বলিয়া সাধু নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতই হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতেও পারিলাম না এবং তাঁহার কথাটারও ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিলাম।

এ বৎসর ফসল ভাল হয় নাই, জলের অভাবে হেমন্তের ধানটা প্রায় আট আনা রকম শুকাইয়া গিয়া ইতিমধ্যেই অভাবের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। সাধু কহিলেন, দাদা, যে ছলেই হোক্ ভগবান যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েছেন, তখন হঠাৎ আর পালাবেন না, অন্ততঃ, এ বছরটা কাটিয়ে যাবেন। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন, তা ভাবিনে, তবে চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভাগ নেওয়া ভাল, তাতে জমিদারী করার পাপের বোঝাটা কতক হাল্কা হয়।

আমি মনে মনে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, জমিদার এবং প্রজা আমারই বটে! কিন্তু পূর্ব্বেও যেমন জবাব দিই নাই, এবারেও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম।

ক্ষুদ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গেছে। কাল অপরাহ্ণের মত আজও আমাদের উভয়কে খাইতে দিয়া রাজলক্ষ্মী একপাশে বসিল। সমস্ত রান্না সে নিজে রাঁধিয়াছে, সুতরাং মাছের মুড়া ও দধির সর সাধুর পাতেই পড়িল। সাধুজী বৈরাগী মানুষ, কিন্তু সাত্বিক এবং অসাত্বিক, নিরামিষ এবং আমিষ কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ দেখা গেল না, বরঞ্চ, এরূপ উদ্দাম অনুরাগের পরিচয় দিলেন যাহা ঘোর সাংসারিকের পক্ষেও দুর্লভ। রান্নার ভাল-মন্দের সমজ্‌দার ব্যক্তি বলিয়াও যেমন আমার খ্যাতি ছিল না, আমাকে বুঝাইবার দিকেও রাঁধুনীর কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ পাইল না।

সাধুর তাড়া নাই, অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে আহার করিতে লাগিলেন—চর্ব্বণ করিতে করিতে কহিলেন, দিদি, সম্পত্তিটি সত্যিই ভাল, ছেড়ে যেতে মায়া হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ছেড়ে যেতে ত তোমাকে আমরা সাধছিনে ভাই।

সাধু হাসিয়া কহিলেন, সন্ন্যাসী ফকিরকে কখনো এত প্রশ্রয় দেবেন না দিদি, ঠক্‌বেন। তা সে যাই হোক, গ্রামটি বেশ, কোথাও একজন এমন চোখে পড়িল না যার জল ছোঁয়া যায়! এমন একটা ঘর দেখিলাম না যার চালে এক আঁটি আস্ত খড় আছে,—যেন ঋষিদের আশ্রম।

আশ্রমের সহিত অস্পৃশ্য গৃহগুলির একদিক দিয়া যে উৎকট সাদৃশ্য ছিল, সেই কথা মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া আমাকে বলিল, শুনলুম সত্যিই নাকি এ-গাঁয়ে কেবল ছোটজাতের বাস,—এক ঘটি জলের প্রত্যাশাও কারও কাছে নেই। বেশী দিন দেখ্‌ছি থাকা চলবে না।

সাধু একটু হাসিলেন, আমি কিন্তু নীরব হইয়া রহিলাম। কারণ, রাজলক্ষ্মীর মত করুণাময়ীও কোন্ সংস্কারের মধ্য দিয়া এত বড় লজ্জার কথা উচ্চারণ করিতে পারিল আমি তাহা জানিতাম। সাধুর হাসি আমাকে স্পর্শ করিল কিন্তু বিদ্ধ করিল না। তাই, কথা কহিলাম না সত্য, তথাপি আমার মন ওই রাজলক্ষ্মীকেই উদ্দেশ করিয়া ভিতরে ভিতরে বলিতে লাগিল, লক্ষ্মি, মানুষের কর্ম্মই কেবল অস্পৃশ্য ও অশুচি হয়, মানুষ হয় না। না হইলে পিয়ারী কিছুতেই আজ আবার লক্ষ্মীর আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিতে পারিত না। আর সে কেবল সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, মানুষকে কেবলমাত্র

মানুষের দেহ বলিয়া আমি কোন দিন ভুল করি নাই। সে পরীক্ষা আমার ছেলেবেলা হইতে বহুবার হইয়া গিয়াছে। অথচ, এ সকল কথা ফুটিয়া তাহাকে বলিবারও যো নাই,—বলিবার প্রবৃত্তিও আর আমার নাই।

উভয়ে আহার সমাধা করিয়া উঠিলাম। রাজলক্ষ্মী আমাদের পান দিয়া বোধ করি নিজেও কিছু খাইতে গেল। কিন্তু আন্দাজ ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে নিজেও যেমন সাধুজীকে দেখিয়া আকাশ হইতে পড়িল, আমিও তেম্‌নি বিস্মিত হইলাম। দেখি, ইতিমধ্যে কখন তিনি বাহিরে গিয়া লোক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং ঔষধের সেই ভারি বাক্সটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া নিজেও প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কাল এই কথাই ছিল বটে, কিন্তু আজ তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়াছিলাম। মনেও করি নাই এই প্রবাসে রাজলক্ষ্মীর এত আদর যত্ন উপেক্ষা করিয়া সাধুজী অনিশ্চয় অন্যত্রের জন্য এমন সত্বর উন্মুখ হইয়া উঠিবেন। স্নেহের শৃঙ্খল এত সহজে কাটিবার নয়, রাজলক্ষ্মীর নিভৃত মনের মধ্যে বোধ হয় এই আশাই ছিল,—সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি কি যাচ্ছো না কি আনন্দ?

সাধু বলিলেন, হাঁ দিদি, যাই। এখন না বেরুলে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

সেখানে কোথায় খাবে, কোথায় শোবে? আপনার লোক যে সেখানে কেউ নেই!

আগে ত গিয়ে পৌঁছই, দিদি!

কবে ফিরবে?

সে ত এখন বলা যায় না। কাজের ভিড়ে যদি না এগিয়ে যাই ত একদিন ফিরতেও পারি।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, তারপরে সে মাথার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন ফিরতেও পার? না সে কিছুতেই হবে না।

কি হবে না তাহা বুঝা গেল, তাই সাধু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, যাবার হেতু ত আপনাকে বলেছি, দিদি।

বলেছ ? আচ্ছা, তবে যাও—এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া সবেগে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত সাধুজী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তারপরে আমার প্রতি চাহিয়া লজ্জিত মুখে কহিলেন, আমার যাওয়া বড় দরকার।

আমি ঘাড় নাড়িয়া কেবলমাত্র বলিলাম, জানি। ইহার অধিক আর কিছু বলিবার ছিল না। কারণ, আমি অনেক দেখিয়া জানিয়াছি স্নেহের গভীরতা কিছুতেই কালের স্বল্পতা দিয়া মাপা যায় না। এবং এই বস্তুটা কাব্যের জন্য কবিরা কেবল শূন্য কল্পনাই করেন নাই—সংসারে ইহা যথার্থই ঘটে। তাই, একের যাওয়ার প্রয়োজনও যতখানি সত্য, অপরের আকুল কণ্ঠের একান্ত নিষেধটাও ঠিক ততখানি সত্য কি না, এ লইয়া আমার মনের মধ্যে বিন্দু-পরিমাণও সংশয়ের উদয় হইল না। আমি অত্যন্ত সহজেই বুঝিলাম এই লইয়া রাজলক্ষ্মীকে হয় ত অনেক ব্যথাই ভোগ করিতে হইবে।

সাধুজা কহিলেন, আমি চ'ললাম। ওদিকের কাজ যদি মেটে ত হয় ত আবার আসবো, কিন্তু এখন একথা জানবার আবশ্যক নেই।

আমি স্বীকার করিয়া বলিলাম, তাই হবে।

সাধুজী কি একটা বলিতে গিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিলেন ; তার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আশ্চর্য্য দেশ এই বাঙলা দেশটা। এর পথেঘাটে মা-বোন, সাধ্য কি এঁদের এড়িয়ে যাই! এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা শুনিয়া আমারও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। মনে হইল তাই বটে! দেশের সমস্ত মা-বোনের বেদনা যাহাকে টান দিয়া ঘরের বাহির করিয়াছে, তাহাকে একটিমাত্র ভগিনীর স্নেহ, দধির সর এবং মাছের মুড়ো দিয়া ধরিয়া রাখিবে কি করিয়া ?

পাঁচ

সাধুজী ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিরহ-ব্যথাটা রতনের কিরূপ বাজিল অবশ্য জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, সম্ভবতঃ মারাত্মক তেমন কিছু হইবে না। কিন্তু একজন ত দেখিলাম কাঁদিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিলেন, এবং তৃতীয় ব্যক্তি রহিলাম আমি! লোকটার সহিত পুরাপুরি চব্বিশ ঘণ্টাও ঘনিষ্ঠতা হইতে পায় নাই, তথাপি আমারও মনে হইতে লাগিল আমাদের এই অনারব্ধ সংসারের মাঝখানে তিনি যেন মস্ত বড় একটা ছিদ্র করিয়া দিয়া গেলেন। এই অনিষ্টটি আপ্‌না হইতেই সারিয়া উঠিবে কিম্বা নিজেই তিনি আবার একদিন অম্‌নি অকস্মাৎ তাঁহার প্রকাণ্ড ঔষধের বাক্সটা ঘাড়ে করিয়া ইহা মেরামত করিতে সশরীরে ফিরিয়া আসিবেন, বিদায়কালে কিছুই বলিয়া গেলেন না। অথচ আমার নিজের খুব যে বেশি উদ্বেগ ছিল তাও নয়। নানা কারণে এবং বিশেষ করিয়া কিছুকাল হইতে জ্বরে ভুগিয়া দেহ ও মনের এমনই একটা নিস্তেজ নিরালম্ব ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল যে, একমাত্র রাজলক্ষ্মীর হাতেই সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় ভাল-মন্দর দায় হইতে অব্যাহতি লইয়াছিলাম। সুতরাং কিছুর জন্যই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিবার আমার আবশ্যকও ছিল না, শক্তিও ছিল না। তবুও মানুষের মনের চঞ্চলতার যেন বিরাম নাই, বাহিরের ঘরে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া একাকী বসিয়া আছি, কত কি যে এলোমেলো ভাবনা আনাগোনা করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই,—সম্মুখের প্রাঙ্গণতলে আলোর দীপ্তি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসন্ন রাত্রির ইঙ্গিতে অন্যমনস্ক মনটাকে মাঝে মাঝে যেন এক একটা চমক্ দিয়া যাইতেছে,—মনে হইতেছে এ জীবনে যত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে, তাহাদের সহিত আজিকার এই অনাগত নিশার অপরিজ্ঞাত মূর্ত্তি যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব নারীর অবগুণ্ঠিতা মুখের মত রহস্যময়। অথচ, এই অপরিচিতার কেমন প্রকৃতি কেমন প্রথা কিছুই না জানিয়া একেবারে ইহার শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই হইবে, মধ্য-পথে আর ইহার কোন বিচারই চলিবে না! আবার পরক্ষণেই যেন অক্ষম চিন্তার সমস্ত শৃঙ্খলই এক নিমিষে ভাঙ্গিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। এম্‌নি যখন মনের অবস্থা, সেই সময় পাশের দ্বারটা খুলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল।

তাহার চোখ দু'টা সামান্য একটু রাঙা, একটু যেন ফুলা-ফুলা। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কহিলাম, আশ্চর্য্য কি! যে ভার, যে শ্রান্তি তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ, আর কেউ হলে ত ভেঙেই প'ড়ত,—আর আমি হলে ত দিনরাতের মধ্যে চোখ খুলতেই পারতুম না, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিতুম।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল,—কিন্তু কুম্ভকর্ণের ম্যালেরিয়া ছিল না। যাই হোক্ তুমি ত দিনের বেলায় ঘুমোও নি?

বলিলাম, না, কিন্তু এখন ঘুম পাচ্ছে, হয় ত একটুকু ঘুমোব। কারণ, কুম্ভকর্ণের যে ম্যালেরিয়া ছিল না, এমন কথাও বাল্মীকি মুনি কোথাও লিখে যাননি!

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, ঘুমোবে এই অবেলায়? রক্ষে কর তুমি,—জ্বর কি তা হলে আর কোথাও বাকি থাকবে? সে-সব হবে না, আচ্ছা, যাবার সময় আনন্দ কি আর কিছু তোমাকে বলে গেল?

প্রশ্ন করিলাম, কি রকম কথা তুমি আশা কর?

রাজলক্ষ্মী কহিল, এই যেমন, কোথায় কোথায় যাবে,—কিম্বা—

এই কিম্বাটাই আসল প্রশ্ন। কহিলাম, কোথায় কোথায় যাবেন তার একপ্রকার আভাস দিয়ে গেছেন, কিন্তু, এই কিম্বাটার সম্বন্ধে কিছুই বলে যাননি। আমি ত তাঁর ফিরে আসার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখিনে।

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু আমি কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এই লোকটিকে কি তুমি বাস্তবিক চিনেছ? আমাকে যেমন একদিন চিনতে পেরেছিলে?

সে আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, না।

কহিলাম, সত্যি বলো, কখনো কোনদিন কি দেখনি?

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তোমার কাছে আমি সত্য করতে পারব না। অনেক সময়ে আমার বড় ভুল হয়। তখন অনেক অপরিচিত লোককেই মনে হয় কোথায় যেন তাকে দেখেছি, তার মুখ যেন আমার চেনা, কেবল

কোথায় দেখেছি সেইটেই মনে করতে পারিনে। আনন্দকেও হয় ত কখনো দেখে থাকব।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আজ আনন্দ চলে গেল বটে, কিন্তু যদি সে কখনো ফিরে আসে ত তার বাপ-মায়ের কাছে আবার একদিন তাকে ফিরিয়ে দেব, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলছি।

আমি বলিলাম, তাতে তোমার গরজ কি ?

সে কহিল, অমন ছেলে চিরদিন ভেসে বেড়াবে এ কথা ভাবলেও যেন আমার বুকে শূল বেঁধে। আচ্ছা, তুমি নিজেও ত সংসার ছেড়েছিলে—সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে কি সত্যিকার আনন্দ কিছু আছে ?

কহিলাম, আমি সত্যিকার সন্ন্যাসী হইনি, তাই ওর ভেতরকার সত্যি খবরটি তোমাকে দিতে পার'ব না! যদি কোনদিন সে ফিরে আসে এ সংবাদ তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রো।

রাজলক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, বাড়ীতে থেকে কি ধর্ম্মলাভ হয় না ? সংসার না ছাড়লে কি ভগবান পাওয়া যায় না ?

প্রশ্ন শুনিয়া আমি করজোড়ে বলিলাম, এর কোনটার জন্যেই আমি ব্যাকুল নই লক্ষ্মী, এ সব ঘোরতর প্রশ্ন আমাকে তুমি ক'রো না, আবার আমার জ্বর আসতে পারে।

রাজলক্ষ্মী হাসিল, তারপরে করুণ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু মনে হয় সংসারে আনন্দর ত সমস্তই আছে, তবু ত সে ধর্ম্মের জন্য এই বয়সেই সব ছেড়ে দিয়ে এসেছে! কিন্তু তুমি ত তা পারোনি ?

বলিলাম, না, এবং ভবিষ্যতেও পারব মনে হয় না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন মনে হয় না ?

কহিলাম, তার প্রধান কারণ, যাকে ছাড়তে হবে সেই সংসারটা যে আমার কোথায় এবং কি প্রকার তা' আমার জানা নেই, এবং যাঁর জন্যে ছাড়তে হবে সেই পরমাত্মার প্রতিও আমার লেশমাত্র লোভ নেই। এতদিন তাঁর অভাবেই কেটে গেছে এবং বাকি ক'টা দিনও অচল হয়ে থাকবে না, এই আমার ভরসা। অন্যপক্ষে তোমার ওই আনন্দ ভায়াটিও গেরুয়া সত্ত্বেও যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্যেই বেরিয়ে এসেছেন আমার তা বিশ্বাস নয়। তার কারণ, আমিও বার-কয়েক

সাধু-সঙ্গ করেছি, তাঁদের কেউই আজও ওষুধের বাক্স ঘাড়ে করে বেড়ানোকে ভগবৎ-লাভের উপায় নির্দ্দেশ করে দেননি। তা ছাড়া তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও ত চোখে দেখলে!

রাজলক্ষ্মী মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তবে কি সে মিছামিছিই ঘর-সংসার ছেড়ে এই কষ্ট করতে বার হয়েছে? সবাই কি তোমার মতই মনে কর?

বলিলাম, না, মস্ত প্রভেদ আছে। সে ভগবানের সন্ধানে বার না হ'লেও মনে হয় যার জন্যে পথে বেরিয়েছে সে তাঁরই কাছাকাছি,—অর্থাৎ আপনার দেশ। তাই তার ঘর-বাড়ী ছেড়ে আসাটা ঠিক সংসার ছেড়ে আসা নয়; সাধুজী কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটি সংসার ছেড়ে বড় সংসারের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারিল না; তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, যাবার সময় সে কি তোমাকে কিছু বলে গেল?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না, তেমন কিছু নয়।

কেন যে একটুখানি সত্য গোপন করিলাম তাহা নিজেও জানি না। কিন্তু বিদায়কালে সাধুজীর শেষ কথাটা তখন পর্য্যন্ত আমার কানে তেমনি বাজিতে-ছিল। যাবার সময় সেই যে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, বিচিত্র দেশ এই বাঙলা দেশটা! এর পথে-ঘাটে মা-বোন—সাধ্য কি তাঁদের ফাঁকি দিয়ে যাই!

ম্লানমুখে রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, আমারও মনের মধ্যে অনেক দিনের অনেক ভুলে-যাওয়া ঘটনা ধীরে ধীরে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, তাই বটে! তাই বটে! সাধুজী তুমি যেই হও, এই অল্প বয়সেই আমার এই কাঙাল দেশটিকে তুমি ভাল করিয়াই দেখিয়াছ। না হইলে ইহার যথার্থ রূপটির খবর আজ এমন সহজে এই কয়টি কথায় দিতে পারিতে না! জানি, অনেকদিনের অনেক ত্রুটি অনেক বিচ্যুতি আমার মাতৃভূমির সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পঙ্ক লেপিয়াছে, তবুও, এ সত্য যাচাই করিবার যাহার সুযোগ মিলিয়াছে, সেই জানে, ইহা কত বড় সত্য!

এই ভাবে নীরবে মিনিট দশ-পনের কাটিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, এই উদ্দেশ্যই যদি তার মনে থাকে, একদিন আবার তাকে ঘরে ফিরতেই হবে আমি বলে দিচ্ছি। এ দেশে নিছক পরের ভাল করতে যাওয়ার দুর্গতি হয় ত সে আজও জানে না। এর স্বাদ কতক আমি জানি। আমারই মত একদিন যখন সংশয়ে, বাধায়, কটু-কথায় তার সমস্ত মন তিক্তরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখনি সে পালিয়ে আসবার পথ পাবে না!

আমি সায় দিয়া কহিলাম, অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ-সব দুঃখের কথা যেন সে বেশ জানে।

রাজলক্ষ্মী বারম্বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, কখ্খনো না, কখ্খনো না। জানলে সে-পথে কেউ যাবে না আমি বলছি।

এ কথার আর জবাব ছিল না। বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, একদিন ইহার অনেক সাধু-সঙ্কল্প, অনেক পুণ্য-কর্ম্ম, তাহার শ্বশুরবাড়ীর দেশে অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিল। সেই নিষ্কাম পরোপকারের ব্যথা অনেকদিন ইহার মনে লাগিয়া ছিল। যদিচ, আরও একটা দিক দেখিবার ছিল, কিন্তু সেই অবলুপ্ত বেদনার স্থানটা চিহ্নিত করিয়া তুলিতেও আর প্রবৃত্তি হইল না, তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অথচ রাজলক্ষ্মী যাহা বলিতেছিল তাহা মিথ্যা নয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এমন হয়? কেন একের শুভ চেষ্টা অপরে এমন সন্দেহের চক্ষে দেখে? কেন এগুলি বিফল করিয়া দিয়া মানুষ সংসারের দুঃখের ভার লঘু করিতে দেয় না? মনে হইল সাধুজী যদি থাকিতেন, কিম্বা যদি কখনো ফিরিয়া আসেন, এই জটিল সমস্যার মীমাংসার ভার তাঁকেই দিব।

সেদিন সকাল হইতে নিকটেই কোথা হইতে মাঝে মাঝে সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল, এই সময়ে জন-কয়েক লোক রতনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। রতন সম্মুখে আসিয়া কহিল, মা, এরা আপনাকে রাজবরণ দিতে এসেছে।—এস না হে, দিয়ে যাও না,—এই বলিয়া সে একজন প্রৌঢ় গোছের লোককে ইঙ্গিত করিল। লোকটির পরিধানে হরিদ্রা-রঙে ছোপানো একটি কাপড়, গলায় নূতন কাঠের মালা। সে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিয়া বারান্দার নীচে হইতেই নূতন

শালপাতায় একটি টাকা ও একটি সুপারি রাজলক্ষ্মীর পদতলের উদ্দেশে রাখিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং কহিল, মা-ঠাকরুণ, আজ আমার মেয়ের বিয়ে।

রাজলক্ষ্মী উঠিয়া আসিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং পুলকিত চিত্তে কহিল, মেয়ের বিয়েতে এই বুঝি দিতে হয় ?

রতন কহিল, না মা তা নয়, যার যেমন সাধ্য সে তেমনি জমিদারকে দেয়, —এরা ছোটজাত, ডোম, এর বেশী আর কোথায় কি পাবে বলুন, এই কত কষ্টে—

কিন্তু নিবেদন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই টাকাটা ডোমের শুনিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, তবে থাক্ থাক্, এ-ও দিতে হবে না—তোমরা এমনিই মেয়ের বিয়ে দাওগে—

এই প্রত্যাখ্যানে কন্যার পিতা এবং ততোধিক রতন নিজে বিপদগ্রস্থ হইয়া উঠিল ; সে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, এই রাজবরণের সম্মানটা গ্রহণ না করিলে কোন মতেই চলিবে না। রাজলক্ষ্মী কেন যে ঐ সুপারিসুদ্ধ টাকাটা লইতে কিছুতেই চাহে না, ঘরের ভিতরে বসিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম, এবং রতনই বা কি জন্য যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিল তাহাও আমার অবিদিত ছিল না। খুব সম্ভব দেয় টাকাটা আরও বেশি এবং গমস্তা কুশারী মহাশয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই ইহারা এই কৌশল করিয়াছে ; এবং রতন 'হুজুর' ইত্যাদি সম্ভাষণের পরিবর্ত্তে তাহাদের মুখপাত্র হইয়া আর্জ্জি পেশ করিতে আসিয়াছে। সে যে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াই আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহার এই সঙ্কট অবশেষে আমিই মোচন করিলাম। উঠিয়া আসিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম, আমি নিলাম, তোমরা বাড়ি গিয়ে বিয়ের উদ্যোগ করগে।

রতনের মুখ গর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং রাজলক্ষ্মী অস্পৃশ্যের প্রতিগ্রহের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল। খুসী হইয়া কহিল, এ ভালই হল যে, যাঁর মান্য তিনি স্বহস্তে নিলেন, এই বলিয়া সে হাসিল।

মধু ডোম কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, হুজুর, পহর

রেতের মধ্যেই লগ্‌ন, একবার যদি পায়ের ধূলো দেন। এই বলিয়া সে একবার আমার ও একবার রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি করুণ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

আমি সম্মত হইলাম, রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু হাসিয়া সানাইয়ের শব্দটা আন্দাজ করিয়া বলিল, ওই বুঝি তোমার বাড়ী মধু? আচ্ছা, যদি সময় পাই ত আমিও গিয়ে একবার দেখে আসব। রতনের প্রতি চাহিয়া কহিল, বড় তোরঙ্গটা খুলে দেখ্‌ ত রে, আমার নতুন শাড়ীগুলো আনা হয়েছে কি না? যা, মেয়েটিকে একখানা দিয়ে আয়। মিষ্টি বুঝি এ দেশে কিছু পাওয়া যায় না? বাতাসা মেলে? আচ্ছা, তাই বেশ! অম্‌নি তাও কিছু কিনে দিয়ে আসিস্‌ রতন। হাঁ মধু, তোমার মেয়ের বয়স কত? পাত্তরের বাড়ী কোথায়? লোক কতগুলি খাবে? এ গাঁয়ে ক'ঘর তোমরা আছ?

জমিদারগৃহিণীর একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে মধু সসম্ভ্রমে এবং সবিনয়ে যাহা কহিল তাহাতে বুঝা গেল তাহার কন্যার বয়স বছর নয়েকের মধ্যেই, পাত্র যুবা পুরুষ—ত্রিশ-চল্লিশের বেশি হইবে না—বাড়ী ক্রোশ-পাঁচেক উত্তরে কি একটা গ্রামে—সে একটা তাহাদের বড় সমাজ, সেখানে জাতীয় ব্যবসা কেহ করে না—সকলেরই চাষ-বাস পেশা—মেয়ে বেশ সুখেই থাকিবে, তবে ভয় শুধু রাত্রিটার জন্য! কারণ, বরযাত্রীর সংখ্যা কত হইবে, এবং তাহারা কোথায় কি ফ্যাসাদ বাধাইয়া দিবে, তাহা আজ প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মতেই অনুমান করিবার যো নাই। তাহারা সকলেই সমৃদ্ধ ব্যক্তি, কি করিয়া যে মান-মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া শুভ-কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে এই ভয়েই মধু কাঁটা হইয়া আছে। এই সকল সবিস্তারে নিবেদন করিয়া সে পরিশেষে সকাতরে জানাইল যে, তাহার চিঁড়া গুড় এবং দধি সংগ্রহ হইয়াছে, এমন কি শেষকালে খান-দুই করিয়া বড় বাতাসাও পাতে দিতে পারিবে; কিন্তু তথাপি যদি কোন গোলযোগ হয় ত তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী সকৌতুকে ভরসা দিয়া কহিল, গোলযোগ কিছু হবে না মধু, তোমার মেয়ের বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হবে আমি আশীর্ব্বাদ করছি। খাবার জিনিস এত জোগাড় করেছ, তোমার বেয়াইয়ের দল খেয়ে খুসী হয়ে বাড়ি যাবে।

মধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সঙ্গের লোক দুইটিকে লইয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আশীর্ব্বচনের উপর বরাত দিয়া সে

বিশেষ কোন সান্ত্বনা লাভ করিল না ; আজ রাত্রির জন্য কন্যার পিতার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ জাগিয়া রহিল।

শুভকর্ম্মে পায়ের ধূলা দিব বলিয়া মধুকে আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু সত্য সত্যই যাইতে হইবে এরূপ সম্ভাবনা বোধ করি আমাদের কাহারও মনে ছিল না। সন্ধ্যার কিছু পরে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার আয়-ব্যয়ের একটা খসড়া পড়িয়া শুনাইতেছিল, আমি বিছানায় শুইয়া মুদ্রিত নেত্রে কতক বা শুনিতেছিলাম, কতক বা শুনিতে ছিলাম না, কিন্তু অদূরে বিবাহ-বাটীর কলরোল কিছুক্ষণ হইতে যেন কিঞ্চিৎ অসাধারণ রকমের প্রখর হইয়া কানে বাজিতেছিল। সহসা রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া সহাস্যে কহিল, ডোমের বাড়ীর বিয়ে, মারামারি এর একটা অঙ্গ নয় ত ?

বলিলাম, উঁচু জাতের নকল যদি করে থাকে ত বিচিত্র নয়। সে-সব কথা তোমার মনে আছে ত ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হুঁ। তারপর ক্ষণকাল কান খাড়া করিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাস্তবিক, এ পোড়া দেশে যা করে আমরা মেয়েদের বিলিয়ে দিই, তাতে ইতর-ভদ্র সবাই সমান। ওরা চলে গেলে আমি খোঁজ নিয়ে শুনলুম ওই যে কাল সকালে ঐ ন'বছরের মেয়েটাকে কোন্ অপরিচিত সংসারে টেনে নিয়ে যাবে, আর কখনও হয়ত আসতে পর্যন্ত দেবে না। এদের নিয়মই এই। বাপ ছ'গণ্ডা টাকায় মেয়েটাকে আজ বিক্রি করে দেবে। একবার পাঠিয়ে দাও, এ কথা মুখে আনবারও যো থাকবে না। আহা ! মেয়েটা সেখানে কতই না কাঁদবে—বিয়ের সে কি জানে বল ?

এ সকল দুর্ঘটনা ত জন্মকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, এক রকম সহিয়াও গিয়াছে,—আর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং প্রত্যুত্তরে কেবল মৌন হইয়াই রহিলাম।

জবাব না পাইয়া সে কহিল, আমাদের দেশে ছোট বড় সব জাতের মধ্যেই বিয়েটা কেবল বিয়েই নয়, এটা ধর্ম্ম,—তাই যা, নইলে—

ভাবিলাম বলি, একে যদি ধর্ম্ম বলিয়াই বুঝিয়াছ ত এত নালিশ কিসের ? আর যে ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন প্রসন্ন না হইয়া গ্লানির ভারে অন্তর কালো হইয়া উঠিতে থাকে তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করাই যায় বা কিরূপে ?

কিন্তু আমার বলিবার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী নিজেই পুনশ্চ কহিল, কিন্তু এ সব বিধি-ব্যবস্থা করে গেছেন যাঁরা তাঁরা ছিলেন ত্রিকালদর্শী ঋষি ; শাস্ত্রবাক্য মিথ্যাও নয়, অমঙ্গলেরও নয়, আমরা কি-ই বা জানি, আর কতটুকুই বা বুঝি!

ব্যস্! যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা আর বলা হইল না। এ সংসারে যাহা কিছু ভাবিবার বস্তু ছিল সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালের জন্য বহু পূর্ব্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, দুনিয়ায় নূতন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকি নাই। এ-কথা রাজলক্ষ্মীর মুখে এই নূতন শুনিলাম না, আরও অনেকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, এবং বরাবরই চুপ করিয়া গেছি। আমি জানি ইহার জবাব দিতে গেলেই আলোচনাটা প্রথমে উষ্ণ এবং পরক্ষণেই ব্যক্তিগত কলহে নিরতিশয় তিক্ত হইয়া উঠে। ত্রিকালদর্শীদের আমি তাচ্ছিল্য করিতেছি না, রাজলক্ষ্মীর মত আমিও তাঁহাদের অতিশয় ভক্তি করি ; শুধু এই কথাটাই ভাবি, তাঁহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেবল আমাদের এই ইংরাজি-আমলটার জন্য ভাবিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অনেক দুরূহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন, আমরাও হয় ত সত্যিসত্যিই আজ বাঁচিতে পারিতাম।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথাগুলো যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইত! কেমন করিয়া পাইত জানি না, কিন্তু এখন এই অস্পষ্ট দীপালোকে আমার মুখের চেহারাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, তবুও যেন আমার নিভৃত চিন্তার ঠিক দ্বারপ্রান্তেই আঘাত করিল। কহিল, তুমি ভাবছ এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি—ভবিষ্যতের বিধি-ব্যবস্থা কেউ পূর্ব্বাহ্ণেই নির্দ্দেশ করে দিতে পারে না। কিন্তু আমি বলছি, পারে। আমার গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেছি, এ কাজ তাঁরা না পারলে সজীব মন্ত্রগুলোকেও কখনো দেখতে পেতেন না। বলি, এটা ত মানো আমাদের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলির প্রাণ আছে? তারা জীবন্ত?

বলিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি না মানতে পার, কিন্তু তবুও এ সত্য। তা নইলে আমাদের দেশে এই পুতুল খেলার বিয়েই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ-বন্ধন

হতে পারত না! এ সমস্তই ত ওই সজীব মন্ত্রের জোরে! সেই ঋষিদের কৃপায়! অবশ্য, অনাচার আর পাপ কোথায় নেই, সে সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু আমাদের এ দেশের মত সতীত্বই কি তুমি আর কোথাও দেখাতে পার?'

বলিলাম, না। কারণ, এ তাহার যুক্তি নয়, বিশ্বাস। ইতিহাসের প্রশ্ন হইলে তাহাকে দেখাইতে পারিতাম এই পৃথিবীতে সজীব মন্ত্রহীন আরও দেশ আছে যেথায় সতীত্বের আদর্শ আজও এমনি উচ্চ। অভয়ার উল্লেখ করিয়া বলিতে পারিতাম, এই যদি, তবে তোমাদের জীবন্ত মন্ত্র নর-নারী উভয়কেই এক আদর্শে বাঁধিতে পারে না কেন? কিন্তু এ সকলের প্রয়োজন ছিল না। আমি জানিতাম তাহার চিত্তের ধারটা কিছুদিন হইতেই কোন্ দিক দিয়া বহিতেছে।

দুষ্কৃতির বেদনা সে ভাল করিয়াই জানে। যাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে কলুষিত না করিয়া কেমন করিয়া যে সে এ জীবনে লাভ করিবে, তাহার কিছুই সে ভাবিয়া পায় না। তাহার দুর্ব্বশ হৃদয় ও প্রবুদ্ধ ধর্ম্মবৃত্তি—এই দুই প্রতিকূলগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যে কেমন করিয়া কোন্ সঙ্গমে সম্মিলিত হইয়া এই দুঃখের জীবনে তাহার তীর্থের মত সুপবিত্র হইয়া উঠিবে, সে তাহার কোন কিনারাই দেখিতে পায় না; কিন্তু আমি পাই। নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া পর্য্যন্ত অপরের গোপন আক্ষেপ প্রতিনিয়তই আমার চোখে পড়ে! বেশ স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু তবু যেন দেখিতে পাই তাহার যে দুর্ম্মদ কামনা এতদিন অত্যুগ্র নেশার মত তাহার সমস্ত মনটাকে উতলা-উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সে যেন আজ স্থির হইয়া তাহার সৌভাগ্যের, তাহার প্রাপ্তিটার হিসাব দেখিতে চাহিতেছে। এই হিসাবের অঙ্কগুলায় কি আছে জানি না, কিন্তু শূন্য ছাড়া যদি আর কিছুই আজ আর সে না দেখিতে পায় ত, কেমন করিয়া কোথায় গিয়া যে আবার আমি নিজের এই শতছিন্ন জীবন-জালের গ্রন্থি বাঁধিতে বসিব এ চিন্তা আমার মধ্যে বহুবার আনাগোনা করিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া কিছুই পাই নাই, কেবল এই কথাটাই নিশ্চয় জানিয়া আছি যে, চিরদিন যে পথে চলিয়াছি, প্রয়োজন হয় ত আবার সেই পথেই যাত্রা সুরু করিব। নিজের সুখ ও সুবিধা লইয়া কাহারও সমস্যা জটিল করিয়া তুলিব না; কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, যে মন্ত্রের

সজীবতার আলোচনায় আমাদের মধ্যে এক মুহূর্ত্তে বিপ্লব বহিয়া গেল, তাহার প্রসঙ্গ লইয়া পাশের বাড়ীতেই যে তখন মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল এ সম্বাদ দু'জনের কেহই জানিতাম না।

অকস্মাৎ পাঁচ-সাতজন গোটা-দুই আলো লইয়া অত্যন্ত সোরগোল করিয়া একেবারে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ব্যাকুলকণ্ঠে ডাক দিল, হুজুর! বাবুমশায়!

আমি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম, রাজলক্ষ্মীও সবিস্ময়ে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নালিশটা তাহারা সকলেই একসঙ্গে এবং সমস্বরে করিতে চায়। রতনের পুনঃপুনঃ বকুনি সত্বেও শেষ পর্য্যন্ত কেহই চুপ করিতে পারিল না। যাহা হৌক, ব্যাপারটা বুঝা গেল। কন্যাসম্প্রদান বন্ধ হইয়া আছে, কারণ, মন্ত্র ভুল হইতেছে বলিয়া বরপক্ষীয় পুরোহিত কন্যাপক্ষীয় পুরোহিতের ফুল জল প্রভৃতি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। বাস্তবিক, এ কি অত্যাচার! পুরোহিত সম্প্রদায় অনেক কীর্ত্তিই করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া জোর করিয়া আর একজন সম-ব্যবসায়ীর ফুল জল প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া, এবং শারীরিক বল প্রয়োগে তাহার মুখ চাপিয়া স্বাধীন ও সজীব মন্ত্রোচ্চারণে বাধা দেওয়া—এমন অত্যাচার ত কখনও শুনি নাই।

রাজলক্ষ্মী কি যে বলিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না; কিন্তু রতন ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল, সে বাহিরে আসিয়া মস্ত একটা ধমক দিয়া কহিল, তোদের আবার পুরুত কিরে? এখানে, অর্থাৎ জমিদারীতে আসিয়া পর্য্যন্ত সে 'তুমি' বলিবার যোগ্য কাহাকেও পায় নাই, কহিল, ডোম-ডোকালির আবার বিয়ে, তাদের আবার পুরুত! এ কি আমাদের বামুন-কায়েত-নবশাক পেয়েছিস্ যে বিয়ে দিতে আসবে বামুনঠাকুর? এই বলিয়া সে বারবার আমার ও রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি সগর্ব্বে চাহিতে লাগিল। এখানে মনে করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে রতন জাতিতে নাপিত।

মধু ডোম নিজে আসিতে পারে নাই, কন্যা-সম্প্রদানে বসিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধী আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি যাহা বলিতে লাগিল তাহাতে যদিচ বুঝা গেল ইহাদের ব্রাহ্মণ নাই, নিজেরা নিজেদের পুরোহিত, তথাপি রাখাল

পণ্ডিত তাহাদের ব্রাহ্মণেরই সামিল। কারণ, তাহার গলায় পৈতা আছে, এবং তাহাদের দশ-কর্ম্ম করায়। এমন কি সে তাহাদের ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খায় না। সুতরাং এত বড় সাত্ত্বিকতার পরেও আর প্রতিবাদ চলে না। অতএব, আসল ও খাঁটি ব্রাহ্মণের সহিত অতঃপর যদি কোন প্রভেদ থাকে ত সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সে যাহা হোক, ইহাদের ব্যাকুলতায় ও অদূরে বিবাহ-বাটীর প্রবল চীৎকার শব্দে আমাকে যাইতে হইল। রাজলক্ষ্মীকে কহিলাম, তুমিও চল না, বাড়ীতে একলা কি করবে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে মাথা নাড়িল, কিন্তু শেষে কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিল না, চল, বলিয়া আমার সঙ্গ লইল। আসিয়া দেখিলাম মধুর সম্বন্ধী অত্যুক্তি করে নাই। বিবাদ তুমুল হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। এদিকে বরপক্ষীয় প্রায় ত্রিশ বত্রিশ জন এবং অন্যদিকে কন্যাপক্ষীয়ও প্রায় ততগুলি। মাঝখানে প্রবল ও স্থূলকায় শিবু পণ্ডিত দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবি রাখাল পণ্ডিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! আমরা সসম্মানে একটা মাদুরের উপর আসন গ্রহণ করিয়া শিবু পণ্ডিতের এই অতর্কিত আক্রমণের হেতু জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, হুজুর, মন্তরের ম জানে না এই ব্যাটা, আবার নিজেকে বলে পণ্ডিত! বিবাহটাই আজ ভেস্তে দিত। রাখাল মুখ ভ্যাঙাইয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, হাঁ দিত! পাঁচখানা গাঁয়ে ছাদ্দ, বিয়ে নিত্যি দিচ্ছি, আর আমি জানিনে মন্তর! মনে ভাবিলাম এখানেও সেই মন্ত্র; কিন্তু বাটীতে রাজলক্ষ্মীর কাছে না হয় মৌন থাকিয়াই তর্কের জবাব দিয়াছি, কিন্তু এখানে যদি যথার্থ-ই মধ্যস্থতা করিতে হয় ত বিপদে পড়িতে হইবে। অবশেষে বহু বাদবিতণ্ডায় স্থির হইল যে রাখালই মন্ত্র পাঠ করাইবে, কিন্তু ভুল যদি কোথাও হয় ত শিবুকে আসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। রাখাল রাজী হইয়া পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিল, এবং কন্যার পিতার হাতে কয়েকটা ফুল এবং বর-কন্যার দুই হাত একত্র করিয়া দিয়া যে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিল তাহা আমার আজও মনে আছে। এগুলি সজীব কি না জানি না এবং মন্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ হয় বেদে ঠিক এই কথাগুলিই ঋষিরা সৃষ্টি করিয়া যান নাই।

রাখাল পণ্ডিত বরকে বলিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

রাখাল কন্যাকে বলিলেন, বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় নমঃ।

বালিকা কন্যার উচ্চারণে পাছে ত্রুটি হয় এইজন্য মধু তাহার হইয়া উচ্চারণ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শিবু পণ্ডিত দুই হাত তুলিয়া বজ্র-গর্জ্জনে সকলকে চমকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, ও মন্তরই নয়! বিয়েই হ'লো না! পিছনে একটা টান পাইয়া ফিরিয়া দেখি রাজলক্ষ্মী মুখের মধ্যে আঁচল গুঁজিয়া প্রাণপণে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং উপস্থিত সমস্ত লোকই একান্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। রাখাল পণ্ডিত লজ্জিত মুখে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার কথা কেহ কানেই লইল না, সকলেই সমস্বরে শিবুকে অনুনয় করিতে লাগিল, পণ্ডিতমশাই, মন্তরটি আপনিই বলিয়ে দিন, নইলে এ বিয়েই হবে না,—সব নষ্ট হয়ে যাবে। সিকি দক্ষিণে ওঁকে দিয়ে আপনিই বারো আনা নেবেন, পণ্ডিতমশাই।

শিবু পণ্ডিত তখন ঔদার্য্য দেখাইয়া কহিলেন, রাখালের দোষ নেই, আসল মন্তর আমি ছাড়া এ অঞ্চলে আর কেউ জানেই না। বেশী দক্ষিণে আমি চাইনে, আমি এইখান থেকেই মন্ত্রপাঠ করছি, রাখাল ওদের পড়াক্! এই বলিয়া সেই শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং পরাজিত রাখাল নিরীহ ভালমানুষটির মত বরকন্যাকে আবৃত্তি করাইতে লাগিল।

শিবু কহিলেন, বল, মধু, ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

শিবু কহিলেন, মধু, এবার তুমি বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ।

সকন্যা মধু ইহাই আবৃত্তি করিল। সকলেই নীরব, স্থির। ভাবে বোধ হইল শিবুর মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে এ অঞ্চলে পদার্পণ করে নাই।

শিবু বরের হাতে ফুল দিয়া কহিল, বিপিন, তুমি বল, যতদিন জীবনং ততদিন ভাত-কাপড় প্রদানং স্বাহা!

বিপিন থামিয়া থামিয়া বহু দুঃখে বহু সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিল।

শিবু কহিলেন, বর কন্যা দু'জনেই বল, যুগল মিলনং নমঃ।

বর এবং কন্যার হইয়া মধু ইহা আবৃত্তি করিল। ইহার পরে বিরাট হরিধ্বনি সহকারে বর-কন্যাকে বাটীর মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমার চতুষ্পার্শ্বে একটা গুঞ্জন রোল উঠিল, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে, হাঁ, একজন শাস্তর জানা লোক বটে! মন্তর পড়ালে বটে! রাখাল পণ্ডিত এতকাল আমাদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

সমস্তক্ষণ আমি গম্ভীর হইয়াই ছিলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত এই অসীম গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াই রাজলক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। ওখানে কি করিয়া যে সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া বসিয়া ছিল আমি জানি না, কিন্তু ঘরে আসিয়া হাসির প্রবাহে তাহার যেন দম বন্ধ হইবার যো হইল। বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া সে কেবলই বলিতে লাগিল, হাঁ, একজন মহামহোপাধ্যায় বটে! রাখাল এতদিন এদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

প্রথমটা আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, তাহার পরে কহিলাম, মহামহোপাধ্যায় দু'জনেই। অথচ, এমনি ক'রেই ত এতকাল এদের মেয়ের মা এবং মেয়ের ঠাকুরমার বিয়ে হয়েছে! রাখালের যাই হোক্, শিবু পণ্ডিতের মন্ত্রগুলোও ঠিক ঋষিরুবাচ বলে মনে হলো না, কিন্তু তবু ত এদের কোন মন্ত্রই বিফল হয়নি! এদের দেওয়া বিবাহ-বন্ধন ত আজও তেমনি দৃঢ়, তেমনি অটুট আছে!

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া সহসা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং একদৃষ্টে চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল।

ছয়

সকালে উঠিয়া শুনিলাম কুশারী মহাশয় মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি একা নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, না, আমিও আছি।

যাবে?

যাবো বই কি।

তাহার এই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। খাওয়া বস্তুটা যে হিন্দু-ধর্ম্মের কি, এবং সমাজের কতখানি ইহার উপর নির্ভর করে রাজলক্ষ্মী তাহা জানে, এবং কতবড় নিষ্ঠার সহিত ইহাকে মানিয়া চলে আমিও তাহা জানি, অথচ এই তাহার জবাব। কুশারী মহাশয় সম্বন্ধে বেশী কিছু জানি না, তবে বাহির হইতে তাঁহাকে যতটা দেখা গিয়াছে, মনে হইয়াছে তিনি আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ, এবং ইহাও নিশ্চিত যে রাজলক্ষ্মীর ইতিহাস তিনি অবগত নহেন, কেবল মনিব বলিয়াই আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে আজ সেখানে গিয়া কি করিয়া কি করিবে আমি ত ভাবিয়াই পাইলাম না। অথচ, আমার প্রশ্নটা বুঝিয়াও সে যখন কিছুই কহিল না, তখন ইহারই নিহিত-কুণ্ঠা আমাকেও নির্ব্বাক করিয়া রাখিল।

যথাসময়ে গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া।

কহিলাম, যাবে না ?

সে কহিল, যাবার জন্যেই ত দাঁড়িয়ে আছি। এই বলিয়া সে গাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিল।

রতন সঙ্গে যাইবে, সে আমার পিছনে ছিল ; ঠাকুরাণীর সাজসজ্জা দেখিয়া সে যে নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিলাম। আমিও আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, কিন্তু সেও যেমন প্রকাশ করিল না, আমিও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। বাড়াতে সে কোনকালেই বেশী গহনা পরে না, কিছুদিন হইতে তাহাও কমিতেছিল ; কিন্তু আজ দেখা গেল গায়ে তাহার কিছুই প্রায় নাই। যে হারটা সচরাচর তাহার গলায় থাকে, সেইটি এবং হাতে একজোড়া বালা। ঠিক মনে নাই, তবুও যেন মনে হইল কাল রাত্রি পর্য্যন্ত যে চুড়ি কয়গাছি দেখিয়াছিলাম সেগুলিও যেন সে আজ ইচ্ছা করিয়াই খুলিয়া ফেলিয়াছে। পরণের কাপড়খানিও নিতান্ত সাধারণ, বোধহয় সকালে স্নান করিয়া যাহা পরিয়াছিল তাহাই। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া আস্তে-আস্তে বলিলাম, একে একে সমস্তই ছাড়লে দেখছি। কেবল আমিই বাকি রয়ে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, এমন ত হতে পারে এই একটার মধ্যেই সমস্ত রয়ে গেছে। তাই যেগুলো বাড়তি ছিল সেইগুলোই একে একে ঝরে যাচ্ছে। এই বলিয়া সে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিল, রতন কাছাকাছি আছে কি না; তার পরে গাড়োয়ানটাও না শুনিতে পায় এমনি অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেশ ত, সে আশীর্ব্বাদই কর না তুমি। তোমার বড় আর ত আমার কিছুই নেই, তোমাকেও যার বদলে অনায়াসে দিতে পারি আমাকে সেই আশীর্ব্বাদই তুমি কর।

চুপ করিয়া রহিলাম। কথাটা এমন একদিকে চলিয়া গেল, যাহার জবাব দিবার কোন সাধ্যই আমার ছিল না। সেও আর কিছু না বলিয়া মোটা বালিশটা টানিয়া লইয়া গুটি-সুটি হইয়া আমার পায়ের কাছে শুইয়া পড়িল। আমাদের গঙ্গামাটি হইতে পোড়ামাটিতে যাইবার একটা অত্যন্ত সোজা পথ আছে। সম্মুখের শুষ্ক-জল খাদটার উপরে যে সঙ্কীর্ণ বাঁশের সাঁকো আছে, তাহার উপর দিয়া গেলে মিনিট-দশেকের মধ্যেই যাওয়া যায়, কিন্তু গরুর গাড়ীতে অনেকখানি রাস্তা ঘুরিয়া ঘণ্টা-দুই বিলম্বে পৌঁছিতে হয়। এই দীর্ঘ পথটায় দু'জনের মধ্যে আর কোন কথাই হইল না। সে কেবল আমার হাতখানা তাহার গলার কাছে টানিয়া লইয়া ঘুমানোর ছল করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল!

কুশারী মহাশয়ের দ্বারে আসিয়া যখন গো-যান থামিল তখন বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কর্ত্তা এবং গৃহিণী উভয়েই একসঙ্গে বাহির হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং অতিশয় সম্মানিত অতিথি বলিয়াই বোধ হয় সদরে না বসাইয়া একেবারে ভিতরে লইয়া গেলেন। তা ছাড়া, অনতিবিলম্বেই বুঝা গেল সহর হইতে দূরবর্ত্তী এই সকল সামান্য পল্লী-অঞ্চলে অবরোধের সেরূপ কঠোর শাসন প্রচলিত নাই! কারণ, আমাদের শুভাগমন প্রচারিত হইতে না হইতেই প্রতিবেশীদের অনেকেই যাহারা খুড়া, জ্যাঠা, মাসিমা ইত্যাদি প্রীতি ও আত্মীয় সম্বোধনে কুশারী ও তাঁহার গৃহিনীকে আপ্যায়িত করিয়া একে-একে, দুইয়ে-দুইয়ে প্রবেশ করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলেই অবলা নহেন। রাজলক্ষ্মীর ঘোমটা দিবার অভ্যাস ছিল না, সেও আমারই মত সম্মুখের বারান্দায়

একখানি আসনের উপর বসিয়া ছিল ; এই অপরিচিত রমণীর সাক্ষাতেও এই অনাহুতের দল বিশেষ কোন সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না। তবে সৌভাগ্য এইটুকু যে আলাপ করিবার ঔৎসুক্যটা নিতান্তই তাঁহার প্রতি না হইয়া আমার প্রতিই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কর্ত্তা অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার ব্রাহ্মণীও তেমনি, কেবল বাড়ীর বিধবা মেয়েটিই রাজলক্ষ্মীর পাশে স্থির হইয়া বসিয়া একটা তাল-পাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিল। আর আমি কেমন আছি, কি অসুখ, কতদিন থাকিব, জায়গাটা ভাল মনে হইতেছে কিনা, জমিদারী নিজে না দেখিলে চুরি হয় কি না, ইহার নূতন কোন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি কি না, ইত্যাদি অর্থ ও ব্যর্থ নানাবিধ প্রশ্নোত্তর-মালার ফাঁকে কুশারী মহাশয়ের-সাংসারিক অবস্থাটা একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। বাটিতে অনেকগুলি ঘর এবং সেগুলি মাটির ; তথাপি মনে হইল কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা সচ্ছল ত বটেই, বোধ হয় একটু বিশেষ রকমই ভাল। প্রবেশ করিবার সময় বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের একধারে একটা ধানের মরাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলাম, ভিতরের প্রাঙ্গণেও দেখিলাম তেমনি আরও গোটা-দুই রহিয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রান্নাঘরই হইবে, তাহারই উত্তরে একটা চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা-দুই ঢেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্ব্বেই যেন তাহার কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। একটা বাতাবী-বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার কয়েকটা চুল্লী নিকান-মুছান ঝর্ঝর্ করিতেছে, এবং সেই পরিষ্কৃত স্থানটুকুর উপরে ছায়াতলে দুটি পরিপুষ্ট গো-বৎস ঘাড় কাৎ করিয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে। তাহাদের মায়েরা কোথায় বাঁধা আছে চোখে পড়িল না সত্য, কিন্তু এটা বুঝা গেল কুশারী-পরিবারে অন্নের মত দুগ্ধেরও বিশেষ কোন অনটন নাই। দক্ষিণের বারান্দার দেয়াল ঘেঁসিয়া ছয়-সাতটা বড় বড় মাটির কলসী বিঁড়ার উপর বসানো আছে। হয় ত গুড় আছে, কি, কি আছে জানি না, কিন্তু যত্ন দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহারা শূন্যগর্ভ কিম্বা অবহেলার বস্তু। কয়েকটা খুঁটির গায়েই দেখিলাম ঢেরা সমেত পাট এবং শণের গোছা বাঁধা রহিয়াছে—সুতরাং বাটীতে যে বিস্তর দড়ি-দড়ার আবশ্যক হয়, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান করিলাম না। কুশারী-গৃহিণী খুব সম্ভব

আমাদের অভ্যর্থনার কাজেই অন্যত্র নিযুক্তা, কর্ত্তাটিও একবার মাত্র দেখা দিয়াই অন্তর্ধান করিয়াছিলেন; তিনি অকস্মাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ আর এক প্রকারে দিয়া কহিলেন, মা এইবার যাই, আহ্নিকটা সেরে এসে একেবারে বসি। বছর পনর-ষোলর একটি সুন্দর সবলকায় ছেলে উঠানের একধারে দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল; কুশারী মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, বাবা হরিপদ, নারায়ণের অন্ন বোধ করি এতক্ষণে প্রস্তুত হল, একবার ভোগটি দিয়ে এসো গে বাবা। আহ্নিকের বাকিটুকু শেষ করতে আর আমার দেরী হবে না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আজ মিছাই আপনাদের কষ্ট দিলাম—বড় দেরী হয়ে গেল। এই বলিয়া আমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আর দেরী না করিয়া চক্ষের পলকে নিজেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এইবার যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পরে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠাঁই করার খবর পৌঁছিল। বাঁচা গেল। কেবল অতিরিক্ত বেলায় জন্য নয়, এইবার আগন্তুকগণের প্রশ্নবাণের বিরতি অনুভব করিয়াই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অব্যাহতি দিয়া যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিন্তু খাইতে বসিলাম কেবল আমি একা। কুশারী মহাশয় সঙ্গে বসিলেন না, কিন্তু সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হেতুটা তিনি সবিনয়ে এবং সগৌরবে নিজেই ব্যক্ত করিলেন। উপবীত ধারণের দিন হইতে ভোজনকালে সেই যে মৌনী হইয়াছিলেন, সে ব্রত আজও ভঙ্গ করেন নাই; সুতরাং একাকী নির্জ্জন গৃহে এই কাজটা তিনি এখনও সম্পন্ন করেন। আপত্তিও করিলাম না, আশ্চর্য্যও হইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে যখন শুনিলাম আজ তাহারও নাকি কি একটা ব্রত আছে,—পরান্ন গ্রহণ করিবে না, তখনই আশ্চর্য্য হইলাম। এই ছলনায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম, এবং ইহার কি যে প্রয়োজন ছিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথা চক্ষের পলকে বুঝিয়া লইয়া কহিল, তার জন্যে তুমি দুঃখ ক'রো না, ভাল করে খাও। আমি যে আজ খাব না, এঁরা সবাই জানতেন।

বলিলাম, অথচ, আমি জানতাম না। কিন্তু এই যদি, কষ্ট স্বীকার করে' আসার কি আবশ্যক ছিল ?

ইহার উত্তর রাজলক্ষ্মী দিল না, দিলেন কুশারী-গৃহিণী। কহিলেন, এ কষ্ট আমিই স্বীকার করিয়েছি বাবা। মা যে এখানে খাবেন না তা জানতাম; তবু আমরা যাঁদের দয়ায় দুটী অন্ন পাই, তাঁদের পায়ের ধূলো বাড়ীতে পড়বে এ লোভ সামলাতে পারলাম না। কি বল মা? এই বলিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিলেন। রাজলক্ষ্মী বলিল, এর জবাব আজ নয় মা, আর একদিন আপনাকে দেব। এই বলিয়া সে হাসিল।

আমি কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুশারী-গৃহিণীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিলাম। পল্লীগ্রামে, বিশেষ এইরূপ সুদূর পল্লীতে ঠিক এমনি সহজ সুন্দর কথাগুলি যেন কোন রমণীর মুখেই শুনিবার কল্পনা করি নাই; কিন্তু এখনও যে এই পল্লী-অঞ্চলেই আরও একটি ঢের বেশী আশ্চর্য্য নারীর পরিচয় পাইতে বাকি ছিল, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই! আমার পরিবেশনের ভার বিধবা কন্যার উপর অর্পণ করিয়া কুশারী-গৃহিণী তালপাতা হাতে আমার সুমুখে বসিয়াছিলেন। বোধ হয়, বয়সে আমার অনেক বড় হইবেন বলিয়াই মাথার উপর অঞ্চলখানি ছাড়া মুখে কোন আবরণ ছিল না। তাহা সুন্দর কিম্বা অসুন্দর, মনেই হইল না, কেবল এইটুকুই মনে হইল, ইহা সাধারণ বাঙালী মায়ের মতই স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ। দ্বারের কাছে কর্ত্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া ছিলেন, বাহির হইতে তাঁহার মেয়ে ডাকিয়া কহিল, বাবা, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। বেলা অনেক হইয়াছিল, এবং এই খবরটুকুর জন্যই বোধ হয় তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন; তথাপি একবার বাহিরে ও একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখন একটু থাক্ মা, বাবুর খাওয়াটা—

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না তুমি যাও, মিথ্যে সময় নষ্ট ক'রো না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোমার খাওয়া হয় না আমি জানি।

কুশারী সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, কহিলেন, নষ্ট আর কি হবে—বাবুর খাওয়াটা হয়েই যাক না।

গৃহিণী কহিলেন, আমি থাকতেও যদি খাওয়ার ত্রুটি হয় ত তুমি দাঁড়িয়ে থাকলেও সারবে না। তুমি যাও,—কি বল বাবা? এই বলিয়া

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। আমিও হাসিয়া বলিলাম, হয় ত বা ত্রুটি বাড়বে। আপনি যান কুশারীমশায়, অমন অভুক্ত চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন পক্ষেই সুবিধে হবে না। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু মনে হইল সম্মানিত অতিথির আহারের স্থানে উপস্থিত না থাকিবার সঙ্কোচটা সঙ্গে লইয়াই গেলেন; কিন্তু এইটাই যে আমার মস্ত ভুল হইয়াছিল তাহা কিছুক্ষণ পরেই আর অবিদিত রহিল না। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, নিরিমিষ আলো চালের ভাত খান; জুড়িয়ে গেলে আর খাওয়াই হয় না, তাই জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাও বলি বাবা, যারা অন্নদাতা তাঁদের পূর্ব্বে নিজের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করাও কঠিন।

কথাটায় মনে মনে আমার লজ্জা করিতে লাগিল, বলিলাম, অন্নদাতা আমি নয়; কিন্তু তাও যদি সত্য হয়, সেটুকু এত কম যে এটুকু বাদ গেলে বোধ করি আপনারা টেরও পেতেন না।

কুশারী-গৃহিণী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানি ধীরে ধীরে যেন অতিশয় ম্লান হইয়া উঠিল। তার পরে কহিলেন, তোমার কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয় বাবা, ভগবান আমাদের কিছু কম দেননি, কিন্তু এখন মনে হয় এত যদি তিনি নাই দিতেন, হয় ত এর চেয়ে তাঁর বেশী দয়াই প্রকাশ পেত। বাড়ীতে ওই ত কেবল একটা বিধবা মেয়ে—কি হবে আমাদের গোলা-ভরা ধানে, কড়া-ভরা দুধে, আর কলসী কলসী গুড় নিয়ে? এ সব ভোগ করবার যারা ছিল, তারা ত আমাদের ত্যাগ করেই চলে গেছে।

কথাটা বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু বলিতে বলিতেই তাঁহার দুটি চোখ ছলছল করিয়া আসিল এবং ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম অনেক গভীর বেদনাই এই কয়টি কথার মধ্যে নিহিত আছে। ভাবিলাম, হয় ত তাঁহার কোন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ওই যে ছেলেটিকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাহাকে অবলম্বন করিয়া হতাশ্বাস পিতামাতা আর কোন সান্ত্বনাই পাইতেছেন না। আমি নীরব হইয়া রহিলাম, রাজলক্ষ্মীও কোন কথা না কহিয়া কেবল তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আমারই মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙিল তাঁহার পরের কথায়। তিনি আপনাকে আপনি সম্বরণ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমাদের

মত তাদেরও ত তোমরাই অন্নদাতা। কর্ত্তাকে বললাম, মনিবকে দুঃখের কথা জানাতে লজ্জা নেই, আমাদের মাকে বাবাকে নিমন্ত্রণের ছল করে একবার ধরে আন, আমি তাঁদের কাছে কেঁদে-কেটে দেখি যদি তাঁরা এর কোন বিহিত করে দিতে পারেন। এই বলিয়া এইবার তিনি অঞ্চল তুলিয়া নিজের অশ্রুজল মোচন করিলেন। সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম সেও আমারই মত সংশয়ে পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের মত এখনও দু'জনে মৌন হইয়া রহিলাম। কুশারী-গৃহিণী এইবার তাঁহাদের দুঃখের ইতিহাস ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া বহুক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা বাহির হইল না, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে, এ কথা বিবৃত করিয়া বলিতে ঠিক এতখানি ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। রাজলক্ষ্মী পরান্ন গ্রহণ করিবে না শুনিয়াও এই মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ হইতে সুরু করিয়া কর্ত্তাটিকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দেওয়া চলিত না ; কিন্তু সে যাই হোক কুশারী-গৃহিণী তাঁহার চক্ষের জল ও অস্ফুট বাক্যের ভিতর দিয়া ঠিক কতখানি যে ব্যক্ত করিলেন, তাহা জানি না এবং ইহার কতখানি যে সত্য তাহাও একপক্ষ শুনিয়া নিশ্চয় করা কঠিন ; কিন্তু আমাদের মধ্যস্থতায় যে সমস্যা আজ তাঁহারা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে সনির্ব্বন্ধ আবেদন করিলেন, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি মধুর ও তেমনি কঠোর।

কুশারী-গৃহিণী যে দুঃখের ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন তাহার মোট কথাটা এই যে, গৃহে তাঁহাদের খাওয়া-পরার যথেষ্ট সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও শুধু যে, কেবল সংসারটাই তাঁহাদের বিষ হইয়া গিয়াছে তাই নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছে তাঁহারা লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেছেন না এবং সমস্ত দুঃখের মূল হইতেছে তাঁহার একমাত্র ছোট জা সুনন্দা। এবং যদিচ তাঁহার দেবর যদুনাথ ন্যায়রত্নও তাঁহাদের কম শত্রুতা করেন নাই, কিন্তু আসল অভিযোগটা তাঁহার সেই সুনন্দার বিরুদ্ধে। এবং এই বিদ্রোহী সুনন্দা ও তাঁহার স্বামী যখন সম্প্রতি আমাদেরই প্রজা, তখন যেমন করিয়াই হোক ইহাদের বশ করিতে হইবে। ঘটনাটা সংক্ষেপে এইরূপ। তাঁহার শ্বশুরশাশুড়ী যখন স্বর্গগত হন তখন তিনি এ বাড়ীর বধূ। যদু কেবল ছয়-সাত বছরের বালক। এ বালককে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার তাঁহারই উপর পড়ে এবং সেদিন পর্য্যন্ত এ ভার

তিনি বহন করিয়াই আসিয়াছেন। পৈতৃক বিষয়ের মধ্যে একখানি মাটির ঘর, বিঘা দুই-তিন ব্রহ্মোত্তর জমি এবং ঘর-কয়েক যজমান। মাত্র এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার স্বামীকে সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে হয়। আজ এই যে প্রাচুর্য্য, এই যে সচ্ছলতা, এসকল সমস্তই তাঁহার স্বকৃত উপার্জ্জনের ফল। ঠাকুরপো কোন সাহায্যই করেন নাই, সাহায্য কখনও তাহার কাছে প্রার্থনাও করা হয় নাই।

আমি কহিলাম, এখন বুঝি তিনি অনেক দাবী করছেন?

কুশারী-গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, দাবী কিসের বাবা, এ ত সমস্তই তার। সমস্তই সে নিত, সুনন্দা যদি না মাঝে পড়ে আমার সোনার সংসার ছারখার করে দিত।

আমি কথাটা ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আপনার এই ছেলেটি?

তিনিও প্রথমটা বুঝিতে পারিলেন না, পরে বুঝিয়া বলিলেন, ওই বিজয়ের কথা বলছ? ও ত আমাদের ছেলে নয় বাবা, ও একটি ছাত্র। ঠাকুরপোর টোলে পড়ত, এখনও তার কাছেই পড়ে, শুধু আমার কাছে থাকে। এই বলিয়াই তিনি বিজয় সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিয়া কহিতে লাগিলেন, কত দুঃখে যে ঠাকুরপোকে মানুষ করি সে শুধু ভগবান জানেন, এবং পাড়ার লোকও কিছু কিছু জানে; কিন্তু নিজে সে আজ সমস্ত ভুলেছে, শুধু আমরাই ভুলতে পারিনি। এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সে সব যাক বাবা, সে অনেক কথা! আমি ঠাকুরপোর পৈতে দিলাম, কর্ত্তা তাকে পড়ার জন্যে মিহিরপুরে শিবু তর্কলঙ্কারের টোলে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা, ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি বলে আমি নিজে কতদিন গিয়ে মিহিরপুরে বাস করে এসেছি, সেও আজ আর তার মনে পড়ে না। যাক—এমন ক'রে কত বছরই না কেটে গেল! ঠাকুরপোর পড়া সাঙ্গ হ'ল, কর্ত্তা তাকে সংসারী করার জন্যে মেয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন; এমন সময়ে বলা নেই কহা নেই, হঠাৎ একদিন শিবু তর্কালঙ্কারের মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করে এনে উপস্থিত। আমাকে নাই বলুক বাবা, অমন দাদার পর্য্যন্ত একটা মত নিলে না!

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, মত না নেওয়ার কি বিশেষ কারণ ছিল?

গৃহিণী কহিলেন, ছিল বই কি। ওরা আমাদের ঠিক স্ব-ঘরও নয়, কুলে-শীলে মানেও ঢের ছোট। কর্ত্তা রাগ করলেন, দুঃখে লজ্জায় বোধ করি এমন মাসখানেক কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কইলেন না, কিন্তু আমি রাগ করিনি। সুনন্দার মুখখানি দেখে প্রথম থেকেই যেন গলে গেলাম। তার ওপর যখন শুনতে পেলাম, তার মা মারা গেছে, বাপ ঠাকুরপোর হাতে সঁপে দিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেছেন, তখন ওই ছোট মেয়েটিকে পেয়ে আমার কি যে হ'ল তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না; কিন্তু সে যে একদিন তার এমন শোধ দেবে, এ কথা তখন কে ভেবেছিল?—এই বলিয়া তিনি হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বুঝিলাম এইখানে ব্যথাটা অতিশয় তীব্র; কিন্তু নীরবে রহিলাম। রাজলক্ষ্মীও এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই; সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাঁরা কোথায়?

প্রত্যুত্তরে তিনি ঘাড় নাড়িয়া যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে বুঝা গেল ইঁহারা আজও এই গ্রামেই আছেন। ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা হইল না, তাঁহার সুস্থ হইতে একটু বেশী সময় গেল; কিন্তু আসল বস্তুটা এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝাই গেল না। এদিকে আমার খাওয়াও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কারণ কান্নাকাটি সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে নাই। সহসা তিনি চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং আমার থালার দিকে চাহিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাক্ বাবা, সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলতে গেলে শেষও হবে না, তোমাদের ধৈর্য্য থাকবে না। আমার সোনার সংসার যারা চোখে দেখেছে, কেবল তারাই জানে ছোটবৌ আমার কি সর্ব্বনাশ করে গেছে। কেবল সেই লঙ্কাকাণ্ডটাই তোমাদের সংক্ষেপে বলব।

যে সম্পত্তিটার উপর আমাদের সমস্ত নির্ভর, সেটা এক সময়ে একজন তাঁতির ছিল। বছরখানেক পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন সকালে তার বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেটিকে সঙ্গে করে বাড়ীতে এসে উপস্থিত। রাগ করে কত কি যে বলে গেল তার ঠিকানা নেই, হয়ত' তার কিছুই সত্য নয়, হয়ত' তার সমস্তই মিথ্যে—ছোটবৌ স্নান করে যাচ্ছিল রান্নাঘরে; সে যেন সেই সব শুনে

একেবারে পাথর হয়ে গেল। তারা চলে গেলেও তার সে ভাব আর ঘুচতে চাইল' না। আমি ডেকে বললাম, সুনন্দা দাঁড়িয়ে রইলি, বেলা হয়ে যাচ্ছে না? কিন্তু জবাবের জন্য তার মুখের পানে চেয়ে আমার ভয় হ'ল। তার চোখের চাহনিতে কিসের যেন একটা আলো ঠিকরে পড়ছে, কিন্তু শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে ফ্যাকাশে,—বিবর্ণ। তাঁতি-বৌয়ের প্রত্যেক কথাটি যেন বিন্দু বিন্দু করে তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। সে তখ্খনি আমার জবাব দিলে না, কিন্তু আস্তে আস্তে কাছে এসে বললে, দিদি, তাঁতি-বৌকে তার স্বামীর বিষয় তোমরা ফিরিয়ে দেবে না! তার ঐটুকু নাবালক ছেলেকে তোমরা সর্ব্বস্ব বঞ্চিত করে সারাজীবন পথের ভিখারী করে রাখবে?

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, শোন কথা একবার। কানাই বসাকের সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেলে, ইনি কিনে নিয়েছেন। নিজের কেনা বিষয় কে কবে পরকে ছেড়ে দেয় ছোটবৌ?

ছোটবৌ বললে, কিন্তু বটঠাকুর এত টাকা পেলেন কোথায়?

রাগ করে জবাব দিলাম, সে কথা জিজ্ঞেসা করগে যা তোর বটঠাকুরকে—বিষয় যে কিনেছে। এই বলে আহ্নিক করতে চলে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সত্যিই ত। যে বিষয় নিলাম হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে তা ফিরিয়ে দিতেই বা ছোটবৌ বলে কি করে?'

কুশারী-গৃহিণী কহিলেন, বল ত বাছা; কিন্তু এ কথা বলা সত্ত্বেও তাঁহার মুখের উপর লজ্জার যেন একটা কালো ছায়া পড়িল। কহিলেন, তবে, ঠিক নিলাম হয়েই ত বিক্রী হয়নি কিনা তাই। আমরা হলাম তাদের পুরুত বংশ। কানাই বসাক মৃত্যুকালে এঁর ওপরেই সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তখন ত আর ইনি জানতেন না সেই সঙ্গে একরাশ দেনাও রেখে গিয়েছিল!

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমি উভয়েই কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কি যেন একটা নোঙরা জিনিস আমার মনের ভিতরটা এক মুহূর্ত্তেই একেবারে মলিন করিয়া দিয়া গেল। কুশারী-গৃহিণী বোধ করি ইহা লক্ষ্য করিলেন না। বলিলেন, জপ, আহ্নিক সমস্ত সেরে ঘণ্টাদুই পরে ফিরে এসে দেখি সুনন্দা সেইখানে ঠিক তেমনি স্থির হয়ে বসে আছে। কোথাও একটা

পা পর্য্যন্ত বাড়ায়নি। কর্ত্তা কাছারী সেরে এখুনি এসে পড়বেন, ঠাকুরপো বিনুকে নিয়ে খামার দেখতে গেছে, তারও ফিরতে দেরী নেই, বিজয় নাইতে গেছে, এখুনি এসে ঠাকুর পূজায় বসবে—রাগের পরিসীমা রইল না, বললাম, তুই কি রান্নাঘরে আজ ঢুকবিনে? ঐ বজ্জাত তাঁতিবেটীর ছেঁড়া কথা নিয়েই সারাদিন বসে থাকবি?

সুনন্দা মুখ তুলে বলল, না দিদি, যে বিষয় আমাদের নয়, সে যদি তোমরা ফিরিয়া না দাও ত আমি রান্নাঘরে ঢুকব না। ওই নাবালক ছেলেটার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমার স্বামী-পুত্রকেও খাওয়াতে পারব না, ঠাকুরের ভোগ রেঁধেও দিতে পারব না। এই বলে' সে তার নিজের ঘরে চলে গেল। সুনন্দাকে আমি চিনতাম। সে যে মিথ্যা কথা বলে না, সে যে তার অধ্যাপক সন্ন্যাসী বাপের কাছে ছেলেবেলা থেকে অনেক শাস্ত্র পড়েছে, তাও জানতাম, কিন্তু, সে যে মেয়েমানুষ হয়েও এমন পাষাণ-কঠিন হতে পারবে তাই কেবল তখনো জানতাম না। আমি তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে গেলাম, পুরুষেরা সব বাড়ী ফিরে এলেন—কর্ত্তার খাবার সময় সুনন্দা দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল! আমি দূর থেকে হাতজোড় করে বললাম, সুনন্দা, একটু, ক্ষমা দে, ওঁর খাওয়াটা হয়ে যাক। সে এটুকু অনুরোধও রাখলে না। গণ্ডূষ করে খেতে বসছিলেন, জিজ্ঞাসা করলে তাঁতিদের সম্পত্তি কি আপনি টাকা দিয়ে নিয়েছিলেন? ঠাকুর ত কিছুই রেখে যাননি, এ ত আপনাদের মুখেই অনেকবার শুনেছি, তবে এত টাকা পেলেন কোথায়?

যে কখনও কথা কয় না, তার মুখে এই প্রশ্ন শুনে কর্ত্তা প্রথমে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, এ সব কথার মানে কি বৌমা?

সুনন্দা উত্তর দিলে, এর মানে যদি কেউ জানে ত সে আপনি। আজ তাঁতিবৌ তার ছেলে নিয়ে এসেছিল, তার সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা আপনার কাছে বাহুল্য—কিছুই আপনার অজানা নেই। এ বিষয় যার, তাকে যদি ফিরিয়ে না দেন ত আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অন্নও আমার স্বামী-পুত্রকে খেতে দিতে পারব না।

আমার মনে হল বাবা, হয় আমি স্বপন দেখছি, না হয় সুনন্দাকে ভূতে পেয়েছে। যে ভাশুরকে সে দেবতার বেশী ভক্তি করে, তাঁকেই এই কথা!

উনিও খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মত বসে রইলেন ; তার পরে জ্বলে উঠে বললেন, বিষয় পাপের হোক, পুণ্যের হোক, সে আমার, তোমার স্বামী-পুত্রের নয়। তোমাদের না পোষায়, তোমরা আর কোথাও যেতে পার ! কিন্তু বৌমা, তোমাকে আমি এতকাল সর্ব্বগুণময়ী বলেই জানতাম, কখনো এমন ভাবিনি। এই বলে তিনি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। সেদিন সমস্ত দিন আর কারও মুখে ভাত জল গেল না। কেঁদে গিয়ে ঠাকুপোর কাছে পড়লাম ; বললাম, ঠাকুরপো, তোমাকে যে আমি কোলে করে মানুষ করেছি—তার এই প্রতিফল ! ঠাকুরপোর চোখ দুটো জলে ভরে গেল, বললে, বৌঠান, তুমিই আমার মা, দাদাও আমার পিতৃতুল্য ; কিন্তু তোমাদের বড় যে, সে ধর্ম্ম। আমারও বিশ্বাস সুনন্দা একটা কথাও অন্যায় বলেনি। শ্বশুরমশায় সন্ন্যাস গ্রহণের দিন তাকে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, মা, ধর্ম্মকে যদি সত্যিই চাও, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি বৌঠান, সে কখ্‌খনো ভুল করে নি।

হায়রে, পোড়া কপাল ! তাকেও যে পোড়ারমুখী ভেতরে ভেতরে এত বশ করে রেখেছিল, আজ আমার তার চোখ খুল্‌ল। সেদিন ভাদ্রের সংক্রান্তি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—থেকে থেকে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ছে, কিন্তু হতভাগী একটা রাত্তিরের জন্যেও আমাদের মুখ রাখলে না, ছেলের হাত ধরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আমার শ্বশুরের কালের একঘর প্রজা মরে হেজে বছর দুই হ'ল চলে গেছে, তাদেরই ভাঙা ঘর একখানি তখনো কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল ; শিয়াল-কুকুর সাপ-ব্যাঙের সঙ্গে তাতেই গিয়ে এই দুর্দ্দিনে আশ্রয় নিলে। উঠোনের জল-কাদা-মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলাম, সর্ব্বনাশী, এই যদি তোর মনে ছিল, এ সংসারে ঢুকেছিলি কেন ? বিনুকে পর্য্যন্ত যে নিয়ে চললি, তুই কি শ্বশুরকুলের নামটা পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকতে দিবিনে প্রতিজ্ঞা করেছিস্ ? কিন্তু কোন উত্তর দিলে না। বললাম, খাবি কি ? জবাব দিলে, ঠাকুর যে তিন বিঘে ব্রহ্মোত্তর রেখে গেছেন, তার অর্দ্ধেকটা ত' আমাদের। কথা শুনে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হ'ল ; বললাম, হতভাগী, তাতে যে একটা দিনও চলবে না। তোরা না হয় না খেয়ে মরতে পারিস্, কিন্তু আমার বিনু ? বললে, একবার কানাই বসাকের ছেলের

কথা ভেবে দেখ দিদি। তার মত একবেলা এক সন্ধ্যে খেয়েও যদি বিনু বাঁচে, ত সেই ঢের।

তারা চলে গেল। সমস্ত বাড়ীটা যেন হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। সে রাত্রিতে আলো জ্বললো না, হাঁড়ি চড়ল না; কর্ত্তা অনেক রাত্রে ফিরে এসে সমস্ত রাত ওই খুঁটিটা ঠেস্ দিয়ে বসে কাটালেন। হয় ত বিনু আমার ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করছে, ভোর না হতেই রাখালকে দিয়ে গরু-বাছুর পাঠিয়ে দিলাম কিন্তু রাক্ষুসি ফিরিয়ে দিয়ে তারই হাতে বলে পাঠালে, বিনুকে আমি দুধ খাওয়াতে চাইনে, দুধ না খেয়ে বেঁচে থাকবার শিক্ষা দিতে চাই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়া কেবল একটা সুগভীর নিঃশ্বাস পড়িল; গৃহিণীর সেই দিনের সমস্ত বেদনা ও অপমানের স্মৃতি উদ্বেল হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল, এবং আমার হাতের ডাল-ভাত শুকাইয়া একেবারে চামড়া হইয়া উঠিল। কর্ত্তার খড়মের শব্দ শুনা গেল, তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা হইয়াছে। আশা করি তাঁহার মৌনব্রত অক্ষুণ্ণ-অটুট থাকিয়া তাঁহার সাত্বিক আহারের আজ কোন বিঘ্ন ঘটায় নাই, কিন্তু এদিকের ব্যাপারটা জানিতেন বলিয়াই বোধ করি আমার তত্ত্ব লইতে আর আসিলেন না। গৃহিণী চোখ মুছিয়া, নাক ঝাড়িয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, তার পর গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় লোকের মুখে মুখে কি দুর্নাম, কি কেলেঙ্কারি বাবা, সে আর তোমাদের কি বলব! কর্ত্তা বললেন, দুদিন যাক, দুঃখের জ্বালায় তারা আপনিই ফিরবে। আমি বললাম, তাকে চেনো না, সে ভাঙবে কিন্তু নুইবে না। আর তাই হ'ল। একটার পর একটা করে আজ আট মাস কেটে গেল, কিন্তু তাকে হেঁট করতে পারলে না। কর্ত্তা ভেবে ভেবে আর আড়ালে কেঁদে কেঁদে যেন কাঠ হয়ে উঠতে লাগলেন। ছেলেটা ছিল তাঁর প্রাণ, আর ঠাকুরপোকে ভালবাসতেন ছেলের চেয়ে বেশি। আর সহ্য করতে না পেরে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, তাঁতিদের যাতে কষ্ট না হয়, তিনি করবেন; কিন্তু সর্ব্বনাশী জবাব দিল, যা তাদের ন্যায্য পাওনা সমস্ত মিটিয়ে দিলেই তবে ঘরে ফিরব। তার এক ছটাক কোথাও বাকি থাকতে যাব না। অর্থাৎ তার মানে নিজেদের অবধারিত মৃত্যু।

আমি গেলাসের জলে হাতখানা একবার ডুবাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তাঁদের কি করে চলে?

কুশারী-গৃহিণী কাতর হইয়া বলিলেন, এর জবাব আর আমাকে দিতে ব'লো না বাবা। এ আলোচনা কেউ করতে এলে আমি কানে আঙুল দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাই,—মনে হয় বুঝি বা আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আট মাস এ-বাড়ীতে মাছ আসে না, দুধ ঘির কড়া চড়ে না। সমস্ত বাড়ীটার ওপর সে যেন এক মর্ম্মান্তিক অভিশাপ রেখে চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তিন জনেই আমরা স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আবার যখন গাড়ীতে গিয়া বসিলাম, কুশারী-গৃহিণী সজল কণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর কানে কানে বলিলেন, মা তারা তোমারই প্রজা। আমার শ্বশুরের দরুণ যে জমিটুকুর ওপর তাদের নির্ভর সেটুকু তোমার গঙ্গামাটিতেই।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

গাড়ী ছাড়িয়া দিতে তিনি পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, মা, তোমার বাড়ী থেকেই চোখে পড়ে। নালার এ-দিকে যে ভাঙা পোড়ো ঘরটা দেখা যায়, সেইটে।

রাজলক্ষ্মী তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

গাড়ী মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কোন কথাই কহিলাম না। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কহিলাম, লক্ষ্মী, যার লোভ নেই, যে চায় না, তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে আর নেই।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া অল্প একটুখানি হাসিয়া বলিল, সে আমি জানি। তোমার কাছে আমার আর কিছুই না হোক, এ শিক্ষা হয়েছে।

আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, যে কয়টি নারী-চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারী মহাশয়ের বিদ্রোহী ভ্রাতৃজায়া। এই সুদীর্ঘ জীবনে সুনন্দাকে আমি আজও ভুলি নাই। মানুষকে এত শীঘ্র এবং এত সহজে রাজলক্ষ্মী আপনার করিয়া লইতে পারে যে, সুনন্দা যে একদিন আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। না হইলে এই আশ্চর্য্য মেয়েটিকে জানিবার সুযোগ আমার কখনও ঘটিত না। অধ্যাপক যদু তর্কালঙ্কারের ভাঙা-চোরা দু-তিনখানা ঘর আমাদের বাড়ীর পশ্চিমে মাঠের একপ্রান্তে চাহিলেই সোজা চোখে পড়ে, এখানে আসিয়া পর্য্যন্তই পড়িয়াছে, কেবল এক বিদ্রোহিনী যে ওইখানে তার স্বামী-পুত্র লইয়া বাসা বাঁধিয়াছে ইহাই জানিতাম না। বাঁশের পুল পার হইয়া একটা কঠিন অনুর্ব্বর মাঠের উপর দিয়া মিনিট-দশেকের পথ; মাঝখানে গাছপালা প্রায় কিছুই নাই, অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। আজ সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া জানালার মধ্যে দিয়া যখন ওই জীর্ণ শ্রীহীন ঘরগুলি চোখে পড়িল, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ব্যথা ও আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিলাম, এবং যে বস্তু অনেকদিন অনেক উপলক্ষে দেখিয়াও বার বার ভুলিয়াছি, সেই কথাই মনে পড়িল যে, সংসারে কোন-কিছুরই কেবলমাত্র বাহিরটা দেখিয়া কিছুই বলিবার যো নাই। কে বলিবে ওই পোড়ো বাড়ীটা শিয়াল-কুকুরের আশ্রয়স্থল নহে? কে অনুমান করিবে, ওই কয়খানা ভাঙা ঘরের মধ্যে কুমার-রঘু-শকুন্তলা-মেঘদূতের অধ্যাপনা চলে, হয়ত স্মৃতি ও ন্যায়ের মীমাংসা ও বিচার লইয়া ছাত্র-পরিবৃত এক নবীন অধ্যাপক মগ্ন হইয়া থাকেন! কে জানিবে উহারই মধ্যে এই বাঙলা দেশের এক তরুণী নারী ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখ বহন করিতেছে! দক্ষিণের জানালা দিয়া বাটীর মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় মনে হইল উঠানের উপর কি যেন একটা হইতেছে—রতন আপত্তি করিতেছে এবং রাজলক্ষ্মী তাহা খণ্ডন করিতেছে। সুতরাং কণ্ঠস্বরটা তাহারই কিছু প্রবল। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে কিছু অপ্রতিভ হইয়া গেল।

কহিল, ঘুম ভেঙে গেল বুঝি ? যাবেই ত'। রতন, তুই গলাটা একটু খাটো কর বাবা, নইলে আমি ত আর পারিনে।

এই প্রকার অনুযোগ এবং অভিযোগে কেবল রতনই একা নয়, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, অতএব সেও যেমন চুপ করিয়া রহিল, আমিও তেমনি কথা কহিলাম না। দেখিলাম একটা বড় চাঙারীতে চাল-ডাল-ঘি-তেল প্রভৃতি এবং আর একটা ছোট পাত্রে এতজ্জাতায় নানাবিধ ভোজ্যবস্তু সজ্জিত হইয়াছে; মনে হইল এইগুলির পরিমাণ ও তাহাদিগকে বহন করিবার শক্তি সামর্থ্য প্রসঙ্গেই রতন প্রতিবাদ করিতেছিল। ঠিক তাই। রাজলক্ষ্মী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, শোন এর কথা। এই ক'টা চাল-ডাল আর বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না! এ যে আমি নিয়ে যেতে পারি রতন! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া স্বচ্ছন্দে বড় ঝুড়িটা তুলিয়া ধরিল।

বাস্তবিক ভার হিসাবে মানুষের পক্ষে, এমন কি রতনের পক্ষেও এগুলি বহিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু কঠিন ছিল আর একটা কাজ। ইহাতে তাহার মর্য্যাদাহানি হইবে, কিন্তু মনিবের কাছে লজ্জায় এই কথাটাই সে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না; আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত সহজেই এ কথাটা বুঝিতে পারিলাম। হাসিয়া কহিলাম, তোমার যথেষ্ট লোকজন আছে, প্রজারও অভাব নেই—তাদের কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, রতন না হয় খালি হাতে সঙ্গে যাক।

রতন অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, রাজলক্ষ্মী একবার আমার ও একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হতভাগা আধঘণ্টা ধরে ঝগড়া করলে, তবু বললে না যে, মা, ওসব ছোট কাজ রতনবাবুর নয়। যা, কাউকে ডেকে আন্‌গে।

সে চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সকালে উঠেই এ-সব যে ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মানুষের খাবার জিনিস সকালেই পাঠাতে হয়।

কিন্তু কোথায় পাঠান হচ্ছে ? এবং তার হেতু ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হেতু মানুষে খাবে, এবং যাচ্ছে বামুনবাড়ীতে।

কহিলাম, বামুনটি কে ?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় ভাবিল নামটা বলিবে কি না; কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, দিয়ে বলতে নেই, পুণ্যি কমে যায়। যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস—তোমার চা তৈরি হয়ে গেছে।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

বেলা বোধ হয় তখন দশটা, বাহিরের ঘরে তক্তাপোষের উপর বসিয়া কাজের অভাবে একখানা পুরানো সাপ্তাহিক কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম, একটা অচেনা কণ্ঠস্বরের সম্ভাষণে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, আগন্তুক অপরিচিতই বটে। কহিলেন, নমস্কার বাবুমশায়।

আমিও হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম, বসুন।

ব্রাহ্মণের অতিশয় দীন বেশ, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মলিন উত্তরীয়। পরিধানের বস্ত্রখানিও তেমনি মলিন, উপরন্তু দু-তিন স্থানে গ্রন্থি বাঁধা। পল্লীগ্রামে ভদ্র ব্যক্তির আচ্ছাদনের দীনতা, বিস্ময়ের বস্তুও নয়, কেবলমাত্র ইহার উপরেই তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অনুমান করাও চলে না। তিনি সম্মুখে বাঁশের মোড়াটার উপরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, আমি আপনার একজন দরিদ্র প্রজা, ইতিপূর্ব্বেই আমার আসা কর্ত্তব্য ছিল—ভারি ত্রুটি হয়ে গেছে।

আমাকে জমিদার মনে করিয়া কেহ আলাপ করিতে আসিলে আমি মনে মনে যেমন লজ্জিত হইতাম, তেমনি বিরক্ত হইতাম; বিশেষতঃ ইহারা যে সকল নিবেদন ও আবেদন লইয়া উপস্থিত হইত, এবং যে সকল বদ্ধমূল উৎপাত ও অত্যাচারের প্রতিবিধান প্রার্থনা করিত তাহাতে আমার কোন হাতই ছিল না। ইহার প্রতিও প্রসন্ন হইতে পারিলাম না, কহিলাম, বিলম্বে আসার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ একেবারে না এলেও আমি ত্রুটি নিতাম না—ও রকম আমার স্বভাব নয়; কিন্তু আপনার প্রয়োজন?

ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, অসময়ে এসে আপনার কাজে হয়ত ব্যাঘাত করলাম, আমি আর একদিন আসব, এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন, বলুন।

আমার বিরক্তিটা তিনি অনায়াসে লক্ষ্য করিলেন। একটু মৌন থাকিয়া শান্তভাবে বলিলেন, আমি সামান্য ব্যক্তি, প্রয়োজনও যৎসামান্য। মা-ঠাকরুণ আমাকে স্মরণ করেছেন, হয়ত তাঁর আবশ্যক থাকতে পারে—আমার কিছু নেই।

জবাবটা কঠোর কিন্তু সত্য, এবং আমার প্রশ্নের তুলনায় অসঙ্গতও নয়; কিন্তু এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত নাকি এরূপ জবাব শুনাইবার কেহ লোক ছিল না, তাই ব্রাহ্মণের প্রত্যুত্তরে কেবল বিস্ময়াপন্ন নয়, সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। অথচ মেজাজ আমার স্বভাবতঃ রুক্ষও নয়, অন্যত্র কোথাও এ কথায় কিছু মনেও হইত না; কিন্তু ঐশ্বর্য্যের ক্ষমতা জিনিসটা এতই বিশ্রী যে সেটা পরের ধার করা হইলেও তাহার অপব্যবহারের প্রলোভন মানুষে সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারে না। অতএব, অপেক্ষাকৃত ঢের বেশী রূঢ় উত্তরই হঠাৎ মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঝাঁজটা তার উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দেখিলাম পাশের দরজাটা খুলিয়া গেল, এবং রাজলক্ষ্মী তাহার পূজার আসন হইতে অসমাপ্ত আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়াই উঠিয়া আসিল। দূর হইতে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কহিল, এরই মধ্যে উঠবেন না, আপনি বসুন। আপনার কাছে আমার অনেক কথা আছে।

ব্রাহ্মণ পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, মা, আপনি ত আমার সংসারের অনেক দিনের দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন, এতে প্রায় আমাদের পনের দিনের খাওয়া চলে যাবে; কিন্তু সম্প্রতি ত অকাল চলছে, ব্রত নিয়ম কিছুরই দিন নেই। ব্রাহ্মণী আশ্চর্য্য হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন—

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, আপনার ব্রাহ্মণী কেবল বারব্রতের দিনক্ষণ-গুলোই শিখে রেখেছেন, কিন্তু প্রতিবেশীর তত্ত্ব নেবার কালাকাল বিচারটা আমার কাছে শিখে যেতে বলে দেবেন!

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এতবড় সিধেটা কি তা হ'লে মা—

প্রশ্নটা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই করিলেন না, কিন্তু আমি দাম্ভিক ব্রাহ্মণের অনুক্ত বাক্যের মর্ম্মটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু ভয় হইল আমারই মত না বুঝিয়া রাজলক্ষ্মীও হয়ত একটা শক্ত কথা শুনিবে। লোকটির একদিকের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত থাকিলেও আর

একদিকের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম, সুতরাং এমন ইচ্ছা হইল না যে আমারই সম্মুখে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুধু একটা সাহস এই ছিল যে, কেহ কোনদিন মুখোমুখি রাজলক্ষ্মীকে নিরুত্তর করিয়া দিতে পারিত না। ঠিক তাহাই হইল। এই বিশ্রী প্রশ্নটাকেও সে অত্যন্ত সহজে পাশ কাটাইয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, তর্কালঙ্কার মশাই, শুনেছি আপনার ব্রাহ্মণী ভারী রাগী মানুষ—বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে পড়লে হয়ত চটে যাবেন, না হ'লে এ কথার জবাব তাঁকেই দিয়ে আসতাম।

এতক্ষণে বুঝিলাম ইনিই যদুনাথ কুশারী। অধ্যাপক মানুষ, প্রিয়তমার মেজাজের উল্লেখে নিজের মেজাজ হারাইয়া ফেলিলেন, হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, না মা, রাগী হবে কেন, নিতান্তই সোজা মানুষ। আমরা দরিদ্র, আপনি গেলে ত তার উপযুক্ত সম্মান করতে পারব না, তিনিই আসবেন। একটু সময় পেলে আমিই তাঁকে সঙ্গে করে' নিয়ে আসব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, তর্কালঙ্কার মশাই, আপনার ছাত্র ক'টি?

কুশারী বলিলেন, পাঁচটি। এ দেশে বেশী ছাত্র পাবার যো নেই,—অধ্যাপনা কেবল নামমাত্র!

সব ক'টিকেই খেতে পরতে দিতে হয়?

না। বিজয় ত দাদার ওখানেই থাকে, একটির বাড়ী গ্রামের মধ্যেই; কেবল তিনটি ছাত্র আমার কাছে থাকে।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অপূর্ব্ব স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, এই দুঃসময়ে এ ত' সহজ নয় তর্কালঙ্কার মশাই!

ঠিক এই কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন ছিল। না হইলে অভিমানী অধ্যাপকের উত্তপ্ত হইয়া উঠার কিছুমাত্র বাধা ছিল না। অথচ এবার তাঁহার মনটা একেবারে ও-দিক দিয়াই গেল না। অতি সহজেই গৃহের দুঃখ-দৈন্য স্বীকার করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, কি করে' যে চলে সে কেবল আমরা দুটি প্রাণীই জানি; কিন্তু তবু ত' ভগবানের উদয়াস্ত আটকে থাকে না, মা! তা ছাড়া উপায়ই বা কি? অধ্যয়ন অধ্যাপনা ত ব্রাহ্মণেরই কাজ। আচার্য্যদেবের কাছে যা পেয়েছি, সে ত' কেবল ন্যস্তধন,—আর একদিন সে ত' ফিরিয়ে দিতেই হবে

মা। একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, একদিন এই ভার ছিল দেশের ভূস্বামীর উপর, কিন্তু এখন দিনকাল সমস্তই বদলে গেছে। সে অধিকারও তাঁদের নেই, সে দায়িত্বও গেছে। প্রজার রক্ত শোষণ করা ছাড়া আর তাঁদের কোন করণীয় নেই। তাঁদের ভূস্বামী বলে মনে করতেই এখন ঘৃণা বোধ হয়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, কিন্তু এদের মধ্যে কেউ যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তাতে যেন আবার বাধা দেবেন না!

কুশারী লজ্জা পাইয়া নিজেও হাসিলেন, কহিলেন, বিমনা হয়ে আপনার কথাটা আমি মনেই করিনি, কিন্তু বাধা দেব কেন? সত্যই ত এ আপনাদেরই কর্ত্তব্য।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমরা পূজা-আচ্চা করি, কিন্তু একটা মন্তরও হয়ত শুদ্ধ আবৃত্তি করতে পারিনে, এও কিন্তু আপনার কর্ত্তব্য, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

কুশারী হাসিয়া বলিলেন, তাই হবে মা। এই বলিয়া তিনি বেলার দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল, যাইবার সময় আমিও কোনমতে একটা নমস্কার সারিয়া লইলাম।

তিনি চলিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী কহিল, আজ তোমাকে একটু সকাল সকাল নাওয়া খাওয়া সেরে নিতে হবে।

কেন বল ত?

দুপুরবেলা একবার সুনন্দার বাড়ীতে যেতে হবে।

একটু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কিন্তু আমাকে কেন? তোমার বাহন রতন আছে ত?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, ও বাহনে আর কুলোবে না। তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আর কোথাও আমি আর এক পাও নড়ছিনে।

বলিলাম, আচ্ছা তাই হবে।

আট

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একদিন সুনন্দা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহাকে পরমাত্মীয়ের মত কাছে পাইয়াছিলাম। ইহার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃত করিয়া না বলিলেও কথাটাকে প্রত্যয় না করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই; কিন্তু আমাদের প্রথম পরিচয়ের ইতিহাসটা বিশ্বাস করান শক্ত হইবে হয়ত। অনেকেই মনে করিবেন ইহা অদ্ভুত। হয়ত অনেকেই মাথা নাড়িয়া কহিবেন, এ সকল কেবল গল্পেই চলে। তাঁহারা বলিবেন, আমরাও বাঙালী, বাঙলা দেশেরই মানুষ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে এমন হয় তাহা ত' কখনো দেখি নাই! তা বটে; কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু ইহাই বলিতে পারি, আমিও এ দেশেরই মানুষ, এবং একটির অধিক সুনন্দা এ দেশে আমারও চোখে পড়ে নাই। তত্রাচ ইহা সত্য।

রাজলক্ষ্মী ভিতরে প্রবেশ করিল, আমি তাহাদের ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া কোথায় একটু ছায়া আছে খোঁজ করিতেছি, একটি সতের-আঠার বছরের ছোকরা আসিয়া কহিল, আসুন, ভেতরে আসুন।

তর্কালঙ্কার মশাই কোথায়? বিশ্রাম করছেন বোধ হয়?

আজ্ঞে না, তিনি হাটে গেছেন। মা আছেন, আসুন। বলিয়া সে অগ্রবর্ত্তী হইল, এবং যথেষ্ট দ্বিধাভরেই আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। একদা কোনকালে হয়ত এ-বাটীর সদর দরজা কোথাও ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। অতএব, ভূতপূর্ব্ব একটা ঢেঁকিশালার পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় নিশ্চয়ই ইহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করি নাই। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সুনন্দাকে দেখিলাম। উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে এই বাড়ীটির মতই একেবারে আভরণবর্জ্জিত। সম্মুখের অপরিসর বারান্দার একধারে মুড়ি ভাজিতেছিল,—বোধহয় রাজলক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—আমাকে জীর্ণ একখানি কম্বলের আসন পাতিয়া দিয়া নমস্কার করিল। কহিল, বসুন। ছেলেটিকে বলিল, অজয়, উনুনে আগুন আছে, একটু তামাক সেজে দাও বাবা। রাজলক্ষ্মী বিনা আসনে পূর্ব্বেই উপবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ সলজ্জ হাস্যে

কহিল, আপনাকে কিন্তু পান দিতে পারব না। পান আমাদের বাড়ীতে নেই।

আমরা কে, অজয় বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সে তাহার গুরু-পত্নীর কথায় সহসা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, নেই? তা হ'লে পান বুঝি আজ হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে মা?

সুনন্দা তাহার মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত মুখ টিপিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ওটা হঠাৎ আজ ফুরিয়ে গেছে, না, কেবল হঠাৎ একদিনই ছিল অজয়? এই বলিয়া সহসা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, ও রবিবারে ছোট মহন্তঠাকুরের আসবার কথায় এক পয়সার পান কেনা হয়েছিল,—সে প্রায় দিন-দশেকের কথা। এই! এতেই আমার অজয় একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে, পান হঠাৎ ফুরোলো কি করে? এই বলিয়া সে আবার হাসিয়া ফেলিল। অজয় মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, বাঃ—এই বুঝি! তা' বেশ ত, হ'লোই বা, ফুরোলোই বা—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে সদয় কণ্ঠে কহিল, তা সত্যিই ত' ভাই, ও পুরুষমানুষ, ও কি করে জানবে কি তোমার সংসারে ফুরিয়েছে!

অজয় একজনকেও তাহার অনুকূলে পাইয়া কহিতে লাগিল, দেখুন ত! দেখুন ত'! অথচ মা ভাবেন—

সুনন্দা তেমনি সহাস্যে বলিল, হাঁ, মা ভাবেন বই কি! না দিদি, আমার অজয়ই হ'ল বাড়ীর গিন্নী;—ও সব জানে। কেবল এখানে যে কোন কষ্ট আছে, মায় বাবুগিরি পর্য্যন্ত, এইটেই ও স্বীকার করতে পারে না।

কেন পারব না! বাঃ—বাবুগিরি কি ভাল! ও ত আমাদের—,এই বলিতে বলিতে কথাটা আর শেষ না করিয়াই সে বোধ করি আমার জন্য তামাক সাজিতেই বাহিরে প্রস্থান করিল। সুনন্দা কহিল, বামুন পণ্ডিতের ঘরে হত্তুকিই যথেষ্ট, খুঁজলে এক-আধটা সুপুরিও হয়ত পাওয়া যেতে পারে—আচ্ছা, আমি দেখছি—বলিয়া সেও যাইবার উদ্যোগ করিতেই রাজলক্ষ্মী সহসা তাহার আঁচল ধরিয়া কহিল, হত্তুকি আমার সইবে না, ভাই, সুপুরিতেও কাজ নেই। তুমি একটুখানি আমার কাছে স্থির হয়ে ব'সো, দুটো কথা কই। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে পার্শ্বে বসাইল।

আতিথ্যের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই নীরব রহিল। এই অবকাশে আমি আর একবার নূতন করিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া লইলাম। প্রথমেই মনে হইল, বস্তুতঃ, এই দারিদ্র্য জিনিসটা সংসারে কতই না অর্থহীন, একজন যদি তাহাকে স্বীকার না করে! এই যে আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরের সামান্য একটি মেয়ে, বাহির হইতে যাহার কোন বিশেষত্ব নাই, না আছে রূপ, না আছে বস্ত্র অলঙ্কার; এই ভগ্ন গৃহের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, কেবল অভাব অনটনের ছায়া—কিন্তু তবুও সে যে ওই ছায়া মাত্রই, তার বেশী কিছু নয়, সে কথাও যেন সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িতে বাকি থাকে না। অভাবের দুঃখটাকে এই মেয়েটি কেবলমাত্র যেন চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দূরে রাখিয়াছে—জোর করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে, এত বড় সাহস তাহার নাই। অথচ মাস-কয়েক পূর্ব্বেও ইহার সমস্তই ছিল,—ঘর-বাড়ী, লোক-জন, আত্মীয়-বন্ধু—সচ্ছল সংসার, কোন বস্তুরই অভাব ছিল না—শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে একখণ্ড জীর্ণ-বস্ত্র ত্যাগ করার মত; মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ, কোথাও কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার কোন চিহ্ন নাই!

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলুম সুনন্দার বুঝি বয়স হয়েছে। ও হরি! একেবারে ছেলেমানুষ!

অজয় বোধ হয় তাহার গুরুদেবের হুঁকাতেই তামাক সাজিয়া আনিতেছিল, সুনন্দা তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ছেলেমানুষ কি রকম! ওই অত বড় বড় ছেলে যার, তার বয়স বুঝি কম! এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। চমৎকার স্বচ্ছন্দ সরল হাসি। অজয় নিজে উনুন হইতে আগুন লইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় পরিহাস করিয়া কহিল, কি জানি কি জাতের ছেলে বাবা তুমি, কাজ নেই তোমার উনুন ছুঁয়ে। আসল কথা, জ্বলন্ত অঙ্গার চুল্লী হইতে উঠানো শক্ত বলিয়া সে আপনি গিয়া আগুন তুলিয়া কলিকাটার উপরে রাখিয়া দিয়া অজয়ের হাতে দিল, এবং হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিল। সাধারণ পল্লীরমণী-সুলভ হাসি তামাসা হইতে আরম্ভ করিয়া কথায়-বার্ত্তায় আচরণে কোনখানে কোন বিশেষত্ব ধরিবার যো নাই,

অথচ, ইতিমধ্যে যে সামান্য পরিচয়টুকু তাহার পাইয়াছি তাহা কতই না অসামান্য। এই অসাধারণতার হেতুটা পরক্ষণেই আমাদের দুজনের কাছেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অজয় আমার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, মা, ওটা তা'হলে তুলে রেখে দি' ?

সুনন্দা ইঙ্গিতে সায় দেওয়ায় তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, আমারই অদূরে একখণ্ড কাঠের পিঁড়ার উপর মস্ত মোটা একটা পুঁথি এলোমেলো ভাবে খোলা পড়িয়া আছে। এতক্ষণ কেহই উহা দেখি নাই। অজয় তাহার পাতাগুলি গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, মা, উৎপত্তি প্রকরণটা ত' আজো শেষ হ'ল না, কবে আর হবে! ও আর হবেই না।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কিসের পুঁথি অজয় ?

যোগবাশিষ্ঠঃ।

তোমার মা মুড়ি ভাজছিলেন আর তুমি শোনাচ্ছিলে ?

না, আমি মা'র কাছে পড়ি।

অজয়ের এই সরল ও সংক্ষিপ্ত উত্তরে সুনন্দা হঠাৎ যেন লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কহিল, পড়াবার মত বিদ্যে ত' ওর মায়ের ছাই আছে। না দিদি, দুপুরবেলা একলা সংসারের কাজ করি, উনি প্রায়ই থাকতে পারেন না, ছেলেরা বই নিয়ে কে যে কখন কি বকে যায় তার বারো আনা আমি শুনতেই পাইনে। ওর কি, যা হোক একটা বলে দিলে।

অজয় তাহার যোগবাশিষ্ঠঃ লইয়া প্রস্থান করিল, রাজলক্ষ্মী গম্ভীর মুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মুহূর্ত্ত কয়েক পরে সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাড়ীটি আমার কাছাকাছি হ'লে আমিও তোমার চেলা হয়ে যেতুম ভাই। একে ত জানিনে কিছুই, তাতে আহ্নিক-পূজোর কথাগুলোও যদি ঠিকমত বলতে পারতুম!

মন্ত্রোচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার সন্দিগ্ধ আক্ষেপ আমি অনেক শুনিয়াছি, ওটা আমার অভ্যাস ছিল, কিন্তু সুনন্দা এই প্রথমে শুনিয়াও কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকিয়া একটু হাসিল মাত্র। কি জানি সে কি মনে করিল। হয়ত ভাবিল, যে তাৎপর্য্য বুঝে না, প্রয়োগ জানে না, শুধু অর্থহীন আবৃত্তির পরিশুদ্ধতায় তা'র এত দৃষ্টি কেন ? হয়ত বা ইহা তাহার কাছেও নূতন নয়,—

আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের মুখে এমনি সকরুণ লোভ ও মোহের কথা সে অনেক শুনিয়াছে, ইহার উত্তর দেওয়া বা প্রতিবাদ করাও আর প্রয়োজন মনে করে না। অথবা এ সকল কিছু নাও হইতে পারে, কেবল স্বাভাবিক বিনয়বশেই মৌন হইয়া রহিল। তবুও এ কথাটা ত' মনে না করিয়া পারিলাম না, সে যদি আজ তাহার এই অপরিচিত অতিথিটিকে নিতান্তই সাধারণ মেয়েদের সমান করিয়া ছোট করিয়া দেখিয়া থাকে ত' আবার একদিন তাহার অতিশয় অনুতাপের সহিত মন বদলাইবার প্রয়োজন হইবে।

রাজলক্ষ্মী চোখের পলকে আপনাকে সামলাইয়া লইল। আমি জানি কেহ হাঁ করিলে সে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে, আর সে মন্ত্র-তন্ত্রের ধার দিয়াও গেল না, এবং একটু পরেই নিছক ঘরকন্না ও গৃহস্থালীর কথা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের মৃদুকণ্ঠের সমস্ত আলোচনা আমার কানেও গেল না, কান দিবার চেষ্টাও করিলাম না, বরঞ্চ তর্কালঙ্কারের থেলো হুঁকায় অজয়-দত্ত শুষ্ক সুকঠোর তামাকু প্রাণপণ করিয়া নিঃশেষ করিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই দুটি রমণী অস্পষ্ট মৃদুস্বরে সংসারযাত্রা সম্বন্ধে কোন্ জটিল তত্ত্বের সমাধান করিতে লাগিল সে তাহারাই জানে; কিন্তু তাহাদেরই অদূরে হুঁকা হাতে নীরবে বসিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, আজ সহসা একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধে একটা বিশ্রী অভিযোগ আছে, মেয়েদের আমরা হীন করিয়া রাখিয়াছি। এই শক্ত কাজটা যে কেমন করিয়া করিয়াছি এবং কোথায় উহার প্রতিকার, এ কথা অনেকবার অনেক দিক দিয়া আমি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আজ সুনন্দাকে ঠিক এমন করিয়া নিজের চোখে না দেখিলে বোধ করি সংশয় চিরদিন রহিয়াই যাইত। দেশে ও বিদেশে রকমারি স্ত্রী-স্বাধীনতা কতই না দেখিয়াছি। ইহার যে নমুনা বর্ম্মা মুলুকে পা দিয়াই চোখে পড়িয়াছিল তাহা ভুলিবার যো কি! জন-তিনেক ব্রহ্ম-সুন্দরী প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া একটা ষণ্ডামার্কা পুরুষকে আক-পেটা করিতেছেন দেখিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠিয়াছিলাম। অভয়া মুগ্ধচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিল, 'শ্রীকান্তবাবু, আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা যদি এমনি—' আমার খুড়ামশাই একবার জন-দুই মাড়োয়ারী রমণীর নামে নালিশ করিতে গিয়াছিলেন, তাহারা রেলগাড়ীতে

নাকি খুড়ার নাক ও কান প্রবল পরাক্রমে মলিয়া দিয়াছিল। শুনিয়া খুড়িমা আমায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যদি ওর চলন থাকত! থাকিলে আমার খুড়ামশাই নিশ্চয় ঘোরতর আপত্তি করিতেন, কিন্তু ইহাতেই যে নারীজাতির হীন অবস্থার প্রতিবিধান হইত, তাহাও ত অসংশয়ে বলা যায় না। ইহাই যে কোথায় এবং কিরূপে হয়, সুনন্দার ভগ্ন-গৃহের ছিন্ন আসনখানিতে বসিয়া আজ নিঃশব্দে এবং নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিলাম। কেবল একটা 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করা ছাড়া সে আমার সহিত দ্বিতীয় বাক্যালাপ করে নাই, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গেও যে কোন বড় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাও নয়; কিন্তু সেই যে অজয়ের মিথ্যা আড়ম্বরের প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে জানাইয়াছিল, এ বাড়ীতে পান নাই, কিনিবার মত সামর্থ্য নাই—এখানে উহা দুর্ল্লভ বস্তু! তাহার সকল কথার মাঝে এই কথাটা যেন আমার কানে বাজিতেই ছিল। তাহার সঙ্কোচলেশহীন এইটুকু পরিহাসে দারিদ্র্যের সমস্ত লজ্জা কোথায় যে লজ্জায় মুখ লুকাইল, সারাক্ষণের মধ্যে আর তাহার দেখাই মিলিল না। এক মুহূর্ত্তেই জানা গেল এই ভাঙা বাড়ী, এই জীর্ণ গৃহসজ্জা, এই দুঃখ-দৈন্য অনটন, এই নিরাভরণ মেয়েটি তাহাদের অনেক উপরে। অধ্যাপক পিতা দিবার মধ্যে, কন্যাকে তাঁহার অশেষ যত্নে ধর্ম্ম ও বিদ্যা দান করিয়া শ্বশুরকুলে পাঠাইয়াছিলেন; তৎপরে সে জুতা মোজা পরিবে কি ঘোমটা খুলিয়া পথে বেড়াইবে, কিম্বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে স্বামী-পুত্র লইয়া ভাঙ্গা বাড়ীতে বাস করিবে, তথায় মুড়ি ভাজিবে, কি যোগবাশিষ্ঠঃ পড়াইবে, সে চিন্তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মেয়েদের আমরা হীন করিয়াছি কিনা, এ তর্ক নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এই দিক দিয়া যদি তাহাদের বঞ্চিত করিয়া থাকি ত সে কর্ম্মের ফলভোগ অনিবার্য্য! অজয়ের 'উৎপত্তি প্রকরণ' উঠিয়া না পড়িলে সুনন্দার লেখাপড়ার কথা আমরা জানিতেও পারিতাম না। তাহার মুড়ি ভাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সরল ও সামান্য হাসি-তামাসার মধ্য দিয়া যোগবাশিষ্ঠের ঝাঁজ কোথাও উঁকি মারে নাই; অথচ স্বামীর অবর্ত্তমানে অপরিচিত অতিথির অভ্যর্থনা করিতেও তাহার কোনখানে বাধিল না। নির্জ্জন গৃহের মধ্যে একটা সতের-আঠার বছরের ছেলের সে এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গিয়াছে যে, শাসন ও

সংশয়ের দড়ি-দড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কল্পনাও বোধ করি কোন দিন তাহার স্বামীর মনে উঠে নাই। অথচ, ইহারই প্রহরা দিতে ঘরে ঘরে কত প্রহরীই না সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে!

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া হাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এদিকে বেলাও পড়িয়া আসিতেছিল। এই দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীর কত কাজই না পড়িয়া আছে মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল, এবং বিদায় লইয়া কহিল, আজ চললুম, যদি বিরক্ত না হও ত' আবার আসবো।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমারও কথা কইবার লোক কেউ নেই, যদি অভয় দেন ত' মাঝে মাঝে আসব।'

সুনন্দা মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। পথে আসিতে আসিতে রাজলক্ষ্মী কহিল, মেয়েটি চমৎকার। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। ভগবান এদের বেশ মিলিয়েছেন।

আমি কহিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এদের ও-বাড়ীর কথাটা আজ আর তুললুম না। কুশারী মহাশয়কে আজও ভাল চিনতে পারিনি, কিন্তু এরা দু'টি জা'ই বড় চমৎকার!

বলিলাম, খুব সম্ভব তাই; কিন্তু তোমার ত' মানুষ বশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, দেখ না চেষ্টা করে' যদি এঁদের আবার মিল করে দিতে পার।

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ক্ষমতা থাকতে পারে কিন্তু তোমাকে বশ করাটা তার প্রমাণ নয়। চেষ্টা করলে ওটা অনেকেই পারত।

বলিলাম, হতেও পারে। তবে চেষ্টার যখন সুযোগ ঘটেনি তখন তর্ক করায় ফল হবে না।

রাজলক্ষ্মী তেমনি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা গো, আচ্ছা। দিন এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে ভেবে রেখো না।

আজ সারাদিনটাই কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়াছিল। অপরাহ্ণ সূর্য্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠেও ইহারই একান্তবর্ত্তী এক ঝাড় বাঁশ ও গোটা-দুই তেঁতুলগাছে যেন

সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল; রাজলক্ষ্মীর শেষ অনুযোগের জবাব দিলাম না, কিন্তু ভিতরের মনটা যেন বাহিরের দশদিকের মতই রাঙিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম ওষ্ঠাধরে হাসি তখনও সম্পূর্ণ মিলায় নাই, বিগলিত স্বর্ণপ্রভায় এই একান্ত পরিরিচিত হাসিমুখখানি একেবারে যেন অপূর্ব্ব মনে হইল। হয়ত এ কেবল আকাশের রঙই নয়; হয়ত, যে আলো আর এক নারীর কাছ হইতে এইমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে সুমুখে আঙ্গুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়েনি কেন বল ত? চাহিয়া দেখিলাম অদূরে ডান দিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে, কহিলাম, বস্তু থাকলে ছায়া পড়ে—বোধ হয় ওটা আর নেই।

আগে ছিল?

লক্ষ্য করে দেখিনি, ঠিক মনে পড়ছে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, আমার পড়ছে,—ছিল না। এতটুকু বয়স থেকে ওটা দেখতে শিখেছিলাম। এই বলিয়া সে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজকের দিনটা আমার বড় ভাল লেগেছে। মনে হচ্ছে এতদিন পরে একটি সঙ্গী পেলাম। এই বলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল। আমি কিছু কহিলাম না, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলাম, সে ঠিক সত্য কথাটাই কহিয়াছে।

বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম, কিন্তু ধূলা পা ধুইবার অবকাশ মিলিল না, শান্তি ও তৃপ্তি দুই-ই একই সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। দেখি, বাহিরের উঠান ভরিয়া জন দশ-পনের লোক বসিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রতন বোধ হয় এতক্ষণ বক্তৃতা করিতেছিল, তাহার মুখ উত্তেজনা ও নিগূঢ় আনন্দে চক্‌চক্‌ করিতেছে; কাছে আসিয়া কহিল, মা, বারবার যা বলেছি ঠিক তাই হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী অধীরভাবে কহিল, কি বলেছিলি আমার মনে নেই, আর একবার বল্‌।

রতন কহিল, নব্‌নেকে পুলিশের লোক হাতকড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেছে।

বেঁধে নিয়ে গেছে! কখন? কি করেছিল সে?

মালতীকে সে একেবারে খুন করে ফেলেছে!

বলিস্ কি রে! তাহার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না না মা-ঠাকরুণ, একেবারে খুন করেনি। খুব মেরেছে বটে, কিন্তু মেরে ফেলেনি।

রতন চোখ রাঙাইয়া কহিল, তোরা কি জানিস্? তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথা? তোদের শুদ্ধ হাতে দড়ি পড়তে পারে জানিস্? শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইল। কেহ কেহ সরিবার চেষ্টাও করিল। রাজলক্ষ্মী রতনের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুই ও-ধারে দাঁড়াগে যা। যখন জিজ্ঞাসা করব বলিস্। ভীড়ের মধ্যে মালতীর বুড়া বাপ পাংশুমুখে দাঁড়াইয়াছিল; আমরা সবাই তাহাকে চিনিতাম, ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে, সত্যি বল ত বিশ্বনাথ? লুকালে কিম্বা মিছা কথা কইলে বিপদে পড়তে পার।

বিশ্বনাথ যাহা কহিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কাল রাত্রি হইতে মালতী তাহার পিতার বাটীতে ছিল। আজ দুপুরবেলা সে পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহার স্বামী নবীন কোথায় লুকাইয়া ছিল, একাকী পাইয়া বিষম প্রহার করিয়াছে—এমন কি মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথমে এখানে আসে, কিন্তু আমাদের দেখা না পাইয়া কুশারী মহাশয়ের সন্ধানে কাছারী বাটীতে যায়, সেখানে তাঁহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া সোজা থানায় গিয়া সমস্ত মার-ধোরের চিহ্ন দেখাইয়া পুলিশ সঙ্গে করিয়া আনিয়া নবীনকে ধরাইয়া দেয়। সে তখন ঘরেই ছিল, নিজের হাতে দুটো চাল সিদ্ধ করিয়া খাইতে বসিতেছিল, সুতরাং পালাইবার সুযোগ পায় নাই। দারোগাবাবু লাথি মারিয়া ভাত ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছেন।

ব্যাপার শুনিয়া রাজলক্ষ্মী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। সে মালতীকে যেমন দেখিতে পারিত না, নবীনের প্রতিও তেমনি প্রসন্ন ছিল না; কিন্তু তাহার সমস্ত রাগ পড়িল গিয়া আমার উপর। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, তোমাকে একশ' বার

বলেছি ছোটলোকদের এ সব নোংরা কাণ্ডের মধ্যে তুমি যেয়ো না। যাও এখন সামলাও গে,—আমি কিছু জানিনে। এই বলিয়া সে আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, নব্‌নের ফাঁসি হওয়াই উচিত। আর ও হারামজাদী যদি মরে থাকে ত' আপদ গেছে!

কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমরা সবাই যেন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। বকুনি খাইয়া মনে হইতে লাগিল কাল এমনি সময়ে মধ্যস্থ হইয়া ইহাদের যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা ভাল হয় নাই। না করিলে এ দুর্ঘটনা হয় ত' আজ ঘটিত না; কিন্তু আমার মৎলব ভাল ছিল। ভাবিয়াছিলাম প্রেম-লীলার যে অদৃশ্য চাপা স্রোতটা অন্তরালে বহিয়া সমস্ত পাড়াটাকে নিরন্তর ঘুলাইয়া তুলিতেছে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে হয়ত ভাল হইবে। দেখিতেছি ভুল করিয়াছি। কিন্তু তার পূর্ব্বে সমস্ত ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলা প্রয়োজন। মালতী নবীন ডোমের স্ত্রী বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত দেখিতেছি সমস্ত ডোমপাড়ার মধ্যে সে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশেষ। কখন কোন্ পরিবারের মাঝে সে যে অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিবে, এ লইয়া কোন মেয়ের মনেই শান্তি নাই। এই যুবতী মেয়েটা যেমন সুশ্রী, তেমনি চপল। সে কাঁচপোকার টিপ পরে, নেবুর তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, পরণে তার মিলের চওড়া কালাপেড়ে শাড়ী, তাহার মাথার ঘোমটা পথে-ঘাটে ঘাড়ে নামিয়া পড়িবার কোন বাধা নাই। এই মুখরা মেয়েটাকে মুখের সামনে বলিবার কাহারো সাহস নাই, কিন্তু অগোচরে তাহার নামের সঙ্গে যে বিশেষণ পাড়ার মেয়েরা যোগ করিয়া দেয়, তাহা লেখা চলে না। প্রথমে নাকি মালতী নবীনের ঘর করিতে চাহে নাই, বাপের বাড়ীতেই থাকিত। বলিত, ও আমাকে খাওয়াবে কি? এবং সেই ধিক্কারেই নাকি নবীন দেশত্যাগী হইয়া কোথায় কোন সহরে গিয়া পিয়াদাগিরি চাকরী করিয়া বছর-খানেক হইল গ্রামে ফিরিয়াছে। আসিবার সময় মালতীর রূপার পৈঁচা, মিহি সূতার শাড়ী, রেশমের ফিতা, এক বোতল গোলাপ-জল এবং একটা টিনের তোরঙ্গ সঙ্গে আনিয়াছে এবং এইগুলির পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে শুধু ঘরে আনা নয়, তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু এ সকল আমার শোনা কথা। আবার কবে হইতে যে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জাগিল, ঘাটে যাবার পথে আড়ি পাতিয়া লক্ষ্য করিতে

লাগিল, এবং অতঃপর যাহা হয় সুরু হইয়া গেল, আমি ঠিক জানি না। আমরা ত আসিয়া অবধি দেখিতেছি, ইহাদের বাক্‌ ও হাত-যুদ্ধ কোনদিন কামাই যায় না। মাথা ফাটাফাটি কেবল আজ নয়, আরও দিন-দুই হইয়া গিয়াছে—বোধ করি এই জন্যও আজ নবীন মোড়ল স্ত্রীর মাথা ভাঙ্গিয়া আসিয়াও নিশ্চিন্ত চিত্তে আহারে বসিতেছিল, কল্পনাও করে নাই পুলিশ ডাকিয়া মালতী তাহাকে বাঁধিয়া চালান দিবে। কাল সকালেই প্রভাতী রাগিণীর ন্যায় মালতীর তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ যখন গগনভেদ করিয়া উঠিল, রাজলক্ষ্মী ঘরের কাজ ফেলিয়া, কাছে আসিয়া কহিল, বাড়ীর পাশে রোজ এ হাঙ্গামা সহ্য হয় না—না হয় কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে হতভাগীকে তুমি দূর করে দাও।

বলিলাম, নবীনটাও কম পাজি নয়। কাজ-কর্ম্ম করবে না, কেবল টেরি কেটে আর মাছ ধরে বেড়াবে, আর হাতে পয়সা পেলেই তাড়ি খেয়ে মারপিট সুরু করবে। বলা বাহুল্য, এ সকল সে সহরে শিখিয়া আসিয়াছিল।

দুই-ই সমান! বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, কাজ-কর্ম্ম করবেই বা কখন? হারামজাদী তার সময় দিলে ত!

বস্তুতঃ, অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের গালিগালাজ ও মারামারির মোকদ্দমা আরও বার-দুই করিয়াছি,—কোন ফল হয় নাই; আজ ভাবিলাম খাওয়া-দাওয়ার পরে ডাকাইয়া আনিয়া এইবার শেষ মীমাংসা করিয়া দিব। কিন্তু ডাকিতে হইল না, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়ে পুরুষে বাড়ী ভরিয়া গেল। নবীন কহিল, বাবুমশাই, ওকে আমি আর চাইনে—নষ্ট মেয়েমানুষ। ও আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যাক।

মুখরা মালতী ঘোমটার ভিতর হইতে কহিল, ও আমার শাঁখা নোয়া খুলে দিক।

নবীন বলিল, তুই আমার রূপোর পৈঁচে ফিরিয়ে দে।

মালতী তৎক্ষণাৎ হাত হইতে সে দুই গাছা টানিয়া খুলিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল।

নবীন কুড়াইয়া লইয়া কহিল, আমার টিনের তোরঙ্গ তুই নিতে পাবিনে।

মালতী কহিল, আমি চাইনে। এই বলিয়া সে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিল।

নবীন তখন বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া মালতীর শাঁখা পট্ পট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল এবং নোয়াগাছটা টানিয়া খুলিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, যা, তোকে বিধবা ক'রে দিলাম।

আমি ত' অবাক হইয়া গেলাম। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তখন বুঝাইয়া বলিল যে, এরূপ না হইলে মালতীর নিকা করা আর হইত না—সমস্তই ঠিকঠাক্ আছে।

কথায় কথায় ব্যাপারটা আরও বিশদ হইল। বিশ্বেশ্বরের বড় জামাইয়ের ভাই আজ ছয় মাস ধরিয়া হাঁটাহাঁটি করিতেছে। তাহার অবস্থা ভাল, বিশুকে সে কুড়ি টাকা নগদ দিবে এবং মালতীকে পায়ে মল, হাতে রূপোর চুড়ি এবং নাকে সোনার নথ দিবে বলিয়াছে, এমন কি এগুলি সে বিশুর কাছে জমা রাখিয়া পর্য্যন্ত দিয়াছে।

শুনিয়া সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল। কিছুদিন হইতে যে একটা কদর্য্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা নিঃসন্দেহ, এবং না জানিয়া হয়ত আমি তাহার সাহায্য করিলাম। নবীন কহিল, আমি ত এই চাই। সহরে গিয়ে এবার মজা করে চাকরী ক'রব—তোর মত অমন দশ গণ্ডা বিয়ে ক'রব। রাঙ্গামাটির হরি মোড়ল ত তার মেয়ের জন্যে সাধাসাধি করছে,—তার পায়ের নোখেও তুই লাগিসনে। এই বলিয়া সে তাহার রূপার পৈঁচা ও তোরঙ্গের চাবি ট্যাকে গুঁজিয়া চলিয়া গেল। এই আস্ফালন সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না যে তাহার সহরের চাকরী, কিম্বা হরি মোড়লের মেয়ে কোনটার আশাই তার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে।

রতন আসিয়া কহিল, বাবু, মা বলছেন এসব নোংরা কাণ্ড বাড়ী থেকে বিদায় করুন।

আমাকে করিতে কিছুই হইল না, বিশ্বেশ্বর মোড়ল তাহার মেয়েকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিছু পাছে আমার পায়ের ধূলা লইতে আসে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ভাবিবার চেষ্টা করিলাম, যাক, যা হইল তা ভালই হইল। মন যখন ভাঙিয়াছে এবং উপায় যখন আছে, তখন ব্যর্থ আক্রোশে নিত্য-নিয়ত মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঘর করার চেয়ে এ ভাল।

কিন্তু আজ সুনন্দার বাটী হইতে ফিরিয়া শুনিলাম, গতকল্যকার নিষ্পত্তি

অমন নিছক ভালই হয় নাই। সদ্যবিধবা মালতীর উপর নবীন স্বামিত্বের দাবি-দাওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেও মারপিটের অধিকার ছাড়ে নাই। সে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় গিয়া হয়ত সমস্ত সকালটা লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়াছে এবং এক সময়ে একাকী পাইয়া বিষম কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু মেয়েটাই বা গেল কোথায় ?

সূর্য্য অস্ত গেল। পশ্চিমের জানালা দিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতে-ছিলাম, খুব সম্ভব মালতী পুলিশের ভয়ে কোথায় লুকাইয়া আছে,—কিন্তু নবীনকে সে যে ধরাইয়া দিয়াছে ভালই করিয়াছে। হতভাগার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে—মেয়েটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

রাজলক্ষ্মী সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। নীরবে বাহির হইয়া পাশের ঘরের চৌকাঠে পা দিয়াই কিন্তু কি একটা ভারি জিনিস পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া দেখি মস্ত একটা কাপড়ের পুঁটুলি দুই হাত বাড়াইয়া তাহার পা ধরিয়া তাহারি উপর মাথা খুঁড়িতেছে। রাজলক্ষ্মীর হাতের প্রদীপটা পড়িয়া গেলেও জ্বলিতেছিল, তুলিয়া ধরিতেই সেই মিহি সূতার চওড়া কালাপেড়ে শাড়ী চোখে পড়িল।

বলিলাম, এ মালতী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হতভাগী, সন্ধ্যা-বেলায় আমায় ছুঁলি ? ইস্! এ কি বল্ ত ?

প্রদীপের আলোকে ঠাহর করিয়া দেখিলাম তাহার মাথার ক্ষত হইতে পুনরায় রক্ত ঝরিয়া অপরের পা দু'খানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই হতভাগিনীর কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া পড়িল ; কহিল, মা আমাকে বাঁচাও—

রাজলক্ষ্মী কটুকণ্ঠে কহিল, কেন, তোর আবার হ'ল কি ?

সে কাঁদিয়া কহিল, দারোগা বলছে কাল সকালেই তাকে চালান দেবে—দিলেই পাঁচ বচ্ছরের জেল হয়ে যাবে।

আমি কহিলাম, যেমন কর্ম্ম তেমনি শাস্তি হওয়া ত চাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হ'লই বা জেল, তাতে তোর কি ?

মেয়েটার কান্না যেন দমকা ঝড়ের মত তাহার বুক ফাটিয়া উঠিল; বলিল, বাবু বলেন বলুন, মা, ও-কথা তুমি ব'লো না—তার মুখের ভাত আমি খেতে দিই নি। বলিতে বলিতে সে আবার মাথা কুটিতে লাগিল,—কহিল, মা, আমাদের তুমি এইবারটি বাঁচিয়ে দাও, আমরা বিদেশে কোথাও চলে গিয়ে ভিক্ষে করে খা'ব। নইলে তোমারি পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে ম'রব।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল; ধীরে ধীরে তাহার একরাশ এলো চুলের উপর হাত রাখিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা আচ্ছা, তুই চুপ কর—আমি দেখছি।

দেখিতেও হইল। রাজলক্ষ্মীর বাক্স হইতে শ'দুই টাকা সেই রাত্রেই কোথায় গিয়া অন্তর্হিত হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু, নবীন মোড়ল কিম্বা মালতী কাহাকেও সকাল হইতে গঙ্গামাটিতে দেখিতে পাওয়া গেল না।

নয়

তাহাদের সম্বন্ধে সবাই ভাবিল, যাক, বাঁচা গেল! রাজলক্ষ্মীর তুচ্ছ কথায় মন দিবার সময় ছিল না; সে উহাদের দুই-চারিদিনেই বিস্মৃত হইল; মনে পড়িলেও কি যে মনে করিত সেই জানে। তবে, পাড়া হইতে যে একটা পাপ বিদায় হইয়াছে, তাহা অনেকেই ভাবিত। কেবল রতন খুসী হইল না। সে বুদ্ধিমান, সহজে মনের কথা ব্যক্ত করে না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইত জিনিসটা সে একেবারেই পছন্দ করে নাই। তাহার মধ্যস্থ হইবার, কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ গেল, ঘরের টাকা গেল—এতবড় একটা সমারোহ কাণ্ড রাতারাতি কোথা দিয়া কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল—সবশুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন নিজেকেই অপমানিত, এমন কি আহত জ্ঞান করিল। তথাপি সে চুপ করিয়াই রহিল। আর বাটীর যিনি কর্ত্রী, তাঁহার ত কোন দিকে খেয়াল মাত্র নাই। যত দিন কাটিতে লাগিল সুনন্দা ও তাহার কাছ হইতে মন্ত্রতন্ত্রের উচ্চারণ-শুদ্ধির লোভ তাহাকে যেন পাইয়া বসিতে লাগিল। কোনদিন

তথায় যাওয়ার তাহার বিরাম ছিল না। সেখানে সে কি পরিমাণে যে ধর্ম্মতত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করিতেছিল তাহা আমি জানিব কি করিয়া ? আমি কেবল জানিতেছিলাম তাহার পরিবর্ত্তন। তাহা যেমন দ্রুত, তেমনি অভাবিত। দিনের-বেলায় আহারটা আমার চিরকালই একটু বেলাতেই সাঙ্গ হইত। রাজলক্ষ্মী বরাবর আপত্তি করিয়াই আসিয়াছে, অনুমোদন কখনও করে নাই—সে ঠিক; কিন্তু সে ত্রুটি সংশোধনের জন্য কখনও আমাকে লেশমাত্র চেষ্টা করিতেও হয় নাই; কিন্তু আজকাল দৈবাৎ কোনদিন অধিক বেলা হইয়া গেলে মনে মনে লজ্জা বোধ করি। রাজলক্ষ্মী বলিত, তুমি রোগা মানুষ, তোমার এত দেরী করা কেন ? নিজের শরীরের পানে না চাও, দাসী চাকরদের মুখের দিকে ত চাইতে হয় ? তোমার কুড়েমিতে তারা যে মারা যায়! কথাগুলো ঠিক সেই আগেকার, তবুও ঠিক তা নয়। সেই সস্নেহ প্রশ্রয়ের স্বর যেন আর বাজে না—বাজে বিরক্তির এমন একটা কুশাগ্র সূক্ষ্ম কটুতা, যাহা চাকর-দাসী কেন, হয়ত—আমি ছাড়া ভগবানের কানেও তাহার নিগূঢ় শ্লেষটুকু ধরা পড়ে না। তাই ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও দাসী-চাকরদের মুখ চাহিয়া তাড়াতাড়ি কোনমতে স্নানাহারটা সারিয়া লইয়া তাহাদের ছুটি করিয়া দিতাম; কিন্তু এই অনুগ্রহের প্রতি চাকর-দাসী যাহারা, তাহাদের আগ্রহ ছিল কি উপেক্ষা ছিল, সে তাহারাই জানে; কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে দেখিতাম ইহার মিনিট দশ-পনেরর মধ্যেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। কোনদিন রতন, কোনদিন বা দরওয়ান সঙ্গে যাইত,—কোনদিন বা দেখিতাম সে একাই চলিয়াছে, ইহাদের কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবার সময় পর্য্যন্ত হয় নাই। প্রথমে দুই-চারি দিন আমাকে সঙ্গে যাইতে সাধিয়াছিল, কিন্তু ওই দুই-চারি দিনেই বুঝা গেল, কোন পক্ষ হইতেই তাহাতে সুবিধা হইবে না। হইলও না। অতএব আমি আমার নিরালা ঘরে পুরাতন আলস্যের মধ্যে এবং সে তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম ও তন্ত্রমন্ত্রের নবীন উদ্দীপনার মধ্যে নিমগ্ন থাকায় ক্রমশঃই উভয়ে যেন পৃথক হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার খোলা জানালা দিয়া দেখিতে পাইতাম সে রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক মাঠের পথ দিয়া দ্রুত পদক্ষেপে মাঠ পার হইয়া যাইতেছে। একাকী সমস্ত দুপুর বেলাটা যে আমার কি করিয়া কাটে, এদিকে খেয়াল করিবার সময় তাহার ছিল না,—সে আমি বুঝিতাম; তবুও যতদূর পর্য্যন্ত

তাহাকে চোখ দিয়া অনুসরণ করা যায়, না করিয়া পারিতাম না। পায়ে-হাঁটা আঁকা-বাঁকা পথের উপর তাহার বিলীয়মান দেহলতা ধীরে ধীরে দূরান্তরালে কোন্ এক সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত—অনেকদিন সেই সময়টুকুও যেন চোখে আমার ধরা পড়িত না,—মনে হইত ওই একান্ত সুপরিচিত চলনখানি যেন তখনও শেষ হয় নাই—সে যেন চলিয়াই চলিয়াছে। হঠাৎ চেতনা হইত। হয়ত চোখ মুছিয়া আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া তাহার পরে বিছানায় শুইয়া পড়িতাম। কর্ম্মহীনতার দুঃসহ ক্লান্তি-বশতঃ হয়ত বা কোনদিন ঘুমাইয়া পড়িতাম—নয়ত নিমীলিত চক্ষে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিতাম। অদূরবর্ত্তী কয়েকটা খর্ব্বাকৃতি বাবলাগাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন একটা বাঁশ ঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝি বা আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে। ভয় হইত, এমন বুঝি বা আর বেশি দিন সহিতে পারিব না। রতন বাড়ী থাকিলে মাঝে মাঝে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে বলিত, বাবু, একবার তামাক দেব কি? এমন কতদিন হইয়াছে, জাগিয়াও সাড়া দিই নাই, ঘুমানোর ভাণ করিয়াছি; ভয় হইয়াছে পাছে সে আমার মুখের উপর বেদনার ঘুণাগ্র আভাসও দেখিতে পায়। প্রতিদিনের মত সেদিনও দুপুরবেলায় রাজলক্ষ্মী সুনন্দার বাটীতে চলিয়া গেলে সহসা আমার বর্ম্মার কথা মনে পড়িয়া বহুকালের পরে অভয়াকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, যে কার্য্যে কাজ করিতাম, তাহার বড়সাহেবেকও একখানা পত্র লিখিয়া খবর লইব। কি খবর লইব, কেন লইব, লইয়া কি হইবে, এতকথা তখনও ভাবি নাই; সহসা মনে হইল জানালার সুমুখ দিয়া যে রমণী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ত্বরিত-পদে সরিয়া গেল, সে যেন চেনা—সে যেন মালতীর মত। উঠিয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখা গেল না। সেই মুহূর্ত্তেই তাহার আঁচলের রাঙা পাড়টুকু আমাদের প্রাচীরের কোণটায় অন্তর্হিত হইল।

মাসখানেকের ব্যবধানে ডোমদের সেই শয়তান মেয়েটাকে সবাই এক প্রকার ভুলিয়াছে, আমিই কেবল তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। জানি না

কেন, আমার মনের একটা কোণে ওই উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটার সেই সন্ধ্যাবেলাকার চোখের জলের এক ফোঁটা ভিজা দাগ তখন পর্য্যন্তও মিলায় নাই। প্রায়ই মনে হইত কি জানি কোথায় তাহারা আছে। জানিতে সাধ হইত এই গঙ্গামাটির অসৎ প্রলোভন ও কুৎসিত ষড়যন্ত্রের বেষ্টনের বাহিরে মেয়েটার স্বামীর কাছে থাকিয়া কি ভাবে দিন কাটিতেছে! ইচ্ছা করিতাম এখানে তাহারা আর যেন শীঘ্র না আসে। ফিরিয়া গিয়া চিঠিটা শেষ করিতে বসিলাম; ছত্রকয়েক লেখার পরেই পদ-শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, রতন। তাহার হাতে সাজা কলিকা; গুড়গুড়ির মাথায় বসাইয়া দিয়া নলটি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, বাবু, তামাক খান্।

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, আচ্ছা।

রতন কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেল না। নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, বাবু, এই রতন পরামাণিক যে কবে মরবে তাই কেবল সে জানে না!

তাহার ভূমিকার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল; রাজলক্ষ্মী হইলে বলিত, জানলে লাভ ছিল, কিন্তু কি বলতে এসেছিস বল্। আমি কিন্তু শুধু মুখ তুলিয়া হাসিলাম। রতনের গাম্ভীর্য্যের পরিমাণ তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না; কহিল, মাকে সেদিন বলেছিলাম কিনা ছোটলোকের কথায় মজবেন না! তাদের চোখের জলে ভুলে দু'দু'শ টাকা জলে দেবেন না! বলুন, বলেছিলাম কিনা! আমি জানি, সে বলে নাই। এ সদভিপ্রায় তাহার অন্তরে ছিল বিচিত্র নয়,—কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলা সে কেন, বোধ হয় আমারও সাহস হইত না। কহিলাম, ব্যাপার কি রতন?

রতন কহিল, ব্যাপার যা' বরাবর জানি,—তাই।

কহিলাম, কিন্তু আমি যখন এখনও জানিনে, তখন একটু খুলেই বল।

রতন খুলিয়াই বলিল। সমস্ত শুনিয়াই মনের মধ্যে যে কি হইল বলা কঠিন। কেবল মনে আছে ইহার নিষ্ঠুর কদর্যতা ও অপরিসীম বীভৎসতার ভারে সমস্ত চিত্ত একেবারে তিক্ত বিবশ হইয়া গেল। কি করিয়া যে কি হইল, রতন সবিস্তারে ইহার ইতিবৃত্ত এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু যেটুকু সত্য সে ছাঁকিয়া বাহির করিয়াছে, তাহা এই যে নবীন মোড়ল সম্প্রতি

জেল খাটিতেছে এবং মালতী তাহার ভগিনীপতির সেই বড়লোক ছোটভাইকে ঠ্যাঙা করিয়া উভয়ে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতে গঙ্গামাটিতে কাল ফিরিয়া আসিয়াছে। মালতীকে একপ্রকার স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ করি বিশ্বাস করাই কঠিন হইত যে, রাজলক্ষ্মীর টাকাগুলার যথার্থ-ই এইভাবে সদগতি হইয়াছে।

সেই রাত্রে আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী এ সংবাদ শুনিল। শুনিয়া কেবল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বলিস্ কি রতন, সত্যি নাকি? ছুঁড়িটা সেদিন আচ্ছা তামাসা করলে ত'! টাকাগুলো গেল,—অবেলায় আমাকে নাইয়ে মারলে! ও কি তোমার খাওয়া হয়ে গেল নাকি! তার চেয়ে খেতে না বসলেই ত হয়?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার কোনদিনই আমি বৃথা চেষ্টা করি না—আজও চুপ করিয়া রহিলাম। তবে একটা বস্তু উপলব্ধি করিলাম। আজ নানা কারণে আমার একেবারে ক্ষুধা ছিল না, প্রায় কিছুই খাই নাই,—তাই আজ সেটা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু কিছুকাল হইতে যে আমার খাওয়া ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল, সে তাহার চোখে পড়ে নাই। ইতি-পূর্ব্বে এ বিষয়ে তাহার নজর এত তীক্ষ্ণ ছিল যে ইহার লেশমাত্র কমবেশি লইয়া তাহার আশঙ্কা ও অভিযোগের অবধি থাকিত না—কিন্তু আজ যে কারণেই হোক একজনের সেই শ্যেন-দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই যে অপরের গভীর বেদনাকেও হা-হুতাশের দ্বারা প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিব, সেও আমি নই। তাই উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার দিনগুলো একভাবেই আরম্ভ হয়, একভাবেই শেষ হয়। আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, অথচ কোন দুঃখ-কষ্টের নালিশও নাই। শরীর মোটের উপর ভালই আছে। পরদিন প্রভাত হইল, বেলা বাড়িয়া উঠিল, যথারীতি স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া নিজের গৃহে গিয়া বসিলাম। সুমুখের সেই খোলা জানালা এবং তেমনি বাধাহীন, উন্মুক্ত শুষ্ক মাঠ। পাঁজিতে আজ বোধ হয় বিশেষ কোন উপবাসের বিধি ছিল; রাজলক্ষ্মীর তাই আজ সেইটুকু সময় অপব্যয় করিতে হইল না,—যথাসময়ের কিছু পূর্ব্বেই সুনন্দার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। অভ্যাসমত বোধ করি বহুক্ষণ তেমনিই চাহিয়াছিলাম, হঠাৎ স্মরণ

হইল কল্যকার অসমাপ্ত চিঠি দু'টা আজ শেষ করিয়া বেলা তিনটার পূর্ব্বেই ডাক বাক্সে ফেলা চাই। অতএব আর মিথ্যা কালহরণ না করিয়া অবিলম্বে তাহাতেই নিযুক্ত হইলাম। চিঠি দু'খানা সম্পূর্ণ করিয়া যখন পড়িতে লাগিলাম, তখন কোথায় যেন ব্যথা বাজিতে লাগিল, কি যেন একটা না লিখিলেই ভাল হইত; অথচ নিতান্তই সাধারণ লেখা, তাহার কোথায় যে ত্রুটি বারবার পড়িয়াও ধরিতে পারিলাম না। একটা কথা আমার মনে আছে। অভয়ার পরে রোহিণী-দাদাকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া শেষের দিকে লিখিয়াছি, তোমাদের অনেকদিন খবর পাই নাই। তোমরা কেমন আছ, কেমন করিয়া তোমাদের দিন কাটিতেছে, কেবলমাত্র কল্পনা করা ছাড়া জানিবার চেষ্টা করি নাই। হয়ত সুখেই আছ, হয়ত নাই, কিন্তু তোমাদের জীবনযাত্রার এই দিকটাকে সেই যে একদিন ভগবানের হাতে ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় পর্দ্দা টানিয়া দিয়াছিলাম, আজও সে তেমনি ঝুলানো আছে; তাহাকে কোনদিন তুলিবার ইচ্ছা পর্য্যন্তও করি নাই। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার দীর্ঘকালের নয়, কিন্তু যে অত্যন্ত দুঃখের ভিতর দিয়া একদিন আমাদের পরিচয় আরম্ভ এবং আর একদিন সমাপ্ত হয়, তাহাকে সময়ের মাপ দিয়া মাপিবার চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। যেদিন নিদারুণ রোগাক্রান্ত হই, সেদিন সেই আশ্রয়হীন সুদূর বিদেশে তুমি ছাড়া আমার যাইবার স্থান ছিল না। তখন একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তুমি দ্বিধা কর নাই—সমস্ত হৃদয় দিয়া পীড়িতকে গ্রহণ করিয়াছিলে। অথচ তেমনি রোগে, তেমনি সেবা করিয়া আর কখনো যে কেহ আমাকে বাঁচায় নাই, এ কথা বলি না; কিন্তু আজ অনেক দূরে বসিয়া উভয়ের প্রভেদটাও অনুভব করিতেছি। উভয়ের সেবার মধ্যে, নির্ভরের মধ্যে, অন্তরের অকপট শুভকামনার মধ্যে, তোমাদের নিবিড় স্নেহের মধ্যে গভীর ঐক্য রহিয়াছে; কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটি স্বার্থলেশহীন সুকোমল নির্লিপ্ততা, এমন অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য ছিল যাহা কেবলমাত্র সেবা করিয়াই আপনাকে আপনি নিঃশেষ করিয়াছে, আমার আরোগ্যের মধ্যে এতটুকু চিহ্ন রাখিতে একটি পাও কখনো বাড়ায় নাই; তোমার এই কথাটাই আজ বারম্বার মনে পড়িতেছে। হয়ত অত্যন্ত স্নেহ আমার সহে না বলিয়াই—হয়ত বা স্নেহের যে রূপ একদিন তোমার চোখে-মুখে দেখিতে পাইয়াছি, তাহারই জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া

উঠিয়াছে। অথচ তোমাকে আর একবার মুখোমুখি না দেখা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সাহেবের চিঠিখানাও শেষ করিয়া ফেলিলাম। একসময়ে তিনি আমার সত্য-সত্যই বড় উপকার করিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছি। প্রার্থনা কিছুই করি নাই, কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরে সহসা গায়ে পড়িয়া এমন ধন্যবাদ দিবার ঘটা দেখিয়াও নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করিতে লাগিল। ঠিকানা লিখিয়া খামে বন্ধ করিতে গিয়া দেখি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এত তাড়াতাড়ি করিয়াও ডাকে দেওয়া গেল না, কিন্তু মন তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন স্বস্তি অনুভব করিল। মনে হইল এ ভালই হইল যে, কাল আর একবার পড়িয়া দেখিবার সময় মিলিবে।

রতন আসিয়া জানাইল কুশারী-গৃহিনী আসিয়াছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কহিলাম, তিনি ত বাড়ী নেই, ফিরে আসতে বোধ করি সন্ধ্যা হবে।

তা' জানি, বলিয়া তিনি জানালার উপর হইতে একটা আসন টানিয়া লইয়া নিজেই মেঝের উপর পাতিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, কহিলেন, কেবল সন্ধ্যা কেন, ফিরে আসতে ত প্রায় রাত হয়েই যায়।

লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিলাম ধনী-গৃহিণী বলিয়া ইনি অতিশয় দাম্ভিকা। কাহারও বাড়ী বড় একটা যান না। এ বাড়ীর সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যবহার অনেকটা এইরূপ; অন্ততঃ, এতদিন ঘনিষ্ঠতা করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে মাত্র বার-দুই আসিয়াছিলেন। মনিববাড়ী বলিয়া একবার নিজেই আসিয়াছিলেন এবং আর একবার নিমন্ত্রণ রাখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু কেন যে আজ অকস্মাৎ স্বেচ্ছায় আগমন করিলেন এবং বাটীতে কেহ নাই জানিয়াও,—আমি ভাবিয়া পাইলাম না।

আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আজকাল ছোটগিন্নীর সঙ্গে ত একেবারে এক-আত্মা!

না জানিয়া তিনি একটা ব্যথার স্থানেই আঘাত করিলেন, তথাপি ধীরে ধীরে বলিলাম, হাঁ, প্রায়ই ওখানে যান বটে। কুশারী-গৃহিনী কহিলেন, প্রায়? রোজ, রোজ! প্রত্যহ! কিন্তু ছোটগিন্নী কি কখন আসে? একটি দিনও না। মানীর মান রাখবে সুনন্দা সে মেয়েই নয়! এই বলিয়া তিনি আমার

মুখের প্রতি চাহিলেন। আমি একজনের নিত্য যাওয়ার কথাই ভাবিয়াছি, কিন্তু আর একজনের আসার কথা মনেও করি নাই; সুতরাং তাঁহার কথায় হঠাৎ একটু যেন ধাক্কা লাগিল; কিন্তু ইহার উত্তর আর কি দিব? শুধু মনে হইল ইঁহার আসার উদ্দেশ্যটা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, এবং একবার এমনও মনে হইল যে মিথ্যা-সঙ্কোচ ও চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলি, আমি নিতান্তই নিরুপায়, অতএব এই অক্ষম ব্যক্তিটিকে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া কোন লাভ নাই। বলিলে কি হইত জানি না, কিন্তু না বলার ফলে দেখিলাম সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা তাঁহার চক্ষের পলকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং কবে, কাহার কি ঘটিয়াছিল, এবং কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, ইহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তাঁহার শ্বশুরকুলের বছর দশেকের ইতিহাস প্রায় রোজ-নামচার আকারে অনর্গল বকিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাহার গোটা-কয়েক কথার পরেই কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণও ছিল। মনে করিয়াছিলাম, একদিকে আত্মপক্ষের স্তুতিবাদ, দয়া দাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি যাহা কিছু ইহারই বিপরীত তাহারই বিশদ বিবরণ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া সন তারিখ, মাস, প্রতিবেশী সাক্ষীদের নামধাম সমেত আবৃত্তি করা ভিন্ন তাহার এই বলার মধ্যে আর কিছুই থাকিবে না। প্রথমটা ছিলও না—কিন্তু হঠাৎ একসময়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল কুশারী-গৃহিণার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে। একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে? তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তার পর ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন, হবার আর কি বাকী রইল বাবু? শুনলাম, কাল নাকি ঠাকুরপো হাটের মধ্যে নিজের হাতে বেগুন বেচতেছিলেন?

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হইল না, এবং মন ভাল থাকিলে হয় ত হাসিয়াই ফেলিতাম। কহিলাম, অধ্যাপক মানুষ তিনি হঠাৎ বেগুনই বা পেলেন কোথায়, আর বেচতেই বা গেলেন কেন?

কুশারী-গৃহিনী বলিলেন, ওই হতভাগীর জ্বালায়। বাড়ির মধ্যেই নাকি গোটা কয়েক গাছে বেগুন ফলেছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলে হাটে বেচতে—এমন করে শত্রুতা করলে আমরা গাঁয়ে বাস করি কি করে?

বলিলাম, কিন্তু একে শত্রুতা করা বলছেন কেন ? তাঁরা ত আপনাদের কিছুর মধ্যেই নেই। অভাব হয়েছে, নিজের জিনিস বিক্রি করতে গেছেন, তাতে আপনার নালিশ কি ?

আমার জবাব শুনিয়া কুশারী-গৃহিণী বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, এই বিচারই যদি করেন, তা হলে আমার বলবার আর কিছু নেই, মনিবের কাছে নালিশ জানাবারও কিছু নেই—আমি উঠলাম।

শেষের দিকে তাঁহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম, দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আপনার মনিব ঠাকুরুণকে জানাবেন, তিনি হয়ত সকল কথা বুঝতেও পারবেন, আপনার উপকার করতেও পারবেন।

তিনি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, আর আমি কাউকে বলতেও চাই নে, আমার উপকার করেও কারও কাজ নেই। এই বলিয়া তিনি সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বললেন, আগে আগে কর্ত্তা বলতেন, দুমাস যাক, আপনিই ফিরে আসবে। তারপরে সাহস দিতেন, থাকো না আরও মাস দুই চেপে, সব শুধরে যাবে—কিন্তু এমনি করে মিথ্যা আশায় আশায় প্রায় বছর ঘুরে গেল ; কিন্তু কাল যখন শুনলাম সে উঠানের দুটো বেগুন পর্য্যন্ত বেচতে পেরেছে, তখন কারও কথায় আর আমার কোন ভরসা নেই। হতভাগী সমস্ত সংসার ছারখার করে দেবে, কিন্তু ও-বাড়ীতে আর পা দেবে না। বাবু, মেয়েমানুষে যে এমন শক্ত পাষাণ হতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি !

তিনি কহিতে লাগিলেন, কর্ত্তা ওকে কোনদিন চিনতে পারেন নি কিন্তু আমি চিনেছিলাম। প্রথম প্রথম এর-ওর-তার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে জিনিস-পত্র পাঠাতাম, উনি বললেন, সুনন্দা জেনেশুনেই নেয়—কিন্তু অমন করলে তাদের চৈতন্য হবে না। আমিও ভাবতাম হবেও বা। কিন্তু একদিন সব ভুলে ভেঙ্গে গেল। কি করে সে জানতে পারে, যতদিন যা কিছু দিয়েছি, একটা লোকের মাথায় সমস্ত টান মেরে আমাদের উঠানের মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেল। তাতে কর্ত্তার তবুও চৈতন্য হল না—হ'ল আমার।

এতক্ষণে আমি তাঁর মনের কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম। সদয়কণ্ঠে কহিলাম, এখন আপনি কি করতে চান ? আচ্ছা, তাঁরা কি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কোন প্রকার শত্রুতা করবার চেষ্টা করেন ?

কুশারী-গৃহিণী আর একদফা কাঁদিয়া ফেলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, পোড়া কপাল! তা হ'লে ত একটা উপায় হ'ত। সে আমাদের এমনি ত্যাগ করেছে যে কোনদিন যেন আমাদের চোখেও দেখেনি, নামও শোনেনি, এমনি কঠিন এমনি পাষাণ মেয়ে! আমাদের দুজনকে সুনন্দা তার বাপ-মায়ের বেশী ভালবাসত; কিন্তু যেদিন থেকে শুনেছে তার ভাশুরের বিষয় পাপের বিষয়, সেই দিন থেকে সমস্ত মন যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছে। স্বামী-পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, তবু এর কড়াক্রান্তি ছোঁবে না; কিন্তু এতবড় সম্পত্তি কি আমরা ফেলে দিতে পারি, বাবু? সে যেমন দয়ামায়াহীন—ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতেও পারে, কিন্তু আমরা ত তা পারি নে।

কি জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু আস্তে আস্তে কহিলাম, আশ্চর্য্য মেয়েমানুষ!

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, কুশারী-গৃহিণী নীরবে কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু হঠাৎ দুই হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সত্যি বলছি বাবু, এদের মধ্যে পড়ে আমার বুকখানা যেন ফেটে যেতে চায়; কিন্তু শুনতে পাই আজকাল সে মা'র নাকি বড় বাধ্য,—কোন একটা উপায় হয় না? আমি যে আর সইতে পারিনে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনিও আর কিছু বলিতে পারিলেন না,—তেমনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

দশ

মানুষের পরকালের চিন্তার মধ্যে নাকি পরের চিন্তার ঠাঁই নাই, না হইলে আমার খাওয়া-পরার চিন্তা রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিতে পারে এতবড় বিস্ময় সংসারে আর কি আছে? এই গঙ্গামাটিতে আমরা কতদিনই বা আসিয়াছি, এ ক'টা দিনের মধ্যেই হঠাৎ সে কতদূরেই না সরিয়া গেল! আমার খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসে এখন বামুনঠাকুর, আমাকে খাওয়াইতে বসে রতন।

একপক্ষে বাঁচিয়াছি, সে দুর্লঙ্ঘ্য পীড়াপীড়ি আর নাই। রোগা শরীরে এগারোটার মধ্যে না খাইলে এখন আর অসুখ করে না। এখন যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা খাই। শুধু রতনের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় ও বামুন-ঠাকুরের সখেদ আত্মভর্ৎসনায় স্বল্পাহারের বড় সুযোগ পাই না—সে বেচারা ম্লানমুখে কেবলি মনে করিতে থাকে তাহারই রান্নার দোষে আমার খাওয়া হইল না। কোনমতে ইহাদের সন্তুষ্ট করিয়া বিছানায় গিয়া বসি। সম্মুখের সেই খোলা জানালা, আর সেই ঊষর প্রান্তরের তীব্র তপ্ত হাওয়া। মধ্যাহ্নের দীর্ঘ দিনমান কেবলমাত্র এই ছায়াহীন শুষ্কতার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া যখন আর কাটিতে চাহিত না, তখন একটা প্রশ্ন সবচেয়ে আমার বেশী মনে পড়িত, সে আমাদের সম্বন্ধের কথাটা। ভাল আমাকে সে আজও বাসে, ইহলোকে আমি তার একান্ত আপনার, কিন্তু লোকান্তরে তার কাছে আমি তত বড়ই পর। তাহার ধর্ম্মজীবনের আমি যে সঙ্গী নই, সেখানে দাবি করিবার আমাকে যে তাহার কোন দলিল নাই, হিন্দুঘরের মেয়ে হইয়া এ কথা সে ভুলে নাই। এই পৃথিবীটাই শুধু নয়, ইহারও অতীত যে স্থানটা আছে, পাথেয় তাহার শুধু আমাকে কেবল ভালবাসিয়াই অর্জ্জন করা যাইবে না, এ সংশয় বোধ করি খুব বড় করিয়াই তাহার মনে উঠিয়াছে।

সে রহিল এই লইয়া, আর আমার দিনগুলা কাটিতে লাগিল এমনি করিয়া। কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের দিবারম্ভ হয় শ্রান্তিতে, অবসান হয় অবসন্ন গ্লানিতে। নিজের আয়ুষ্কালটাকে নিজের হাত দিয়া প্রতিনিয়ত হত্যা করিয়া চলা ব্যতীত সংসারে আর যেন আমার কিছু করিবার নাই। রতন আসিয়া মাঝে মাঝে তামাক দিয়া যায়, সময় হইলে চা আনিয়া দেয় —কিছু বলে না ; কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার বোধ হয়, সে পর্য্যন্ত আমাকে যেন কৃপার চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছে। কখনো বা হঠাৎ আসিয়া বলে বাবু, জানালাটা বন্ধ করে দিন, আগুনের ঝলক আসছে। আমি বলি, থাক্। মনে হয়, কত লোকের গায়ের স্পর্শ এবং কত না অচেনা লোকের তপ্ত শ্বাসের আমি যেন ভাগ পাই। হয়ত আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু ইন্দ্রনাথ আজিও বাঁচিয়া আছে, এই উষ্ণ বায়ু হয়ত তাহাকে এইমাত্র

ছুঁইয়া আসিল। হয় ত সে আমারই মত তাহার অনেকদিনের সুখদুঃখের শিশু সঙ্গীটিকে স্মরণ করিতেছে! আর আমাদের উভয়ের সেই অন্নদা-দিদি! ভাবিতাম হয়ত এতদিনে তাঁহার সকল দুঃখের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কখনও মনে হয়, এই কোণেই ত বর্ম্মাদেশ, বাতাসের ত বাধা নাই, কে বলিবে সমুদ্র পার করিয়া অভয়ার স্পর্শটুকু সে আমার কাছে বহিয়া আনিতেছে না! অভয়াকে মনে পড়িলে সহজে সে আমার মন ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। রোহিণীদা এখন কাজে গিয়াছেন, আর তাহাদের ছোট্ট বাসাবাড়ির সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মেঝেতে বসিয়া অভয়া তাহার সেলাই লইয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলায় আমারি মত সে ঘুমাইতে পারে না, এতদিনে—হয়ত কোন ছোট্ট শিশুর কাঁথা, কিম্বা তেমনি ছোট্ট বালিশের ওড় কিম্বা এমনি কিছু তাহার ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র গৃহিণীপনা!

বুকের মাঝখানে গিয়া যেন তীরের মত বিঁধে; যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত সংস্কার, যুগ-যুগান্তরের ভাল-মন্দ বিচারের অভিমান আমারও ত রক্তের মধ্যে প্রবহমান। কেমন করিয়া অকপটে তাহাকে দীর্ঘায়ুঃ হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করি! কিন্তু মন যে সরমে সঙ্কোচে একেবারে ছোট হইয়া আসিতে চায়!

কর্ম্মনিরতা অভয়ার শান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই। তাহার পাশে নিষ্কলঙ্ক ঘুমন্ত বালক। যেন সদ্য-ফোটা পদ্মের মত শোভায় সম্পদে গন্ধে মধুতে টলটল করিতেছে। এতখানি অমৃত বস্তুর জগতে কি সত্যই প্রয়োজন ছিল না? মামব-সমাজে মানব-শিশুর মর্য্যাদা নাই, নিমন্ত্রণ নাই, স্থান নাই বলিয়া ইহাকেই ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে হইবে? কল্যাণের ধনকেই চির অকল্যাণের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার অপেক্ষা মানব হৃদয়ের বৃহত্তর ধর্ম্ম আর নাই?

অভয়াকে আমি চিনি। এইটুকুকে পাইতে সে যে তাহার জীবনের কতখানি দিয়াছে তাহা আর কেহ না জানে আমি ত জানি! হৃদয়হীন বর্ব্বরতায় কেবলমাত্র অশ্রদ্ধা ও উপহাসের দ্বারাই সংসারে সকল প্রশ্নের জবাব হয় না। ভোগ! অত্যন্ত মোটা রকমের লজ্জাকর দেহের ভোগ! তাই বটে! অভয়াকে ধিক্কার দিবার কথাই বটে!

বাহিরের তপ্ত বাতাসে চোখের তপ্ত অশ্রু আমার নিমিষে শুকাইত। বর্ম্মা হইতে চলিয়া আসার কথাটা মনে পড়িত। ঠিক সেই সময়টায় তখন রেঙ্গুনে মরণের ভয়ে ভাই বোনকে, ছেলে বাপ-মাকেও ঠাঁই দিত না। মৃত্যু-উৎসবের উদ্দণ্ড মৃত্যু-লীলা সরহময় চলিয়াছে—তেমনি সময়ে যখন আমি মৃত্যু-দূতের কাঁধে চড়িয়া তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন নূতন-পাতা ঘর-কন্নার মোহ ত তাহাকে একটা মুহূর্ত্তও দ্বিধায় ফেলে নাই। সে কথা ত শুধু আমার আখ্যায়িকার এই কয়টা লাইন পড়িয়াই বুঝা যাইবে না, কিন্তু, আমি ত জানি সে কি! আরও অনেক বেশি আমি জানি। আমি জানি কিছুই অভয়ার কঠিন নয়—মৃত্যু, সেও তাহার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা এই সব প্রাচীন ও মামুলি বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে একমাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।

কাজের জন্য পুরানো মনিবের কাছে দরখাস্ত করিয়াছি, ভরসা আছে আবেদন না-মঞ্জুর হইবে না। সুতরাং আবার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে। ইতিমধ্যে দুই তরফেই অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। তাহার ভারও সামান্য নয়, কিন্তু সে-ভার সে জমা করিয়াছে আপনার অসামান্য সরলতায় ও স্বেচ্ছায়, আর আমার জমিয়া উঠিয়াছে তেমনি অসাধারণ বলহীনতায় ও ইচ্ছা-শক্তির অভাবে। কি জানি, ইহাদের রঙ ও চেহারা সেদিন মুখোমুখি কেমনতর দেখিতে হইবে।

একাকী সমস্ত দিন প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন, বেলা পড়িলে একটুখানি বেড়াইতে বাহির হইতাম। দিন পাঁচ-সাত হইতে ইহা এক-প্রকার অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। ধূলাময় যে পথটা দিয়া একদিন আমরা গঙ্গামাটিতে আসিয়াছিলাম, সেই পথ ধরিয়া কোন কোন দিন অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতাম। অন্যমনে আজও তেমনি চলিয়াছিলাম, সহসা দেখিতে পাইলাম সম্মুখে লাল পাহাড় সৃষ্টি করিয়া কে একজন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। সভয়ে রাস্তা ছাড়িয়া নামিয়া দাঁড়াইলাম। ঘোড়-সওয়ার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া ঘোড়া থামাইল, ফিরিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার নাম শ্রীকান্তবাবু না? আমাকে চিনতে পারেন?

বলিলাম, নাম আমার তাই বটে, কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারলাম না!

লোকটি ঘোড়া হইতে নামিল। পরনে তাহার ছিন্ন ও মলিন সাহেবী পোষাক, মাথায় জরাজীর্ণ সোলার হ্যাট খুলিয়া হাতে লইয়া কহিল, আমি সতীশ ভরদ্বাজ। থার্ডক্লাস থেকে প্রোমোশন না পেয়ে সার্ভে-স্কুলে পড়তে যাই, মনে পড়ে না?

মনে পড়িল। খুসী হইয়া কহিলাম, তাই বল, তুমি আমাদের ব্যাঙ। এখানে সাহেব সেজে যাচ্ছ কোথায়?

ব্যাঙ হাসিয়া কহিল, সাহেব কি আর সাধে সাজি ভাই, রেলওয়ে কনষ্ট্রাক্‌শনে সাব-ওভারসিয়ারি চাকরী করি, কুলি তাড়াতেই জীবন যায়, হ্যাট কোট না থাকলে কি আর রক্ষা ছিল? এতদিনে তারাই আমাকে তাড়াতো। সোপলপুরে একটু বরাত সেরে ফিরছি—মাইলটাক দূরে আমার তাঁবু, সাঁইথিয়া থেকে যে নতুন লাইন বসছে তাতেই কাজ। যাবে আমার ওখানে? চা খেয়ে আসবে?

অস্বীকার করিয়া কহিলাম, আজ নয়, কোনদিন যদি সুযোগ হয় আসবো।

ব্যাঙ তখন অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—শরীর কেমন, কোথায় থাকি, এখানে কি সূত্রে আসা, ছেলে-মেয়ে কয়টি, তাহারা কে কেমন আছে ইত্যাদি।

জবাবে বলিলাম, শরীর ভাল নয়, থাকি গঙ্গামাটিতে, যে সূত্রে এখানে আসা তাহা অত্যন্ত গোলমেলে। ছেলে মেয়ে নাই, অতএব তাহারা কে কেমন আছে এ প্রশ্ন নিরর্থক।

ব্যাঙ সাদা-সিধা গোছের লোক। আমার উত্তরগুলা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অপরের ব্যাপার বুঝিতেই হইবে এরূপ দৃঢ়-সঙ্কল্প ব্যক্তি সে নয়। সে নিজের কথাই বলিতে লাগিল। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, তরিতরকারি মেলে, মাছ এবং দুধ চেষ্টা করিলে পাওয়া যায়, তবে লোকজন নাই, সঙ্গী-সাথীর অভাব, কিন্তু কষ্ট বিশেষ হয় না, কারণ সন্ধ্যার পরে একটু নেশা-ভাঙ করিলেই বেশ চলিয়া যায়। সাহেবরা হাজার হোক বাঙ্গালীর চেয়ে ঢের ভাল,—টেম্পোরারি গোছের তাড়ির শেড একটা খোলা হইয়াছে—যত ইচ্ছা খাও, তাহার নিজের ত একরকম পয়সা লাগে না বলিলেই হয়—সবই

ভাল,—কনষ্ট্রাক্‌শনে দুপয়সা আছেও বটে, এবং আমার জন্য বড়সাহেবকে ধরিয়া চাকরী একটা অনায়াসে করিয়া দিতে পারে,—এমনি সব তাহার সৌভাগ্যের ছোট বড় কাহিনী। ব্যাঙ তাহার বেতো ঘোড়ার মুখ ধরিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে বকিতে বকিতে চলিল ; বার বার জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি নাগাইদ তাহার ক্যাম্পে পায়ের ধূলা দিতে পারি, এবং ভরসা দিয়া জানাইল যে পোড়ামাটিতে প্রায়ই তাহার কাজ থাকে, ফিরিবার পথে একদিন আমার গঙ্গামাটিতে সে নিশ্চয় গিয়া উপস্থিত হইবে।

সেদিন বাড়িতে ফিরিতে আমার একটু রাত্রি হইল। পাচক আসিয়া জানাইল আহার প্রস্তুত। হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়াছি, এমন সময়ে রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে ঘরে ঢুকিয়া চৌকাঠের কাছে বসিয়া পড়িল, হাসিমুখে কহিল, তুমি কিন্তু কিছুতেই অমত করতে পাবে না বলে রাখছি।

কহিলাম, না, আমার অমত নেই।

কি তা না শুনেই ?

কহিলাম, আবশ্যক মনে হয় বোলো একসময়।

রাজলক্ষ্মীর হাসিমুখ গম্ভীর হইল, কহিল, আচ্ছা—হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল আমার থালার উপরে। কহিল, ভাত খাচ্ছো যে বড় ? তুমি জানো রাত্রে তোমার ভাত সহ্য হয় না—তুমি কি তোমার অসুখটা আমাকে সারাতে দেবে না ঠিক করেছ ?

ভাত আমার ভালই সহ্য হইতেছিল, কিন্তু সে কথা বলিয়া লাভ নাই। রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দিল, মহারাজ ? পাচক দ্বারের কাছে আসিতেই তাহাকে থালা দেখাইয়া ততোধিক তীব্রস্বরে কহিল, কি এ ? তোমাকে বোধ হয় এক হাজার বার বলেছি ভাত বাবুকে কিছুতেই রাত্রে দেবে না—তোমাকে একমাসের মাইনে আমি জরিমানা করলুম। অবশ্য টাকার দিক দিয়া জরিমানার কোন অর্থ নাই তাহা সকল চাকরেই জানে, কিন্তু তিরস্কারের দিক দিয়া তাহার অর্থ আছে বই কি! মহারাজ রাগ করিয়া কহিল, ঘি নেই আমি কি কোরব ?

নেই কেন তাই শুনি ?

সে জবাব দিল, দু-তিন দিন জানিয়েছি আপনাকে ঘি ফুরিয়েছে, লোক পাঠান্। আপনি না পাঠালে আমার দোষ কি?

সংসার-খরচের সাধারণ ঘি এইখানেই পাওয়া যাইত, কিন্তু আমার জন্য আসিত সাঁইথিয়ার নিকটবর্ত্তী কি একটা গ্রাম হইতে। তাহা লোক পাঠাইয়া আনাইয়া লইতে হইত। কথাটা রাজলক্ষ্মীর অন্যমনস্ক কর্ণরন্ধ্রে হয় প্রবেশ করে নাই, না হয় ত সে ভুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কবে থেকে নেই মহারাজ?

তা' হবে পাঁচ-সাত দিন।

এই পাঁচ-সাত দিন ওঁকে ভাত খাওয়াচ্ছো? রতনকে ডাকিয়া কহিল, আমিই যেন ভুলেছিলাম, কিন্তু তুই কি আনিয়ে দিতে পারতিস নে বাবা! এমনি করেই কি সবাই মিলে আমাকে জব্দ করতে হয়?

রতন মনে মনে তাহার ঠাকুরাণীর উপর খুসী ছিল না। দিবারাত্রি বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকায় এবং বিশেষ করিয়া আমার প্রতি ঔদাসীন্যে তাহার বিরক্তির একশেষ হইয়াছিল, কর্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, কি জানি মা, তুমি গেরাহ্যি করলে না দেখে ভাবলুম ভাল দামী ঘি বোধ হয় আর চাইনে। নইলে পাঁচ-ছদিন ধরে আমি রোগা-মানুষকে ভাত খেতে দিই!

রাজলক্ষ্মীর বলিবার কিছুই ছিল না, তাই ভৃত্যের কাছে এতবড় খোঁচা খাইয়াও সে কিছুক্ষণ নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্ করিয়া বোধ করি সেই মাত্র তন্দ্রা আসিয়াছিল, রাজলক্ষ্মী দ্বার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং আমার পায়ের কাছে আসিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া ডাকিল, তুমি কি ঘুমোলে?

বলিলাম, না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তোমাকে পাবার জন্যে আমি যা করেছি, তার অর্দ্ধেক করলেও বোধ হয় ভগবানকে এতদিনে পেতুম; কিন্তু তোমাকে পেলাম না।

বলিলাম, হতে পারে মানুষকে পাওয়া আরও শক্ত।

মানুষকে পাওয়া? রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, যাই হোক

ভালবাসাটাও ত একরকমের বাঁধন, বোধ হয় এও তোমার সয় না—গায়ে লাগে।

এ অভিযোগের জবাব নাই, এ অভিযোগ শাশ্বত ও সনাতন। আদিম মানব-মানবী হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এ কলহের মীমাংসক কেহ নাই—এ বিবাদ যেদিন মিটিবে, সংসারের সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য্য সেদিন তিক্ত, বিষ হইয়া উঠিবে। তাই উত্তর দিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া নীরব হইয়া রহিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে উত্তরের জন্য রাজলক্ষ্মী পীড়াপীড়ি করিল না। জীবনের এতবড় সর্ব্বব্যাপী প্রশ্নটাকেও সে যেন এক নিমেষে আপনা-আপনিই ভুলিয়া গেল। কহিল, ন্যায়রত্ন ঠাকুর বলছিলেন একটা ব্রতের কথা—কিন্তু একটু কঠিন বলে সবাই নিতে পারে না, আর এত সুবিধাই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

অসমাপ্ত প্রস্তাবের মাঝখানে মৌন হইয়া রহিলাম, সে বলিতে লাগিল, তিন দিন একরকম উপোস করেই থাকতে হয়, সুনন্দারও ভারি ইচ্ছে—দু'জনের একসঙ্গেই তা হ'লে হয়ে যায়—কিন্তু—এই বলিয়া সে নিজেই একটু হাসিয়া বলিল, কিন্তু তোমার মত না হলে ত আর—

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মত না হলে কি হবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা হলে হবে না।

কহিলাম, তবে এ মতলব ত্যাগ কর, আমার মত নেই।

যাও—তামাসা করতে হবে না।

তামাসা নয়, সত্যি আমার মত নেই—আমি নিষেধ করছি।

কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মীর মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমরা যে সমস্ত স্থির করে ফেলেছি। জিনিষ-পত্র কিনতে লোক গেছে—কাল হবিষ্যি করে পরশু থেকে যে—বাঃ এখন বারণ করলে হবে কেন? সুনন্দার কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে? ছোটঠাকুর—বাঃ! এ কেবল তোমার চালাকি। আমাকে মিছিমিছি রাগাবার জন্যে—না, সে হবে না, তুমি বল তোমার মত আছে?

বলিলাম, আছে; কিন্তু, তুমি কোনদিনই ত আমার মতামতের অপেক্ষা

কর না লক্ষ্মী, আজই বা হঠাৎ কেন তামাসা করতে এলে ? আমার আদেশ মানতে হবে এ দাবী আমি ত কখনো তোমার কাছে করি নি ?

রাজলক্ষ্মী আমার পায়ের উপর হাত রাখিয়া কহিল, আর কখনও হবে না, এই বারটি শুধু প্রসন্ন-মনে আমাকে হুকুম দাও।

কহিলাম, আচ্ছা ; কিন্তু ভোরেই তোমাকে হয়ত যেতে হবে, আর রাত কোরো না, শুতে যাও।

রাজলক্ষ্মী গেল না, আস্তে আস্তে আমার পায়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার কেবলি মনে হইতে লাগিল সে স্নেহস্পর্শ আর নাই। সেও ত বেশিদিনের কথা নয়, আরা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে আমাকে যেদিন সে কুড়াইয়া বাড়ী আনিয়াছিল, সেদিন এমনি করিয়াই পায়ে হাত বুলাইয়া আমাকে সে ঘুম পাড়াইতে ভালবাসিত। ঠিক এমনিই নীরব, কিন্তু মনে হইত তাহার দশ অঙ্গুলি যেন দশ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়া নারী হৃদয়ের যাহা কিছু আছে, সমস্ত নিঃশেষ করিয়া আমার এই পা দুটার উপরে উজাড় করিয়া দিতেছে। অথচ, এ আমি চাহি নাই, এই লইয়াই যে কেমন করিয়া কি করিব সেও ভাবিয়া পাই নাই। বানের জলের মত—আসার দিনও আমার মত চাহে নাই, হয়ত যাবার দিনেও তেমনি মুখ চাহিবে না। চোখ দিয়া আমার সহজে জল পড়ে না, ভালবাসার কাঙাল-বৃত্তি করিতেও আমি পারি না। জগতে কিছুই নাই, কাহারো কাছে কিছু পাই নাই, দাও দাও বলিয়া হাত বাড়াইয়া থাকিতে আমার লজ্জা করে। বইয়ে পড়িয়াছি, এই লইয়া কত বিরোধ, কত জ্বালা, মান-অভিমানের কতই না প্রমত্ত আক্ষেপ—স্নেহের সুধা গরল হইয়া উঠার কত না বিক্ষুব্ধ কাহিনী! এ সকল মিথ্যা নয় জানি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে বৈরাগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ চমক ভাঙিয়া বলিতে লাগিল, ছি ছি ছি!

বহুক্ষণ পরে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী যখন সাবধানে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, তখন জানিতেও পারিল না যে নিদ্রাবিহীন নিমীলিত চোখের কোণ দিয়া আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। অশ্রু পড়িতেই লাগিল, কিন্তু আজিকার আয়ত্তাতীত ধন একদিন আমারই ছিল বলিয়া ব্যর্থ হাহাকারে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া তুলিতে আর প্রবৃত্তি হইল না।

সকালে উঠিয়া শুনিলাম অতি প্রত্যূষেই রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া রতনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং তিনদিনের মধ্যে যে বাড়ী আসিতে পারিবে না এ খবরও পাইলাম। হইলও তাহাই। সেখানে বিরাট কাণ্ড কিছু যে চলিতে লাগিল তাহা নয়, তবে দু-দশজন ব্রাহ্মণ-সজ্জনের যে গতিবিধি হইতেছে, কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন হইয়াছে, তাহার আভাস জানালায় বসিয়াই অনুভব করিতাম। কি ব্রত, কিরূপ তাহার অনুষ্ঠান, সম্পন্ন করিলে স্বর্গের পথ কতখানি সুগম হয়, ইহার কিছুই জানিতাম না, জানার কৌতূহলও ছিল না। রতন প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিত। বলিত, আপনি একবারও গেলেন না বাবু?

জিজ্ঞাসা করিতাম, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

রতন একটু মুস্কিলে পড়িত। সে এইভাবে জবাব দিত যে, আমার একেবারেই না যাওয়াটা লোকের চোখে যেন কেমন কেমন ঠেকে। হয়ত বা কেউ মনে করে, এতে আমার অনিচ্ছা। বলা যায় না ত?

না, বলা কিছুই যায় না। প্রশ্ন করিতাম, তোমার মনিব কি বলেন?

রতন বলিত, তাঁর ইচ্ছে ত জানেন, আপনি না থাকলে কিছুই তাঁর ভাল লাগে না; কিন্তু কি করবেন, তাই কেউ জিজ্ঞেসা করলে বলেন, রোগা শরীর, এতখানি হাঁটলে অসুখ করতে পারে। আর এসে হবেই বা কি!

বলিলাম, সে ত ঠিক! তা ছাড়া তুমি ত জান রতন, এই সব পূজা-অর্চ্চনা, ধর্ম্ম-কর্ম্মের মাঝখানে আমি ভয়ানক বে-মানান হয়ে পড়ি। যাগ-যজ্ঞের ব্যাপারে আমার একটু গা-আড়াল দিয়ে থাকাই ভাল। ঠিক না?

রতন সায় দিয়া বলিত, সে ঠিক; কিন্তু আমি বুঝিতাম রাজলক্ষ্মীর দিক দিয়া, আমার উপস্থিতি তথায়—কিন্তু থাক্ সে।

হঠাৎ মস্ত একটা সুখবর পাইলাম। মনিবের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিবার অজুহাতে গোমস্তা কাশীনাথ কুশারী মহাশয় সস্ত্রীক গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বলিস কি রতন, একেবারে সস্ত্রীক?

আজ্ঞে হাঁ। তাও আবার বিনা নেমন্তন্নে।

বুঝিলাম ভিতরে রাজলক্ষ্মীর কি একটা কৌশল আছে। সহসা এমনও মনে হইল, হয়ত এই জন্যই সে নিজের গৃহে না করিয়া অপরের গৃহে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছে।

রতন কহিতে লাগিল, বিনুকে কোলে নিয়ে বড়গিন্নীর সে কি কান্না! ছোট মা-ঠাকরুণ সহস্তে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন, খেতে চান নি বলে আসন পেতে ঠাঁই করে ছোট মেয়ের মত তাঁকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিলেন। মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, ব্যাপার দেখে বুড়ো কুশারী ঠাকুরমশাই ত একেবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন—আমার ত বোধ হয়, বাবু, কাজ-কর্ম্ম শেষ হয়ে গেলে ছোট মা-ঠাকরুণ এবার ওই ভাঙা কুঁড়েটার মায়া কাটিয়ে নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে উঠবেন। তা যদি হয় ত গাঁ-সুদ্ধ সবাই খুসী হবে। আর এ কীর্ত্তি যে আমার মায়ের সেও কিন্তু আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি বাবু।

সুনন্দাকে যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে এতখানি আশান্বিত হইতে পারিলাম না, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর উপর হইতে আমার অনেকখানি অভিমান শরতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত দেখিতে দেখিতে সরিয়া গিয়া চোখের সুমুখটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল।

এই দু'টি ভাই ও জায়েদের মধ্যে বিচ্ছেদ যেখানে সত্যও নয়, স্বাভাবিকও নয়, মনের মধ্যে এতটুকু চিড় না খাইয়াও বাহিরে যেখানে এতবড় ভাঙন ধরিয়াছে—সেই ফাটল জোড়া দিবার মত হৃদয় ও কৌশল যাহার আছে তাহার মত শিল্পী আর আছে কোথায়? এই উদ্দেশ্যে কতদিন হইতেই না সে গোপনে উদ্যোগ করিয়া আসিতেছে। একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম, এই সদিচ্ছা যেন তাহার পূর্ণ হয়। কিছুদিন হইতে আমার অন্তরের মধ্যে নিভৃতে যে ভার সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার অনেকখানি হাল্কা হইয়া গিয়া আজিকার দিনটা আমার বড় ভাল কাটিল। কোন্ শাস্ত্রীয় ব্রত রাজলক্ষ্মী নিয়াছে আমি জানি না, কিন্তু আজ তাহার তিন দিনের মিয়াদ পূর্ণ হইয়া কাল আবার দেখা হইবে, এ কথাটা বহুদিন পরে আবার যেন নূতন করিয়া স্মরণ হইল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী আসিতে পারিল না, কিন্তু অনেক দুঃখ করিয়া রতনের মুখে খবর পাঠাইল যে, এমনি অদৃষ্ট একবার দেখা করিয়া যাইবারও সময় নাই—দিন-ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। নিকটে কোথায় বক্রেশ্বর বলিয়া

তীর্থ আছে, সেখানে জাগ্রত দেবতা এবং গরম জলের কুণ্ড আছে, তাহাতে অবগাহন স্নান করিলে শুধু সে-ই নয়, তাহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের তিন-কোটি জন্মের যে যেখানে আছে সবাই উদ্ধার হইয়া যাইবে। সঙ্গী জুটিয়াছে, দ্বারে গরুর গাড়ী প্রস্তুত, যাত্রা-ক্ষণ প্রত্যাসন্ন প্রায়। দু-একটা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু দরওয়ানের হাত দিয়া রতন পাঠাইয়া দিল, সে বেচারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া দিতে গেল। শুনিলাম ফিরিয়া আসিতে পাঁচ-সাত দিন বিলম্ব হইবে।

আরও পাঁচ-সাত দিন! বোধ করি অভ্যাসবশতঃই হইবে, আজ তাহাকে দেখিবার জন্য মনে মনে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম; কিন্তু রতনের মুখে অকস্মাৎ তাহার তীর্থ-যাত্রার সংবাদ পাইয়া নিরাশার অভিমান বা ক্রোধের পরিবর্ত্তে বুকের মধ্যেটা আমার সহসা করুণা ও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। পিয়ারী সত্যসত্যই নিঃশেষ হইয়া মরিয়াছে এবং তাহারই কৃত-কর্ম্মের দুঃসহ ভারে আজ রাজলক্ষ্মীর সর্ব্বদেহ-মনে যে বেদনার আর্ত্তনাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্বরণ করিবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই যে অশ্রান্ত বিক্ষোভ, নিজের জীবন হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার এই যে দিগ্বিহীন ব্যাকুলতা, ইহার কি কোন শেষ নাই? খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মত কি সে দিন-রাত্রি অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া মরিবে? আর সেই পিঞ্জরের লৌহ-শলাকার মত আমিই কি চিরদিন তাহার মুক্তির পথের দ্বার আগলাইয়া থাকিব? সংসারে যাহাকে কোন কিছু দিয়া কোন দিন বাঁধিতে পারিল না, সেই আমার ভাগ্যেই কি শেষে এত বড় দুর্ভোগ ভগবান লিখিয়া দিয়াছেন? আমাকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে, আমার মোহ সে কাটাইতে পারে না। ইহারই পুরস্কার দিতে কি তাহার সকল ভবিষ্যৎ সুকৃতির গায়ে নিগড় হইয়া থাকিবে?

মনে মনে বলিলাম, আমি তাহাকে ছুটি দিব—সেবারের মত নয়, এবার—একান্ত-চিত্তে, অন্তরের সমস্ত শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া চিরদিনের মত মুক্তি দিব, এবং যদি পারি সে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমি এ দেশ ছাড়িয়া যাইব। কোন প্রয়োজনে, কোন অজুহাতে সম্পদ ও বিপদের কোন আবর্ত্তনেই আর তাহার সম্মুখীন হইব না। একদিন নিজের অদৃষ্টই আমাকে এ সঙ্কল্প স্থির রাখিতে দেয় নাই, কিন্তু আর তাহার কাছে আমি কিছুতেই পরাভব মানিব না।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! একদিন পাটনা হইতে যখন বিদায়

লইয়াছিলাম পিয়ারী চুপ করিয়া তাহার দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। তখন মুখে তাহার কথা ছিল না, কিন্তু সেই নিরুদ্ধ অন্তরের অশ্রুগাঢ় ফিরিবার ডাক কি সমস্ত পথটাই আমার কানে গিয়া পুনঃ পুনঃ পোঁছে নাই? কিন্তু ফিরি নাই। দেশ ছাড়িয়া সুদূর বিদেশে চলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই যে রূপহীন ভাষাহীন দুর্ব্বার আকর্ষণ আমাকে অহর্নিশি টানিতে লাগিল, দেশ-বিদেশের ব্যবধান তাহার কাছে কতটুকু? আবার একদিন ফিরিয়া আসিলাম। বাহিরের লোকে আমার পরাজয়ের গ্লানিটাই দেখিতে পাইল, আমার মাথার অম্লানকান্ত জয়মাল্য তাহাদের চোখে পড়িল না। এমনিই হয়। আমি জানি, অচির ভবিষ্যতে আবার একদিন বিদায়ের ক্ষণ আসিয়া পড়িবে। সেদিনও হয়ত সে তেমনি নীরব হইয়াই রহিবে, কিন্তু আমার শেষ-বিদায়ের যাত্রাপথ ব্যাপিয়া সেই অশ্রুতপূর্ব্ব নিবিড় আহ্বান হয়ত আর কানে পশিবে না।

মনে মনে বলিলাম, থাকার নিমন্ত্রণ শেষ হইয়া যখন যাওয়াটাই কেবল বাকি থাকে সে কি ব্যথার বস্তু! অথচ এ ব্যথার অংশী নাই শুধু, আমারই হৃদয়ে গহ্বর খনিয়া এই নিন্দিত বেদনাকে চিরদিন একাকী থাকিতে হইবে। রাজলক্ষ্মীকে ভালবাসিবার অধিকার সংসার আমাকে দেয় নাই; এই একাগ্র প্রেম, এই হাসি-কান্না, মান-অভিমান, এই ত্যাগ, এই নিবিড় মিলন—সমস্তই লোকচক্ষে যেমন ব্যর্থ, এই আসন্ন বিচ্ছেদের অসহ দন্তর্দাহও বাহিরের দৃষ্টিতে আজ তেমনি অর্থহীন। আজ এই কথাটাই আমার সবচেয়ে বেশি বাজিতে লাগিল, একের মর্ম্মান্তিক দুঃখ যখন অপরের কাছে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার চেয়ে ট্রাজিডি পৃথিবীতে আর আছে কি! অথচ এমনিই বটে! লোকের মধ্যে বাস করিয়াও যে লোকাচার মানে নাই, বিদ্রোহ করিয়াছে, সে নালিশ করিবে গিয়া কাহার কাছে? এ সমস্যা সনাতন, শাশ্বত, পুরাতন। সৃষ্টির দিন হইতে আজি পর্য্যন্তই এই প্রশ্নই বারম্বার আবর্ত্তিয়া চলিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের গর্ভে যতদূর দৃষ্টি যায় ইহার সমাধান চোখে পড়ে না। ইহা অন্যায়, অবাঞ্ছিত। তথাপি এতবড় সম্পদ, এতবড় ঐশ্বর্য্যই কি মানুষের আর আছে? অবাধ্য নরনারীর এই অবাঞ্ছিত হৃদয়াবেগের কত নিঃশব্দ বেদনার ইতিহাসকেই না মাঝখানে রাখিয়া যুগে যুগে কত পুরাণ, কত কাহিনী, কত কাব্যেরই না অভ্রভেদী সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে?

কিন্তু আজ যদি থামিয়া যায়? মনে মনে বলিলাম, থাক্, রাজলক্ষ্মীর ধর্ম্মে মতি হোক, তাহার বক্রেশ্বরের রাস্তা সুগম হোক, তাহার মন্ত্রোচ্চারণ নিভুর্ল হোক্, আশীর্ব্বাদ করি তাহার পুণ্যার্জ্জনের পথ নিরন্তর নির্ব্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক হোক, আমার দুঃখের ভার আমি একাই বহন করিব।

পরদিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনে হইল গঙ্গামাটির এই বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাট, খোলা মাঠ, সকল বন্ধনই যেন আমার শিথিল হইয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী কবে ফিরিবে তাহার স্থির নাই, কিন্তু মন যেন আর একটা দণ্ডও এখানে থাকিতে চাহে না। স্নানের জন্য রতন তাগিদ শুরু করিয়াছে। কারণ যাইবার সময় রাজলক্ষ্মী শুধু কড়া হুকুম দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, রতনকে তাহার পা ছুঁয়াইয়া দিব্য করাইয়া লইয়াছে যে তাহার অবর্ত্তমানে আমার এতটুকু অযত্ন বা অনিয়ম না হয়। খাবার সময় সকালে এগারোটা ও রাত্রে আটটার মধ্যে ধার্য্য হইয়াছে, রতনকে প্রত্যহ ঘড়ি দেখিয়া সময় লিখিয়া রাখিতে হইবে। কথা আছে ফিরিয়া আসিয়া সে প্রত্যেককে একমাসের করিয়া মাহিনা বকশিস্ দিবে। রান্না শেষ করিয়া বামুনঠাকুর ঘর-বাহির করিতেছে এবং চাকরের মাথায় তরিতরকারি, মাছ, দুধ প্রভৃতি লইয়া প্রভাত না হইতেই যে কুশারী মহাশয় স্বয়ং আসিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা বিছানায় শুইয়া টের পাইয়াছিলাম। ঔৎসুক্য কিছুতেই আর ছিল না—বেশ, এগারোটা এবং আটটাই সই। একমাসের উপরি মাহিনা হইতে আমার জন্য তোমরা বঞ্চিত হইবে না তাহা নিশ্চিত।

কাল রাত্রে অতিশয় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, আজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই স্নানাহার শেষ করিয়া বিছানায় শুইতে না শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙ্গিল চারিটার কাছাকাছি। কয়েকদিন হইতেই নিয়মিত বেড়াইতে বাহির হইতেছিলাম, আজিও হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

দ্বারের বাহিরে একজন লোক বসিয়াছিল, সে হাতে একখানা চিঠি দিল। সতীশ ভরদ্বাজের চিঠি, কে একজন অনেক কষ্টে একছত্র লিখিয়া জানাইয়াছে, সে অত্যন্ত পীড়িত। আমি না গেলে সে মরিয়া যাইবে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে তার ?

লোকটা বলিল, কলেরা।

খুসী হইয়া কহিলাম, চল। খুসী তাহার কলেরার জন্য নয়, গৃহের সংস্রব হইতে কিছুক্ষণের জন্যও দূরে যাইবার সুযোগ মিলিল ইহাই পরম লাভ বলিয়া মনে হইল।

একবার ভাবিলাম রতনকে ডাকিয়া একটা খবর দিয়া যাই কিন্তু সময় অভাবে ঘটিয়া উঠিল না। যেমন ছিলাম, তেমনি বাহির হইয়া গেলাম, এ বাড়ির কেহ কিছু জানিতেও পারিল না।

প্রায় ক্রোশ-তিনেক পথ হাঁটিয়া শেষ-বেলায় গিয়া সতীশের ক্যাম্পে পৌঁছিলাম। ধারণা ছিল রেলওয়ে কন্‌ষ্ট্রাকশনের ইন্‌-চার্জ্জ এস. সি. ভরদ্বাজের অনেক কিছু ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইব, কিন্তু গিয়া দেখিলাম হিংসা করিবার মত কিছু নয়। ছোট একটা ছোলদারি তাঁবুতে সে থাকে, পাশেই তাহার লতা-পাতা খড়-কুটা দিয়া তৈরী কুটীরে রান্না হয়। একটি হৃষ্টপুষ্ট বাউরী মেয়ে আগুন জ্বালিয়া কি একটা সিদ্ধ করিতেছিল, আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল।

ইতিমধ্যে রামপুরহাট হইতে একজন ছোকরা গোছের পাঞ্জাবী ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে সতীশের বাল্যবন্ধু জানিয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। রোগীর সম্বন্ধে জানাইলেন যে কেস সিরিয়স নয়, প্রাণের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ট্রলি প্রস্তুত, এখনি বাহির হইতে না পারিলে হেড কোয়াটার্স পৌঁছিতে অতিশয় রাত্রি হইয়া যাইবে—ক্লেশের অবধি থাকিবে না। আমার কি হইবে সে তাঁহার ভাবিবার বস্তু নয়। কখন কি করিতে হইবে রীতিমত উপদেশ দিলেন, এবং ঠেলাগাড়িতে রওনা হইবার মুখে কি ভাবিয়া তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া গোটা দুই-তিন কৌটা ও শিশি আমার হাতে দিয়া কহিলেন, কলেরা কতকটা ছোঁয়াচে রোগের মত। ঐ ডোবার জলটা ব্যবহার করতে মানা করে দেবেন, এই বলিয়া তিনি মাটি-তোলা খাদটা হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আর যদি খবর পান কুলিদের মধ্যে কারও হয়েছে—হতেও পারে—এই ঔষধগুলো ব্যবহার করবেন। এই বলিয়া তিনি রোগের কি অবস্থায় কোন্‌টা দিতে হইবে বলিয়া দিলেন।

মানুষটি মন্দ নয়, দয়া-মায়া আছে। আমার বাল্যবন্ধু কেমন থাকেন কাল যেন তিনি খবর পান, এবং কুলিদের উপরও যেন দৃষ্টি রাখতে ভুল না হয়, আমাকে বার বার সাবধান করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ হইল ভাল। রাজলক্ষ্মী গিয়াছে বক্রেশ্বর দেখিতে, আর রাগ করিয়া আমি বাহির হইয়াছি পথে। পথেই এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ। বাল্য-কালের পরিচয়, অতএব বাল্যবন্ধু ত বটেই; তবে বছর পনের খবরাখবর ছিল না, হঠাৎ চিনিতে পারি নাই; কিন্তু দিন-দুয়ের মধ্যেই অকস্মাৎ এ কি ঘোরতর মাখামাখি! তাহার কলেরায় চিকিৎসার ভার, শুশ্রূষার ভার, মায় তাঁর শ-দেড়েক মাটিকাটা কুলির খবরদারির ভার গিয়া পড়িল আমার উপর! বাকি রহিল শুধু তাহার শোলার হ্যাট এবং টাট্টু ঘোড়াটি। আর বোধ হয় যেন ওই কুলি মেয়েটিও। তাহার মানভূমের অনির্ব্বচনীয় বাউরী ভাষার অধিকাংশই ঠেকিতে লাগিল, কেবল এটুকু ঠেকিল না যে মিনিট দশ-পনেরর মধ্যেই সে আমাকে পাইয়া অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়াছে। যাই, আর ত্রুটি রাখি কেন, ঘোড়াটিকে একবার দেখিয়া আসি গে।

ভাবিলাম আমার অদৃষ্টই এমনি। না হইলে রাজলক্ষ্মী বা আসিত কিরূপে, অভয়াই বা আমাকে দিয়া তাহার দুঃখের বোঝা বহাইত কেমন করিয়া? আর এই ব্যাঙ এবং তাহার কুলি গ্যাঙ। কোন ব্যক্তির পক্ষেই ত এ সকল ঝাড়িয়া ফেলিতে এক মুহূর্ত্তের অধিক সময় লাগিত না। আর আমিই বা সারাজীবন বহিয়া বেড়াই কিসের জন্য?

তাঁবুটা রেল কোম্পানীর। সতীশের নিজস্ব সম্পত্তির একটা তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিয়া লইলাম। কয়েকটা এনামেলের বাসন, একটা ষ্টোভ, একটা লোহার তরঙ্গ, একটা কেরোসিন তেলের বাক্স, এবং তাহার শয়ন করিবার ক্যাম্বিশের খাট, বহু ব্যবহারে ডোঙার আকার ধারণ করিয়াছে। সতীশ চালাক লোক, এ খাটে বিছানার প্রয়োজন হয় না, একখানা যা-তা হইলেই চলিয়া যায়, তাই ডোরাকাটা একখানা সতরঞ্চি ছাড়া আর কিছুই সে কেনে নাই। ভবিষ্যতে কলেরা হওয়ার কোন ব্যবস্থাই তাহার ছিল না। ক্যাম্বিশের খাটে শুশ্রূষা করার অত্যন্ত অসুবিধা, এবং একমাত্র সতরঞ্চি অতিশয় নোংরা হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তাহাকে নীচে শোয়ানো ছাড়া উপায় নাই।

আমি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। মেয়েটির নাম কালীদাসী, জিজ্ঞাসা করিলাম, কালী, কারও দু-একখানা বিছানা পাওয়া যাবে ?

কালী কহিল, না।

কহিলাম, দুটি খড়-টড় যোগাড় করে আনতে পার ?

কালী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, এখানে কি গরু আছে ?

কহিলাম, বাবুকে তা হ'লে শোয়াই কোথায় ?

কালী নির্ভয়ে মাটি দেখাইয়া কহিল, হেথাকে। উ কি বাঁচবেক ?

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল, এমন নির্ব্বিকল্প প্রেম জগতে সুদুর্ল্লভ। মনে মনে বলিলাম, কালী, তুমি ভক্তির পাত্র ! তোমার কথাগুলি শুনলে আর মোহ-মুদ্গর পাঠের আবশ্যকতা থাকে না ; কিন্তু আমার সেরূপ বিজ্ঞানময় অবস্থা নয়, লোকটা এখনও বাঁচিয়া ; কিছু একটা পাতা চাই-ই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবুর পরণের একখানা কাপড়-চোপড়ও কি নাই ?

কালী ঘাড় নাড়িল। তাহার মধ্যে দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না। সে 'বোধ হয়' বলে না। কহিল, কাপড় নেই, পেন্টুলুন আছে।

পেন্টুলুন সাহেবী জিনিষ, মূল্যবান বস্তু, কিন্তু তাহা দ্বারা শয্যারচনার কাজ চলে কিনা ভাবিয়া পাইলাম না। সহসা মনে পড়িল আসিবার সময় অদূরে একটা ছিন্ন জীর্ণ ত্রিপল দেখিয়াছিলাম, কহিলাম, চল না যাই, দুজনে ধরাধরি করে সেটা নিয়ে আসি। পেন্টুলুন পাতার চেয়ে সে ভাল হবে।

কালী রাজী হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তখনও তাহা পড়িয়া ছিল, আনিয়া তাহাতেই সতীশ ভরদ্বাজকে শোয়াইয়া দিলাম। তাহারই একধারে কালী অত্যন্ত সবিনয়ে স্থান লইল, এবং দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ধারণা ছিল, মেয়েদের নাক ডাকে না। কালী তাহারও অপ্রমাণ করিয়া দিল।

আমি একাকী সেই কেরোসিন বাক্সের উপর বসিয়া। এদিকে সতীশের হাতে পায়ে ঘন ঘন খিল ধরিতেছে, সেক-তাপের প্রয়োজন, বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া কালীকে তুলিলাম, সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া জানাইল কাট-কুটা নাই, সে আগুন জ্বালিবে কি দিয়া ? নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিতাম, কিন্তু

আলোর মধ্যে সম্বল এই হ্যারিকেনটি লণ্ঠনটি। তথাপি একবার রান্নাঘরে গিয়া খোঁজ করিয়া দেখিলাম, কালী মিথ্যা বলে নাই। এই কুটীরটা ছাড়া অগ্নি সংযোগ করিতে পারি এরূপ দ্বিতীয় বস্তু নাই; কিন্তু সাহস হইল না, পাছে প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে সৎকার করিয়া ফেলি! ক্যাম্প-খাট এবং কেরোসিনের বাক্স বাহিরে আনিয়া দেশলাই জ্বালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইলাম, নিজের জামা খুলিয়া পুটুলির মত করিয়া কিছু কিছু সেক্ দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া রোগীর কোন উপকারই তাহাতে হইল না।

রাত্রি দুটাই হইবে কি তনট হইবে খবর আসিল জন-দুই কুলির ভেদ-বমি হইতেছে। তাহারা আমাকে ডাক্তারবাবু বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহাদেরই আলোর সাহায্যে ঔষধপত্র লইয়া কুলি লাইনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মালগাড়ীতে তাহারা থাকে। ছাদ-বিহীন খোলা ট্রাকের সারি লাইনের উপর দাঁড়াইয়া আছে, মাটিকাটার প্রয়োজন হইলে ইঞ্জিন জুড়িয়া দিয়া তাহাদের গম্য স্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

বাঁশের মই দিয়া ট্রাকের উপর উঠিলাম। একধারে একজন বুড়োগোছের লোক শুইয়া আছে, তাহার মুখের পরে আলো পড়িতেই বুঝা গেল রোগ সহজ নয়, ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অন্য ধারে জন পাঁচ-সাত লোক, স্ত্রী পুরুষ দুইই আছে, কেহ বা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কাহারও বা তখন পর্য্যন্ত সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই।

ইহাদের জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেশ বাঙলা বলিতে পারে, জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একজন রোগী কই?

সে অন্ধকারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আর একখানা ট্রাক দেখাইয়া কহিল, উখানে।

পুনরায় মই দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এবার একজন স্ত্রীলোক। বয়স পঁচিশ-ত্রিশের অধিক নয়, গুটি-দুই ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে তাহার পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। স্বামী নাই, সে গত বৎসর আড়কাঠির পাল্লায় পড়িয়া আর একটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের স্ত্রীলোক লইয়া আসামে চাবাগানে কাজ করিতে গিয়াছে।

এ গাড়ীতে আরও জন পাঁচ-ছয় স্ত্রী-পুরুষ ছিল, তাহারা একবাক্যে উহার পাষণ্ড স্বামীর নিন্দা করা ছাড়া আমার বা রোগিণীর কোন সাহায্যই করিল না। পাঞ্জাবী ডাক্তারের শিক্ষামত উভয়কেই ঔষধ দিলাম, শিশু দুটাকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কাহাকেও তাহাদের ভার লইতে স্বীকার করাইতে পারিলাম না।

সকাল নাগাদ আর একটা ছেলের ভেদ-বমি সুরু হইল, ওদিকে সতীশ ভরদ্বাজের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইয়াই আসিতেছে। বহু সাধ্য-সাধনায় একজনকে পাঠাইলাম সাঁইথিয়া ষ্টেশনে পাঞ্জাবী ডাক্তারকে খবর দিতে। সে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তিনি আর কোথাও গিয়াছেন রোগী দেখিতে।

আমার সবচেয়ে মুস্কিল হইয়াছিল সঙ্গে টাকা ছিল না! নিজে ত কাল হইতে উপবাসে আছি। নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, কিন্তু সে না হয় হইল, কিন্তু জল না খাইয়া বাঁচি কিরূপে? সুমুখের খাদের জল ব্যবহার করিতে সকলকেই নিষেধ করিয়া দিলাম, কেহই কথা শুনিল না। মেয়েরা মৃদু হাস্যে জানাইল, এ ছাড়া জল আর আছে কোথায় ডাক্তার? কিছুদূরে গ্রামের মধ্যে জল ছিল, কিন্তু যায় কে? তাহারা মরিতে পারে, কিন্তু বিনা পয়সায় এই ব্যর্থ কাজ করিতে রাজী নয়।

এমনি করিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ট্রাকের উপরেই আমাকে দিন দুই তিন বাস করিতে হইল। কাহাকেও বাঁচাইতে পারিলাম না, সব কয়টাই মরিল, কিন্তু মরাটাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার নয়। মানুষ জন্মাইলেই মরে, কেহ দুদিন আগে, কেহ দুদিন পরে—এ আমি সহজ এবং অত্যন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারি। বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়া পাই না এই মোটা কথা বুঝিবার জন্য এত শাস্ত্রালোচনা, এত বৈরাগ্য-সাধনা, এত প্রকারের তত্ত্ববিচারের প্রয়োজন হয় মানুষের কিসের জন্য। সুতরাং মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতেই পারি না।

পরদিন সকালে ভরদ্বাজের দেহত্যাগ হইল। লোকাভাবে দাহ করা গেল না, মা ধরিত্রী তাহাকে কোলে স্থান দিলেন।

ও-দিকের কাজ মিটাইয়া ট্রাকে ফিরিয়া আসিলাম। না আসিলেই ছিল

ভাল, কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। জনারণ্যের মাঝখানে রোগীদের লইয়া আমি নিছক একাকী। সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের মধ্যেই সঞ্চিত হইয়া গেল। প্রথম সূর্য্যতাপে চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহারই মাঝে ত্রিপলের নীচে রোগীদের লইয়া আমি একা। ছোট ছেলেটা যে কি দুঃখই পাইতে লাগিল তাহার অবধি নাই, অথচ এক ভাঁড় জল দিবার পর্য্যন্ত কেহ নাই। সরকারি কাজ, মাটি-কাটা বন্ধ থাকিতে পারে না, হপ্তার শেষে মাপ করিয়া তাহার মজুরি মিলিবে। অথচ তাহাদেরই স্বজাতি, তাহাদেরই ত ছেলে! গ্রামের মধ্যে দেখিয়াছি, কিছুতেই ইহারা এমনধারা নয়; কিন্তু এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে সর্ব্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লোকগুলাকে কেবলমাত্র উদয়াস্ত মাটি-কাটার জন্যই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ট্রাকের উপর জমা হইয়াছে, এইখানেই তাহাদের মানব-হৃদয়-বৃত্তি বলিয়া আর কোথাও কিছু বাকি নাই! শুধু মাটি-কাটা, শুধু মজুরি। সভ্য মানুষে এ কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।

ভরদ্বাজ গিয়াছে, কিন্তু তাহার অমর-কীর্ত্তি তাড়ির দোকান অক্ষয় হইয়া আছে। সন্ধ্যাবেলায় নরনারী নির্বিশেষে মাতাল হইয়া দলে দলে ফিরিয়া আসিল, দুপুরবেলার রাঁধা ভাত হাঁড়িতে জল দেওয়া আছে, এ হাঙ্গামাটাও এ-বেলায় মেয়েদের নাই। তাহার পরে কে বা কাহার কথা শুনে। জমাদারের গাড়ী হইতে ঢোল ও করতাল সহযোগে প্রবল সঙ্গীতচর্চ্চা হইতে লাগিল, সে যে কখন থামিবে ভাবিয়া পাইলাম না। কাহারও জন্য আমাদের মাথাব্যথা নাই। আমার ঠিক পাশের ট্রাকেই কে একটা মেয়ের বোধ হয় জনদুই প্রণয়ী জুটিয়াছে, সারা রাত্রি ধরিয়া তাহাদের উদ্দাম প্রেমলীলার বিরাম নাই; এদিকে ট্রাকে এক ব্যাটা কিছু অধিক তাড়ি খাইয়াছে; সে এমনি উচ্চ কলরোলে স্ত্রীর কাছে প্রণয় ভিক্ষা করিতে লাগিল যে আমার লজ্জার সীমা রহিল না। দূরের একটা গাড়ী হইতে কে একজন স্ত্রীলোক মাঝে মাঝে বিলাপ করিতেছিল, তাহার মা ঔষধ চাহিয়া আসায় খবর পাইলাম কামিনীর সন্তান-সম্ভাবনা

হইয়াছে। লজ্জা নাই, সরম নাই, গোপনীয় কোথাও কিছু নাই—সমস্ত খোলা, সমস্ত অনাবৃত। জীবনযাত্রার অবাধ গতি বীভৎস প্রকাশ্যতায় অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে! শুধু আমিই কেবল দল ছাড়া। আসন্ন মৃত্যু-লোকযাত্রী মা ও তাহার ছেলেকে একাকী লইয়া গভীর আঁধার রাত্রে বসিয়া আছে।

ছেলেটা বলিল, জল?

মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিলাম, জল নেই বাবা, সকাল হোক।

ছেলেটা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা। তার পরে চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে রহিল।

তৃষ্ণার জল না থাক্‌, কিন্তু আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। হায় রে, হায়! শুধু কেবল মানবের স্থকুমার হৃদয়-বৃত্তিই নয়, নিজের সুদুঃসহ যাতনার প্রতিও কি অপরিসীম ঔদাসীন্য! এই ত পশু! এ ধৈর্য্য-শক্তি নয়, জড়তা। এ সহিষ্ণুতা মানবতার ঢের নীচের স্তরের বস্তু।

আমাদের ট্রাকে অন্য লোকগুলো অকারণে ঘুমাইতেছে। কালিপড়া হ্যারিকেনের অত্যন্ত মলিন আলোকে আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম মা ও ছেলে উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া খিল ধরিয়াছে; কিন্তু কি-ই বা আমার করিবার ছিল।

সম্মুখে কালো আকাশের অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, সেদিকে চাহিয়া আমি বেদনায়, ক্ষোভে ও নিষ্ফল আক্ষেপে বার বার করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর; কিন্তু যে নির্ম্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস্‌ না! যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।

বারো

সকালে খবর পৌঁছিল আর দুই জন পীড়িত হইয়াছে। ঔষধ দিলাম, জমাদার সাঁইথিয়ায় সংবাদ পাঠাইয়া দিল। আশা করিলাম, এবার কর্তৃপক্ষের আসন টলিবে।

বেলা নয়টা আন্দাজ ছেলেটা মরিল। ভালই হইল। এই ত ইহাদের জীবন।

সম্মুখের মাঠের পথ দিয়া দুই জন ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়াছিলেন; কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে গ্রাম কত দূরে?

যিনি বৃদ্ধ, তিনি মুখটা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন, ঐ যে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, খাবার জিনিষ কিছু মেলে?

অন্যজন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, মেলে না কি রকম! ভদ্রলোকের গ্রাম—চাল, ডাল, ঘি, তেল, তরি-তরকারি যা খুসী আপনার। আসছেন কোথা থেকে? নিবাস? মশায়, আপনারা?

সংক্ষেপে তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া সতীশ ভরদ্বাজের নাম করিতেই উভয়ে রুষ্ট হইয়া উঠিলেন; বৃদ্ধ বলিলেন, মাতাল, বদমাইস, জোচ্চোর!

তাঁহার সঙ্গী কহিলেন, রেলের লোক আর কত ভাল হবে। কাঁচা পয়সাটা বেশ হাতে ছিল কি না!

প্রত্যুত্তরে সতীশের টাটকা কবরের ঢিপিটা আমি হাত দিয়া দেখাইয়া জানাইলাম, এখন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা। কাল সে মরিয়াছে, লোকাভাবে দাহ করিতে পারা যায় নাই, ঐখানে মাটি দিতে হইয়াছে।

বলেন কি! বামুনের ছেলেকে—

কিন্তু উপায় কি?

শুনিয়া উভয়েই ক্ষুব্ধ হইয়া জানাইলেন যে, ভদ্রলোকের গ্রামে একটুখানি খবর পাইলে যা হোক একটা উপায় নিশ্চয় হইয়া যাইত। একজন প্রশ্ন করিলেন, আপনি তাঁর কে?

বলিলাম, কেউ না। সামান্য পরিচয় ছিল মাত্র। এই বলিয়া কি করিয়া এখানে জুটিলাম সংক্ষেপে তাহারই বিবরণ দিলাম। দুই দিন খাওয়া হয় নাই, অথচ কুলিদের মধ্যে কলেরা সুরু হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছি না।

খাওয়া হয় নাই শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং সঙ্গে যাইবার জন্য বারম্বার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং এই ভয়ানক ব্যাধির মধ্যে খালি পেটে থাকা যে মারাত্মক ব্যাপার তাহাও একজন জানাইয়া দিলেন।

বেশী বলিতে হইল না, ক্ষুৎপিপাসায় মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছিলাম—তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম। পথে এই বিষয়েই আলাপ হইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ের লোক, সহরের শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু মজা এই যে, ইংরাজ রাজত্বের খাঁটি পলিটিক্সটুকু তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত নয়। এ যেন দেশের লোকে দেশের মাটি হইতে, জল হইতে, আকাশ হইতে, বাতাস হইতে অস্থি-মজ্জা দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

উভয়েই কহিলেন, সতীশ ভরদ্বাজের দোষ নেই মশায়, আমরা হলেও ঠিক অমনি হয়ে উঠতাম। কোম্পানী বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সে-ই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি এঁদের ছোঁয়াচের গুণ।

ক্ষুধার্ত্ত ও একান্ত ক্লান্তদেহে অধিক কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা রেললাইন পাতবার ? কোন লোকে কি চায় ? চায় না ; কিন্তু তবু চাই। দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায় ; কোথাও একটু ভাল খাবার জল থাকলে কি সতীশবাবুই মারা যেতেন ? কখ্‌খনো না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, হর-রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা ! কর্ত্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে ! কি বলেন মশাই ? ঠিক নয় ?

আলোচনা করিবার মত গলায় জোর ছিল না বলিয়াই শুধু ঘাড় নাড়িয়া

নিঃশব্দে সায় দিয়া মনে মনে সহস্রবার বলিতে লাগিলাম, এই, এই, এই! কেবলমাত্র এই জন্যই তেত্রিশ কোটী নরনারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীয় শাসনতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুদ্ধ-মাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধন-ভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্ব্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিবসহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার যো নাই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার এই চিন্তাতেই যেন বাক্য যোজনা করিয়া কহিলেন, মশাই, ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে আমি মানুষ, আগেই বিশ ক্রোশের মধ্যে রেলগাড়ী ছিল না, তখন কি সস্তা, আর কি প্রচুর জিনিষ-পত্রই না সেখানে ছিল। তখন কারও কিছু জন্মালে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তার একটু ভাগ পেত—এখন থোড়, মোচা, উঠানের দুআঁটি শাক পর্য্যন্ত কেউ কাউকে দিতে চায় না, বলে, থাক্, সাড়ে আটটার গাড়ীতে পাইকেরের হাতে তুলে দিলে দু'পয়সা আসবে। এখন দেওয়ার নাম হয়েছে অপব্যয়—মশাই, দুঃখের কথা বলতে কি, পয়সা করার নেশায় মেয়ে-পুরুষে সবাই যেন একেবারে ইতর হয়ে গেছে।

আর আপনারাই কি প্রাণভরে ভোগ করতে পায়? পায় না! শুধু ত আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী নয়, নিজেদেরও সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা পাওয়াটাই হয়েছে যেন তাদের একটি মাত্র পরমার্থ।

এই সমস্ত অনিষ্টের গোড়া হচ্ছে এই রেলগাড়ী। শিরার মত দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলের রাস্তা যদি না ঢুকতে পেত, খাবার জিনিষ চালান দিয়ে পয়সা রোজগারের এত সুযোগ না থাকতো, আর সেই লোভে মানুষ যদি এমন পাগল হয়ে না উঠত এত দুর্দ্দশা দেশের হ'ত না।

রেলের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগও কম নহে। বস্তুতঃ যে ব্যবস্থায় মানুষের জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য-সম্ভার প্রতিদিন অপহৃত হইয়া সৌখীন আবর্জ্জনায় সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা না জন্মিয়াই পারে না। বিশেষতঃ দরিদ্র মানবের যে দুঃখ ও

যে হীনতা এইমাত্র চোখে দেখিয়া আসিলাম, কোন যুক্তি-তর্ক দিয়াই তাহার উত্তর মিলে না, তথাপি কহিলাম, আবশ্যকের অতিরিক্ত জিনিষগুলো অপচয় না ক'রে যদি বিক্রী হয়ে অর্থ আসে সে কি নিতান্তই মন্দ ?

ভদ্রলোক লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হাঁ নিতান্ত মন্দ, নিছক অকল্যাণ।

ইহার ক্রোধ ও ঘৃণা আমার অপেক্ষা ঢের বেশী প্রচণ্ড। বলিলেন, এই অপচয়ের ধারণাটা আমার বিলাতের আমদানী, ধর্ম্মস্থান ভারতবর্ষের মাটিতে এর জন্ম হয়নি, জন্ম হতেই পারে না। মশাই, মাত্র নিজের প্রয়োজনটুকুই কি একমাত্র সত্য ? যার নেই তার প্রয়োজন মিটানোর কি কোন মূল্যই পৃথিবীতে নেই ? সেটুকু বাইরে চালান দিয়ে অর্থ সঞ্চয় না করাই হ'ল অপচয়, হ'ল অপরাধ ? এই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর উক্তি আমাদের মুখ দিয়ে বার হয়নি, বার হয়েছে তাদের, যারা বিদেশ থেকে এসে দুর্ব্বলের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার দেশব্যাপী জালে ফাঁসের পরে ফাঁস যোজনা করে চলেছে।

বলিলাম, দেখুন, দেশের অন্ন বিদেশে বার করে নিয়ে যাবার আমি পক্ষপাতী নই, কিন্তু একের উদ্‌বৃত্ত অন্নে অপরের চিরদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে থাকবে এইটেই কি মঙ্গলের ? তা ছাড়া বাস্তবিক বিদেশ থেকে এসে ত তারা জোর করে কেড়ে নিয়ে যায় না ? অর্থ দিয়ে কিনে নিয়েই ত যায় ?

ভদ্রলোক তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, হাঁ, কিনেই বটে! বঁড়শিতে টোপ গেঁথে জলে ফেলা যেমন মাছের সাদর নিমন্ত্রণ!

এই ব্যঙ্গোক্তির আর উত্তর দিলাম না। কারণ একে ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রান্তিতে বাদানুবাদের শক্তি ছিল না, অপিচ তাঁহার বক্তব্যের সহিত মূলতঃ আমার বিশেষ মতভেদও ছিল না।

কন্তু আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি অকস্মাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং আমাকেই প্রতিপক্ষ জ্ঞানে অত্যন্ত উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন, মশাই, ওদের উদ্দাম বণিকবুদ্ধির তত্ত্ব কথাটুকুকেই সার সত্য বলে বুঝে আছেন, কিন্তু আসলে এতবড় অসৎ বস্তু পৃথিবীতে আর নেই, ওরা জানে শুধু ষোল আনার পরিবর্ত্তে চৌষট্টি পয়সা গুণে নিতে—ওরা

বোঝে কেবল দেনা আর পাওনা—ওরা শিখেছে শুধু ভোগটাই মানব জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বলে স্বীকার করতে। তাই ত ওদের পৃথিবী-জোড়া সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্যসন জগতের সমস্ত কল্যাণ আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। মশাই, এই রেল, এই কল, এই লোহা-বাঁধানো রাস্তা—এই ত হ'ল পবিত্র vested interest—এই গুরুভারেই ত সংসারে কোথাও গরীবের নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই!

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি বলেছিলেন একের প্রয়োজনে অতিরিক্ত বস্তুটুকু চালান দেবার সুযোগ না থাকলে হয় নষ্ট হ'ত, না হয় অভাবগ্রস্তেরা বিনামূল্যে খেত। একেই অপচয় বলছিলেন না?

কহিলাম, হাঁ, তার পক্ষে অপচয় বৈ কি।

বৃদ্ধ প্রত্যুত্তরে অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, এ সব বিলাতী বুলি, অর্ব্বাচীন অধার্ম্মিকের অজুহাত। কারণ, আর একটু যখন বেশী চিন্তা করতে শিখবেন, তখন আপনারই সন্দেহ হবে বাস্তবিক এইটেই অপচয়, না দেশের শস্য বিদেশে রপ্তানি করে ব্যাঙ্কে টাকা জমানোই বেশী অপচয়! দেখুন মশাই, চিরদিনই আমাদের গ্রামে গ্রামে জন-কতক উদ্যমহীন, উপার্জ্জন-বিমুখ উদাসীন প্রকৃতির লোক থাকত, তাদের মুদি-ময়রার দোকানে দাবা পাশা খেলে, মড়া পুড়িয়ে, বড় লোকের আড্ডায় গান-বাজনা ক'রে, বারওয়ারীতলায় মুড়ুলী করে, আরও—এমনি সব অকাজেই দিন কাটত। তাদের সকলেরই যে ঘরের মধ্যে অন্ন-সংস্থান থাকত তা নয়, তবু অনেকের উদ্বৃত্ত অংশেই তাদের সুখে দুঃখে দিন চলে যেত। আপনাদের অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষিতদের যত আক্রোশ তাদের 'পরেই ত? যাক, চিন্তার হেতু নেই, এই সব অলস, অকেজো, পরাশ্রিত মানুষগুলো এখন লোপ পেয়েছে কারণ উদ্বৃত্ত বলে ত আর কোথাও কিছু নেই, সুতরাং, হয় অন্নাভাবে মরেছে, না হয়, কোথাও গিয়ে কোন ছোট দাস্য-বৃত্তিতে ভর্ত্তি হয়ে জীবন্মৃত-ভাবে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে। মেহন্নতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবন-সংগ্রাম বুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু আমার মত যাদের বেশী বয়স হয়েছে তারাই জানে কি গেছে! জীবন-সংগ্রাম তাদের বিলুপ্ত করেছে—কিন্তু সমস্ত গ্রামের আনন্দটুকুও যেন তাদের সঙ্গে সহমরণে গেছে!

এই শেষ কথাটায় চকিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলাম। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাকে অল্পশিক্ষিত, সাধারণ গ্রাম্য ভদ্রলোক ব্যতীত কিছুই বেশী মনে হইল না—অথচ বাক্য যেন তাঁহার অকস্মাৎ আপনাকে অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া গেল।

তাঁহার সকল কথাকেই যে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম তাহা নয়, কিন্তু অস্বীকার করিতেও বেদনা বোধ করিলাম। কেমন যেন সংশয় জন্মিল, এ সকল বাক্য তাঁহার নিজের নয়, এ যেন অলক্ষিতে আর কাহারও জবানী।

অতিশয় সঙ্কোচের সহিত প্রশ্ন করিলাম, কিছু যদি মনে না করেন—

না না, মনে করব কেন, বলুন ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এ সকল কি আপনার নিজেরই অভিজ্ঞতা, নিজেরই চিন্তার ফল ?

ভদ্রলোক রাগ করিলেন। বলিলেন, কেন, এসব মিথ্যে নাকি ? একটি অক্ষরও মিথ্যে নয় জানবেন।

না না, মিথ্যে ত বলি নি, তবু—

তবু আবার কি ? আমাদের স্বামিজী কখনো মিথ্যে উচ্চারণ করেন না। তাঁর মত জ্ঞানী কেউ আছে নাকি ?

প্রশ্ন করিলাম, স্বামিজী কে ?

ভদ্রলোকের সঙ্গীটি ইহার উত্তর দিলেন। কহিলেন, স্বামী বজ্রানন্দ। বয়সে কম হলে কি হয়, অগাধ পণ্ডিত, অগাধ—

তাঁকে আপনারা চেনেন নাকি ?

চিনি নে ? বেশ। তিনি আমাদের আপনার লোক বললেই যে হয় ? এঁর বাড়ীতেই যে তাঁর প্রধান আড্ডা! এই বলিয়া তিনি সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া কহিলেন, আড্ডা ব'লো না নরেন, বল, আশ্রম। মশাই, আমি গরীব, যা পারি তাঁর সেবা করি ; কিন্তু এ যেন বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ! মানুষ ত নয়, মানুষের আকৃতিতে দেবতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সম্প্রতি কতদিন আছেন আপনাদের গ্রামে ?

নরেন কহিলেন, প্রায় মাস-দুই হবে। এ অঞ্চলে না আছে একটা ডাক্তার-বদ্যি, না আছে একটা ইস্কুল। এর জন্যেই তাঁর যত পরিশ্রম। আবার নিজেও একজন মস্ত ডাক্তার।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হইল। ইনিই সেই আনন্দ। সাঁইথিয়া ষ্টেশনে আহারাদি করাইয়া রাজলক্ষ্মী যাহাকে পরম সমাদরে গঙ্গামাটিতে আনিয়াছিল। সেই বিদায়ের ক্ষণটি মনে পড়িল। রাজলক্ষ্মীর সে কি কান্না! পরিচয় ত মাত্র দুদিনের, কিন্তু কত বড় স্নেহের বস্তুকেই যেন চোখের আড়ালে কোন্ ভয়ানক বিপদের মুখে পাঠাইয়া দিতেছে এমনি তাহার ব্যথা। ফিরিয়া আসিবার সে কি ব্যাকুল অনুনয়; কিন্তু আনন্দ সন্ন্যাসী! তাহার মমতাও নাই, মোহও নাই। নারী-হৃদয়ের বেদনার রহস্য তাহার কাছে মিথ্যা বই আর কিছুই নয়! তাই এতদিন এত কাছে থাকিয়াও অপ্রয়োজনে দেখা দিবার প্রয়োজন সে পলকের জন্যও অনুভব করে নাই, এবং ভবিষ্যতে হয় ত কখনও এই প্রয়োজনের হেতু আসিবে না; কিন্তু রাজলক্ষ্মী এ কথা শুনিলে যে কত বড় আঘাত পাইবে সে শুধু আমি জানি।

নিজের কথা মনে পড়িল। আমারও বিদায়ের মুহূর্ত্ত আসন্ন হইয়া আসিয়াছে—যাইতেই হইবে তাহা প্রতিনিয়তই উপলব্ধি করিতেছি—আমার প্রয়োজন রাজলক্ষ্মীর সমাপ্ত হইয়া আসিতেছে, কেবল ইহাই ভাবিয়া পাই না, সেদিনের দিনান্তটা রাজলক্ষ্মীর কোথা দিয়া কেমন করিয়া অবসান হইবে।

গ্রামে পৌঁছিলাম। নাম মামুদপুর। বৃদ্ধ যাদব চক্রবর্ত্তী তাহারই উল্লেখ করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, নাম শুনে চমকাবেন না মশাই, আমাদের চতুঃসীমানার মধ্যে মুসলমানের ছায়াটুকু পর্য্যন্ত মাড়াতে হয় না। যেদিকে তাকান ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর সৎজাত। অনাচরণীয় জাতের বসতি পর্য্যন্ত নেই। কি বল নরেন, আছে?

নরেন সানন্দে সায় দিয়া বারম্বার মাথা নাড়িয়া কহিল, একটিও না, একটিও না। তেমন গাঁয়ে আমরা বাস করি নে।

হইতে পারে সত্য, কিন্তু এত খুসী হইবারই বা কি আছে, ভাবিয়া পাইলাম না।

চক্রবর্ত্তী-গৃহে বজ্রানন্দের সাক্ষাৎ মিলিল। হাঁ, তিনিই বটে। আমাকে দেখিয়া তাঁর যেমন বিস্ময়, তেমনি আনন্দ।

দাদা যে! হঠাৎ এখানে? এই বলিয়া আনন্দ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। এই নর-দেহধারী দেবতাকে সসম্মানে অভিবাদন করিতে দেখিয়া চক্রবর্ত্তী বিগলিত হইয়া গেলেন। আশে-পাশে আরও অনেকগুলি ভক্ত ছিলেন, তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি যেই হই, সামান্য ব্যক্তি যে নয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সংশয় রহিল না।

আনন্দ কহিল, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে, দাদা?

উত্তর দিলেন চক্রবর্ত্তী। আমার যে দিন-দুই আহার নিদ্রা ছিল না, এবং বহু পুণ্যফলেই শুধু বাঁচিয়া আসিয়াছি, ইহাই ব্যক্ত করিয়া কুলিদের মধ্যে মড়কের বিবরণ এমনি সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন, যে আমার পর্য্যন্ত তাক লাগিয়া গেল।

আনন্দ বিশেষ কোন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া, অপরের কান বাঁচাইয়া কহিলেন, এতটা দুদিনের উপবাসে হয় না দাদা, একটু দীর্ঘকালের দরকার। কি হয়েছিল? জ্বর?

বলিলাম, আশ্চর্য্য নয়। ম্যালেরিয়া ত আছেই।

চক্রবর্ত্তী আতিথ্যের ত্রুটি করিলেন না, খাওয়াটা আজ ভাল রকমই হইল।

আহারান্তে প্রস্থানের আয়োজন করিতে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি হঠাৎ কুলিদের মধ্যে জুটেছিলেন কি ক'রে?

বলিলাম, দৈবের চক্রান্তে।

আনন্দ সহাস্যে কহিলেন, চক্রান্তই বটে। রাগের মাথায় বাড়ীতে বোধ হয় খবরও দেন নি?

বলিলাম, না; কিন্তু সে রাগ করে নয়। দেওয়া বাহুল্য বলেই দিই নি। তা ছাড়া লোকই বা পেতাম কোথায়?

আনন্দ বলিলেন, সে একটা কথা; কিন্তু আপনার ভাল-মন্দ দিদির কাছে বাহুল্য হয়ে উঠলো কবে থেকে? তিনি হয়ত ভয়ে-ভাবনায় আধমরা হয়ে গেছেন।

কথা বাড়াইয়া লাভ নাই—এ প্রশ্নের আর জবাব দিলাম না। আনন্দ স্থির করিলেন জেরায় আমাকে একেবারে জব্দ করিয়া দিয়াছেন। তাই স্নিগ্ধ-মৃদুহাস্যে ক্ষণকাল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়া কহিলেন, আপনার রথ প্রস্তুত, বোধ করি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী গিয়ে পৌঁছতে পারবেন। আসুন, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি।

বলিলাম, কিন্তু বাড়ী যাবার পূর্ব্বে কুলিদের একটু খবর নিয়ে যেতে হবে।

আনন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তার মানে রাগ এখনো পড়ে নি; কিন্তু আমি বলি, দৈবের ষড়যন্ত্রে দুর্ভোগ যা কপালে ছিল তা ফলেছে। আপনি ডাক্তারও নন, সাধুবাবাও নন, গৃহী লোক। এখন খবর নেবার যদি কিছু থাকে ত সে ভার আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যান, কিন্তু গিয়ে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তাঁর আনন্দ ভাল আছে।

দ্বারে গরুর গাড়ী তৈরী ছিল। গৃহস্বামী চক্রবর্ত্তী আসিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন, এদিকে আর যদি কখনো আসা হয় এ বাড়ীতে যেন পদধূলি দিয়ে যান। তাঁহার আন্তরিক আতিথ্যের জন্য সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু দুর্ল্লভ পদধূলির আশা দিতে পারিলাম না। বাঙলাদেশ আমাকে অচিরে ছাড়িয়া যাইতে হইবে এ কথা মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিলাম, সুতরাং কোন দিন কোন কারণেই এ প্রদেশে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা আমার পক্ষে সুদূরপরাহত।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে আনন্দ ছইয়ের মধ্যে মাথা গলাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, দাদা, এ দিকের জল-বাতাস আপনার সইছে না। আমার হয়ে দিদিকে বলবেন, পশ্চিম মুলুকের মানুষ আপনি, আপনাকে যেন তিনি সে দেশেই নিয়ে যান।

বলিলাম, এ দেশে কি মানুষ বাঁচে না আনন্দ?

প্রত্যুত্তরে আনন্দ লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কহিলেন, না; কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করে কি হবে দাদা, শুধু আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধটা তাঁকে জানাবেন। বলবেন, আনন্দ-সন্ন্যাসীর চোখ নিয়ে না দেখলে এর সত্যতা বোঝা যাবে না।

মৌন হইয়া রহিলাম। কারণ রাজলক্ষ্মীকে এ অনুরোধ জানানো যে আমার পক্ষে কত কঠিন আনন্দ তাহার কি জানে?

গাড়ী ছাড়িলে তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কই, আমাকে ত একবারও যাবার নিমন্ত্রণ করলেন না দাদা ?

মুখে বলিলাম, তোমার কত কাজ, তোমাকে নিমন্ত্রণ করা কি সোজা ভাই ; কিন্তু মনে মনে আশঙ্কা ছিল ইতিমধ্যে পাছে কোনদিন তিনি নিজেই গিয়া উপস্থিত হয়। এই তীক্ষ্ণ-ধী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি হইতে তখন কিছুই আর আড়ালে রাখিবার যো থাকিবে না। একদিন তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না, মনে মনে হাসিয়া বলিতাম, আনন্দ, এ জীবনের অনেক কিছুই বিসর্জ্জন দিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব না, কিন্তু আমার লোকসানের সেই সহজ হিসাবটাই শুধু দেখিতে পাইলে, কিন্তু তোমার দেখার বাহিরে যে আমার সঞ্চয়ের অঙ্কটা একেবারে সংখ্যাতীত হইয়া রহিল ! মৃত্যু-পারের সে পাথেয় যদি আমার জমা থাকে এ দিকের কোন ক্ষতিকেই আমি গণনা করিব না ; কিন্তু আজ ? বলিবার কথা কি ছিল ? তাই নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া চক্ষের পলকে মনে হইল ঐশ্বর্য্যের সেই অপরিমেয় গৌরব যদি সত্যই আজ মিথ্যা মরীচিকায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে ত এই গলগ্রহ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য, অবাঞ্ছিত গৃহস্বামীর ভাগ্যে অতিথি আহ্বান করিবার বিড়ম্বনা যেন না আর ঘটে।

আমাকে নীরব দেখিয়া আনন্দ তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, আচ্ছা, নূতন করে না-ই যেতে বললেন, আমার সাবেক নিমন্ত্রণ পুঁজি আছে, আমি সেই দাবীতেই হাজির হতে পারব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কাজটা কি নাগাদ হতে পারবে ?

আনন্দ হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই দাদা, আপনাদের রাগ পড়বার ভেতরে গিয়ে উত্ত্যক্ত করব না—তার পরেই যাব।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। রাগ করিয়া যে আসি নাই তাহা বলিতেও ইচ্ছা হইল না।

পথ কম নয়, গাড়োয়ান ব্যস্ত হইতেছিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিলে তিনি আর একবার নমস্কার করিয়া মুখ সরাইয়া লইলেন।

এ অঞ্চলে যান-বাহনের প্রচলন নাই, সে উদ্দেশ্যে পথ তৈরী করিয়াও কেহ রাখে নাই, গো-শকট মাঠ ভাঙ্গিয়া, উঁচু-নীচু খানা-খন্দ অতিক্রম করিয়া যদৃচ্ছা চলিতে লাগিল। ভিতরে অর্দ্ধশায়িতভাবে পড়িয়া আনন্দ সন্ন্যাসীর

কথার সুরটাই আমার কানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাগ করিয়া আসি নাই, ও বস্তুটা লাভেরও নয়—লোভেরও নয়, কিন্তু কেবলি মনে হইতে লাগিল—এও যদি সত্য হইত; কিন্তু সত্য নয়, সত্য হইবার পথ নাই। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, রাগ করিব কাহার উপরে? কিসের জন্য? কি তাহার অপরাধ? ঝরণার জলধারার অধিকার লইয়াই বিবাদ করা চলে, কিন্তু উৎস মুখে জলই যদি শেষ হইয়া থাকে ত শুষ্ক খাদের বিরুদ্ধে মাথা খুঁড়িয়া মরিব কোন্ ছলনায়?

এমনি করিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়াছিল হুঁস করি নাই। হঠাৎ খালের মধ্যে গাড়ী গড়াইয়া পড়ায় ঝাঁকানি খাইয়া উঠিয়া বসিলাম। সুমুখের চটের পর্দ্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম সন্ধ্যা হয় হয়। গাড়ীর চালকটি ছেলেমানুষ, বোধ করি বছর পনেরর বেশী হইবে না। বলিলাম, ওরে, এত জায়গা থাকতে খানায় নামালি কেন?

ছেলেটি তাহার রাঢ় দেশের ভাষায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, নামবো কিসের তরে? বলদ আপনি নেমে গেল।

নেমে গেল কি রে? তুই কি গরু সামলাতে পারিস্ নে?

না। বলদ নতুন যে।

খুব ভাল; কিন্তু এদিকে যে অন্ধকার হয়ে এল, গঙ্গামাটি আর কতদূরে?

তার কি জানি! গঙ্গামাটি কখনো আসছি নাকি?

বলিলাম, কখনো যদি আসনি বাবা, তবে আমার উপরেই বা এত প্রসন্ন হলে কেন? কাউকে জিজ্ঞাসা কর্ না রে, গঙ্গামাটি আর কত দূরে?

উত্তরে সে কহিল, এদিকে লোক আছে না কি? নেই।

ছেলেটার আর যাই দোষ থাক্, জবাবগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি প্রাঞ্জল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই গঙ্গামাটির পথ চিনিস্ ত?

তেমনি সুস্পষ্ট উত্তর। কহিল, না।

তবে এলি কেন রে?

মামা বললে, বাবুকে নিয়ে যা। এই সোজা দক্ষিণে গিয়ে পূবে বাঁক ঘুরলেই গঙ্গামাটি। যাবি আর আসবি।

সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি, আর বেশী বিলম্বও নাই। এতক্ষণ ত চোখ বুজিয়া

নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলাম, ছেলেটার কথায় এবার ভয় পাইয়া বলিলাম, এই সোজা দক্ষিণের বদলে উত্তরে গিয়ে পশ্চিমের বাঁক ধরিস নি ত রে ?

ছেলেটি কহিল, তার কি জানি।

বলিলাম, জানিস্ নে ত চল্ দুজনে অন্ধকারে যমের বাড়ি যাই। হতভাগা পথ চিনিস নে ত এলি কেন ? তোর বাপ আছে ?

না।

মা আছে ?

মা মারা গেছে।

আপদ গেছে। চল তা হ'লে আজ রাত্রে তাদের কাছেই যাওয়া যাক। তোর মামার শুধু বুদ্ধি-বিবেচনা নয়, দয়া-মায়া আছে।

আর খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পরে ছেলেটা কাঁদিতে লাগিল, জানাইল যে, আর সে যাইতে পারিবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, থাকবি কোথায় ? সে জবাব দিল যে, সে ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু এই অবেলা সন্ধ্যাবেলায় আমার উপায় ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি ছেলেটি স্পষ্টবাদী। কহিল, তুমি বাবু নেবে যাও। মামা বলে গেছে ভাড়া পাঁচসিকে। কম দিলে আমাকে মারবে।

কহিলাম, আমার জন্যে তুমি মার খাবে সে কেমন কথা! একবার ভাবিলাম, এই গাড়ীতেই যথাস্থানে ফিরিয় যাই; কিন্তু কেমন যেন প্রবৃত্তি হইল না। রাত্রি আসন্ন, স্থান অপরিচিত, লোকালয় যে কোথায় এবং কত দূরে বুঝিবার যো নাই ; কেবল সুমুখে একটা বড় আম-কাঁঠালের বাগান দেখিয়া অনুমান করিলাম গ্রাম বোধ হয় বেশী দূর হইবে না। আশ্রয় হয় ত একটা মিলিবে। আর যদি নাই মিলে তাহাতেই বা কি ? না হয় এমনি করিয়াই এবারের যাত্রা সুরু হইবে।

নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। দেখিলাম ছেলেটির শুধু কথাই নয়, কাজের ধারাও চমৎকার স্পষ্ট। নিমেষে গাড়ীর মুখ ফিরাইয়া লইল, বৃষ-যুগল গৃহে প্রত্যাগমনের ইঙ্গিতমাত্র চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তেরো

সন্ধ্যা শেষ হইল বলিয়া, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতে তখনও বিলম্ব ছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে যেমন করিয়া হোক আশ্রয় একটা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। একাজ আমার পক্ষে নূতনও নহে, কঠিন বলিয়াও কোনদিনও ভয় হয় নাই ; কিন্তু আজ সেই আমবাগানের পাশ দিয়া পায়ে-চলার পথের রেখা ধরিয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন কেমন যেন উদ্বিগ্ন লজ্জায় মনের ভিতরটা ভরিয়া আসিতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন যে পথে চলিয়াছি সে যে বাঙ্গলার রাঢ় দেশ। ইহার সম্বন্ধে ত কোন অভিজ্ঞতা নাই ; কিন্তু এ কথা স্মরণ হইল না যে, সে সকল দেশের সম্বন্ধেও একদিন এমনি অনভিজ্ঞই ছিলাম, জ্ঞান যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা এমনি করিয়াই আপনাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, অপরে করিয়া দেয় নাই।

আসল কথা, কিসের জন্য যে সেদিন দ্বার আমার সর্ব্বত্রই মুক্ত ছিল, এবং আজ সঙ্কোচ দ্বিধায় তাহা অবরুদ্ধ প্রায়, সেই কথাটাই ভাবিয়া দেখিলাম না। সেদিনের সে-যাওয়ার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না, কিন্তু আজ যাহা করিতেছি সে শুধু সেদিনের নকলমাত্র। সেদিন বাহিরের অপরিচিতই ছিল আমার পরমাত্মীয়, তাদের 'পরে নিজের ভারার্পণ করিতে তখন বাধে নাই, কিন্তু সেই ভার আজ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি একান্তভাবে ন্যস্ত হইয়া সমস্ত ভারকেন্দ্রটাই অন্যত্র অপসারিত হইয়া গিয়াছে। তাই আজ অজানা-অচেনার মধ্যে চলিবার পা দুটা আমার প্রতিপদেই ভারী হইয়াই আসিতেছে। সেদিনের সেই সব-সুখ দুঃখের ধারণায় আজ কতই না প্রভেদ! তথাপি চলিতে লাগিলাম। এই বনের মধ্যে রাত্রি যাপনের সাহসও নাই, শক্তিও গিয়াছে—আজিকার মত কিছু একটা পাইতেই যে হইবে।

ভাগ্য ভাল, খুব বেশি দূর হাঁটিতে হইল না। পত্রঘন কি একটা গাছের ফাঁক দিয়া অট্টালিকার মত দেখা গেল। সেই পথটুকু ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অট্টালিকাই বটে, কিন্তু মনে হইল জনহীন। সুমুখে লোহার গেট কিন্তু ভাঙা। শিকগুলোর অধিকাংশই লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। খোলা বারান্দা, বড় বড় দুটো ঘর, একটা বন্ধ এবং যেটা খোলা তাহার দ্বারে আসিবামাত্র একজন কঙ্কালসার মানুষ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, ঘরের চার কোণে চারিটা লোহার খাট—একদিন গদি পাতা ছিল কিন্তু কালক্রমে চটগুলো লুপ্ত হইয়াছে, আছে শুধু ছোবড়ার কিছু কিছু তখনও অবশিষ্ট, একটা তেপাই, গোটা-কয়েক টিন ও এনামেলের পাত্র, তাহাদের শ্রী ও বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনাতীত। অনুমান যাহা করিয়াছিলাম, তাহাই বটে। বাড়ীটি হাসপাতাল। এই লোকটি বিদেশী, চাকরী করিতে আসিয়া পীড়িত হইয়া দিন-পনের হইল ইনডোর পেশেণ্ট হইয়া আছে। লোকটির সহিত প্রথম আলাপ এইরূপ ঘটিল ঃ

বাবুমশায়, গোটা-চারেক পয়সা দেবেন ?

কেন বল ত ?

ক্ষিদেয় মরি বাবু, মুড়ি-টুড়ি দুটো কিনে খাব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি রোগী মানুষ, যা-তা খাওয়া তোমার বারণ নয় ?

আজ্ঞে, না।

এখানে তোমাকে খেতে দেয় না ?

লোকটি কহিল যে, সকালে একবাটি সাগু দিয়াছিল তাহা সে কোন্‌কালে খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন হইতে সে গেটের কাছে বসিয়া থাকে, ভিক্ষা পায় ত আর একবার খাওয়া চলে, না হয় ত উপবাসে কাটে। ডাক্তার একজন আছেন, বোধহয় যৎসামান্য হাতখরচা মাত্র বন্দোবস্ত আছে, সকাল-বেলায় একবার করিয়া তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। আর একটি লোক নিযুক্ত আছে, তাহাকে কম্পাউণ্ডারি হইতে সুরু করিয়া লণ্ঠনে তেল দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই করিতে হয়। পূর্ব্বে একজন চাকর ছিল বটে, কিন্তু মাস-ছয়েক হইল মাহিনা না পাওয়ায় রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এখনও নূতন কেহ ভর্ত্তি হয় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ঝাঁট-পাট কে দেয় ?

লোকটি বলিল, আজকাল আমিই দিই। আমি চলে গেলে আবার যে নতুন রুগী আসবে সে-ই দেবে।

কহিলাম, বেশ ব্যবস্থা। হাসপাতালটি কাহার জান?

লোকটি আমাকে ও-দিকের বারন্দায় লইয়া গেল। কড়ি হইতে একটি টিনের লণ্ঠন ঝুলিতেছে। কম্পাউণ্ডারবাবু বেলা-বেলি সেটি জ্বালিয়া দিয়া কাজ সারিয়া ঘরে চলিয়া গিয়াছেন। দেওয়ালের গায়ে মস্ত একটা মর্ম্মর প্রস্তর-ফলক। সোনার জল দিয়া ইংরাজী-অক্ষরে আগাগোড়া খোদাই-করা সন তারিখ সম্বলিত শিলালিপি। জেলার যে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট অপরিসীম দয়ায় ইহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ধাম সর্ব্বাগ্রে, নীচে প্রশস্তি পাঠ। কে একজন রায়বাহাদুর তাঁহার রত্নাগর্ভা মাতার স্মৃতিরক্ষার্থ জননী-জন্মভূমিতে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর শুধু মাতা-পুত্রই নয়, ঊর্দ্ধতন তিন-চারি পুরুষের বিবরণ। বোধ করি ছোট-খাটো কুল-কারিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকটি যে রাজ-সরকারে রায়বাহাদুরির যোগ্য তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ টাকা নষ্ট করার দিক দিয়া ত্রুটি ছিল না। ইঁট ও কাঠ এবং বিলাতের আম্‌দানি লোহার কড়ি বরগার বিল মিটাইয়া অবশিষ্ট যদি বা কিছু থাকিয়া থাকে, সাহেব শিল্পীর হাতে বংশ-গৌরব লিখাতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। ডাক্তার ও রোগীর ঔষধ পথ্যাদির ব্যাপারের ব্যবস্থা করিবার হয়ত টাকাও ছিল না, ফুরসৎও ছিল না।

প্রশ্ন করিলাম, রায় বাহাদুরের বাড়ী কোথায়?

সে কহিল, বেশী দূরে নয়, কাছেই।

এখন গেলে দেখা হবে?

আজ্ঞে না, বাড়ীতে তালাবন্ধ, তাঁরা সব কলকাতায় থাকেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কবে আসেন জান?

লোকটি বিদেশী, সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না, তবে কহিল যে বছর-তিনেক পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলেন এ কথা সে ডাক্তারবাবুর মুখে শুনিয়াছিল। সর্ব্বত্র একই দশা, অতএব দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু ছিল না।

এদিকে অপরিচিত স্থানে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেছিল, সুতরাং রায় বাহাদুরের কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করার চেয়ে জরুরি কাজ বাকী ছিল। লোকটিকে কিছু পয়সা দিয়া জানিয়া লইলাম যে নিকটেই একঘর চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণের বাটী। তাঁহারা অতিশয় দয়ালু, এবং রাত্রিটার মত আশ্রয় মিলিবেই। সে নিজেই

রাজী হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, তাহাকে ত মুদীর দোকান যাইতেই হইবে, একটুখানি ঘুর-পথ কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না।

চলিতে চলিতে, তাহার কথায় বার্ত্তায় বুঝিলাম এই দয়ালু ব্রাহ্মণ পরিবার হইতে সে পথ্যাপথ্য অনেক রাত্রেই গোপনে সংগ্রহ করিয়া খাইয়াছে।

মিনিট-দশেক হাঁটিয়া চক্রবর্ত্তীর বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার পথিপ্রদর্শক ডাক দিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই ঘরে আছেন ?

কোন সাড়া আসিল না। ভাবিয়াছিলাম কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণবাটীতে আতিথ্য লইতে চলিয়াছি, কিন্তু ঘর-দ্বারের শ্রী দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল। ওদিকে সাড়া নাই, এদিকে আমার সঙ্গীর অধ্যবসায়ও অপরাজেয়। তাহা না হইলে এই গ্রাম ও এই হাসপাতালে বহুদিন পূর্ব্বেই তাহার রুগ্ন আত্মা স্বর্গীয় হইয়া তবে ছাড়িত। সে ডাকের উপর ডাক দিতেই লাগিল।

হঠাৎ জবাব আসিল, যা যা, আজ যা। যা বলছি।

লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, প্রত্যুত্তরে কহিল, কে এসেছে বার হয়ে দেখুন না।

কিন্তু বিচলিত হইয়া উঠিলাম আমি। যেন চক্রবর্ত্তীর পরমপূজ্য গুরুদেব গৃহ পবিত্র করিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছি।

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তে মোলায়েম হইয়া উঠিল—কে রে ভীম ? বলিতে বলিতে গৃহস্বামী দ্বারপথে দেখা দিলেন। পরণের বস্ত্রখানি মলিন এবং অতিশয় ক্ষুদ্র, অন্ধকার-প্রায় সন্ধ্যার ছায়ায় তাঁহার বয়স অনুমান করিতে পারিলাম না, কিন্তু খুব বেশি বলিয়াও মনে হইল না। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে রে ভীম ?

বুঝিলাম আমার সঙ্গীর নাম ভীম। বলিল, ভদ্দরলোক, বামুন। পথ ভুলে হাসপাতালে গিয়ে হাজির। আমি বললাম, ভয় কি, চলুন না ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ীতে রেখে আসি, গুরু আদরে থাকবেন।

বস্তুতঃ ভীম অতিশয়োক্তি করে নাই, চক্রবর্ত্তী আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। স্বহস্তে মাদুর পাতিয়া বসিতে দিলেন, এবং তামাক ইচ্ছা করি কি না জানিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া নিজেই তামাক সাজিয়া আনিলেন।

বলিলেন, চাকরগুলো সব জ্বরে পড়ে রয়েছে—করি কি !

শুনিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম এক চক্রবর্তীর গৃহ ছাড়িয়া আর এক চক্রবর্তীর গৃহে আসিয়া পড়িলাম। কে জানে আতিথ্যটা এখানে কিরূপ দাঁড়াইবে। তথাপি হুকাটি হাতে পাইয়া টানিবার উপক্রম করিয়াছি, সহসা অন্তরাল হইতে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল "হাঁ গা, কে মানুষটি এলো ?"

অনুমান করিলাম, ইনিই গৃহিণী। জবাব দিতে চক্রবর্তীরই শুধু গলা কাঁপিল না, আমারও যেন হৃৎকম্প হইল।

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, মস্ত লোক গো, মস্ত লোক। অতিথি ব্রাহ্মণ—নারায়ণ !—পথ ভুলে এসে পড়েছেন—শুধু রাত্রিটা—ভোর না হতেই আবার সকালেই চলে যাবেন।

ভিতর হইতে জবাব আসিল, হাঁ, সবাই আসে পথ ভুলে! মুখপোড়া অতিথিদের আর কামাই নেই। ঘরে না আছে একমুঠো চাল, না আছে একমুঠো ডাল—খেতে দেবে কি উনুনের পাঁশ ?

আমার হাতের হুঁকা হাতেই রহিল। চক্রবর্তী কহিলেন, আহা কি যে বল তুমি! আমার ঘরে আবার চাল ডালের অভাব! চল চল, ভেতরে চল, ভেতরে চল, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চক্রবর্তী-গৃহিণী ভিতরে যাইবার জন্য বাহিরে আসেন নাই। বলিলেন, কি ঠিক করে দেবে শুনি? আছে ত খালি মুঠো-খানেক চাল, ছেলেমেয়ে দুটাকে রাত্তিরের মত সেদ্ধ করে দেব। বাছাদের উপুসি রেখে ওকে দেব গিলতে ? মনেও ক'রো না।

মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও! না না করিয়া কি একটা বলিতে গেলাম, কিন্তু চক্রবর্তীর বিপুল ক্রোধে তাহা ভাসিয়া গেল। তিনি তুমি ছাড়িয়া তখন তুই ধরিলেন, এবং অতিথি-সৎকার লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে যে আলাপ সুরু হইল তাহার ভাষাও যেমন, গভীরতাও তেমনি। আমি টাকা লইয়া বাহির হই নাই, পকেটে সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহাও খরচ হইয়া গিয়াছিল। শুধু গলায় সোনার বোতাম ছিল, কিন্তু কে বা কাহার কথা শোনে। ব্যাকুল হইয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে চক্রবর্তী সজোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, অতিথি নারায়ণ। বিমুখ হয়ে গেলে গলায় দড়ি দেব।

গৃহিণী কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জ অ্যাক্‌সেপ্ট করিয়া কহিলেন, তা হ'লে ত বাঁচি। ভিক্ষে-সিক্ষে করে বাছাদের খাওয়াই।

এদিকে আমার ত প্রায় হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম করিয়াছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, চক্রবর্তীমশাই, সে না হয় একদিন ভেবে-চিন্তে ধীরে-সুস্থে করবেন—করাই ভাল—কিন্তু সম্প্রতি আমাকে হয় ছাড়ুন, না হয় একগাছা দড়ি দিন, ঝুলে পড়ে আপনার আতিথ্যের দায় থেকে মুক্ত হই।

চক্রবর্ত্তী অন্তঃপুর লক্ষ্য করিয়া হাঁকিয়া বলিলেন, আক্কেল হ'ল? বলি, শিখলি কিছু?

পাল্টা জবাব আসিল, হাঁ। মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে ভিতর হইতে শুধু একখানি হাত বাহির হইয়া, ঢুম্ করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বসাইয়া দিয়া আদেশ হইল, যাও, শ্রীমন্তর দোকানে এটা রেখে চাল ডাল তেল নুন নিয়ে এসো গে। দেখো যেন মিন্‌সে হাতে পেয়ে সব কেটে না নেয়।

চক্রবর্ত্তী খুসী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আরে না না, এ কি ছেলের হাতের নাড়ু?

চট করিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া বার-কয়েক টান দিয়া কহিলেন, আগুনটা নিবে গেছে। গিন্নি, দাও দিকি কলকেটা পাল্টে, একবার খেয়েই যাই। যাব আর আসব। এই বলিয়া তিনি কলিকাটা হাতে লইয়া অন্দরের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

ব্যস্, স্বামী-স্ত্রীতে সন্ধি হইয়া গেল। গৃহিণী তামাক সাজিয়া দিলেন, কর্ত্তা প্রাণ ভরিয়া ধূম পান করিলেন। প্রসন্ন চিত্তে হুঁকাটি আমার হাতে দিয়া ঘড়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চাল আসিল, ডাল আসিল, তেল আসিল, নুন আসিল, যথাসময়ে রন্ধনশালায় আমার ডাক পড়িল। আহারে বিন্দুমাত্র রুচি ছিল না, তথাপি নিঃশব্দে গেলাম। কারণ আপত্তি করা শুধু নিষ্ফল নয়, না বলিতে আমার আতঙ্ক বোধ হইল। এ জীবনে বহুবার বহুস্থানেই আমাকে অযাচিত আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছি বলিলে অসত্য বলা হইবে, কিন্তু এমন সম্বর্দ্ধনাও কখনো ভাগ্যে জুটে নাই; কিন্তু শিক্ষার

তখনও বাকি ছিল। গিয়া দেখিলাম উনন জ্বলিতেছে, এবং অন্নের পরিবর্ত্তে কলাপাতায় চাল, ডাল, আলু ও একটা পিতলের হাঁড়ি।

চক্রবর্ত্তী উৎসাহভরে কহিলেন, দিন হাঁড়িটা চড়িয়ে, চট্‌পট্‌ হয়ে যাবে। খাঁড়িমুসুরের খিচুড়ি, আলুভাতে, তোফা লাগবে খেতে। ঘি আছে, গরম গরম—

চক্রবর্ত্তীর রসনা সরস হইয়া উঠিল; কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া উঠিল; কিন্তু পাছে আমার কোন কথায় বা কাজে আবার একটা প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার নির্দ্দেশমত হাঁড়ি চড়াইয়া দিলাম। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী আড়ালে ছিলেন, স্ত্রীলোকের চক্ষে আমার অপটু হস্ত গোপন রহিল না, এবার তিনি আমাকেই উদ্দেশ করিয়া কথা কহিলেন। তাঁহার আর যা দোষই থাক্‌, সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জা বলিয়া যে শব্দগুলা অভিধানে আছে, তাহাদের অতিবাহুল্য দোষ যে ইহার ছিল না এ কথা বোধ করি অতি বড় নিন্দুকেও স্বীকার না করিয়া পারিবে না। তিনি কহিলেন, তুমি ত বাছা রান্নার কিছুই জান না।

আমি তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইলাম, আজ্ঞে, না।

তিনি বলিলেন, কর্ত্তা বলছিলেন বিদেশী লোক, কে বা জানবে, কে বা শুনবে। আমি বললাম, তা হতে পারে না। একটা রাত্তিরের জন্য একমুঠো ভাত দিয়ে আমি মানুষের জাত মারতে পারব না। আমরা বাবা অগ্রদানী বামুন।

আমার যে আপত্তি নাই, এবং ইহা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি এ-কথা বলিতেও কিন্তু আমার সাহস হইল না, পাছে স্বীকার করিলেও কোন বিভ্রাট ঘটে। মনের মধ্যে শুধু একটি মাত্র চিন্তা ছিল কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে এবং এই বাড়ীর নাগপাশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিব। সুতরাং—নির্দ্দেশমত খিচুড়িও রাঁধিলাম, এবং পিণ্ড পাকাইয়া গরম ঘি দিয়া তোফা গিলিবার চেষ্টাও করিলাম। এ অসাধ্য যে কি করিয়া সম্পন্ন করিলাম আজও বিদিত নই, কেবলই মনে হইতে লাগিল চাল ডালের তোফা পিণ্ড পেটের মধ্যে গিয়া পাথরের পিণ্ড পাকাইতেছে।

অধ্যবসায়ে অনেক কিছুই হয়, কিন্তু তাহারও সীমা আছে। হাত-মুখ

ধুইবারও অবসর মিলিল না, সমস্ত বাহির হইয়া গেল। ভয়ে শীর্ণ হইয়া উঠিলাম, কারণ এগুলো যে আমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শক্তি আর ছিল না। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়া উঠিল, কোনমতে বলিয়া ফেলিলাম, কোথাও আমাকে একটু শোবার জায়গায় দিন, মিনিট-পাঁচেক সামলে নিয়েই আমি সমস্ত পরিষ্কার করে দেব। ভাবিয়াছিলাম প্রত্যুত্তরে কি যে শুনিব জানি না, কিন্তু আশ্চর্য্য, এই চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর ভয়ানক কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ কোমল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে তিনি অন্ধকার হইতে আমার সম্মুখে আসিলেন। বলিলেন, তুমি কেন বাবা পরিষ্কার করতে যাবে, আমিই সব সাফ করে ফেলছি। বাইরের বিছানাটা এখনও করে উঠতে পারি নি, ততক্ষণ এসো তুমি আমার ঘরে গিয়ে শোবে।

না বলিবার সামর্থ্যও নাই, নীরবে অনুসরণ করিয়া তাঁহারই শতচ্ছিন্ন শয্যায় আসিয়া চোখ বুজিয়া পড়িলাম।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন মাথা তুলিবারও শক্তি ছিল না এমনি জ্বর! সহজে চোখ দিয়া আমার জল পড়ে না, কিন্তু এতবড় অপরাধের যে এখন কেমন করিয়া কি জবাবদিহি করিব এই কথা ভাবিয়া নিছক ও নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কেই আমার দুই চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল বহুবার বহু নিরুদ্দেশ যাত্রাতেই বাহির হইয়াছি, কিন্তু এতখানি বিড়ম্বনা জগদীশ্বর আর কখনও অদৃষ্টে লিখেন নাই। আর একবার প্রাণপণে উঠিয়া বসিবার প্রয়াস করিলাম, কিন্তু কোনমতেই মাথা সোজা করিতে না পারিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আজ চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী সহিত মুখোমুখি আলাপ হইল। বোধ হয় অত্যন্ত দুঃখের মধ্য দিয়া দিয়াই নারীর সত্যকার গভীর পরিচয়টুকু লাভ করা যায়। তাঁকে চিনিয়া লইবার এমন কষ্টিপাথরও আর নাই, তাঁহার হৃদয় জয় করিবার এত বড় অস্ত্রও পুরুষের হাতে আর দ্বিতীয় নাই। আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, ঘুম ভেঙেছে বাবা?

চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহার বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি—কি বেশী হইতে পারে। রংটি কালো, কিন্তু চোখ-মুখ সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ ঘরের

মেয়েদের মতই। রুক্ষতার কোথাও কিছু নাই, আছে শুধু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া গভীর দারিদ্র্য ও অনশনের চিহ্ন আঁকা—চোখ মেলিয়া চাহিলেই তাহা ধরা পড়ে। কহিলেন, কাল আঁধারে দেখতে পাই নি বাবা, কিন্তু আমার বড়ছেলে বেঁচে থাকলে তার তোমার বয়সই হ'ত।

ইহার আর উত্তর কি। তিনি হঠাৎ কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, জ্বরটা এখনও খুব রয়েছে।

আমি চোখ বুজিয়া ছিলাম, চোখ বুজিয়াই কহিলাম, কেউ একটুখানি সাহায্য করলে বোধ হয় হাসপাতালে যেতে পারব—সে ত আর বেশী দূরে নয়।

তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার কথায় তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন বেদনায় ভরিয়া গেল। বলিলেন, দুঃখের জ্বালায় কাল কি একটা বলেছি বলেই বাবা রাগ করে ওই যমপুরীতে চলে যাবে? আর যাবে বললেই আমি যেতে দেব? এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, আতুরের নিয়ম নেই বাবা। এই যে লোকে হাসপাতালে গিয়ে থাকে, সেখানে কাদের ছোঁওয়া খেতে হয় বল ত? কিন্তু তাতে কি জাত যায়? আমি সাগু বার্লি তৈরি করে দিলে কি তুমি খাবে না?

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম যে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, এবং শুধু পীড়িত বলিয়া নয়, অত্যন্ত নীরোগ শরীরেও আমার ইহাতে বাধা হয় না।

অতএব রহিয়া গেলাম। বোধহয় সর্ব্বসমেত দিন-চারেক ছিলাম। তথাপি সেই চারিদিনের স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়। জ্বর একদিনেই গেল, কিন্তু বাকি দিন কয়টা দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা নড়িতে দিলেন না। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়াই এই ব্রাহ্মণ পরিবারের দিন কাটিতেছে এবং দুর্গতিকে সহস্র-গুণে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে বিনা দোষে সমাজের অর্থহীন পীড়ন। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী তাঁহার অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেও এতটুকুও অবসর পাইলে আমার কাছে আসিয়া বসিতেন। মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেন, ঘটা করিয়া রোগের পথ্য যোগাইতে পারিতেন না, এই ত্রুটি যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবার কি ঐকান্তিক চেষ্টাই না তাঁহার দেখিতে পাইতাম। পূর্ব্বে অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, জমিজমা মন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁহার নির্ব্বোধ স্বামীকে লোকে

প্রতারিত করিয়াই এই দুঃখে ফেলিয়াছে। তাহারা আসিয়া ঋণ চাহিত, বলিত, দেশে বড়লোক ঢের আছে, কিন্তু এতবড় বুকের পাটা কয়জনের আছে? অতএব এই বুকের পাটা সপ্রমাণ করিতে তিনি ঋণ করিয়া ঋণ দিতেন। প্রথমে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া এবং পরে স্ত্রীকে গোপন করিয়া সম্পত্তি বন্ধক দিয়া। ইহার ফল অধিকাংশ স্থলেই যাহা হয় এখানেও তাহাই হইয়াছে।

এ কুকার্য্য যে চক্রবর্ত্তীর অসাধ্য নয় তাহা একটা রাত্রির অভিজ্ঞতা হইতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলাম। বুদ্ধির দোষে বিষয়-সম্পত্তি অনেকেরই যায়, এবং তার পরিণামও অত্যন্ত দুঃখের হয়, কিন্তু এই দুঃখ যে সমাজের অনাবশ্যক, অন্ধ নিষ্ঠুরতায় কতখানি বাড়িতে পারে তাহা চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর প্রতি কথায় অস্থি মজ্জায় অনুভব করিলাম। তাঁহাদের দুইটিমাত্র শোবার ঘর। একটিতে ছেলেমেয়েরা থাকে এবং অন্যটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বাহিরের লোক হইয়াও আমি অধিকার করিয়া আছি। ইহাতে আমার সঙ্কোচের অবধি ছিল না। বলিলাম, আজ ত আমার জ্বর ছেড়েছে এবং আপনাদেরও ভারী কষ্ট হচ্ছে। যদি বাইরের ঘরে একটা বিছানা করে দেন ত আমি ভারী তৃপ্তি পাই।

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সে কি হয় বাছা, আকাশে মেঘ করে আছে, বৃষ্টি যদি হয় ত ওঘরে এমন ঠাঁই নেই যে মাথাটুকু রাখা যায়। তুমি রোগা-মানুষ, এ ভরসা ত করতে পারি নে বাবা।

তাঁহাদের প্রাঙ্গণের একধারে কিছু খড় সঞ্চিত ছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহার ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সময়ে মেরামত করে নেন নি কেন। জল-ঝড়ের ত দিন এসে পড়েছে।

ইহার প্রত্যুত্তরে জানিলাম যে তাহা সহজে হইবার নয়। পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া এ অঞ্চলের চাষীরা তাঁহাদের কাজ করে না। গ্রামান্তরে মুসলমান ঘরামী আছে তাহারাই ঘর ছাইয়া দেয়। যে-কোন কারণে হোক এবৎসর তাহারা আসিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বাবা, আমাদের দুঃখের কি সীমা আছে? সে বছর আমার সাত-আট বছরের মেয়েটা হঠাৎ কলেরায় মারা গেল; পূজোর সময় আমার

ভাইয়েরা গিয়েছিল কাশী বেড়াতে, তাই আর লোক পাওয়া গেল না, ছোট-ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে একা এঁকেই শ্মশানে নিয়ে যেতে হ'ল। তাও কি সৎকার করা গেল? কাঠ-কুটো কেউ কেটে দিলে না, বাপ হয়ে গর্ত্ত খুঁড়ে বাছাকে পুঁতে রেখে ইনি ঘরে ফিরে এলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার পুরাতন শোক একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহার মোট অভিযোগ এই যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কোন্ কালে কে শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ত অপরাধ? অথচ শ্রাদ্ধ হিন্দুদের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং কেহ-না-কেহ গ্রহণ না করিলে সে শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও নিষ্ফল হইয়া যায়। তবে দোষটা কোথায়? আর দোষই যদি থাকে ত মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করান কিসের জন্যে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও যেমন কঠিন, পূর্ব্ব-পিতামহগণের কোন দুষ্কৃতির শাস্তি স্বরূপ তাঁহাদের বংশধরগণ এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন তাহা এতকাল পরে আবিষ্কার করাও তেমনি দুঃসাধ্য। শ্রাদ্ধের দান লওয়া ভাল কি মন্দ জানি না। মন্দ হলেও একথা সত্য যে ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ তাঁহারা করেন না, অতএব নিরপরাধ। অথচ প্রতিবেশী হইয়া আর একজন প্রতিবেশীর জীবন-যাত্রার পথ বিনা দোষে মানুষে এতখানি দুর্গম ও দুঃখময় করিয়া দিতে পারে, এমন হৃদয়হীন নির্দয় বর্ব্বরতার উদাহরণ জগতে বোধ করি এক হিন্দুসমাজ ব্যতীত আর কোথাও নাই।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, এ গ্রামে লোক বেশী নেই, জ্বর ওলাউঠায় অর্দ্ধেক মরে গিয়েছে। এখন আছে শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর রাজপুত। আমাদের যে কোন উপায় নেই বাবা, নইলে ইচ্ছে হয়, কোন মুসলমানের গ্রামে গিয়ে বাস করি।

বলিলাম, কিন্তু সেখানে ত জাত যেতে পারে।

চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলেন না; কহিলেন, আমার সম্পর্কে একজন খুড়শ্বশুর আছেন, তিনি দুমকায় চাকরী করতে গিয়ে খৃষ্টান হয়েছেন। তাঁর ত আর কোন কষ্টই নেই।

চুপ করিয়া রহিলাম। হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে শুনিলে ক্লেশ বোধ হয়, কিন্তু সান্ত্বনাই বা দিব কি

বলিয়া ? এতদিন জানিতাম অস্পৃশ্য নীচ জাতি যাহারা আছে তাহারাই শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যে নির্য্যাতন ভোগ করে, কিন্তু আজ জানিলাম কেহই বাদ যায় না। অর্থহীন অবিবেচনায় পরস্পরের জীবন নির্ভর করিয়া তোলাই যেন এ সমাজের মজ্জাগত সংস্কার। পরে অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেকেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহা অন্যায়, ইহা গর্হিত, তথাপি নিরাকরণেরও কোন পন্থাই তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না ; এই অন্যায়েরই মধ্য দিয়া তাঁহারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত চলিতে সম্মত আছেন, কিন্তু প্রতিকারের প্রবৃত্তি বা সাহস কোনটাই তাঁহাদের নাই। জানিয়া বুঝিয়াও অবিচারের প্রতিবিধান করিবার শক্তি যাহাদের এমন করিয়া তিরোহিত হইয়াছে সে জাতি যে দীর্ঘকাল বাঁচিবে কি করিয়া ভাবিয়া পাওয়া শক্ত।

দিন-তিনেক পরে সুস্থ হইয়া একদিন সকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, মা আজ আমাকে বিদায় দিন।

চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, বলিলেন, দুঃখীর ঘরে অনেক দুঃখ পেলে বাবা, তোমাকে কটু কথাও কম বলি নি।

এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না—না না, সে কিছুই না—আমি মহা সুখে ছিলাম, আমার কৃতজ্ঞতা—ইত্যাদি মামুলি ভদ্রবাক্য উচ্চারণ করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইল। বজ্রানন্দের কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল, ঘর ছাড়িয়া আসিলে কি হইবে, এই বাঙ্গলা দেশের গৃহে গৃহে মা বোন, সাধ্য কি তাঁদের স্নেহের আকর্ষণ এড়াইয়া যাই। কথাটা কত বড়ই না সত্য!

নিরতিশয় দারিদ্র্য ও নির্ব্বোধ স্বামীর অবিচেনার আতিশয্য এই গৃহস্থ ঘরের গৃহিণীকে প্রায় পাগল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই তিনি অনুভব করিলেন আমি পীড়িত, আমি নিরুপায়—আর তাঁহার ভাবিবার কিছু রহিল না। মাতৃত্বের সীমাহীন স্নেহে আমার রোগ পর-গৃহবাসের সমস্ত দুঃখ যেন দুই হাত দিয়া মুছিয়া লইলেন।

চক্রবর্ত্তী চেষ্টা করিয়া একখানি গো-যান সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, গৃহিণীর ভারি ইচ্ছা ছিল আমি স্নানাহার করিয়া যাই, কিন্তু রৌদ্র বাড়িবার আশঙ্কায় পীড়াপীড়ি করিলেন না। শুধু যাত্রাকালে দেবদেবীর নাম স্মরণ করিয়া চোখ

মুছিয়া কহিলেন, বাবা, যদি কখনও এদিকে এস আর একবার দেখা দিয়ে যেয়ো।

এদিকে আসাও কখনও হয় নাই, দেখা দিতেও আর পারি নাই, শুধু বহুদিন পরে শুনিয়াছিলাম, রাজলক্ষ্মী কুশারী মহাশয়ের হাত দিয়া তাঁহাদের অনেকখানি ঋণের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

চোদ্দ

গঙ্গামাটির বাটিতে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। দ্বারের উভয় পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গল-ঘট বসান। উপরে আম্র-পল্লবের মালা দোলান। বাহিরে অনেকগুলি লোক বসিয়া জটলা করিয়া তামাক খাইতেছে। গরুর গাড়ীর শব্দে তাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল। বোধ হয় ইহারই মধুর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আর একজন যিনি অকস্মাৎ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখি তিনি স্বয়ং বজ্রানন্দ। তাঁহার উল্লসিত কলরব উদ্দাম হইয়া উঠিল, এবং কে একজন ছুটিয়া ভিতরে খবর দিতেও গেল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে তিনি আসিয়া সকল বিবরণ জানানো পর্য্যন্ত চারিদিকে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টাও যেমন বিরাম নাই, বাড়ীসুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তারও তেমনি অবধি নাই। ব্যাপার কি? অকস্মাৎ কোথায় ডুব দিয়েছিলেন বলুন ত? গাড়োয়ান ছোঁড়াটা ত গিয়ে বললে আমাকে গঙ্গামাটির পথে নামিয়ে দিয়ে সে ফিরে গেছে।

রাজলক্ষ্মী কাজে ব্যস্ত ছিল, আসিয়া পায়ের কাছে গড় করিয়া প্রণাম করিল, বলিল, বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে কি শাস্তিই তুমি দিলে। বজ্রানন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু দেখ আনন্দ, আমার মন জানতে পেরেছিল যে আজ ইনি আসবেনই।

হাসিয়া বলিলাম, দোরে কলাগাছ আর ঘটস্থাপনা দেখেই আমি বুঝেছি যে আমার আসার খবরটি তুমি পেয়েছ।

কবাটের আড়ালে রতন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া

উঠিল, আজ্ঞে সে জন্যে নয়। আজ বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন হবে কি না। বজ্রনাথ দেখে এসে মা—

রাজলক্ষ্মী ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল—তোকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না রতন, নিজের কাজে যা।

তাহার আরক্ত মুখের প্রতি চাহিয়া বজ্রানন্দ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কি জানেন দাদা, কোন একটা কাজে লেগে না থাকলে মানসিক উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সহ্য যায় না। ভোজের আয়োজনটা কেবল এই জন্যেই। না দিদি ?

রাজলক্ষ্মী জবাব দিল না, রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা কহিল, ভয়ানক রোগা দেখাচ্চে দাদা, ইতিমধ্যে কাণ্ডটা কি ঘটেছিল বলুন ত ? বাড়ী না ঢুকে হঠাৎ গা ঢাকা দিলেন কেন ?

গা ঢাকা দিবার হেতু সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া আনন্দ কহিল, ভবিষ্যতে এ রকম ক'রে আর পলায়ন করবেন না। কি ভাবে যে ওঁর দিনগুলো কেটেছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তাহা জানিতাম। সুতরাং চোখে না দেখিয়াও আমি বিশ্বাস করিলাম। রতন চা ও তামাক দিয়া গেল। আনন্দ কহিল, আমিও বাইরে যাই দাদা। এখন আপনার কাছে বসে থাকলে আর একজন হয়ত ইহজন্মে আমার মুখ দেখবেন না। এই বলিয়া সে হাসিয়া প্রস্থান করিল।

খানিক পরে রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, ও ঘরে গরম জল গামছা কাপড় সমস্ত রেখে এলাম, শুধু গা-মাথা মুছে কাপড় ছেড়ে ফেল গে। জ্বরের ওপর খবরদার যেন মাথায় জল ঢেলো না বলছি।

কহিলাম, কিন্তু স্বামীজী তোমাকে ভুল বলেছে, জ্বর আমার নেই। রাজলক্ষ্মী বলিল, না-ই থাক, কিন্তু হতে কতক্ষণ ?

কহিলাম, সে খবর তোমাকে সঠিক দিতে পারব না, কিন্তু গরমে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যাচ্ছে, স্নান করা দরকার।

রাজলক্ষ্মী কহিল, দরকার না কি ? তা হ'লে একা হয় ত পেরে উঠবে না, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। এই বলিয়া সে নিজেই

হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কেন আড়ি ক'রে আমাকেও কষ্ট দেবে, নিজেও কষ্ট পাবে ? এত অবেলায় নেয়ো না লক্ষ্মীটি।

এই ধরণের কথা বলায় রাজলক্ষ্মীর জোড়া কোথাও দেখি নাই। নিজের ইচ্ছাকেই জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার কটুতাটুকু সে স্নেহের মাধুর্য্যরসে এমনিই ভরিয়া নিতে পারিত যে, সে জিদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন সঙ্কল্পই মাথা তুলিতে পারিত না। এ ব্যাপারটা তুচ্ছ, স্নান না করিলেও আমার চলিয়া যাইবে, কিন্তু চলিয়া যায় না এমন ব্যাপারেও বহুবার দেখিয়াছি তাহার ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি শুধু কেবল আমিই পাই নাই তাহা নয়, কাহাকেও কোনদিনই খুঁজিয়া পাইতে দেখি নাই। আমাকে তুলিয়া দিয়া সে খাবার আনিতে গেল। বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণ ভোজনের পালাটা আগে শেষ হোক না।

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, রক্ষে কর তুমি, সে পালা শেষ হতে যে সন্ধ্যে হয়ে যাবে!

গেলেই বা।

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, তাই বটে। ব্রাহ্মণ ভোজন আমার মাথায় থাক, তার জন্যে তোমাকে উপোস করালে আমার স্বর্গের সিঁড়ি উপরের বদলে একেবারে পাতালে মুখ করে দাঁড়াবে। এই বলিয়া সে আহার্য্য আনিতে প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে কাছে বসিয়া আজ সে আমাকে যাহা খাওয়াইতে বসিল তাহা রুগীর পথ্য। কর্ম্ম-বাটীর যাবতীয় গুরুপাক বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না, বুঝা গেল, আমার আসার পরেই সে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছে। তথাপি আসা পর্য্যন্ত তাহার আচরণ, তাহার কথা কহার ধরণে এমনই কি একটা অনুভব করিতেছিলাম যাহা শুধুই অপরিচিত নয়, অত্যন্ত নূতন। ইহাই খাওয়ানোর সময়ে একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অথচ কিসে এবং কেমন করিয়া যে সুস্পষ্ট হইল, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি অস্পষ্ট করিয়াও বুঝাইতে পারিতাম না। হয়ত এই কথাটাই প্রত্যুত্তরে বলিতাম যে মানুষের অত্যন্ত ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাষা বোধ হয় আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজলক্ষ্মী খাওয়াইতে বসিল, কিন্তু খাওয়া না-খাওয়া লইয়া

তাহার আগেকার দিনের সেই অত্যন্ত জবরদস্তি ছিল না, ছিল ব্যাকুল অনুনয়। জোরে নয়, ভিক্ষা। বাহিরের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে না, পড়ে শুধু মানুষের নিভৃত হৃদয়ের অপলক চোখ দুটির দৃষ্টিতে।

খাওয়া শেষ হইল। রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি এখন যাই ?

অতিথি সজ্জন বাহিরে সমবেত হইতেছিলেন; বলিলাম, যাও।

আমার উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি হাতে লইয়া সে যখন ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অন্যমনে সেইদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল রাজলক্ষ্মীকে যেমনটি রাখিয়া গিয়াছিলাম এই কটা দিন পরে তেমনটি ত আর ফিরিয়া পাইলাম না। আনন্দ বলিয়াছিল, কাল হইতেই দিদির এক প্রকার অনাহারে কাটিয়াছে, আজ জলস্পর্শ করেন নাই, এবং কাল কত বেলায় যে তাঁহার উপবাস ভাঙ্গিবে তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। অসম্ভব নয়। চিরদিনই দেখিয়া আসিয়াছি ধর্ম্মপিপাসু-চিত্ত তাহার কোনদিন কোন কৃচ্ছ্রসাধনেই পরাঙ্মুখ নয়। এখানে আসিয়া অবধি সুনন্দার সাহচর্য্যে সেই অবিচলিত নিষ্ঠা তাহার নিরন্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। আজ তাহাকে অল্পক্ষণ মাত্রই দেখিবার অবকাশ পাইয়াছি, কিন্তু যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় পথে সে এই অবিশ্রান্ত দ্রুতবেগে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, মনে হইল, তাহার নিন্দিত-জীবনের সঞ্চিত কালিমা যত বড়ই হোক, তাহার নাগাল পাইবে না। কিন্তু আমি ? আমি যে তাহার পথের মাঝখানে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর মত সমস্ত অবরোধ করিয়া আছি!

কাজকর্ম্ম সারিয়া নিঃশব্দ পদে রাজলক্ষ্মী যখন গৃহে প্রবেশ করিল তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। আলো কমাইয়া, অত্যন্ত সাবধানে আমার মশারি ফেলিয়া দিয়া সে নিজের শয্যায় গিয়া শুইতে যাইতেছিল; আমি কথা কহিলাম। বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণভোজনের পালা ত সন্ধ্যার পূর্ব্বে শেষ হয়েছে, এত রাত হ'ল যে ?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে চমকিত হইল, পরে হাসিয়া কহিল, আ আমার কপাল! আমি ভয়ে ভয়ে আসছি পাছে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিই। এখনো জেগে আছ, ঘুমোও নি যে বড় ?

তোমার আশাতেই জেগে আছি।

আমার আশায়? তবে ডেকে পাঠাও নি কেন?—বলিয়া সে কাছে আসিয়া মশারীর একটা ধার তুলিয়া দিয়া আমার শয্যার শিয়রে আসিয়া বসিল। বরাবরের অভ্যাস মত আমার চুলের মধ্যে তাহার দুই হাতের দশ আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল, ডেকে পাঠাও নি কেন?

ডেকে পাঠালেই কি তুমি আসতে? তোমার কত কাজ।

হোক কাজ। তুমি ডাকলে না বলতে পারি এমন সাধ্যি আছে আমার?

ইহার উত্তর ছিল না। জানি, আমার আহ্বান সত্যই উপেক্ষা করিবার সাধ্য তাহার নাই; কিন্তু আজ এই সত্যকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার সাধ্য আমার কই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

ভাবছি।

ভাবছো? কি ভাবছো? বলিয়া সে ধীরে ধীরে আমার কপালের উপরে তাহার মাথাটি ন্যস্ত করিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার ওপর রাগ করে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলে যে বড়?

রাগ করে গিয়েছিলাম তুমি জানলে কি করে?

রাজলক্ষ্মী মাথা তুলিল না, আস্তে আস্তে বলিল, আমি রাগ করে গেলে তুমি জানতে পার না?

কহিলাম, বোধ হয় পারি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি বোধহয় পার, কিন্তু আমি নিশ্চয় পারি। আর তোমার পারার চেয়েও ঢের বেশি পারি।

হাসিয়া কহিলাম, তাই হোক। এ নিয়ে বিবাদ করে জয়ী হতে আমি চাই নে লক্ষ্মী, নিজের হারার চেয়ে তুমি হেরে গেলেই আমার ঢের বেশী লোকসান।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যদি জান, তবে বল কেন?

কহিলাম, বলি নে ত আর; কিন্তু বলা যে অনেকদিন বন্ধ করেছি, সেই খবরটিই তুমি জান না।

রাজলক্ষ্মী নীরব হইয়া রহিল। পূর্ব্বে হইলে সে আমাকে সহজে অব্যাহতি

দিত না, লক্ষ কোটি প্রশ্ন করিয়া ইহার কৈফিয়ৎ আদায় করিয়া লইত, কিন্তু এখন সে মৌন-মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে সে মুখ তুলিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাকি এর মধ্যে জ্বর হয়েছিল? কোথায় ছিলে? বাড়ীতে আমাকে খবর পাঠালে না কেন?

খবর না পাঠাইবার হেতু বলিলাম। একে ত খবর আনিবার লোক ছিল না; দ্বিতীয়তঃ যাঁহার কাছে খবর পাঠাইব, তিনি যে কোথায় জানিতাম না; কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে ছিলাম তাহার সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর নিকট আজই সকালে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। সেই দীন-হীন গৃহস্থ পরিবারে যে ভাবে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম এবং যেমন করিয়া অপরিসীম দৈন্যের মধ্যেও গৃহকর্ত্রী অজ্ঞাত-কুলশীল রোগগ্রস্থ অতিথিকে পুত্রাধিক স্নেহে শুশ্রূষা করিয়াছেন, তাহা বলিতে গিয়া কৃতজ্ঞতা ও বেদনায় আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া কহিল, যাতে তাঁরা ঋণমুক্ত হন, কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও না কেন?

বলিলাম, থাকলে দিতাম, কিন্তু টাকা ত আমার নেই।

আমার এই সকল কথায় রাজলক্ষ্মী মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইত, আজও সে মনে মনে তেমনিই দুঃখ পাইল, কিন্তু তাহার টাকা যে আমারও টাকা এ কথা সজোরে প্রতিপন্ন করিতে আগেকার দিনের মত আর কলহে প্রবৃত্ত হইল না। চুপ করিয়া রহিল।

এই জিনিষটা তাহার নূতন দেখিলাম। আমার এই কথার উত্তরে ঠিক এমনি শান্ত নিরুত্তরে বসিয়া থাকা আমাকেও বিঁধিল। কিছুক্ষণ পরে সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল। যেন দীর্ঘশ্বাসের বাতাস দিয়া সে তাহার চারিদিকে ঘনায়মান বাষ্পাচ্ছন্ন মোহের আবরণটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিল। ঘরের মন্দ আলোকে তাহার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। রাজলক্ষ্মী বলিল, বর্ম্মা থেকে তোমায় চিঠির জবাব এসেছে। আফিসের বড় খাম, হয় ত জরুরি কিছু আছে ভেবে আনন্দকে দিয়ে পড়িয়ে নিলাম।

তার পরে?

বড়সাহেব তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। জানিয়েছেন, তুমি গেলেই তোমার সাবেক চাকরী আবার ফিরে পাবে।

বটে!

হাঁ। আনবো চিঠিখানা?

না, থাক্। কাল সকালে দেখবো।

আবার দুজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। কি যে বলিব, কেমন করিয়া যে এই নীরবতা ভাঙ্গিব ভাবিয়া না পাইয়া মনের ভিতরটায় কেবল তোলপাড় করিতে লাগিল। হঠাৎ এক ফোঁটা চোখের জল টপ্ করিয়া আমার কপালের উপরে আসিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে এ ত খারাপ সংবাদ নয়; কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া বলিল, তুমি বিদেশে চাকরী নিয়ে আবার চলে যাবার চেষ্টা করছ, আমাকে একথা জানাও নি কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমি বাধা দেব?

কহিলাম, না। বরঞ্চ জানালে তুমি উৎসাহই দিতে; কিন্তু সে জন্য নয় —বোধ হয় ভেবেছিলাম এ সব তুচ্ছ ব্যাপার শোনবার তোমার সময় হবে না।

রাজলক্ষ্মী নির্ব্বাক হইয়া রহিল; কিন্তু তাহার উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস চাপিবার প্রাণপণ চেষ্টাও আমার কাছে গোপন রহিল না; কিন্তু ক্ষণকাল মাত্র। ক্ষণেক পরেই সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, এ কথার জবাব দিয়ে আর আমার অপরাধের বোঝা বাড়াব না। তুমি যাও, তোমাকে আমি কিছুতেই বারণ করব না। এই বলিয়া সে পুনরায় মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিল, এখানে না এলে বোধহয় আমি কোনদিন বুঝতে পারতাম না তোমাকে কত বড় দুর্গতির মধ্যে টেনে এনেছি। এই গঙ্গামাটির অন্ধকূপে মেয়েমানুষের চলে, কিন্তু পুরুষের চলে না। এখানকার এই কর্ম্মহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন ত তোমার আত্মহত্যার সমান। এ আমি চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেউ কি তোমায় দেখিয়ে দিয়েছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। আমি নিজেই দেখেছি। তীর্থযাত্রা করেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর দেখতে পাই নি। তার বদলে কেবল তোমার লক্ষ্যহারা বিরস

মুখই দিনরাত্রি চোখে পড়েছে। আমার জন্য তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু আর না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে একটা জ্বালার ভাবই ছিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরের অনির্ব্বচনীয় করুণায় বিভোর হইয়া গেলাম। বলিলাম তোমাকেই কি কম ছাড়তে হয়েছে লক্ষ্মী। গঙ্গামাটি ত তোমারও যোগ্য স্থান নয়; কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সঙ্কোচে মরিয়া গেলাম। কারণ, অনবধানতা বশতঃ যে গর্হিত বাক্য আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী এই রমণীর কাছে তাহা গোপন রহিল না; কিন্তু আমাকে আজ সে ক্ষমা করিল। বোধ হয় কথার ভাল-মন্দ লইয়া মান অভিমানের জাল বুনিয়া সময় নষ্ট করার মত সময় আর তার ছিল না। বলিল, বরঞ্চ আমিই গঙ্গামাটির যোগ্য নই। সকলে এ কথা বুঝবে না, কিন্তু তোমার বোঝা উচিত যে সত্যিই আমাকে কিছু ছাড়তে হয় নি। পাষাণের মত যে ভার একদিন লোকে আমার বুকে চাপিয়ে দিয়েছিল, কেবল তাই আর একদিন আমার ঘুচেছে। আর শুধু কি তাই? আজীবন তোমাকেই চেয়েছিলাম, তোমাকে পেয়ে, ছাড়ার অসংখ্য গুণ যে ফিরে পেয়েছি সে কি তুমিই জান না?

জবাব দিতে পারিলাম না। অন্তরের অজানা অভ্যন্তর হইতে কে যেন এই কথাই আমাকে বলিতে লাগিল, ভুল হইয়াছে, তোমার মস্ত ভুল হইয়াছে। না বুঝিয়া তাহাকে অত্যন্ত অবিচার করিয়াছি। রাজলক্ষ্মী ঠিক এই ভাবেই আঘাত করিল, বলিল, ভেবেছিলাম তোমার জন্য এ কথা কখনো তোমাকে জানাব না, কিন্তু আজ আর আমি থাকতে পারলুম না। এই কষ্টটাই আমার সবচেয়ে বেশি লেগেছে যে, তুমি অনায়াসে ভাবতে পেরেছ যে পুণ্যের লোভে আমি এমনি উন্মাদ হয়ে গেছি যে তোমাকেও অবহেলা করতে সুরু করেছি। রাগ করে চলে যাবার আগে এ কথা তোমার একবারও মনে হয়নি যে ইহকালে পরকালে রাজলক্ষ্মীর তোমার চেয়ে লোভের বস্তু আর কি আছে! বলিতে বলিতেই তাহার চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া আমার মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল।

কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিবার ভাষা মনে পড়িল না, শুধু মাথার উপর হইতে ডান হাতটি তাহার নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। রাজলক্ষ্মী বাঁ

হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছিয়া বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, প্রজাদের সব খাওয়া শেষ হ'ল কি না আমি দেখে আসিগে। তুমি ঘুমোও। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাকে ধরিয়া রাখিলে হয় ত রাখিতে পারিতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিলাম না। সেও আর ফিরিয়া আসিল না—আমারও যতক্ষণ না ঘুম আসিল শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম, জোর করিয়া রাখিয়া লাভ হইত কি? আমার পক্ষ হইতে ত কোনদিন কোন জোরই ছিল না, সমস্ত জোরই আসিয়াছিল তাহার দিক দিয়া। আজ সে-ই যদি বাঁধন খুলিয়া আমাকে মুক্তি দিয়া আমাকে মুক্ত করিতে চায় ত আমি ঠেকাইব কোন্ পথে?

সকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রথমেই ও-দিকের খাটের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী ঘরে নাই। রাত্রে সে আসিয়াছিল, কিম্বা অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের ঘরে গিয়া দেখি সেখানে একটা কোলাহল উঠিয়াছে। রতন কেট্‌লি হইতে গরম চা পাত্রে ঢালিয়াছে, এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা ষ্টোভে করিয়া সিঙ্গাড়া কচুরী ভাজিয়া তুলিতেছে, এবং বজ্রানন্দ তাহার সন্ন্যাসীর নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়া এই সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি চাহিয়া আছে। আমাকে ঢুকিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার ভিজা চুলের উপর আঁচল টানিয়া দিল এবং বজ্রানন্দ কলরব করিয়া উঠিল, এই যে দাদা! আপনার দেরী দেখে ভাবছিলাম বুঝি বা সমস্ত জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, হাঁ, তোমার পেটের মধ্যে গিয়ে জুড়িয়ে জল হ'ত!

আনন্দ কহিল, দিদি, সন্ন্যাসী-ফকিরকে খাতির করতে শিখুন। ও রকম কড়া কথা বলবেন না। আমাকে বলিল, কই, তেমন ভাল দেখাচ্ছে না ত! হাতটা একবার দেখব কি!

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, রক্ষে কর আনন্দ, তোমার আর ডাক্তারিতে কাজ নেই, উনি বেশ আছেন।

আনন্দ বলিল, সেইটাই নিশ্চয় করবার জন্যে হাতটা একবার—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, তোমাকে হাত দেখতে হবে না, এখ্‌খুনি হয় ত সাগুর ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বলিলাম, সাগু আমি ঢের খেয়েছি, সুতরাং ও ব্যবস্থা করে দিলেও আর শুনব্ না।

শুনেও তোমার কাজ নেই। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্লেটে করিয়া খান-কয়েক গরম কচুরী ও সিঙ্গাড়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। রতনকে কহিল, তোর বাবুকে চা দে।

বজ্রানন্দ সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বে ডাক্তারি পাশ করিয়াছিল, অতএব সহজে হার মানিবার পাত্র নয়; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে গেল, কিন্তু দিদি, একটা দায়িত্ব আপনার—

রাজলক্ষ্মী তাহার কথার মাঝখানেই থামাইয়া দিল, শোন কথা, ওঁর দায়িত্ব আমার নয় ত কি তোমার? আজ পর্য্যন্ত যত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ওঁকে খাড়া রাখতে হয়েছে সে যদি শুনতে ত দিদির কাছে আর ডাক্তারি করতে যেতে না। এই বলিয়া সে বাকি সমস্ত খাবার একটা থালায় ঢালিয়া তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সহাস্যে কহিল, এখন খাও এগুলো, কথা বন্ধ হোক্।

আনন্দ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আরে এত খাওয়া যায়?

রাজলক্ষ্মী বলিল, যায় না ত সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলে কেন? আরও পাঁচজন ভদ্রলোকের মত গেরস্ত থাকলেই ত হ'ত।

আনন্দর দুই চক্ষু সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মত দিদির দল এই বাঙ্গলা মুলুকে আছে বলেই ত', নইলে দিব্যি ক'রে বলছি আজই এই গেরুয়া-টেরুয়াগুলো অজয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যেতাম; কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে, দিদি। পরশু থেকেই একরকম উপোস করে আছেন, আজ আহ্নিক-টাহ্নিকগুলো একটু সকাল সকাল সেরে নিন। এ গুলোতে এখনও স্পর্শদোষ ঘটে নি, বলেন ত না হয়—, এই বলিয়া সে সম্মুখে ভোজ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

রাজলক্ষ্মী ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বল কি আনন্দ, কাল যে আমার সমস্ত ব্রাহ্মণ এসে উঠতে পারেন নি!

আমি বলিলাম, আগে তারা এসে উঠুন। তারপরে—

আনন্দ কহিল, তাহলে আমাকে উঠতে হ'ল। তাদের নামও ঠিকানা

দিন, পাষণ্ডদের গলায় গামছা দিয়ে এনে ভোজন করিয়ে ছাড়ব। এই বলিয়া সে উঠার পরিবর্ত্তে থালা টানিয়া লইয়া নিজেই ভোজনে মন দিল।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, সন্ন্যাসী কিনা, দেব-দ্বিজে অতিশয় ভক্তি।

এইরূপে আমাদের সকালের চা খাওয়ার পালাটা যখন সাঙ্গ হইল তখন বেলা আটটা। বাহিরে আসিয়া বসিলাম। শরীরেও গ্লানি ছিল না, হাসি-তামাসায় মনও যেন স্বচ্ছ, প্রসন্ন হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর বিগত রাত্রির কথাগুলোর সহিত তাহার আজিকার কথা ও আচরণের কোন ঐক্যই ছিল না। সে যে অভিমান ও বেদনায় ব্যথিত হইয়াই ঐরূপ করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রাত্রির স্তব্ধ আঁধার আবরণের মধ্যে তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনাকে বৃহৎ ও কঠোর কল্পনা করিয়া যে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়াছি, আজ দিনের আলোকে তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জাও পাইলাম, কৌতুকও অনুভব করিলাম।

কল্যকার মত আজ আর উৎসবের ঘটা ছিল না, তথাপি মাঝে মাঝে আহূত ও অনাহূতের ভোজন-লীলা সমস্ত দিনমান ব্যাপিয়াই অব্যাহত রহিল। বেলা গেল। আর একবার আমরা চায়ের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া ঘরের মেঝেতে আসন করিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার কাজ-কর্ম্ম কতকটা সারিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্য আমাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বজ্রানন্দ কহিল, দিদি স্বাগত।

রাজলক্ষ্মী তাহার প্রতি হাসিমুখে চাহিয়া বলিল, সন্ন্যাসীর বুঝি দেব-সেবা সুরু হ'ল, তাই এত আনন্দ ?

আনন্দ কহিল, মিথ্যে বলেন নি দিদি! সংসারে যাবতীয় আনন্দ আছে তার মধ্যে ভজনানন্দ ও ভোজনানন্দই শ্রেষ্ঠ এবং শাস্ত্র বলেছেন ত্যাগীর পক্ষে দ্বিতীয়টিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ, সে তোমার মত ত্যাগীর পক্ষে।

আনন্দ উত্তর দিল, এও মিথ্যে নয় দিদি। আপনি গৃহিণী বলেই এর মর্ম্মগ্রহণ করতে পারেন নি। নইলে আমরা ত্যাগীর দল যখন আনন্দে মশগুল হয়ে আছি, আপনি তখন তিনদিন ধরে কেবল পরকে খাওয়াচ্ছেন আর নিজে মরচেন উপবাস করে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মরছি আর কই ভাই? দিনের পর দিন ত দেখছি এ দেহটার শ্রীবৃদ্ধি হয়েই চলেছে।

আনন্দ কহিল, তার কারণ, হতে বাধ্য। সেবারেও আপনাকে দেখে গিয়েছিলাম, এবারেও এসে দেখছি। আপনার পানে চাইলে মনে হয় না যে পৃথিবীর জিনিষ দেখছি, এ যেন দুনিয়া ছাড়া আর কিছু।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে হাসিয়া কহিলাম, তোমার আনন্দর যুক্তির প্রণালীটা দেখলে? শুনিয়া আনন্দও হাসিল, কহিল, এ ত যুক্তি নয়—স্তুতি। দাদার সে-দৃষ্টি থাকলে কি আর বর্ম্মায় যেতেন চাকরীর দরখাস্ত করতে? আচ্ছা দিদি, কোন্ দুষ্ট-বুদ্ধি দেবতাটি দিয়েছিলেন এই অন্ধ মানুষটিকে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে? তাঁর কি আর কাজ ছিল না?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, দেবতার দোষ নেই ভাই, দোষ এই ললাটের। আর ওঁর দোষ ত অতিবড় শত্রুতেও দিতে পারবে না। এই বলিয়া সে আমাকে দেখাইয়া কহিল, পাঠশালে উনি ছিলেন সর্দ্দার-পোড়ো, যত না দিতেন পড়া ব'লে, তার ঢের বেশী দিতেন বেত। তখন পড়ি ত সবে বোধোদয়, বইয়ের বোধ ত খুবই হ'ল, বোধ হ'ল আর এক রকমের। ছেলেমানুষ, ফুল পাব কোথায়, বনের বঁইচি ফলের মালা গেথে ওঁকে করলাম বরণ। এখন ভাবি, তার সঙ্গে তার কাঁটাগুলোও যদি গেঁথে দিতাম! বলিতে বলিতে তাহার কুপিত কণ্ঠস্বর চাপা-হাসির আভায় অপরূপ হইয়া উঠিল।

আনন্দ কহিল, উঃ—কি ভয়ানক রাগ!

রাজলক্ষ্মী বলিল, রাগ নয় ত কি? কাঁটা তুলে দেবার আর কেউ থাকলে নিশ্চয় দিতাম। এখনো পাই ত দি। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতেছিল, আনন্দ ডাকিয়া কহিল, পালাচ্ছেন যে বড়?

কেন, আর কাজ নেই না কি? চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ওঁর কোঁদল করার সময় আছে, কিন্তু আমার নেই।

আনন্দ বলিল, দিদি আমি আপনার অনুগত ভক্ত; কিন্তু এ অভিযোগে সায় দিতে আমারও লজ্জা করছে। উনি একটা কথাও কইলে না হয় পাকিয়ে

তোলবার চেষ্টা করা যেত, কিন্তু একদম বোবা মানুষকে ফাঁদে ফেলা যায় কি ক'রে ? করলেও ধর্ম্মে সইবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঐ ত হয়েছে আমার জ্বালা। বেশ, ধর্ম্মে যা সয়, তাই না হয় কর। চায়ের বাটীগুলো সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—আমি ততক্ষণ রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি গে। বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, দাদার কি বর্ম্মা যাবার সঙ্কল্প এখনও আছে না কি ? কিন্তু দিদি কখ্খনো সঙ্গে যাবেন না তা আমাকে বলেছেন।

সে আমি জানি।

তবে ?

তবে একলাই যেতে হবে।

বজ্রানন্দ কহিল, এই দেখুন আপনার অন্যায়। অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যক আপনাদের নেই, তবে কিসের জন্যে যাবেন পরের গোলামি করতে ?

বলিলাম, অন্ততঃ অভ্যাসটা বজায় রাখতে!

এটা রাগের কথা দাদা।

কিন্তু রাগ ছাড়া কি মানুষের আর কোন হেতু থাকতে নেই, আনন্দ ?

আনন্দ কহিল, থাকলেও অপরের পক্ষে বোঝা কঠিন।

ইচ্ছা হইল বলি, এ কঠিন কাজ অপরের করিবারই বা প্রয়োজন কি, কিন্তু বাদানুবাদে জিনিষটা পাছে তিক্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় চুপ করিয়া গেলাম।

এমনি সময়ে রাজলক্ষ্মী বাহিরের কাজ সারিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এবং দাঁড়াইয়া না থাকিয়া একবার ভালমানুষের মত আনন্দের পার্শ্বে গিয়া স্থির হইয়া বসিল। আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দিদি, উনি বলছিলেন, অন্ততঃ গোলামির অভ্যাস বাহাল রাখবার জন্যেও ওঁর বিদেশ যাওয়া চাই। আমি বলছিলাম, তাই যদি চাই, আসুন না আমার কাজে যোগ দেবেন। বিদেশে না গিয়ে দেশের গোলামিতেই দুই ভাইয়ে জীবন কাটিয়ে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু উনি ত ডাক্তারি জানেন না আনন্দ ?

আনন্দ কহিল, আমি কি শুধু ডাক্তারিই করি ? ইস্কুল করি, পাঠশালা করি, তাদের দুর্দ্দশা যে কত দিক দিয়ে কত বড় তা অবিশ্রাম বোঝবার চেষ্টা করি।

তারা বোঝে ?

আনন্দ কহিল, সহজে বোঝে না; কিন্তু মানুষের শুভ ইচ্ছা যখন বুক থেকে সত্য হয়ে বার হয়, তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় না দিদি।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। বোধহয় সে বিশ্বাস করিল না, বোধহয় সে আমার জন্য মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, পাছে আমিও সায় দিয়া বসি, পাছে আমিও—

আনন্দ প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়লেন যে বড় ?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল, পরে স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে কহিল, দেশের দুর্দ্দশা যে কত বড় তা আমিও জানি আনন্দ ; কিন্তু তোমার একলার চেষ্টায় আর কি হবে ভাই ? আমাকে দেখাইয়া কহিল, আবার উনি যাবেন সাহায্য করতে ? তবেই হয়েছে। তা হ'লে আমার মত ওঁর সেবাতেই তোমার দিন কাটবে, আর কারও কিছু করতে হবে না। বলিয়া সে হাসিল।

তাহার হাসি দেখিয়া আনন্দ নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ নেই দিদি ওঁকে নিয়ে, থাকুন উনি চিরকাল আপনার চোখের মণি হয়ে; কিন্তু একলা দোকলার কথা এ নয়! একলা মানুষেরও আন্তরিক ইচ্ছা-শক্তি এত বড় যে তার পরিমাণ হয় না। ঠিক বামনদেবের পায়ের মত। বাইরে থেকে সে দেখতে ছোট, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পদতলটুকু প্রসারিত হলে বিশ্ব আচ্ছন্ন করে দেয়।

চাহিয়া দেখিলাম, বামনদের উপমায় রাজলক্ষ্মীর চিত্ত কোমল হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সে কিছুই কহিল না।

আনন্দ বলিতে লাগিল, হয় ত আপনার কথাই ঠিক, বিশেষ কিছু করতে আমি পারি নে ; কিন্তু একটা কাজ করি। সাধ্যমত দুঃখীর দুঃখের অংশ আমি নিই দিদি।

রাজলক্ষ্মী অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, সে আমি জানি, আনন্দ। তোমাকে দেখে প্রথম দিনই আমি তা বুঝেছিলাম।

আনন্দ বোধহয় এ কথায় কান দিল না, সে নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, আপনাদের মত আমারও অভাব কিছুই ছিল না। বাবার যা আছে, বিপুল, সুখে দিন কাটাবার পক্ষেও সে বেশী। আমার কিন্তু তাতে

প্রয়োজন নেই। এই দুঃখীর দেশে সুখ-ভোগের লালসাটাও যদি এ জীবনে ঠেকিয়ে রাখতে পারি সেই আমার ঢের।

রতন আসিয়া জানাইল, পাচক বলিতেছে খাবার প্রস্তুত।

রাজলক্ষ্মী তাহাকে ঠাঁই করিবার আদেশ দিয়া আমাদের কহিল, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল সেরে নাও আনন্দ, আমি বড় ক্লান্ত।

সে যে ক্লান্ত তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু ক্লান্তির দোহাই দিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই। উভয়ে নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রঙ্গ-রহস্যে আজিকার প্রভাত আরম্ভ হইয়াছিল আমাদের ভারী একটা প্রসন্নতার মধ্য দিয়া, সায়াহ্নের সভাও জমিয়াছিল হাস্যপরিহাসে উজ্জ্বল হইয়া; কিন্তু ভাঙ্গিল যেন নিরানন্দের মলিন অবসাদে। আহারের জন্য দুজনে যখন রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম তখন কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না।

পরদিন সকালে বজ্রানন্দ প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। কাহারও কোথাও যাইবার কথা উঠিলেই রাজলক্ষ্মী চিরদিন আপত্তি করে। দিনক্ষণের অজুহাতে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করিয়া অত্যন্ত বাধা দেয়; কিন্তু আজ সে একটা কথাও বলিল না। শুধু বিদায় লইয়া যখন সে প্রস্তুত হইল, তখন কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আনন্দ, আবার কবে আসবে ভাই?

আমি নিকটেই ছিলাম, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সন্ন্যাসীর চোখের দীপ্তি ঝাপ্সা হইয়া আসিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আসব বই কি দিদি। যদি বেঁচে থাকি, মাঝে মাঝে উৎপাত করতে হাজির হবই।

ঠিক ত?

নিশ্চয়।

কিন্তু আমরা ত শীঘ্রই চলে যাব। যেখানে থাকব যাবে সেখানে?

আদেশ করলে যাব বই কি দিদি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেয়ো। তোমার ঠিকানা আমাকে লিখে দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখব।

আনন্দ পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া ঠিকানা লিখিয়া হাতে

দিল। সন্ন্যাসী হইয়াও আমাদের উভয়কে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, এবং রতন আসিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলে আশীর্ব্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

পনের

সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ তাহার ঔষধের বাক্স ও ক্যাম্বিসের ব্যাগ লইয়া যেদিন বাহির হইয়া গেল সেদিন শুধু যে সে এ বাড়ীর সমস্ত আনন্দটুকুই ছাঁকিয়া লইয়া গেল তাই নয়, আমার মনে হইল যেন সে সেই শূন্য স্থানটুকু ছিদ্রহীন নিরানন্দ দিয়া ভরিয়া দিয়া গেল। ঘন শৈবাল পরিব্যাপ্ত জলাশয়ের যে জলটুকু তাহার অবিশ্রান্ত চাঞ্চল্যের অভিঘাতে আবর্জ্জনামুক্ত ছিল, সে যেন তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লেপিয়া একাকার হইতে চলিল। তবুও ছয়-সাতদিন কাটিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী প্রায় সারাদিনই বাড়ী থাকে না। কোথায় যায় কি করে জানি না, জিজ্ঞাসাও করি না। দিনান্তে একবার যখন দেখা হয় তখন হয় সে অন্যমনস্ক, না হয় বড় কুশারীঠাকুর সঙ্গে থাকেন, কাজের কথা চলে। একলা ঘরের মধ্যে, যে আনন্দ আমার কেহ নয়, তাকেই বার বার মনে পড়ে। মনে হয় হঠাৎ যদি সে আবার আসিয়া পড়ে! শুধু যে কেবল আমিই খুসী হই তাই নয়, ওই যে রাজলক্ষ্মী বারান্দার ওধারে বসিয়া প্রদীপের আলোকে কি একটা করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি জানি সেও তেমনি খুসী হইয়া উঠে। এমনিই বটে। একদিন যাহাদের উন্মুখ যুগ্ম-হৃদয় বাহিরের সর্ববিধ সংস্রব পরিহার করিয়া একান্ত সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া থাকিত, আজ ভাঙ্গনের দিনে সেই বাহিরটাকেই আমাদের কত বড়ই না প্রয়োজন! মনে হয় যে-কেহ-হোক, একবার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি।

এমনি করিয়া দিন যখন আর কাটিতে চাহে না, তখন হঠাৎ একসময়ে রতন আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখের হাসি সে আর চাপিতে পারে না! রাজলক্ষ্মী গৃহে ছিল না, অতএব তাহার ভীত হইবারও আবশ্যক ছিল

না, তথাপি সে সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আস্তে আস্তে বলিল শোনেন নি বুঝি ?

কহিলাম, না।

রতন বলিল, মা দুর্গা করুন, মায়ের এই মতিটি যেন শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে। আমরা দু-চার দিনেই যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছি ?

রতন আর একবার দ্বারের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কহিল, সে খবরটা সঠিক এখনো পাই নি। হয় পাটনায়, না হয় কাশীতে, না হয়— কিন্তু এ ছাড়া মার বাড়ী ত আর কোথাও নেই !

চুপ করিয়া রহিলাম। আমার এত বড় ব্যাপারেও নিরুৎসুকতা লক্ষ্য করিয়া বোধহয় সে ভাবিল আমি তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাই সে চাপা গলায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি বলছি এ সত্যি। যাওয়া আমাদের হবেই। আঃ—বাঁচা যায় তা হ'লে, না ?

বলিলাম, হাঁ।

রতন অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল, কষ্ট করে আর দু-চারদিন সবুর করুন, ব্যস্। বড় জোর হপ্তা-খানেক, তার বেশী নয়। গঙ্গামাটির সমস্ত ব্যবস্থা মা কুশারীমশাইয়ের সঙ্গে শেষ করে ফেলেছেন, এখন বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে একবার দুর্গা দুর্গা বলে পা বাড়াতে পারলে হয়। আমরা হলুম সব সহরের মানুষ, এখানে কি কখনো মন বসে ? এই বলিয়া সে খুসীর আবেগে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

রতনের অজানা কিছুই নাই। তাহাদেরই মত আমিও যে একজন রাজলক্ষ্মীর অনুচরের মধ্যে, এবং ইহার অধিক কিছু নয়, এ কথা সে জানে। সে জানে, কাহারও কোন মতামতেরই মূল্য নাই, সকলের সমস্ত ভাল লাগা-না-লাগা কর্ত্রীর ইচ্ছা ও অভিরুচির 'পরেই নির্ভর করে।

যে আভাষটুকু রতন দিয়া গেল সে নিজে তাহার মর্ম্ম বুঝে না, কিন্তু তাহার বাক্যের সেই নিহিত অর্থ দেখিতে দেখিতে আমার চিত্তপটে সর্ব্বদিক দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর শক্তির অবধি নাই, এই বিপুল শক্তি দিয়া পৃথিবীতে সে যেন কেবল নিজেকে লইয়াই খেলা করিয়া চলিয়াছে।

একদিন এই খেলায় আমার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার সেই একাগ্র বাসনার প্রচণ্ড আকর্ষণ প্রতিহত করিবার সাধ্য আমার ছিল না, হেঁট হইয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে সে বড় করিয়া আনে নাই। ভাবিতাম আমার জন্য সে অনেক স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছে; কিন্তু আজ চোখে পড়িল ঠিক তাহাই নয়। রাজলক্ষ্মীর স্বার্থের কেন্দ্রটা এতকাল দেখি নাই বলিয়াই এরূপ ভাবিয়া আসিয়াছি। বিত্ত, অর্থ, ঐশ্বর্য্য—অনেক কিছুই সে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে কি আমরই জন্য? আবর্জ্জনা স্তূপের মত সে সকল কি তাহার নিজের প্রয়োজনেরই পথরোধ করে নাই? আমি এবং আমাকে লাভ করার মধ্যে যে রাজলক্ষ্মীর কতবড় প্রভেদ ছিল সেই সত্য আজ আমার কাছে প্রতিভাত হইল। আজ তাহার চিত্ত ইহলোকের সমস্ত পাওয়া তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার সেই পথ জুড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান আমার নাই। অতএব অন্যান্য আবর্জ্জনার মত আমাকেও যে এখন পথের একধারে অনাদরে পড়িয়া থাকিতে হইবে তাহা যত বেদনাই দিক, অস্বীকার করিবার পথ নাই। অস্বীকার করিও না কখনও।

পরদিন সকালেই জানিতে পারিলাম ধূর্ত্ত রতন তথ্য যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা ভ্রান্ত নহে। গঙ্গামাটি সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর নিজের মুখেই তাহা অবগত হইলাম, প্রভাতে নিয়মিত পূজা আহ্নিক সমাধা করিয়া সে অপরাপর দিনের মত বাহির হইল না। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, পরশু এমনি সময়ে যদি খাওয়া-যাওয়া শেষ ক'রে আমরা বার হয়ে যেতে পারি ত সাঁইথিয়ার পশ্চিমের গাড়ী অনায়াসে ধরতে পারব, কি বল?

বলিলাম, পারবে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এখানকার বিলি-ব্যবস্থা ত এক রকম শেষ করে ফেললাম। কুশারীমশাই যেমন দেখছিলেন, শুনছিলেন, তেমনিই করবেন।

কহিলাম, ভালই হ'ল।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। বোধ হয় প্রশ্নটা ঠিকমত আরম্ভ করিতে পারিতেছিল না বলিয়াই। শেষে কহিল, বঙ্কুকে চিঠি লিখে দিয়েছি, সে একখানা গাড়ী রিজার্ভ করে ষ্টেশনেই উপস্থিত থাকবে; কিন্তু থাকে তবেই ত!

বলিলাম, নিশ্চয় থাকবে। সে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না সাধ্যমত করবে না। তবুও—আচ্ছা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না?

কোথায় যাইতে হইবে এ প্রশ্ন করিতে পারিলাম না। মুখে বাধিল। কেবল বলিলাম, যদি যাবার প্রয়োজন মনে কর ত যেতে পারি।

ইহার প্রত্যুত্তরে রাজলক্ষ্মীও কিছু বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কই তোমার চা এখনো ত আনলে না?

কহিলাম, বোধ হয় কাজে ব্যস্ত আছে।

বস্তুতঃ, চা আনিবার সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেকার দিনে ভৃত্যদের এতবড় অপরাধ সে কিছুতেই মার্জ্জনা করিতে পারিত না, বকিয়া-ঝকিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিত, কিন্তু এখন কি একপ্রকারের লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল এবং একটা কথাও না কহিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে সকল প্রজারা আসিয়াই ঘেরিয়া দাঁড়াইল। ডোমদের মালতী মেয়েটিকে আর একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া তাহারা অন্যত্র গিয়া সংসার পাতাইয়াছিল, দেখা হইল না। খবর পাইলাম সেখানে স্বামী লইয়া সে সুখে আছে। কুশারী-সহোদর-যুগল রাত্রি থাকিতেই সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁতীদের সম্পত্তি-ঘটিত বিবাদের সুমীমাংসা হওয়ায় তাঁহারা আবার এক হইয়াছিলেন। কি করিয়া যে রাজলক্ষ্মী কি করিল সবিস্তারে জানিবার কৌতূহলও ছিল না, জানিও না। কেবল এইটুকু তাঁহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া জানিতে পারিলাম যে, কলহের অবসান হইয়াছে, এবং পূর্ব্ব-সঞ্চিত বিচ্ছেদের গ্লানি কোন পক্ষের মনেই আর বিদ্যমান নাই।

সুনন্দা আসিয়া তাহার ছেলেকে লইয়া আমাকে প্রণাম করিল, কহিল, আমাদের যে আপনি শীঘ্র ভুলে যাবেন না সে আমি জানি। এ বাহুল্য প্রার্থনা আপনার কাছে আমি করব না।

সহাস্যে কহিলাম, আমার কাছে আবার কি কাজের প্রার্থনা করবে, দিদি?

আমার ছেলেকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

কহিলাম, এই ত বাহুল্য প্রার্থনা, সুনন্দা। তোমার মত মায়ের ছেলেকে যে কোন্ আশীর্ব্বাদ করা যায় সে ত আমিই জানি নে, দিদি।

রাজলক্ষ্মী কি একটা প্রয়োজনে এই দিক দিয়া যাইতেছিল কথাটা তাহার কানে যাইতেই ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার হইয়া জবাব দিয়া কহিল, ওর ছেলেকে তুমি এই আশীর্ব্বাদ করে যাও যেন বড় হয়ে ও তোমার মত মন পায়।

হাসিয়া কহিলাম, বেশ আশীর্ব্বাদ। তোমার ছেলেকে বুঝি লক্ষ্মী তামাসা করতে চায়, সুনন্দা।

কথা আমার শেষ না হইতেই রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, কি, তামাসা করতে চাই নিজের ছেলের সঙ্গে? এই যাবার সময়ে? এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমিও ত ওর মায়ের মত, আমি প্রার্থনা করি ভগবান যেন ওকে এই বরই দেন। তার চেয়ে বড় ত আমি কিছুই জানি নে।

সহসা চাহিয়া দেখিলাম তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর একটি কথাও না কহিয়া সে ঘর হইলে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর সবাই মিলিয়া গঙ্গামাটি হইতে চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এমন কি রতন পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ চোখ মুছিতে লাগিল। যাহারা রহিল তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সকলেই আবার আসিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, শুধু দিতে পারিলাম না আমি। আমিই কেবল নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম এ জীবনে এখানে ফিরিয়া আসিবার আমার সম্ভাবনা নাই। তাই যাবার পথে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রতি বার বার ফিরিয়া চাহিয়া কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যেন অপরিমেয় মাধুর্য্য ও বেদনায় পরিপূর্ণ একখানি বিয়োগান্ত নাটকের একমাত্র যবনিকা পড়িল; নাট্যশালার দীপ নিভিল—এইবার মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ সংসারের সহস্রবিধ ভীড়ের মধ্যে আমাকে রাস্তায় বাহির হইতে হইবে; কিন্তু জনতার মাঝখানে যে-মনের অত্যন্ত সতর্কতায় পদক্ষেপ করিবার কথা, আমার সেই মন যেন নেশার ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরে আমরা সাঁইথিয়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মীর

আদেশ ও উপদেশের কোনটাই বঙ্কু অবহেলা করে নাই। সে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া নিজে আসিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত ছিল, যথাসময়ে ট্রেন আসিলে মাল-পত্র বোঝাই দিয়া রতনকে চাকরদের কামরায় তুলিয়া দিয়া বিমাতাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল; কিন্তু আমার সহিত সে বিশেষ কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিল না, কারণ এখন তাহার দর বাড়িয়াছে, ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি লইয়া এখন সংসারে সে মানুষের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; বঙ্কু বিচক্ষণ ব্যক্তি। সকল অবস্থাকেই মানিয়া লইয়া চলিতে জানে। এ বিদ্যা যাহার অধিগত হইয়াছে পৃথিবীতে তাহাকে দুঃখ বোধ করিতে হয় না।

গাড়ী ছাড়িতে তখনও মিনিট-পাঁচেক বাকি ছিল, কিন্তু আমার কলিকাতা যাইবার ট্রেণ আসিবে প্রায় শেষ রাত্রে। একধারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, রাজলক্ষ্মী তাহার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া হাতের ইসারায় আমাকে আহ্বান করিল। নিকটে যাইতেই কহিল, একবার ভেতরে এস। ভিতরে আসিতে সে হাত ধরিয়া আমাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিল, তুমি কি খুব শীঘ্রই বর্ম্মায় চলে যাবে? যাবার আগে আর একটিবার কি দেখা দিয়ে যাবে না?

কহিলাম, যদি প্রয়োজন মনে কর যেতে পারি।

রাজলক্ষ্মী চুপি চুপি উত্তর দিল, সংসারে যাকে প্রয়োজন বলে সে নেই। শুধু আর একবার দেখতে চাই। আসবে?

আসব।

কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দেবে?

দেব।

বাহিরে গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং গার্ডসাহেব তাঁহার সবুজ আলো বার বার নাড়িয়া এই আদেশই কায়েম করিলেন। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া আমার পায়ের ধূলো লইয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিল। আমি নামিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেই গাড়ী চলিতে সুরু করিল। অন্ধকার রাত্রি, ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না, কেবল ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মের গোটা-কতক কেরোসিনের আলো মন্থরগতিশীল গাড়ীর সেই খোলা জানালার একটি অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তির উপরে বার-কয়েক আলোকপাত করিল।

কলিকাতা আসিয়া চিঠি দিলাম, এবং জবাবও পাইলাম। এখানে কাজ বেশী ছিল না, যাহা ছিল তাহা দিন-পনেরর মধ্যে শেষ হইল। এইবার বিদেশে যাইবার আয়োজন করিতে হইবে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি মত আর একবার রাজলক্ষ্মীকে দেখা দিতে হইবে। আরও সপ্তাহ-দুই এমনিই কাটিয়া গেল। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল এতদিনে কি জানি কি তাহার মতলব হইবে, হয় ত সহজে ছাড়িতে চাহিবে না, হয়ত দূরে যাওয়ার বিরুদ্ধে নানারূপ ওজর আপত্তি তুলিয়া জিদ করিতে থাকিবে—কিছুই অসম্ভব নয়। এখন সে কাশীতে। তাহার বাসার ঠিকানাও জানি, ইতিমধ্যে দুই-তিন-খানা পত্রও পাইয়াছি, এবং ইহাও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমার প্রতিশ্রুতির বিষয় কোথাও সে ইঙ্গিতে স্মরণ করাইবার প্রয়াস করে নাই। না করিবারই কথা! মনে মনে বললাম, আপনাকে এতখানি ছোট করিয়া আমিও বোধ করি মুখ ফুটিয়া লিখিতে পারিতাম না, তুমি একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যাও। অকস্মাৎ দেখিতে দেখিতে কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিলাম। এ জীবনে সে যে এতখানি জড়াইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া যে এতদিন ভুলিয়াছিলাম ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম তখনও সময় আছে, তখনও গাড়ী ধরিতে পারি। বাসায় সমস্ত পড়িয়া রহিল, বাহির হইয়া পড়িলাম। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষগুলোর প্রতি চাহিয়া মনে হইল থাক্ এ সকল পড়িয়া। আমার প্রয়োজনের কথা যে আমার চেয়েও বেশী করিয়া জানে তাহার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া আর প্রয়োজনের বোঝা বহিব না। রাত্রে ট্রেনের মধ্যে কিছুতেই ঘুম আসিল না, অলস তন্দ্রার ঝোঁকে মুদ্রিত দুই চক্ষুর পাতার উপরে কত খেয়াল, কত কল্পনাই যে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহার আদি অন্ত নাই। হয়ত অধিকাংশই এলোমেলো, কিন্তু সবটুকু যেন একেবারে মধু দিয়া ভরা। ক্রমশঃ সকাল হইল, বেলা বাড়িতে লাগিল, লোকজনের ওঠা-নামা হাঁকা-হাঁকি, দৌড়-ধাপের অবধি রহিল না, খুব রৌদ্রতাপে চতুষ্পার্শের কোথাও কোন কুহেলিকার চিহ্নমাত্র রহিল না, কিন্তু আমার চক্ষে সমস্তই একেবারে বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পথে ট্রেণের বিলম্ব হওয়ায় রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাটীতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা অধিক হইয়াছে। বাহিরে বসিবার ঘরের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ গোছের ব্রাহ্মণ বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চান ?

কি চাই সহসা বলিতে পারিলাম না। তিনি পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কাকে খুঁজছেন ?

কাহাকে খুঁজিতেছি ইহাও সহসা বলা কঠিন। একটু থামিয়া কহিলাম, রতন আছে ?

না, সে বাজারে গেছে !

ব্রাহ্মণ সজ্জন ব্যক্তি। আমার ধূলি-ধূসর মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া বোধ হয় অনুমান করিলেন যে আমি দূর হইতে আসিতেছি। সদয় কণ্ঠে কহিলেন, আপনি বসুন, সে শীঘ্রই ফিরিবে। আপনার কি তাকেই শুধু দরকার ?

নিকটে একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িলাম। তাঁহার প্রশ্নের ঠিক উত্তরটা না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে বঙ্কুবাবু আছেন ?

আছেন বই কি। এই বলিয়া তিনি একজন নতুন চাকরকে ডাকিয়া বঙ্কুকে ডাকিয়া দিতে কহিলেন। বঙ্কু আসিয়া আমাকে দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, পরে তাহার নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইয়া কহিল, আমরা ভেবেছিলাম আপনি বুঝি বর্ম্মায় চলে গেছেন।

এই আমরা যে কে কে এ প্রশ্ন আমি আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। বঙ্কু কহিল, আপনার জিনিষ-পত্র বুঝি এখনো গাড়ীতেই—

না, জিনিষ-পত্র আমি কিছুই সঙ্গে আনি নি।

আনেন নি ? রাত্রের গাড়ীতেই ফিরবেন বুঝি ?

কহিলাম, সম্ভব হলে তাই ফিরব ভেবেছি।

বঙ্কু কহিল, তা হলে একটা বেলার জন্যে আর দরকারই বা কি।

ভৃত্য আসিয়া ধুতি গামছা হাত-মুখ ধোবার জল প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্তই দিয়া গেল, কিন্তু আর কেহ আমার কাছে আসিল না।

খাবার ডাক পড়িল, গিয়া দেখিলাম আমার ও বঙ্কুর ঠাঁই পাশাপাশি

হইয়াছে। দক্ষিণের দরজা ঠেলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। গোড়ায় বোধহয় তাহাকে চিনিতে পারি নাই। যখন পারিলাম প্রথমটা চোখের সম্মুখে যেন সমস্ত কালো হইয়া উঠিল। এখানে কি আছে, এবং কে আছে মনে পড়িল না। পরক্ষণেই মনে হইল নিজের মর্য্যাদা রাখিয়া, হাস্যকর কিছু একটা না করিয়া ফেলিয়া কেমন করিয়া এ বাড়ি হইতে আবার সহজ মানুষের মত বাহির হইতে পারিব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, গাড়ীতে কষ্ট হয় নি ত।

এ ছাড়া সে আর কি বলিতে পারে! ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, বোধ হয় মুহূর্ত্ত-কয়েকের বেশী নয়, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিলাম, না কষ্ট হয় নি।

এইবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে যে শুধু থান কাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই মেঘের মত পিঠ-জোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশিও আর নাই। মাথার 'পরে ললাটের প্রান্ত পর্য্যন্ত আঁচল-টানা, তথাপি তাহারই ফাঁক দিয়া কাটা চুলের দুই-চারি-গোছা অলক কণ্ঠের উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উপবাস ও কঠোর আত্ম-নিগ্রহের এমনি একটা রুক্ষ শীর্ণতা মুখের'পরে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইল এই একটা মাসেই বয়সেও সে যেন আমাকে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ভাতের গ্রাস আমার গলায় পাথরের মত বিঁধিতেছিল, তবু জোর করিয়া গিলিতে লাগিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল যেন চিরদিনের মত এই নারীর জীবন হইতে আমি মুছিয়া বিলুপ্ত হইতে পারি, এবং আজ শুধু একটা দিনের জন্যও সে যেন আমার খাওয়ার স্বল্পতা লইয়া আর আলোচনা করিবার অবসর না পায়।

আহারের শেষে রাজলক্ষ্মী কহিল, বঙ্কু বলছিল তুমি নাকি আজ রাত্রের গাড়ীতেই ফিরে যেতে চাও?

বলিলাম, হাঁ।

ইস্! আচ্ছা, কিন্তু তোমার জাহাজ ছাড়বে ত সেই রবিবারে।

তাহার এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে বিস্মিত হইয়া মুখের প্রতি চাহিতেই

সে হঠাৎ যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তার ত এখনও তিন দিন দেরী!

বলিলাম, হাঁ, আরও কাজ আছে।

পুনরায় রাজলক্ষ্মী কি একটা বলিতে গিয়াও চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় আমার শ্রান্তি বা অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনার কথা মুখে আনিতে পারিল না। খানিকক্ষণ পরে মৌন থাকিয়া কহিল, আমার গুরুদেব এসেছেন।

বুঝিলাম বাহিরে যে ব্যক্তির সহিত প্রথমেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল তিনিই। ইঁহাকেই দেখাইবার জন্য সে আমাকে একবার এই কাশীতেই টানিয়া আনিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমার গাড়ী ছাড়িবে বারোটার পরে। এখনও ঢের সময়। মানুষটি সত্যই ভাল। স্বধর্ম্মে অবিচলিত নিষ্ঠাও আছে, উদারতারও অভাব নাই। আমাদের সকল কথাই জানেন, কারণ গুরুর কাছে রাজলক্ষ্মী গোপন কিছুই করে নাই। অনেক কথাই বলিলেন, গল্পচ্ছলে উপদেশও কম দিলেন না, কিন্তু তাহা উগ্রও নয়, আঘাতও করে না। সমস্ত কথা মনে নাই, হয়ত মন দিয়াও শুনি নাই, তবে এটুকু স্মরণ আছে যে একদিন রাজলক্ষ্মীর যে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তিনি তাহা জানিতেন, তাই দীক্ষার সম্বন্ধেও তিনি প্রচলিত রীতি মানেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, যাহার পা পিছলাইয়াছে, সৎগুরুর প্রয়োজন তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ইহার বিরুদ্ধে আর বলিবার কি আছে? তিনি আর এক দফা শিষ্যার ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্ম্মশীলতার অজস্র প্রশংসা করিলেন; কহিলেন, এমন আর দেখি নাই। বস্তুতঃ ইহাই সত্য, এবং কাহারও অপেক্ষা আমি নিজেও কম জানি না; কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

সময় হইয়া আসিল, ঘোড়ার গাড়ী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, গুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া আমি গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। রাজলক্ষ্মী পথে আসিয়া গাড়ীর ভিতরে হাত বাড়াইয়া বার বার করিয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় দিল, কিন্তু কথা কহিল না। বোধ হয় সে শক্তি তাহার ছিল না। ভালই হইল যে অন্ধকারে সে আমার মুখ দেখিতে পাইল না। আমিও স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, কি যে বলিব, খুঁজিয়া

পাইলাম না। শেষ বিদায়ের পালাটা নিঃশব্দে সাঙ্গ হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে দুই চোখ দিয়া আমার ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সর্ব্বান্তঃকরণে কহিলাম, তুমি সুখী হও, শান্ত হও, তোমার লক্ষ্য ধ্রুব হোক, তোমাকে হিংসা করি না, কিন্তু যে দুর্ভাগা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া একই সাথে একদিন তরুণী ভাসাইয়াছিল, এ জীবনে তাহার আর কূল মিলিবে না। ঘর্ ঘর্ ঝর্ ঝর্ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল, গঙ্গামাটির সকল স্মৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিল। সেদিন বিদায়ের ক্ষণে যে সকল কথা মনে আসিয়াছিল, আবার তাহাই জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, এই যে এক জীবন-নাট্যের অত্যন্ত স্থূল এবং সাধু উপসংহার হইল ইহার খ্যাতির আর অন্ত নাই। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিলে ইহার অম্লান দীপ্তি কোনদিন নিবিবে না, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে মাথা নত করিবার মত পাঠকেরও কোনদিন সংসারে অভাব ঘটিবে না —কিন্তু আমার নিজের কথা কাহাকেও বলিবার নহে—আমি চলিলাম অন্যত্র। আমারই মত যে কলুষের পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছে, ভাল হইবার আর পথ পাই, সেই অভয়ার আশ্রয়ে। মনে মনে রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, তোমার পুণ্য-জীবন উন্নত হইতে উন্নততর হোক, তোমার মধ্য দিয়া ধর্ম্মের মহিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হোক, আমি আর ক্ষোভ করিব না। অভয়ার চিঠি পাইয়াছি। স্নেহে, প্রেমে, করুণায় অটল অভয়া, ভগিনীর অধিক—বিদ্রোহী অভয়া আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আসিবার কালে ক্ষুদ্র দ্বারপ্রান্তে তাহার সজল চক্ষু মনে পড়িল, মনে পড়িল তাহার সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস। চিত্তের শুচিতায়, বুদ্ধির নির্ভরতায় ও আত্মার স্বাধীনতায় সে যেন আমার সমস্ত দুঃখ এক নিমিষে আবৃত করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সহসা গাড়ী থামিতে চমকিত হইয়া দেখিলাম ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি। নামিয়া দাঁড়াইতে আর একব্যক্তি কোচবাক্স হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

কে রে, রতন যে?

বাবু, বিদেশে চাকরের যদি অভাব হয় ত আমাকে একটু খবর দেবেন। যতদিন বাঁচব আপনার সেবার ত্রুটি হবে না।

গাড়ীর লণ্ঠনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তুই কাঁদচিস্ কেন বল্ ত?

রতন জবাব দিল না, হাত দিয়া চোখ মুছিয়া পায়ের কাছে আর একবার ঢিপ্ করিয়া নমস্কার করিয়াই দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আশ্চর্য্য, এই সেই রতন!

চতুর্থ পর্ব্ব

এক

এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মতো। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই। কাশীর ফেরত-ট্রেনের মধ্যে বসিয়া বার বার করিয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আমার ভাগ্যেই বা পুনঃ পুনঃ এমন ঘটে কেন? আমরণ নিজের বলিয়া কি কোনদিন কিছুই পাইব না? এমনি করিয়াই কি চিরজীবন কাটিবে? ছেলে-বেলার কথা মনে পড়িল। পরের ইচ্ছায় পরের ঘরে বছরের পর বছর জমিয়া এই দেহটাকেই দিল শুধু কৈশোর হইতে যৌবনে আগাইয়া কিন্তু মনটাকে দিয়াছে কোন্ রসাতলের পানে খেদাইয়া। আজ অনেক ডাকাডাকিতেও সেই বিদায় দেওয়া মনের সাড়া মিলে না, যদিবা কোন ক্ষীণ কণ্ঠের অনুরণন কদাচিৎ কানে আসিয়া লাগে, আপন বলিয়া নিঃসংশয়ে চিনিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে ভয় পাই।

এটা বুঝিয়া আসিয়াছি রাজলক্ষ্মী আমার জীবনে আজ মৃত, বিসর্জ্জিত প্রতিমার শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া ফিরিয়াছি—আশা করিবার, কল্পনা করিবার, আপনাকে ঠকাইবার কথাও কোন সূত্র আর অবশিষ্ট রাখিয়া আসি নাই। ওদিকটা নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; কিন্তু এই শেষ যে কতখানি শেষ, তাহা বলিবই বা কাহাকে, আর বলিবই বা কেন?

কিন্তু এই ত সেদিন। কুমারসাহেবের সঙ্গে শিকারে যাওয়া—

দেবাৎ পিয়ারীর গান শুনিতে বসিয়া এমন কিছু একটা ভাগ্যে মিলিল যাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপরিসীম। নিজের গুণে পাই নাই, নিজের দোষেও হারাই নাই, তথাপি হারানোটাকেই আজ স্বীকার করিতে হইল, ক্ষতিটাই আমার বিশ্ব জুড়িয়া রহিল। চলিয়াছি কলিকাতায়, বাসনা একদিন আবার বর্ম্মায় পৌঁছিব ; কিন্তু এ যেন সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া জুয়াড়ীর ঘরে ফেরা। ঘরের ছবি অস্পষ্ট, অপ্রকৃত —শুধু পথটাই সত্য। মনে হয়, এই পথের চলাটা যেন আর না ফুরায়।

অ্যাঁ! এ কি শ্রীকান্ত যে!

এ যে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে সে খেয়ালও করি নাই। দেখি, আমার দেশের ঠাকুর্দ্দা ও রাঙাদিদি ও একটি সতের-আঠার বছরের মেয়ে ঘাড়ে, মাথায় ও কাঁখে একরাশ মোটঘাট লইয়া প্লাটফর্ম্মে ছুটোছুটি করিয়া অকস্মাৎ আমার জানালার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছেন।

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, উঃ কি ভিড়! একটা ছুঁচ গলাবার জায়গা নেই! এই ত তিন-তিনটে মানুষ! তোমার গাড়ীটি ত দিব্যি খালি—উঠবো?

উঠুন, বলিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা তিন-তিনটে মানুষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া যাবতীয় বস্তু নামাইয়া রাখিলেন, ঠাকুর্দ্দা কহিলেন, এ বুঝি বেশি ভাড়ার গাড়ী, আবার দণ্ড লাগবে না ত?

বলিলাম, না, আমি গার্ডসাহেবকে বলে দিয়ে আসছি।

গার্ডকে বলিয়া যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন তাঁহারা আরামে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছেন। গাড়ী ছাড়িলে রাঙাদিদি আমার দিকে নজর দিলেন, চমকাইয়া বলিলেন,

তোর এ কি ছিরি হয়েছে শ্রীকান্ত! এ যে মুখ শুকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গেছে! কোথায় ছিলি এতদিন? ভ্যালা ছেলে যা হোক! সেই যে গেলি একটা চিঠিও কি দিতে নেই? বাড়ীসুদ্ধ সবাই ভেবে মরি।

এ সকল প্রশ্নের কেহ জবাব প্রত্যাশা করে না, না পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে না।

ঠাকুর্দ্দা জানাইলেন, তিনি সস্ত্রীক গয়াধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন, এবং সেই মেয়েটি তাঁর বড় শ্যালিকার নাতনি—বাপ হাজার টাকা গুণে দিতে চায় তবু এতদিন মনোমত একটি পাত্র জুটলো না। ছাড়লে না, তাই সঙ্গে করে আনতে হ'লো। পুঁটু, প্যাঁড়ার হাঁড়িটা খোল ত। গিন্নি, বলি দইয়ের কড়াটা ফেলে আসা হয় নি ত? দাও, শালপাতায় ক'রে গুছিয়ে দাও দিকি—গোটা দুই প্যাঁড়া, এক থাবা দই—এমন দই কখনো মুখে দাও নি ভায়া, দিব্যি ক'রে বলতে পারি। না—না—না—ঘটির জলে হাতটা আগে ধুয়ে ফেলো পুঁটু—যাকে তাকে ত নয়—এসব মানুষকে কি ক'রে দিতে থুতে হয় শেখো।

পুঁটু যথা আদেশে সযত্নে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিল, অতএব অসময়ে ট্রেনের মধ্যে অযাচিত প্যাঁড়া ও দধি জুটিল। খাইতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমার ভাগ্যে যত অঘটন ঘটে। এইবার পুঁটুর জন্য হাজার টাকা দামের পাত্র না মনোনীত হইয়া উঠি। বর্ম্মায় ভালো চাকরী করি এ খবরটা তাঁহারা আগের বারেই পাইয়াছিলেন।

রাঙাদিদি অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং আত্মীয় জ্ঞানে পুঁটু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কারণ, আমি ত আর পর নই।

বেশ মেয়েটি সাধারণ ভদ্রগৃহস্থের ঘরের, ফর্সা না হোক, দেখিতে ভালোই। ঠাকুর্দ্দা তাহার গুণের বিবরণ দিয়া শেষ করিতে পারেন

না এমনি অবস্থা ঘটিল। লেখাপড়ার কথায় রাঙাদিদি বলিলেন, ও এমনি গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে যে তোদের আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। ও বাড়ীর নন্দরাণীকে এমনি একখানি চিঠি লিখে দিয়েছিল যে সাতদিনের দিন জামাই পনের দিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়লো।

রাজলক্ষ্মীর উল্লেখ কেহ ইঙ্গিতেও করিলেন না। সেরূপ ব্যাপার যে একটা ঘটিয়াছিল তাহা কাহারও মনে নাই।

পরদিন দেশের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমাকে নামিতেই হইল। তখন বেলা বোধ করি দশটার কাছাকাছি; সময়ে স্নানাহার না করিলে পিত্ত পড়িবার আশঙ্কায় দুজনেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

বাড়ীতে আনিয়া আদর-যত্নের আর অবধি রহিল না। পুঁটুর বর যে আমিই, পাঁচ-সাত দিনে এ সম্বন্ধে গ্রামের মধ্যে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না, এমন কি পুটুরও না।

ঠাকুর্দ্দার ইচ্ছা আগামী বৈশাখেই শুভকর্ম্ম সমাধা হইয়া যায়। পুঁটুর যে যেখানে আছে আনিয়া ফেলিবারও একটা কথা উঠিল। রাঙাদিদি পুলকিত চিত্তে কহিলেন, মজা দেখেচো, কে যে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেচে আগে থাকতে কারও বলবার যো নেই।

আমি প্রথমটা উদাসীন, পরে চিন্তিত, তারপরে ভীত হইয়া উঠিলাম। সায় দিয়াছি কি দিই নাই—ক্রমশঃ নিজেরই সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। ব্যাপার এমনি দাঁড়াইল যে না বলিতে সাহস হয় না পাছে বিশ্রী কিছু একটা ঘটে। পুঁটুর মা এখানেই ছিলেন, একটা রবিবারে হঠাৎ বাপও দেখা দিয়া গেলেন। আমাকে কেহ যাইতেও দেয় না, আমোদ-আহ্লাদ ঠাট্টা-তামাসাও চলে—পুঁটু যে ঘাড়ে চাপিবেই—শুধু দিনক্ষণের অপেক্ষা—উত্তরোত্তর এমনি লক্ষণই চারিদিক দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। জালে জড়াইতেছি—

মনে শান্তিও পাই না—জাল কাটিয়া বাহির হইতেও পারি না। এমনি সময়ে হঠাৎ একটা সুযোগ ঘটিল। ঠাকুর্দ্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কোন কোষ্ঠী আছে কিনা। সেটা ত দরকার?

জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়া বলিয়া ফেলিলাম, আপনারা কি পুঁটুর সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া সত্যিই স্থির করেছেন?

ঠাকুর্দ্দা কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, সত্যিই? শোন কথা একবার!

কিন্তু আমি ত এখনো স্থির করি নি।

করো নি? তাহ'লে করো। মেয়ের বয়েস বারো-তেরোই বলি আর যাই করি, আসলে ওর বয়েস হলো সতেরো-আঠারো। এর পরে ও মেয়ের বিয়ে দেবো আমরা কেমন করে?

কিন্তু সে দোষ ত আমার নয়!

দোষ তবে কার? আমার বোধ হয়?

ইহার পরে মেয়ের মা ও রাঙাদিদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী মেয়েরা পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল। কান্নাকাটি, অনুযোগ-অভিযোগের আর অন্ত রহিল না। পাড়ার পুরুষেরা কহিল, এত বড় শয়তান আর দেখা যায় না, উহার রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু শিক্ষা দেওয়া এক কথা, মেয়ের বিবাহ দেওয়া আর এক কথা। সুতরাং ঠাকুর্দ্দা চাপিয়া গেলেন। তারপরে সুরু হইল অনুনয়-বিনয়ের পালা। পুঁটুকে আর দেখি না, সে বেচারা লজ্জায় বোধ করি কোথাও মুখ লুকাইয়া আছে। ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। কি দুর্ভাগ্য লইয়াই উহারা আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। শুনিতে পাইলাম ঠিক এই কথাই উহার মা বলিতেছে,—ও হতভাগী আমাদের সবাইকে খেয়ে তবে যাবে। ওর এমনি কপাল যে ও চাইলে সমুদ্দুর পর্য্যন্ত শুকিয়ে যায়—পোড়া শোল মাছ জলে পালায়। এমন ওর হবে না ত হবে কার!

কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর্দ্দাকে ডাকিয়া বাসার ঠিকানা দিলাম, বলিলাম, আমার একজনের মত নেওয়া দরকার, তিনি বললেই আমি সম্মত হবো।

ঠাকুর্দ্দা গদ্‌গদকণ্ঠে আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, দেখো ভাই, মেয়েটাকে মেরো না। তাঁকে একটু বুঝিয়ে ব'লো যেন অমত না করেন।

বলিমাম, আমার বিশ্বাস তিনি অমত করবেন না, বরঞ্চ খুশি হয়েই সম্মতি দেবেন।

ঠাকুর্দ্দা আশীর্ব্বাদ করিলেন—কবে তোমার বাসায় যাবো দাদা?

পাঁচ-ছ'দিন পরেই যাবেন।

পুঁটুর মা, রাঙাদিদি রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া চোখের জলের সঙ্গে আমাকে বিদায় দিলেন।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট! কিন্তু এ ভালোই হইল যে একপ্রকার কথা দিয়া আসিলাম। রাজলক্ষ্মী এ বিবাহে যে লেশমাত্র আপত্তি করিবে না এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

দুই

ষ্টেশনে পদার্পণ মাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল; পরেরটা আসিতে ঘণ্টা-দুই দেরি—সময় কাটাইবার পন্থা খুঁজিতেছি—বন্ধু জুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি মুহূর্ত্ত-কয়েক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্রীকান্ত না?

হাঁ।

আমায় চিনতে পারলে না? আমি গহর। এই বলিয়া সে সবেগে আমার হাত মলিয়া দিল, সশব্দে পিঠে চাপড় মারিল এবং সজোরে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, চল্ আমাদের বাড়ী। কোথা যাওয়া হচ্ছিল, কলকাতায়? আর যেতে হবে না— চল্।

সে আমার পাঠশালার বন্ধু। বয়সে বছর-চারেকের বড়, চিরকাল আধপাগলা গোছের ছেলে—মনে হইল বয়সের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহার জবরদস্তি পূর্ব্বেও এড়াইবার যো ছিল না, সুতরাং আজ রাত্রের মতো সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বলা বাহুল্য, তাহার উল্লাস ও আত্মীয়তার সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার মত শক্তি আজ আমার নাই; কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। আমার ব্যাগটা সে নিজেই তুলিয়া লইল, কুলি ডাকিয়া বিছানাটা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিল, জোর করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া আমাকে কহিল, ওঠ্।

পরিত্রাণ নাই—তর্ক করা বিফল!

বলিয়াছি গহর আমার পাঠশালার বন্ধু। আমাদের গ্রাম হইতে তাহাদের বাড়ী এক ক্রোশ দূরে, একই নদীর তীরে। বাল্যকালে তাহারই কাছে বন্দুক ছুড়িতে শিখি। তাহার বাবার একটা সেকেলে গাদাবন্দুক ছিল, সেই লইয়া নদীর ধারে, আম-বাগানে, ঝোপেঝাড়ে দুজনে পাখী মারিয়া বেড়াইতাম, ছেলেবেলায় কতদিন তাহাদের বাড়ীতে রাত কাটাইয়াছি—তাহার মা মুড়ি গুড় দুধ কলা দিয়া আমার ফলারের জোগাড় করিয়া দিত। তাহাদের জমিজমা চাষ-আবাদ অনেক ছিল। গাড়ীতে বসিয়া গহর প্রশ্ন করিল, এতদিন কোথায় ছিলি শ্রীকান্ত?

যেখানে যেখানে ছিলাম একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখন কি করো গহর?

কিছুই না।

তোমার মা ভালো আছেন?

মা-বাবা দুজনেই মারা গেছেন—বাড়ীতে আমি একলা আছি।

বিয়ে করো নি?

সেও মারা গেছে।

মনে মনে অনুমান করিলাম এই জন্যই যাহাকে হোক ধরিয়া লইয়া যাইতে তাহার এত আগ্রহ। কথা খুঁজিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সেই গাদাবন্দুকটা আছে?

গহর হাসিয়া কহিল, তোর মনে আছে দেখছি। সেটা আছে, আর একটা ভালো বন্দুক কিনেছিলাম, তুই শিকারে যেতে চাস্ ত সঙ্গে যাবো, কিন্তু আমি আর পাখী মারি নে—বড় দুঃখ লাগে।

সে কি গহর, তখন যে এই নিয়ে দিনরাত থাকতে!

তা সত্যি, কিন্তু এখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

গহরের আর একটা পরিচয় আছে—সে কবি। তখনকার দিনে সে মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটিতে পারিত, যে-কোন সময়ে যে-কোন বিষয়ে। অনেকটা পাঁচালীর ধরণে। ছন্দ, মাত্রা, ধ্বনি ইত্যাদি কাব্যশাস্ত্র বিধি মানিয়া চলিত কিনা সে জ্ঞান আমার তখনও ছিল না এখনও নাই, কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধ, টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বের কাহিনী তাহার মুখে ছড়ায় শুনিয়া আমরা সেকালে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। এ আমার মনে আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর, তোমার যে একদিন কৃত্তিবাসের চেয়ে ভালো রামায়ণ রচনার সখ ছিল সে সঙ্কল্প আছে না গেছে?

গেছে? গহর মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, সে কি যাবার রে? ঐ নিয়েই ত বেঁচে আছি। যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন ঐ নিয়েই থাকবো। কত লিখেচি, চল্ না আজ তোকে সমস্ত রাত্রি শোনাবো। তবু ফুরোবে না।

বল কি গহর?

নয় ত কি তোরে মিথ্যে বলচি?

প্রদীপ্ত কবি-প্রতিভায় তাহার চোখ-মুখ ঝক্ঝক্ করিতে লাগিল। সন্দেহ করি নাই, শুধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তথাপি পাছে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়, আমাকে ধরিয়া বসাইয়া সে সারারাত্রি ব্যাপিয়া কাব্যচর্চ্চা করে, এই ভয়ে শঙ্কার সীমা রহিল না। প্রসন্ন করিতে বলিলাম, না গহর, তা বলি নি, তোমার অদ্ভুত শক্তি আমরা সবাই স্বীকার করি, তবে, ছেলে-বেলার কথা মনে আছে কিনা তাই শুধু বলছিলাম। তা বেশ, বেশ—এ একটা বাঙলা দেশের কীর্ত্তি হয়ে থাকবে।

কীর্ত্তি? নিজের মুখে কি আর বলব ভাই, আগে শোন, তার পরে হবে কথা।

কোন দিক দিয়াই নিস্তার নাই। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিলাম, সকাল থেকেই শরীরটা এমন বিশ্রী ঠেকচে যে, মনে হচ্চে ঘুমোতে পেলে—

গহর কানও দিল না, বলিল, পুষ্পক রথে সীতা যেখানে কাঁদতে কাঁদতে গয়না ফেলে দিচ্চেন সে জায়গাটা যারা শুনেচে চোখের জল রাখতে পারে নি শ্রীকান্ত।

চোখের জল যে আমিই রাখিতে পারিব সে সম্ভাবনা কম। বলিলাম, কিন্তু—

গহর কহিল, আমাদের সেই বুড়ো নয়নচাঁদ চক্রবর্ত্তীকে তোর মনে আছে ত, তার জ্বালায় আমি আর পারি নে। যখন তখন এসে বলবে, গহর, সেইখানটা একবার পড় দেখি শুনি। বলে, বাবা,

তুই কখনো মোছলমানের ছেলে নোস্—তোর গায়ে আসল ব্রহ্ম-রক্ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

নয়নচাঁদ নামটা খুব সচরাচর মিলে না তাই মনে পড়িল। বাড়ী গহরদের গ্রামেই, জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই চক্কোত্তি বুড়ো ত? যাঁর সঙ্গে তোমার বাবার লাঠালাঠি মালি-মোকদ্দমা চলছিলো?

গহর বলিল, হাঁ, কিন্তু বাবার সঙ্গে পারবে কেন—তার জমি, বাগান, পুকুর, মায় বাস্তু সমেত বাবা দেনার দায়ে নিলেম করে নিয়েছিল, আমি কিন্তু তার পুকুর আর ভিটেটা ফিরিয়ে দিয়েছি—ভারী গরীব—দিনরাতচোখের জল ফেলত,সেকি আর ভাল শ্রীকান্ত?

ভালো ত নয়ই। চক্রবর্ত্তীর কাব্য-প্রীতিতে এমনি কিছু একটা আন্দাজ করিতেছিলাম, বলিলাম, এখন চোখের জল ফেলা থেমেচে ত?

গহর কহিল, লোক কিন্তু সত্যিই ভালোমানুষ! দেনার জ্বালায় এক সময়ে যা করেছিল অমন অনেকেই করে। ওর বাড়ীর পাশেই বিঘে-দেড়েকের একটা আমবাগান আছে তার প্রত্যেক গাছটিই চক্কোত্তির নিজের হাতে পোঁতা। নাতি-নাতনী অনেকগুলি, কিনে খাবার পয়সা নেই—তা ছাড়া আমার কেই বা আছে, কেই বা খাবে।

সে ঠিক। ওটাও ফিরিয়ে দাও গে।

দেওয়াই উচিত শ্রীকান্ত। চোখের সামনে আম পাকে, ছেলে-পুলেগুলোর নিঃশ্বাস পড়ে—আমার ভারী দুঃখ হয় ভাই। আমের সময় আমার বাগানগুলো ত সব ব্যাপারীদের জমা করেই দিই—ও বাগানটা আর বিক্রী করি নে, বলি, চক্কোত্তিমশাই তোমার নাতিরা যেন পেড়ে খায়। কি বলিস্ রে, ভালো না?

নিশ্চয়ই ভালো। মনে মনে বলিলাম, বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক, তাহার কল্যাণে গরীব নয়নচাঁদ যদি যৎকিঞ্চিৎ গুছাইয়া লইতে পারে হানি কি? তা ছাড়া গহর কবি। কবি মানুষের অত

বিষয়-সম্পত্তি কিসের জন্য, যদি রসগ্রাহী রসিক সুজনদের ভোগেই না লাগে ?

চৈত্রের প্রায় মাঝামাঝি। গাড়ীর কবাটটা গহর অকস্মাৎ শেষ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে মাথা বাড়াইয়া বলিল, দক্ষিণে বাতাসটা টের পাচ্চিস্ শ্রীকান্ত ?

পাচ্চি।

গহর কহিল, বসন্তকে ডাক দিয়ে কবি বলেছেন, "আজ দখিন দুয়ার খোলা—"

কাঁচা মেঠো রাস্তা, এক ঝাপটা মলয়ানিল রাস্তার শুকনো ধূলা আর রাস্তায় রাখিল না, সমস্ত মাথায় মুখে মাখাইয়া দিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কবি বসন্তকে ডাকেন নি, তিনি বলেচেন এ সময়ে যমের দক্ষিণ দোর খোলা—সুতরাং গাড়ীর দরজা বন্ধ না করলে হয়ত সে-ই এসে হাজির হবে।

গহর হাসিয়া কহিল, গিয়ে একবার দেখবি চল্। দুটো বাতাবি লেবুর গাছে ফুল ফুটেছে, আধক্রোশ থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। সুমুখের জাম গাছটা মাধবী ফুলে ভরে গেছে, তার একটা ডালে মাধবীর লতা, ফুল এখনো ফোটে নি, কিন্তু থোপা থোপা কুঁড়ি। আমাদের চারদিকেই ত আমের বাগান, এবার মৌলে মৌলে গাছ ছেয়ে গেছে, কাল সকালে দেখিস্ মৌমাছির মেলা! কত দোয়েল, কত বুলবুলি আর কত কোকিলের গান। এখন জোছনা রাত কিনা, তাই রাত্রিতেও কোকিলের ডাকাডাকি থামে না। বাইরের ঘরের দক্ষিণের জানালাটা যদি খুলে রাখিস্ তোর দুচোখে আর পলক পড়বে না। এবার কিন্তু সহজে ছেড়ে দিচ্চি নে ভাই, তা আগে থেকে বলে রাখচি। তা ছাড়া খাবার ভাবনাও নেই, চক্কোত্তিমশাই একবার খবর পেলে হয়, তোরে গুরুর আদর করবে।

তাহার আমন্ত্রণের অকপট আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলাম। কতকাল পরে দেখা, কিন্তু ঠিক সেদিনের সেই গহর—এতটুকু বদলায় নাই—তেমনি ছেলেমানুষ—তেমনি বন্ধু সম্মিলনে তাহার অকৃত্রিম উল্লাসের ঘটা।

গহররা মুসলমান-ফকির সম্প্রদায়ের লোক। শুনিয়াছি তাহার পিতামহ বাউল, রামপ্রসাদী ও অন্যান্য গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত, তাহার একটা পোষা শালিক পাখীর অলৌকিক সঙ্গীত-পারদর্শিতার কাহিনী তখনকার দিনে এদিকে প্রসিদ্ধ ছিল। গহরের পিতা কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তেজারতি ও পাটের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ছেলের জন্য সম্পত্তি খরিদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, অথচ ছেলে পাইল না বাপের বিষয়-বুদ্ধি—পাইয়াছে ঠাকুর্দ্দার কাব্য ও সঙ্গীতের অনুরাগ। সুতরাং, পিতার বহুশ্রমার্জ্জিত জমিজমা চাষ-আবাদের শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে তাহাও সন্দেহের বিষয়।

সে যাই হোক, বাড়ীটা তাহাদের দেখিয়াছিলাম ছেলেবেলায়। ভালো মনে নাই। এখন হয়ত তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে কবির বাণী-সাধনার তপোবনে। আর একবার চোখে দেখিবার আগ্রহ জন্মিল।

তাহাদের গ্রামের পথ আমাদের পরিচিত, তাহার দুর্গমতার চেহারাও মনে পড়ে, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই জানা গেল শৈশবের সেই মনে-পড়ার সঙ্গে আজকের চোখে দেখার একেবারে কোন তুলনাই হয় না। বাদশাহী আমলের রাজবর্ত্ম—অতিশয় সনাতন। ইট-পাথরের পরিকল্পনা এদিনের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মনে হইতে বহুকাল পূর্ব্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে জানে অনুযোগ অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু 'পথকর' যোগাইতে হয়, কিন্তু সে পথ যে কোথায় এবং কাহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহুল্য।

সেই পথের বহুকাল সঞ্চিত স্তূপীকৃত ধূলাবালির বাধা ঠেলিয়া গাড়ী আমাদের কেবলমাত্র চাবুকের জোরেই অগ্রসর হইতেছিল, এমনি সময়ে গহর অকস্মাৎ উচ্চ-কোলাহলে ডাক দিয়া উঠিল, গাড়োয়ান, আর না, আর না—থামো থামো—একদম রোকো!

সে এমন করিয়া উঠিল, যেন পাঞ্জাব-মেলের ব্যাপার। সমস্ত ভ্যাকুয়াম-ব্রেক চক্ষের নিমিষে কষিতে না পারিলে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা।

গাড়ী থামিল। বাঁ-হাতি পথটা তাহাদের গ্রামে ঢুকিবার। নামিয়া পড়িয়া গহর কহিল, নেমে আয় শ্রীকান্ত। আমি ব্যাগটা নিচ্ছি, তুই নে বিছানাটা—চল্।

গাড়ী বুঝি আর যাবে না?

না। দেখছিস্‌নে পথ নেই।

তা বটে। দক্ষিণে ও বামে শিয়াকুল ও বেতসকুঞ্জের ঘন-সম্মিলিত শাখা-প্রশাখায় পল্লী-বীথিকা অতিশয় সঙ্কীর্ণ। গাড়ী ঢোকার প্রশ্নই অবৈধ, মানুষেও একটু সাবধানে কাৎ হইয়া না ঢুকিলে কাঁটায় জামাকাপড়ের অপঘাত অনিবার্য্য। এতএব কবির মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনবদ্য। সে ব্যাগটা কাঁধে করিল, আমি বিছানাটা বগলে চাপিয়া গোধূলিবেলায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম।

কবিগৃহে আসিয়া যখন পৌঁছানো গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুমান করিলাম আকাশে বসন্ত-রাত্রির চাঁদও উঠিয়াছে। তিথিটা ছিল বোধ করি পূর্ণিমার কাছাকাছি, অতএব আশা করিয়া রহিলাম গভীর নিশীথে চন্দ্রদেব মাথায় উপরে আসিলে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইবে। গৃহের চারিদিকেই নিবিড় বেণুবন, খুব সম্ভব তাহার কোকিল, দোয়েল ও বুলবুলির দল এর

মধ্যেই থাকে এবং অহর্নিশ শিস দিয়া, গান গাহিয়া কবিকে ব্যাকুল করিয়া দেয়। পরিপক্ক অসংখ্য বেণুপত্ররাশি ঝরিয়া ঝরিয়া উঠান-আঙ্গিনা পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, দৃষ্টিমাত্রই ঝরা-পাতার গান গাহিবার প্রেরণায় সমস্ত মন মুহূর্ত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠে। চাকর আসিয়া বাহিরে ঘর খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, গহর তক্তপোষটা দেখাইয়া কহিল, তুই এই ঘরেই থাকবি। দেখিস্ কি রকম হাওয়া।

অসম্ভব নয়। দেখিলাম, দখিনা-বায়ে রাজ্যের শুকনা লতা-পাতা গবাক্ষপথে ভিতরে ঢুকিয়া ঘর ভরিয়াছে, তক্তপোষ ভরিয়াছে, মেঝেতে পা ফেলিতে গা ছমছম করে। খাটের পায়ার কাছে ইঁদুরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া একরাশি মাটি তুলিয়াছে, দেখাইয়া বলিলাম, গহর, এ ঘরে কি তোমরা ঢোকো না?

গহর বলিল, না, দরকারই হয় না। আমি ভেতরেই থাকি। কাল সব পরিষ্কার করিয়ে দেব।

তা যেন দিলে, কিন্তু গর্ত্তটায় সাপ থাকতে পারে ত?

চাকরটা বলিল, ছুটো ছিল, আর নেই। এমন দিনে তারা থাকে না, হাওয়া খেতে বা'র হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করে জানলে মিঞা?

গহর হাসিয়া কহিল, ও মিঞা নয়, আমাদের নবীন। বাবার আমলের লোক। গরুবাছুর, চাষবাস দেখে, বাড়ী আলগায়। আমাদের কোথায় কি আছে না আছে সব জানে।

নবীন হিন্দু বাঙালীও বটে, পৈতৃককালের লোকও বটে। এই পরিবারের গরুবাছুর চাষবাস হইতে বাড়ীঘর-দোরের অনেক কিছু জানাও তাহার অসম্ভব নয়, তথাপি সাপের সম্বন্ধে ইহার মুখের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। ইহাদের বাড়ীসুদ্ধ সকলকে দক্ষিণা হাওয়ায় পাইয়া বসিয়াছে। ভাবিলাম, হাওয়ার লোভে সর্পযুগলের বহির্গমন আশ্চর্য্য নয় মানি, কিন্তু প্রত্যাগমন করিতেই বা কতক্ষণ?

গহর বুঝিল, আমি বিশেষ ভরসা পাই নাই, কহিল তুই ত থাকবি খাটে, তোর ভয়টা কিসের ? তা ছাড়া ওঁরা থাকেন না আর কোথায় ? কপালে লেখা থাকলে রাজা পরীক্ষিৎও নিস্তার পান না—আমরা ত তুচ্ছ।—নবীন, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে খালের মুখে একটা ইট চাপা দিয়ে দিস্। ভুলিস্ নে ; কিন্তু কি খাবি বল্ ত শ্রীকান্ত ?

বলিলাম, যা জোটে।

নবীন কহিল, দুধ মুড়ি আর ভালো আকের গুড় আছে। আজকের মতো জোগাড়।

বলিলাম, খুব খুব, এ বাড়ীতে ও জিনিসের আমার অভ্যাস আছে। আর কিছু জোগাড়ের দরকার নেই বাবা, তুমি বরঞ্চ আস্তো দেখে একখানা ইট জোগাড় করে আনো। গর্ত্তটা একটু মজবুত ক'রে চাপা দাও—দখিনে বাতাসে ভরপূর হয়ে ওঁরা যখন ঘরে ফিরবেন তখন হঠাৎ না ঢুকে পড়তে পারেন।

নবীন আলো দিয়া চৌকির তলায় কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারিয়া বলিল, নাঃ—হবে না।

কি হবে না হে ?

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হবে না। খালের মুখ কি একটা বাবু ? এক পাঁজা ইট চাই যে। ইঁদুরে মেঝেটা একেবারে ঝাঁঝরা করে রেখেচে।

গহর বিশেষ বিচলিত হইল না, শুধু লোক লাগাইয়া কাল নিশ্চয় ঠিক করিয়া ফেলিতে হুকুম করিয়া দিল।

নবীন হাত-পা ধুইবার জল দিয়া ফলারের আয়োজনে ভিতরে চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি খাবে গহর ?

আমি ? আমার এক বুড়ো মাসী আছেন, তিনিই রান্না করেন। সে যাক, খাওয়াদাওয়া চুকলে লেখাগুলো তোরে প'ড়ে শোনাবো। সে আপন কাব্যের অনুধ্যানেই মগ্ন ছিল, অতিথির সুখ-সুবিধার

কথা হয়ত চিন্তাও করে নাই ; কহিল, বিছানাটা পেতে ফেলি কি বল্ ? রাত্তিরে দুজনে একসঙ্গেই থাকবো—কেমন ?

এ আর এক বিপদ। বলিলাম, না ভাই গহর, তুমি তোমার ঘরে শোও গে, আজ আমি বড় ক্লান্ত, বই তোমার কাল সকালে শুনবো।

কাল সকালে ? তখন কি সময় হবে ?

নিশ্চয় হবে।

গহর চুপ করিয়া একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, কিম্বা একটা কাজ করলে হয় না শ্রীকান্ত, আমি পড়ে যাই, তুমি শুয়ে শুয়ে শোনো। ঘুমিয়ে পড়লেই আমি উঠে যাবো। কি বলো ? এই বেশ মতলব—না ?

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম, না ভাই গহর, তাতে তোমার বইয়ের মর্য্যাদা নষ্ট হবে। কাল আমি সমস্ত মন দিয়ে শুনবো।

গহর ক্ষুন্নমুখে বিদায় লইল ; কিন্তু বিদায় করিয়া নিজের মনটাও প্রসন্ন হইল না।

এই এক পাগল। ইতিপূর্ব্বে ইশারায় ইঙ্গিতে বুঝিয়াছিলাম তাহার কাব্যগ্রন্থ সে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে চায়। মনে আশা, সংসারে একটা নূতন সাড়া পড়িবে। সে লেখাপড়া বেশি করে নাই, পাঠশালায় ও ইস্কুলে সামান্য একটু বাংলা ও ইংরাজী শিখিয়াছিল মাত্র। মনও ছিল না, বোধ হয় সময়ও পায় নাই। কবে কোন্ শৈশবে সে কবিতা ভালোবাসিয়াছে, হয়ত এ মুগ্ধতা তাহার শিরার রক্তে প্রবহমান, তারপর জগতের বাকি সব কিছুই তাহার চক্ষে অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। নিজের অনেক রচনাই তাহার মুখস্থ, গাড়ীতে বসিয়া গুন গুন করিয়া মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেও ছিল, শুনিয়া তখন মনে করিতে পারি নাই বাগ্দেবী তাঁহার স্বর্ণপদ্মের

একটি পাপড়ি খসাইয়াও এই অক্ষম ভক্তটিকে কোনদিন পুরস্কার দিবেন ; কিন্তু অক্লান্ত আরাধনার একাগ্র আত্মনিবেদনে এ বেচারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম বারো বৎসর পরে এই দেখা। এই দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া এ পার্থিব সকল স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া কথার পরে কথা গাঁথিয়া শ্লোকের পাহাড় জমা করিয়াছে, কিন্তু এসব কোন্ কাজে লাগিবে? কাজেও লাগে নাই জানি। গহর আজ আর নাই। তাহার দুশ্চর তপস্যার অকৃতার্থতা স্মরণ করিয়া মনে আজও দুঃখ পাই। ভাবি, লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন, গন্ধহীন কত ফুল ফুটিয়া আপনি শুকায়। বিশ্ববিধানে কোন সার্থকতা যদি তাহার থাকে, গহরের সাধনাও হয়ত ব্যর্থ হয় নাই।

অতি প্রত্যূষেই ডাকাডাকি করিয়া গহর আমার ঘুম ভাঙাইয়া দিল, তখন হয়ত সবে সাতটা বাজিয়াছে কিংবা বাজেও নাই। তাহার ইচ্ছা বসন্তদিনে বঙ্গের নিভৃত-পল্লীর অপরূপ শোভা-সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হই। তাহার ভাবটা এমনি, যেন আমি বিলাত হইতে আসিয়াছি। তাহার আগ্রহ ক্ষ্যাপার মতো, অনুরোধ এড়াইবার যো নাই, অতএব হাতমুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইল। প্রাচীরের গায়ে আধমরা একটা জামগাছের অর্দ্ধেকটায় মাধবী ও অর্দ্ধেকটায় মালতীলতা। কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অত্যন্ত নির্জীব চেহারা —তথাপি, একটায় গোটাকয়েক ফুল ফুটিয়াছে, অপরটায় সবে কুঁড়ি ধরিয়াছে। তাহার ইচ্ছা গোটাকয়েক ফুল আমাকে উপহার দেয়, কিন্তু গাছে এত কাটপিঁপড়া যে ছোঁবার যো নাই। সে এই বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিল যে আর একটু বেলা হইলে আঁকশি দিয়া অনায়াসে পাড়াইয়া দিতে পারিবে। আচ্ছা, চলো।

নবীন প্রাতঃক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ সুনির্ব্বাহের উদ্যোগ পর্ব্বে দম

ভরিয়া তামাক টানিয়া প্রবল বেগে কাশিতেছিল, থুথু ফেলিয়া ঢোক গিলিয়া অনেকটা সামলাইয়া লইয়া হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। বলিল, বনেবাদাড়ে মেলাই যাবেন না বলে দিচ্চি।

গহর বিরক্ত হইয়া উঠিল—কেন রে?

নবীন জবাব দিল, গোটা দুত্তিন শেয়াল ক্ষেপেছে—গরু-মনিষ্যি একসাই কামড়ে বেড়াচ্চে।

আমি সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইলাম। কোথায় হে নবীন?

কোথায় সে কি দেখে রেখেচি? আছেই কোন্ ঠাঁই ঝোপে-ঝাড়ে। যান ত একটু চোখ রেখে চলবেন।

তাহলে কাজ নেই ভাই গহর।

বাঃ—রে! এই সময়টায় শিয়াল-কুকুর একটু ক্ষ্যাপেই—তা বলে লোকজন রাস্তায় চলবে না কি? বেশ ত!

এ-ও দখিনা হাওয়ার ব্যাপার। অতএব, প্রকৃতির শোভা দেখিতে সঙ্গে যাইতেই হইল। পথের দুধারে আমবাগান। কাছে আসিতেই অগণিত ছোট ছোট পোড়া চড়চড় পটপট শব্দে আম্রমুকুল ছাড়িয়া চোখে নাকে মুখে জামার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, শুকনা পাতায় আমের মধু ঝরিয়া চটচটে আঠার মত হইয়াছে, সেগুলা জুতার তলায় জড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বেদখল করিয়া বিরাজিত ঘেঁটু গাছের কুঞ্জ, মুকুলিত, বিকশিত পুষ্পসম্ভারে একান্ত নিবিড়—মনে পড়িয়া গেল নবীনের সতর্কবাণী। গহরের মতে কালটা ক্ষেপিবার উপযোগী। সুতরাং ঘেঁটু ফুলের শোভা সময় মত আর একদিন না হয় উপভোগ করা যাইবে, আজ গহর ও আমি, অর্থাৎ নবীনের 'গরু-মনিষ্যি' একটু দ্রুতপদেই স্থানত্যাগ করিলাম।

বলিয়াছি, আমাদেরই গ্রামের নদী ইহাদের গ্রামপ্রান্তে

প্রবাহিত। বর্ষার পরিস্ফীত জলধারা বসন্ত সমাগমে একান্ত শীর্ণ, সেদিনের স্রোতশ্চালিত অপরিমেয় পানা ও শৈবাল আজ শুষ্ক তটভূমিতে পড়িয়া শিশির ও রৌদ্রে পচিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে নরককুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। পরপারে দূরে কয়েকটা শিমুল গাছে অজস্র রাঙা ফুল ফুটিয়া আছে চোখে পড়িল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা কবির কাছেও এখন যেন বাড়াবাড়ি বলিয়া ঠেকিল। বলিল, চল্ ঘরে ফিরি।

তাই চলো।

আমি ভেবেছিলাম তোর এসব ভালো লাগবে।

বলিলাম, লাগবে ভাই লাগবে। ভাল ভাল কথা দিয়ে এসব তুমি কবিতায় লিখো, পড়ে আমি খুশীই হবো।

তাই বোধ হয় গাঁয়ের লোক ফিরেও চায় না।

না। দেখে দেখে তাদের অরুচি ধরে গেছে। চোখের রুচি আর কানের রুচি এক নয় ভাই। যারা মনে করে কবির বর্ণনা চোখে দেখতে পেলে লোকে মোহিত হয়ে যায়, তারা জানে না। দুনিয়ার সকল ব্যাপারই তাই। চোখে যা সাধারণ ঘটনা, হয়ত বা সামান্য তুচ্ছ বস্তু, কবির ভাষায় তাই হয়ে যায় নতুন সৃষ্টি। তুমি দেখতে পাও সেও সত্যি, আমি যে দেখতে পেলাম না সেও সত্যি। এর জন্যে তুমি দুঃখ ক'রো না গহর।

তবুও ফিরিবার পথে সে কত কি যে আমাকে দেখাইবার চেষ্টা করিল তাহার সংখ্যা নাই। পথের প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি লতাগুল্ম পর্য্যন্ত যেন তাহার চেনা। কি একটা গাছের অনেকখানি ছাল কেহ বোধ হয় ঔষধের প্রয়োজনে চাঁচিয়া লইয়া গিয়াছে, তখনও আঠা ঝরিতেছে, গহর হঠাৎ দেখিতে পাইয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। আবার দুই চোখ ছলছল করিয়া

আসিল—অন্তরে সে যে কি বেদনাই বোধ করিল তাহার মুখ দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। চক্রবর্ত্তী যে তাহার সমুদয় হারানো বিষয় ফিরিয়া পাইতেছিল সে কেবল কৌশল বিস্তার করিয়া নয়—তাহার হেতু ছিল গহরের নিজেরই স্বভাবের মধ্যে। ব্রাহ্মণের প্রতি অনেকখানি ক্রোধ আমার আপনিই পড়িয়া গেল। চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল না, কারণ শোনা গেল, তাঁহার গৃহে গুটি দুই নাতির 'মায়ের অনুগ্রহ' দেখা গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ওলাবিবি এখনও দেখা দেন নাই—পচা-পুকুরের জল আর একটু শুকাইবার অপেক্ষায় আছেন।

সে যাই হোক, বাড়ীতে ফিরিয়া গহর তাহার পুঁথি আনিয়া হাজির করিল, তাহার পরিমাণ দেখিয়া ভয় পায় না সংসারে এমন কেহ যদি থাকেন তাহা অত্যন্ত বিরল। বলিল, না পড়া হলে কিন্তু ছাড়া পাবে না শ্রীকান্ত। সত্যি ক'রে তোমাকে মত দিতে হবে।

এ আশঙ্কা ছিলই। স্পষ্ট করিয়া রাজী হইতে পারি এ সাহস ছিল না, তথাপি দিনের পর দিন করিয়া কবির বাটীতে কাব্য আলোচনায় এ-যাত্রায় আমার সাতদিন কাটিল। কাব্যের কথা থাক, কিন্তু নিবিড় সাহচর্য্যে মানুষটির যে পরিচয় পাইলাম তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি বিস্ময়কর।

একদিন গহর বলিল, তোর কাজ কি শ্রীকান্ত বর্ম্মায় গিয়ে। আমাদের দুজনেরই আপনার বলতে কেউ নেই, আয় না দু ভাইয়ে এখানেই একসঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

হাসিয়া বলিলাম, আমি তোমার মতো কবি নই ভাই, গাছ-পালার ভাষাই বুঝি নে, তাদের সঙ্গে কথা কইতেও পারি নে, পারবো কেন এই বনের মধ্যে বাস করতে? দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠবো যে!

গহর গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, আমি কিন্তু সত্যিই ওদের

ভাষা বুঝি, ওরা সত্যিই কথা কয়—তোরা পারিস্ নে বিশ্বাস করতে ?

বলিলাম, বিশ্বাস করা যে শক্ত এটা তুমিও ত বোঝো ?

গহর সহজেই স্বীকার করিয়া লইল, কহিল, হাঁ, তাও বুঝি।

একদিন সকালে তাহার রামায়ণের অশোকবনের অধ্যায়টা কিছুক্ষণ পড়ার পড়ে সে হঠাৎ বই মুড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা শ্রীকান্ত, তুই কাউকে ভালোবেসেছিলি ?

কাল অনেক রাত্রি জাগিয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত আমার এই শেষ চিঠিই লিখিয়াছিলাম। ঠাকুর্দ্দার কথা, পুঁটির কথা, তাহার দুর্ভাগ্যের বিবরণ সমস্তই তাহাতে ছিল। তাঁহাদিগকে কথা দিয়াছিলাম একজনের অনুমতি চাহিয়া লইব—সে ভিক্ষাও তাহাতে ছিল। পাঠানো হয় নাই, চিঠিটা তখনও আমার পকেটে পড়িয়া। গহরের প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিলাম, না।

গহর কহিল, যদি কখনো ভালোবাসিস্, যদি কখনো সেদিন আসে আমাকে জানাস্ শ্রীকান্ত।

জেনে তোমার কি হবে ?

কিছুই না। তখন শুধু তোদের মধ্যে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে আসবো।

আচ্ছা।

আর যদি তখন টাকার দরকার হয় আমাকে খবর দিস্। বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে, সে আমার কাজে লাগলো না—কিন্তু তোদের হয়ত কাজে লেগে যাবে।

তাহার বলার ধরণটা এমনি যে শুনিলেও চোখে জল আসিয়া পড়িতে চায়! বলিলাম, আচ্ছা, তাও জানাবো; কিন্তু আশীর্ব্বাদ করো সে প্রয়োজন যেন না হয়।

আমার যাবার দিনে গহর পুনরায় আমার ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া প্রস্তুত হইল। প্রয়োজন ছিল না, নবীন ত লজ্জায় প্রায় আধমরা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কানও দিল না। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া সে মেয়েমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমার মাথার দিব্যি রইল শ্রীকান্ত, চলে যাবার আগে আবার একদিন এসো, যেন আর একবার দেখা হয়।

আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কথা দিলাম দেখা করিতে আবার আসিব।

কলকাতায় পৌঁছে কুশল সংবাদ দেবে বলো ?

এ প্রতিশ্রুতিও দিলাম। যেন কতদূরেই না চলিয়াছি।

কলিকাতার বাসায় গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। চৌকাঠে পা দিয়াই যাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল সে আর কেহ নহে, স্বয়ং রতন।

এ কি রে, তুই যে ?

হাঁ, আমিই। কাল থেকে বসে আছি—একখানা চিঠি আছে। বুঝিলাম সেই প্রার্থনার উত্তর। কহিলাম, চিঠি ডাকে দিলেও ত আসতো ?

রতন বলিল, সে ব্যবস্থা চাষাভুষো মুটেমজুর গেরস্ত লোকদের জন্যে। মা'র চিঠি একটা লোক না খেয়ে না ঘুমিয়ে পাঁচশো মাইল ছুটে হাতে ক'রে না আনলে খোয়া যায়। জানেন ত সব, কেন মিছে জিজ্ঞাসা করচেন।

পরে শুনিয়াছিলাম রতনের এ অভিযোগ মিথ্যা। কারণ সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া এ চিঠি হাতে করিয়া আনিয়াছে। এখন মনে হইল গাড়ীর ভিড়ে ও আহারাদির অব্যবস্থায় তাহার মেজাজ বিগড়াইয়াছে। হাসিয়া কহিলাম, ওপরে আয়। চিঠি পরে হবে, চল্ তোর খাবার জোগাড়টা আগে করে দিই গে!

রতন পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, চলুন।

সশব্দ উদ্গারে চমকিত করিয়া রতন দেখা দিল।

কি রতন, পেট ভরলো?

আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আপনি যাই বলুন বাবু, আমাদের কলকাতায় বাঙালী বামুন-ঠাকুর ছাড়া রান্নার কেউ কিছু জানে না। ওদের ঐসব মেড়ুয়া-মহারাজগুলোকে ত জানোয়ার বললেই হয়।

উভয় প্রদেশের রান্নার ভালো-মন্দ, অথবা পাচকের শিল্প-নৈপুণ্য লইয়া রতনের সঙ্গে কখনো তর্ক করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না; কিন্তু রতনকে যতদূর জানি তাহাতে বুঝিলাম সুপ্রচুর ভোজনে সে পরিতুষ্ট হইয়াছে। না হইলে পশ্চিমা পাচকদের সম্বন্ধে এমন নিরপেক্ষ সুবিচার করিতে পারিত না। কহিল, গাড়ীর ধকলটা ত সামান্য নয়, একটু আড়মোড়া ভেঙ্গে গড়িয়ে না নিলে—

বেশ ত রতন, ঘরে হোক, বারান্দায় হোক, একটা বিছানা পেতে শুয়ে পড়ো গে। কাল সব কথা হবে।

কি জানি কেন, চিঠির জন্য উৎকণ্ঠা ছিল না। মনে হইতেছিল সে যাহা লিখিয়াছে তাহা ত জানিই।

রতন ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল। আগাগোড়া গালা দিয়া শিলমোহর করা। বলিল, বারান্দার ঐ দক্ষিণের জানালার ধারে বিছানাটা পেতে ফেলি। মশারি খাটাবার হাঙ্গামা নেই—কলকাতা ছাড়া এমন সুখ কি আর কোথাও আছে! যাই—

কিন্তু খবর সব ভালো ত রতন?

রতন মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, তাই ত দেখায়। গুরু-দেবের কৃপায় বাড়ীর বাইরেটা গুলজার, ভেতরে দাসদাসী, বঙ্কুবাবু, নতুন বৌমা এসে ঘরদোর আলো করেছেন, আর সবার ওপরে

স্বয়ং মা আছেন যে বাড়ীর গিন্নী—এমন সংসারকে নিন্দে করবে কে? আমি কিন্তু অনেক কালের চাকর, জাতে নাপ্‌তে—রত্নাকে অত সহজে ভোলানো যায় না বাবু। তাই ত সেদিন ইষ্টিশানে চোখের জল সামলাতে পারি নি, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিদেশে চাকরের অভাব হলে রতনকে একটা খবর পাঠাবেন। জানি, আপনার সেবা করলেও সেই মায়ের সেবাই করা হবে। ধর্ম্মে পতিত হবো না।

কিছুই বুঝিলাম না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলাম। সে বলিতে লাগিল, বঙ্কুবাবুর বয়সও হ'লো, যা হোক একটু বিদ্যেসিদ্যে শিখে মানুষও হয়েছেন। ভাবচেন বোধ হয় কিসের জন্য আর পরবশে থাকা? দানপত্রের জোরে মেরে ত সব নিয়েছেন। মোটামুটি যে বেশ কিছু মেরেছেন তা মানি, কিন্তু সে কতক্ষণ বাবু?

স্পষ্ট এখনও হইল না, কিন্তু একটা আবছায়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল।

সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, স্বচক্ষেই ত দেখেছেন মাসে অন্ততঃ দুবার ক'রে আমার চাকরী যায়। অবস্থা মন্দ নয়, রাগ করে চলে গেলেও পারি, কিন্তু যাই নে কেন? পারি নে। এটুকু জানি, যাঁর দয়ায় হয়েছে তাঁর একটা নিঃশ্বাসেই আশ্বিনের মেঘের মতো সমস্ত উবে যাবে, চোখের পাতা ফেলবার সময় দেবে না। ওতো মায়ের রাগ নয়, ও আমার দেবতার আশীর্ব্বাদ।

এখানে পাঠককে একটু স্মরণ করাইয়া-দেওয়া আবশ্যক যে রতন ছেলেবেলায় কিছুকাল প্রাইমারী স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়াছিল।

একটু থামিয়া কহিল, মায়ের বারণ তাই কখনো বলি নে। ঘরে যা কিছু ছিল খুড়োরা ঠকিয়ে নিলে, একঘর যজমান পর্য্যন্ত দিলে না। ছোট দুটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মাকে ফেলে পেটের দায়ে একদিন গাঁ ছেড়ে বা'র হলাম, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের তপিস্যে ছিল, আমার এই মায়ের ঘরেই চাকরী জুটে গেল। সমস্ত দুঃখই

শুনলেন কিন্তু কিছুই তখন বললেন না। বছরখানেক পরে একদিন নিবেদন জানালাম, মা, ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখতে একবার সাধ হয়, যদি দিনকয়েকের ছুটি দেন। হেসে বললেন, আবার আসবি ত? যাবার দিনে হাতে একটি পুঁটলি গুঁজে দিয়ে বললেন, রতন, খুড়োদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিস্ নে বাবা, যা তোর গেছে এই দিয়ে ফিরিয়ে নিগে যা। খুলে দেখি পাঁচশো টাকা। প্রথমে নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস হ'লো না, ভয় হ'লো বুঝিবা জেগে জেগেই স্বপন দেখচি। আমার সেই মাকেই বঙ্কুবাবু এখন ব্যাঁকা-ট্যারা কথা কয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে গজগজ করে। ভাবি, এর আর বেশীদিন নয়, মা লক্ষ্মী টললেন বলে!

আমি এ আশঙ্কা করি নাই, নিরুত্তরে শুনিতে লাগিলাম।

মনে হইল রতন কিছুদিন হইতেই ক্রোধে ও ক্ষোভে ফুলিতেছে; কহিল, মা যখন দেন দুহাতে ঢেলে দেন। বঙ্কুকেও দিয়েছেন। তাই ও ভেবেচে নেঙড়ানো মৌচাকের আর দাম কি, বড়জোর এখন জ্বালানোই চলে। তাই ওর এত অগ্রাহ্য। মুখ্যু জানে না যে আজও মায়ের একখানা গয়না বিক্রী করলে অমন পাঁচখানা বাড়ী তৈরী হয়।

আমিও জানিতাম না। হাসিয়া বলিলাম, তাই নাকি? কিন্তু সে-সব আছে কোথায়?

রতন হাসিল, কহিল, আছে তাঁরই কাছে। মা অত বোকা নন। এক আপনার পায়েই সমস্ত উজোড় করে দিয়ে তিনি ভিখারী হতে পারেন, কিন্তু আর কারও জন্যে নয়। বঙ্কু জানে না যে আপনি বেঁচে থাকতে মায়ের আশ্রয়ের অভাব নেই, আর রতন বেঁচে থাকতে তাঁর চাকরের ভাবনা ভাবতে হবে না। সেদিন কাশী থেকে আপনার অমনি ক'রে চলে আসা যে মা'র বুকে কি শেল বিঁধেছে বঙ্কুবাবু তার কি খবর রাখে। গুরুঠাকুরই বা তার সন্ধান পাবে কোথায়।

কিন্তু আমাকে যে তিনি নিজেই বিদায় করেছেন এ খবর ত তুমি জানো রতন ?

রতন জিভ কাটিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। এতটা বিনয় কখনো তাহার পূর্ব্বে দেখি নাই। বলিল, আমরা চাকরবাকর বাবু, এ-সব কথা আমাদের কানেও শুনতে নাই। ও মিথ্যে।

রতন আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া একটু গড়াইয়া লইতে প্রস্থান করিল। বোধ করি কাল আটটার পূর্ব্বে আর তার দেহটা 'ধাতে' আসিবে না।

দুটো বড় খবর পাওয়া গেল। একটা এই যে বঙ্কু বড় হইয়াছে। পাটনায় যখন তাহাকে প্রথম দেখি তখন বয়স তাহার ষোল-সতের, এখন একুশ বৎসরের যুবক। উপরন্তু এই পাঁচ-ছয় বৎসরের ব্যবধানে সে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শৈশবের সেই সকৃতজ্ঞ স্নেহ যদি আজ যৌবনের আত্ম-সম্মানবোধে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে বিস্ময়ের কি আছে ?

দ্বিতীয় সংবাদ—না বঙ্কু, না গুরুদেব, রাজলক্ষ্মীর গভীরতম বেদনার কোনও সন্ধান আজও তাঁহাদের জানা নাই।

মনের মধ্যে এই কথা দুটাই বহুক্ষণ ধরিয়া নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সযত্ন-অঙ্কিত শিলমোহরের গালার ছাপগুলো দেখিয়া লইয়া চিঠি খুলিলাম। তাহার হাতের লেখা বেশী দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু স্মরণ হইল হস্তাক্ষর দুষ্পাঠ্য না হইলেও ভালো নয় ; কিন্তু এই পত্রখানি সে অত্যন্ত সাবধানে লিখিয়াছে, বোধ হয় তাহার ভয় বিরক্ত হইয়া আমি না ফেলিয়া রাখি। যেন আগাগোড়া সবটুকুই সহজে পড়িতে পারি।

আচার-আচরণে রাজলক্ষ্মী সে যুগের মানুষ। প্রণয় নিবেদনের

আতিশয্য ত দূরের কথা, 'ভালবাসি' এমন কথাও কখনো স্বমুখে উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সে লিখিয়াছে চিঠি—আমার প্রার্থনার অনুকূলে অনুমতি দিয়া। তবু, কি জানি কি আছে, পড়িতে কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। তাহার বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। সেদিন তাহার পড়াশুনা সাঙ্গ হইয়াছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। পরবর্ত্তীকালে ঘরে বসিয়া হয়ত সামান্য কিছু বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া থাকিবে। অতএব, ভাষার ইন্দ্রজাল, শব্দের ঝঙ্কার, পদবিন্যাসের মাধুরী তাহার পত্রের মধ্যে আশা করা অন্যায়। সর্ব্বদা প্রচলিত সামান্য গোটাকয়েক কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর সে কি করিবে? একটা অনুমতি দিয়া মামুলী শুভ-কামনা করিয়া দুছত্র লেখা—এই ত? কিন্তু খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের কিছুই আর মনে রহিল না। পত্র দীর্ঘ নয়, কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গী যত সহজ ও সরল ভাবিয়াছিলাম তাহাও নয়। আমার আবেদনের উত্তর সে এইরূপ দিয়াছে—

৺কাশীধাম

প্রণামান্তে সেবিকার নিবেদন—

তোমার চিঠিখানা এইবার নিয়ে একশোবার পড়লুম। তবু ভেবে পেলুম না তুমি ক্ষেপেচ না আমি ক্ষেপেচি। ভেবেছ বুঝি হঠাৎ তোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম? কুড়িয়ে তোমাকে পাই নি, পেয়েছিলুম অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়। তাই, বিদায় দেবার কর্ত্তা তুমি নও, আমাকে ত্যাগ করার মালিকানা স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নেই!

ফুলের বদলে বন থেকে তুলে বঁইচির মালা গেঁথে কোন্

শৈশবে তোমাকে বরণ করেছিলুম সে তোমার মনে নেই। কাঁটায় হাত বয়ে রক্ত ঝড়ে পড়তো, রাঙামালার সে রাঙা-রং তুমি চিনতে পারো নি। বালিকার পূজার অর্ঘ্য সেদিন তোমার গলায়, তোমার বুকের 'পরে রক্তরেখায় যে লেখা এঁকে দিত সে তোমার চোখে পড়ে নি, কিন্তু যাঁর চোখে সংসারের কিছুই বাদ পড়ে না, আমার সে নিবেদন তাঁর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছেছিল।

তারপরে এলো দুর্য্যোগের রাত, কালো মেঘে দিলে আমার আকাশের জ্যোৎস্না ঢেকে; কিন্তু সে সত্যিই আমি না আর কেউ, এ জীবনে যথার্থ-ই ওসব ঘটেছিল, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেচি ভাবতে গিয়ে অনেক সময়ে ভয় হয় বুঝিবা আমি পাগল হয়ে যাবো। তখন সমস্ত ভুলে যাকে ধ্যান করতে বসি তাঁর নাম বলা চলে না। কাউকে বলতে নেই। তাঁর ক্ষমাই আমার জগদীশ্বরের ক্ষমা। এতে ভুল নেই, সন্দেহ নেই, এখানে আমি নির্ভয়।

হাঁ, বলছিলুম, তারপরে এলো আমার দুর্দ্দিনের রাত্রি, কলঙ্কে দিল দুচোখের সকল আলো নিবিয়ে; কিন্তু সেই কি মানুষের সমস্ত পরিচয়? সেই অখণ্ড গ্লানির নিরবকাশ আবরণের বাইরে তার কি আর কিছুই বাকি নেই?

আছে। অব্যাহত অপরাধের মাঝে মাঝে তাকে আমি বার বার দেখতে পেয়েচি। তাই যদি না হ'তো, বিগত দিনের রাক্ষসটা যদি আমার অনাগতর সমস্ত মঙ্গলকে নিঃশব্দে গিলে খেতো, তবে তোমাকে ফিরে পেতুম কি ক'রে? আমার হাতে এনে আবার তোমাকে দিয়ে যেতো কে?

আমার চেয়ে তুমি চার-পাঁচ বছরের বড়, তবু তোমাকে যা মানায় আমাকে তা সাজে না। বাঙালী-ঘরের মেয়ে আমি, জীবনের সাতাশটা বছর পার করে দিয়ে আজ যৌবনের দাবী আর করি নে। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না—যত অধমই হই,

ও-কথা যদি ঘুণাক্ষরেও তোমার মনে আসে তার বাড়া লজ্জা আমার নেই। বঙ্কু বেঁচে থাক, সে বড় হয়েছে, তার বৌ এসেছে —তোমার বিয়ের পরে তাদের সুমুখে বা'র হবো আমি কোন্ মুখে? এ অসম্মান সইবো কি ক'রে?

যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখবে কে—পুঁটু? আর আমি ফিরে আসবো তোমার বাড়ীর বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তারপরেও বেঁচে থাকতে বলো নাকি?

হয়ত প্রশ্ন করবে, তবে কি এমনি নিঃসঙ্গ জীবনই চিরদিন কাটাবো? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক, এর জবাব দেবার দায় আমার নয়, তোমার। তবে নিতান্তই যদি ভেবে না পাও, বুদ্ধি এতই ক্ষয়ে গিয়ে থাকে আমি ধার দিতে পারি, শোধ দিতে হবে না— কিন্তু ঋণটা অস্বীকার ক'রো না যেন।

তুমি ভাবো গুরুদেব দিয়েছেন আমাকে মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র দিয়েছে পথের সন্ধান, সুনন্দা দিয়েছে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, আর তুমি দিয়েছো শুধু ভার বোঝা। এমনিই অন্ধ তোমরা।

জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে ত ফিরে পেয়েছিলুম আমার তেইশ বছর বয়সে, কিন্তু তার আগে এঁরা সব ছিলেন কোথায়? তুমি এত ভাবতে পারো আর এটা ভাবতে পারো না?

আশা ছিল একদিন আমার পাপ ক্ষয় হবে, আমি নিষ্পাপ হবো। এ লোভ কেন জানো? স্বর্গের জন্য নয়—সে আমি চাই নে। আমার কামনা মরণের পরে যেন আবার এসে জন্মাতে পারি। বুঝতে পারো তার মানে কি?

ভেবেছিলুম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে—তাকে নির্ম্মল আমাকে করতেই হবে; কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে ত থাকলো আমার জপতপ, পূজা-অর্চ্চনা, থাকলো সুনন্দা, থাকলো আমার গুরুদেব।

স্বেচ্ছায় মরণ আমি চাই নে; কিন্তু আমাকে অপমান করার

ফন্দি যদি ক'রে থাকো, সেই বুদ্ধি ত্যাগ করো। • তুমি দিলে বিষ আমি নেবো, কিন্তু ও নিতে পারবো না। • আমাকে জানো বলেই জানিয়ে দিলুম যে সূর্য্য অস্ত যাবে, তার পুনরুদয়ের অপেক্ষায় বসে থাকার আমার আর সময় হবে না। ইতি—

রাজলক্ষ্মী

বাঁচা গেল। সুনিশ্চিত কঠোর অনুশাসনের চরম লিপি পাঠাইয়া একটা দিকে সে আমাকে একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল। এ জীবনে ও ব্যাপার লইয়া ভাবিবার আর কিছু রহিল না; কিন্তু কি করিতে পারিব না তাহাই নিঃসংশয়ে জানিলাম, কিন্তু অতঃপর কি আমাকে করিতে হইবে এ সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মী একেবারে নির্ব্বাক্। হয়ত উপদেশ দিয়া আর একদিন চিঠি লিখিবে, কিংবা আমাকেই সশরীরে তলব করিয়া পাঠাইবে, কিন্তু আপাততঃ ব্যবস্থা যাহা হইল তাহা অত্যন্ত চমৎকার। এদিকে ঠাকুর্দ্দা মহাশয় সম্ভবতঃ কাল সকালেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন, ভরসা দিয়া আসিয়াছি চিন্তার হেতু নাই, অনুমতি পাওয়ায় বিঘ্ন ঘটিবে না; কিন্তু আসিয়া যাহা পোঁছিল তাহা নির্ব্বিঘ্নে অনুমতিই বটে। রতন নাপিতের হাতে সে যে চেলি এবং টোপর পাঠায় নাই এই ঢের।

ও-পক্ষে দেশের বাটীতে বিবাহের আয়োজন নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতেছে। পুঁটুর আত্মীয়-স্বজনও কেহ কেহ হয়ত আসিয়া হাজির হইতেছে, এবং প্রাপ্তবয়স্কা অপরাধী মেয়েটা হয়ত এতদিনে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার পরিবর্ত্তে একটুখানি সমাদরের মুখ দেখিতে পাইয়াছে। ঠাকুর্দ্দাকে কি বলিব জানি, কিন্তু কেমন করিয়া সেই কথাটা বলিব ইহাই ভাবিয়া পাইলাম না। তাঁহার নির্ম্মম তাগাদা ও লজ্জাহীন যুক্তি ও ওকালতি মনে মনে আলোচনা করিয়া অন্তরটা একদিকে যেমন তিক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার ব্যর্থ প্রত্যাবর্ত্তনে নিরাশায় ক্ষিপ্ত

পরিজনগণের ঐ দুর্ভাগা মেয়েটাকে অধিকতর উৎপীড়নের কথা মনে করিয়াও হৃদয় তেমনি ব্যথিত হইয়া আসিল; কিন্তু উপায় কি? বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলাম। পুঁটুর কথা ভুলিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল গঙ্গামাটির কথা। জনবিরল সেই ক্ষুদ্র পল্লীস্মৃতি কোনদিন মুছিবার নয়। এ জীবনের গঙ্গা-যমুনা ধারা একদিন এইখানে আসিয়া মিলিয়াছে, এবং স্বল্পকাল পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া আবার একদিন এইখানেই বিযুক্ত হইয়াছে। একত্রবাসের সেই ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি শ্রদ্ধায় গভীর, স্নেহে মধুর, আনন্দে উজ্জ্বল, আবার তাদের মতই নিঃশব্দ বেদনায় নিরতিশয় স্তব্ধ। বিচ্ছেদের দিনেও আমরা প্রবঞ্চনার পরিবর্ত্তে কেহ কাহাকেও কলঙ্কলিপ্ত করি নাই, লাভ-ক্ষতির নিষ্ফল বাদ-প্রতিবাদে গঙ্গামাটির শান্ত গৃহখানিকে আমরা ধূম্রাচ্ছন্ন করিয়া আসি নাই। সেখানে সবাই জানে আবার একদিন আমরা ফিরিয়া আসিব, আবার সুরু হইবে আমোদ-আহ্লাদ, সুরু হইবে ভূস্বামিনীর দীন-দরিদ্রের সেবা ও সৎকার; কিন্তু সে সম্ভাবনা যে শেষ হইয়াছে, প্রভাতের বিকশিত মল্লিকা দিনান্তের শাসন মানিয়া লইয়া নীরব হইয়াছে, এ কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না।

চোখে ঘুম নাই, বিনিদ্র রজনী ভোরের দিকে যতই গড়াইয়া আসিতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল এ রাত্রি যেন না পোহায়। এই একটিমাত্র চিন্তাই এমনি করিয়া যেন আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

বিগত কাহিনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে পড়ে, বীরভূম জেলার সেই তুচ্ছ কুটীরখানি মনের উপর ভূতের মতো চাপিয়া বসে, অনুক্ষণ গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রাজলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ হাত দুটি চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ-জীবনে পরিতৃপ্তির আস্বাদন এমন করিয়া কখনো করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

এতকাল ধরাই পড়িয়াছি, ধরিতে পারি নাই; কিন্তু আজ

ধরা পড়িল রাজলক্ষ্মীর সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা কোথায়। সে জানে আমি সুস্থ নই, যে কোনদিন অসুখে পড়িতে পারি, তখন কোথাকার কে এক পুঁটু আমাকে ঘিরিয়া শয্যা জুড়িয়া বসিয়াছে, রাজলক্ষ্মীর কোন কর্ত্তৃত্বই নাই, এত বড় দুর্ঘটনা মনের মধ্যে সে ঠাঁই দিতে পারে না। সংসারের সব কিছু হইতেই নিজেকে সে বঞ্চিত করিতে পারে কিন্তু এ বস্তু অসম্ভব—এ তাহার অসাধ্য। মরণ তুচ্ছ, এর কাছে রহিল তাহার গুরুদেব, রহিল তাহার জপতপ ব্রত-উপবাস। সে মিথ্যা ভয় আমাকে চিঠির মধ্যে দেখায় নাই।

ভোরের সময় বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, রতনের ডাকে যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন বেলা হইয়াছে। সে কহিল, কে একটি বুড়ো ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়ী করে এইমাত্র এলেন।

এ ঠাকুর্দ্দা ; কিন্তু গাড়ী ভাড়া করিয়া ? সন্দেহ জন্মিল।

রতন কহিল, সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে আছে।

এ পুঁটু। এই নির্লজ্জ মানুষটা তাহাকে কলিকাতার বাসায় পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। সকালের আলো তিক্ততায় ম্লান হইয়া উঠিল, বলিলাম, তাঁদের এই ঘরে এনে বসাও রতন, আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসচি ; এই বলিয়া নীচে স্নানের ঘরে চলিয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিতে ঠাকুর্দ্দাই আমাকে সমাদর অভ্যর্থনা করিলেন, যেন আমিই অতিথি—এসো দাদা, এসো। শরীরটা বেশ ভালো ত ?

আমি প্রণাম করিলাম। ঠাকুর্দ্দা হাঁকিলেন, পুঁটু গেলি কোথায় ?

পুঁটু জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতেছিল, কাছে আসিয়া নমস্কার করিল।

ঠাকুর্দ্দা কহিলেন, ওর পিসিমা বিয়ের আগে ওকে একবার দেখতে চায়। পিসেমশাই হাকিম—পাঁচশো টাকা মাইনে। ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হয়ে এসেছে—ঘর-সংসার ফেলে পিসির বা'র হবার যো নেই, তাই সঙ্গে নিয়ে এলুম, বললুম, পরের হাতে তুলে দেবার আগে ওকে একবার দেখিয়ে আনিগে। ওর দিদিমা আশীর্ব্বাদ করে বললে, পুঁটি, এমনি অদৃষ্ট যেন তোরও হয়।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বে নিজেই বলিলেন, আমি কিন্তু সহজে ছাড়চি নে ভায়া। হাকিমই হোন আর যেই হোন, আত্মীয় ত—দাঁড়িয়ে থেকে কাজটি সমাধা করে দিতে হবে—তবে তাঁর ছুটি। জানোই ত দাদা, শুভকর্ম্মে বহু বিঘ্ন—শাস্ত্রে কি বলে—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—অমন একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকলে কারুর টুঁ শব্দ করবার ভরসা হবে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে ত বিশ্বাস নেই—ওরা সব পারে! কিন্তু হাকিম কিনা, ওদের রাশই আলাদা।

পুঁটুর পিসেমশাই হাকিম। খবরটা অবান্তর নয়—তাৎপর্য্য আছে।

নতুন হুঁকা কিনিয়া আনিয়া রতন সযত্নে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, ঠাকুর্দ্দা ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিলেন, লোকটিকে কোথায় যেন দেখেচি বলে মনে হচ্চে না?

রতন তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে হাঁ, দেখেচেন বইকি। দেশের বাড়ীতে বাবুর অসুখের সময়ে।

ওঃ—তাইত বলি। চেনা মুখ।

আজ্ঞে হাঁ। বলিয়া রতন চলিয়া গেল।

ঠাকুর্দ্দার মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত্ত লোক, বোধ হয় সমস্ত কথাই তাঁহার স্মরণ হইল। নীরবে তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, বেরুবার সময়ে দিনটা দেখিয়ে এসেছিলাম, বেশ ভালো দিন, আমার ইচ্ছে আশীর্ব্বাদের কাজটা অমনি সেরে যাই। নতুনবাজারে সমস্ত কিনতে পাওয়া যায়, চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দিলে হয় না? কি বলো?

কিছুতেই কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কোনমতে শুধু বলিয়া ফেলিলাম, না।

না? না কেন? বেলা বারোটা পর্য্যন্ত দিনটা ত বেশ ভালো। পাজি আছে?

বলিলাম, পাজির দরকার নেই। বিবাহ আমি করতে পারবো না।

ঠাকুর্দ্দা হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন। গলাটা বেশ শান্ত ও গম্ভীর করিয়া কহিলেন, উয্যুগ-আয়োজন এক রকম সম্পূর্ণ বললেই হয়। মেয়ের বিয়ে ব'লে কথা, ঠাট্টা-তামাসার ব্যাপার ত নয়—কথা দিয়ে এসে এখন না বললে চলবে কেন?

পুঁটু পিছন ফিরিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে, এবং দ্বারের আড়ালে রতন কান পাতিয়া রাখিয়াছে বেশ জানি।

বলিলাম, কথা দিয়ে যে আসি নি তা আমিও জানি, আপনিও জানেন। বলেছিলাম একজনের অনুমতি পেলে রাজী হতে পারি।

অনুমতি পাও নি?

না।

ঠাকুর্দ্দা একমুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলেন, পুঁটির বাপ বলে, সর্ব্বরকমে সে হাজার টাকা দেবে। ধরাধরি করলে আরও দু-একশ' উঠতে পারে। কি বলো হে?

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তামাকটা আর একবার পালটে দেব কি?

দাও। তোমার নামটি কি বাপু?

রতন।

রতন? বেশ নামটি—থাকো কোথায়?

কাশীতে।

কাশী? ঠাকরুণদি বুঝি আজকাল কাশীতেই থাকেন? কি করচেন সেখানে?

রতন মুখ তুলিয়া বলিল, সে খবরে আপনার দরকার ?

ঠকুর্দ্দা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, রাগ করো কেন বাপু, রাগের ত কিছু নেই। গাঁয়ের মেয়ে কিনা, তাই খবরটা জানতে ইচ্ছে করে। হয়ত তাঁর কাছে গিয়ে পড়তেই বা হয়। তা ভালো আছে ত ?

রতন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল, এবং মিনিট-দুই পরেই কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়া হুঁকাটা তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ঠাকুর্দ্দা সবলে কয়েকটা টান দিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন—দাঁড়াও ত বাপু, পায়খানাটা একবার দেখিয়ে দেবে। ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল কিনা! বলিতে বলিতে তিনি রতনের আগেই ব্যস্ত-দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পুঁটু মুখ ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, দাদামশায়ের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। বাবা হাজার টাকা কোথায় পাবেন যে দেবেন ? অমনি ক'রে পরের গয়না চেয়ে দিদির বিয়ে—এখন তারা দিদিকে আর নেয় না। তারা বলে, ছেলের আবার বিয়ে দেবে।

এই মেয়েটি এত কথা আমার সঙ্গে পূর্ব্বে কহে নাই, কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা সত্যিই হাজার টাকা দিতে পারেন না ?

পুঁটু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কখ্‌খনো না। বাবা রেলে চল্লিশ টাকা মোটে মাইনে পান, আমার ছোট ভাইয়ের ইস্কুলের মাইনের জন্যে আর পড়াই হলো না। সে কত কাঁদে। বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটি ছলছল করিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, তোমার কি শুধু টাকার জন্যেই বিয়ে হচ্ছে না ?

পুঁটু কহিল, হাঁ, তাইত। আমাদের গাঁয়ে অমূল্যবাবুর সঙ্গে

বাবা সম্বন্ধ করেছিলেন। তাঁর মেয়েরাই আমার চেয়ে অনেক বড়। মা জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন বলেই ত সে বিয়ে বন্ধ হলো। এবারে বাবা বোধ হয় আর কারু কথা শুনবেন না, সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন।

বলিলাম, পুঁটু, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

পুঁটু সলজ্জে মাথা নীচু করিয়া একটুখানি মাথা নাড়িল।

কিন্তু আমিও ত তোমার চেয়ে চোদ্দ-পনের বছরের বড়?

পুঁটু এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি আর কোথাও কখনো সম্বন্ধ হয় নি?

পুঁটু মুখ তুলিয়া খুশী হইয়া বলিল, হয়েছিল ত। আপনাদের গ্রামের কালিদাসবাবুকে জানেন? তাঁর ছোট ছেলে। বি. এ. পাস করেছে, বয়েস আমার চেয়ে কেবল একটুখানি বড়। তার নাম শশধর।

তোমার তাকে পছন্দ হয়?

পুঁটু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিলাম, কিন্তু শশধর তোমাকে যদি পছন্দ না করে?

পুঁটু বলিল, তাই বইকি! আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে কেবল আনাগোনা করত। রাঙাদিদিমা ঠাট্টা করে বলতেন, সে শুধু আমার জন্যেই।

কিন্তু এ বিয়ে হলো না কেন?

পুঁটুর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, কহিল, তার বাবা হাজার টাকার গয়না আর হাজার টাকা নগদ চাইলে। আর কোন্ না, পাঁচশ' টাকা খরচ হবে বলুন? এ ত জমিদারদের ঘরের মেয়ের জন্যই হয়। সত্যি নয়? ওরা বড়লোক, অনেক টাকা ওদের, আমার মা তাদের বাড়ী গিয়ে কত হাতে-পায়ে ধরলে, কিন্তু কিছুতে শুনলে না।

শশধর কিছু বললে না ?

না, কিছু না, কিন্তু সেও ত বেশী বড় নয়—তার বাপ-মা বেঁচে আছে কিনা।

তা বটে, শশধরের বিয়ে হয়ে গেছে ?

পুঁটু ব্যগ্র হইয়া কহিল, না, এখনো হয় নি। শুনছি নাকি শীগ্‌গির হবে।

আচ্ছা, সেখানে তোমার বিয়ে হ'লে তারা যদি তোমাকে ভালো না বাসে ?

আমাকে ? কেন ভালোবাসবে না ? আমি যে রাঁধাবাড়া, সেলাই করা, সংসারের সব কাজ জানি। আমি একলাই তাদের সব কাজ করে দেবো।

এর বেশী বাঙালী-ঘরের মেয়ে কিই বা জানে! কায়িক পরিশ্রম দিয়াই সে সমস্ত অভাব পূরণ করিতে চায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁদের সব কাজ নিশ্চয় করবে ত ?

হাঁ, নিশ্চয় করব।

তা হ'লে তোমার মাকে গিয়ে ব'লো, শ্রীকান্তদাদা আড়াই হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আপনি দেবেন ? তা হ'লে বিয়ের দিনে যাবেন বলুন ?

হাঁ, তাও যাবো।

দ্বারপ্রান্তে ঠাকুর্দ্দার সাড়া পাওয়া গেল। কোঁচায় মুখ মুছিতে মুছিতে তিনি প্রবেশ করিলেন—তোফা পায়খানাটি ভায়া! শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। রতন গেল কোথায়, আর এক কলকে তামাক দিক না।

চার

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে মানুষকে সদুপদেশ দিয়া কখনো ফললাভ হয় না। সৎ পরামর্শ কিছুতেই কেহ শুনে না; কিন্তু সত্য বলিয়াই দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রমও আছে। সেই ঘটনাটা বলিব।

ঠাকুর্দ্দা দাঁত বাহির করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন, পুঁটু বিস্তর পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া আদেশ পালন করিল, কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে আমার পরিতাপের অবধি রহিল না। সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া কেবলি তিরস্কার করিতে লাগিল যে, কে ইহারা যে বিদেশে চাকরী করিয়া বহু দুঃখে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাই দিয়া দিব? ঝোঁকের মাথায় একটা কথা বলিয়াছি বলিয়াই দাতাকর্ণগিরি করিতেই হইবে তাহার অর্থ কি? কোথাকার কে এই মেয়েটা গাড়ীতে অযাচিত প্যাঁড়া এবং দই খাওয়াইয়া আমাকে ত আচ্ছা ফাঁদে ফেলিয়াছে। একটি ফাঁস কাটিতে আর একটা ফাঁসে জড়াইয়া পড়িলাম। পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল, এবং এই নিরীহ মেয়েটার প্রতি ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। আর ঐ সয়তান ঠাকুর্দ্দা! ইচ্ছা করিতে লাগিল লোকটা যেন না আর বাড়ী পৌঁছায়, রাস্তাতেই সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মারা যায়; কিন্তু সে আশা ভিত্তিহীন। নিশ্চয় জানি লোকটা কিছুতেই মরিবে না এবং একবার যখন আমার বাসার ঠিকানা জানিয়াছে তখন আবার আসিবে, এবং যেমন করিয়া পারে টাকা আদায় করিবে। হয়ত এবার সেই হাকিম-পিসেমশাইকে সঙ্গে করিয়া

আনিবে। এক উপায়—যঃ পলায়তি। টিকিট কিনিতে গেলাম কিন্তু জাহাজে স্থানাভাব—সমস্ত টিকিট পূর্ব্বাহ্লেই বিক্রী হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পরের মেলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সে ছয়-সাত দিনের ব্যাপার। .

আর এক পন্থা বাসা বদল করা। ঠাকুর্দ্দা না খুঁজিয়া পায়; কিন্তু এমন একটি ভালো জায়গা এত শীঘ্র পাওয়াই বা যায় কোথায়? কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে ভালোমন্দর প্রশ্নই অবান্তর—যথারণ্যং তথা গৃহম্—শিকারীর হাত হইতে প্রাণ বাঁচানোর দায়।

ভয় ছিল আমার গোপন উদ্বেগটা পাছে রতনের চোখে পড়ে; কিন্তু বিপদ হইয়াছে তাহার নড়িবার গা নাই, কাশীর চেয়ে কলিকাতা তাহার বেশী মনে ধরিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, চিঠির জবাব নিয়ে কি তুমি কালই যেতে চাইচো, রতন?

রতন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আজ্ঞে না। আজ দুপুরে মাকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিলাম আমার দু-পাঁচ দিন দেরী হবে। মরা সোসাইটি, জ্যান্ত সোসাইটি না দেখে আর ফিরচি নে। আবার কবে কোন্ কালে আসা হবে তার কোন ঠিক নেই।

বলিলাম, কিন্তু তিনি ত উদ্বিগ্ন হতে পারেন—

আজ্ঞে, না। গাড়ীর ধকলটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নি সে-কথা লিখে দিয়েছি।

কিন্তু চিঠির জবাবটা—

আজ্ঞে, দিন না। কালই রেজেষ্ট্রি করে পাঠিয়ে দেবো'খন। সে বাড়ীতে মা'র চিঠি যমে খুলতে সাহস করবে না।

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নাপিত ব্যাটার কাছে কোন ফন্দিই খাটিল না। সব প্রস্তাবই নাকচ করিয়া দিল।

যাবার সময় ঠাকুর্দ্দা টাকার কথাটা প্রচার করিয়াই গিয়াছেন।

তাহা চিত্তের ঔদার্য্য অথবা সারল্যের প্রাচুর্য্য এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। তিনি সাক্ষী রাখিয়া গিয়াছেন।

রতন ঠিক সেই কথাই পাড়িল, বলিল, যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি, বাবু।

কি কথা রতন?

রতন একটু দ্বিধা করিয়া বলিল, আড়াই হাজার টাকা ত নিতান্ত তুচ্ছ নয় বাবু—ওরা কে যে ওদের মেয়ের বিয়েতে এতটা টাকা আপনি খামোকা দান করবেন বললেন। তা ছাড়া, ঠাকুর্দ্দাই হোক আর যেই হোক, বুড়োটা লোক ভালো নয়! ওকে বলাটা ভাল হয়নি বাবু।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া যেমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম, মনের মধ্যে তেমনি জোর পাইলাম—ইহাই চাহিতেছিলাম।

তথাপি কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস দিয়া কহিলাম, বলাটা ভালো হয় নি, না রতন?

রতন বলিল, নিশ্চয় ভালো হয় নি বাবু! টাকাটা ত কম নয়। তা ছাড়া, কিসের জন্যে বলুন ত?

ঠিক ত! কহিলাম, তা হ'লে না দিলেই হবে।

রতন সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সে ছাড়বে কেন?

কহিলাম, না ছেড়ে করবে কি? লেখাপড়া করে ত দিই নি। আর, তখন আমি এখানে থাকবো কি বর্মায় চলে যাবো তাই বা কে জানে!

রতন এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, বলিল, বুড়োকে আপনি চিনিতে পারেন নি বাবু, ওদের লজ্জা-সরম মান-অপমান নেই। কেঁদেকেটে ভিক্ষে করেই হোক, আর ভয় দেখিয়ে জুলুম করেই হোক, টাকা ও নেবেই। আপনার দেখা না পেলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ও কাশী গিয়ে মা'র কাছ থেকে আদায়

করে ছাড়বে। মা বড় লজ্জা পাবেন বাবু, ও মতলবে কাজ নেই।

শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। রতন আমার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। অর্থহীন আকস্মিক-করুণার হঠকারিতার জরিমানা আমাকে দিতেই হইবে। নিস্তার নাই।

রতন পাড়াগাঁয়ের ঠাকুর্দ্দাকে যে চিনিতে ভুল করে নাই, বুঝা গেল যখন চতুর্থ দিবসে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কেবল আশা করিয়াছিলাম, এবার নিশ্চয় হাকিম-পিসেমশাই সঙ্গে আসিবেন—কিন্তু একাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, দশখানা গ্রামের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে দাদা, সবাই বলচে, কলিকালে এমন কখনো শোনা যায় না। গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় এভাবে উদ্ধার করে দিতে কেউ কখনো চোখে দেখে নি। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হও।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বিয়ে কবে ?

এই মাসের পঁচিশে স্থির হয়েছে, মধ্যে কেবল দশটা দিন বাকী। কাল পাকা দেখা, আশীর্ব্বাদ—বেলা তিনটের পর বারবেলা, এর ভেতরেই শুভকর্ম্ম সমাধা করে নিতে হবে; কিন্তু তুমি না গেলে বরঞ্চ সব বন্ধ থাকবে, তবু কিছুই হতে পারবে না। এই নাও তোমার পুঁটুর চিঠি—সে নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছে; কিন্তু তাও বলি দাদা, যে রত্ন তুমি স্বেচ্ছায় হারালে তার জোড়া কখনো পাবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁজ-করা একখণ্ড হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে দিলেন।

কৌতূহলবশতঃ চিঠিখানা পড়িবার চেষ্টা করিলাম, ঠাকুর্দ্দা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, কালিদাসের পয়সা থাকলে হবে কি, একেবারে ছোটলোক—চামার। চোখের চামড়া বলে

তার কোন বালাই নেই।—কালই টাকাকড়ি সব নগদ চুকিয়ে দিতে হবে—গহনাপত্র নিজের স্যাকরা দিয়ে গড়িয়ে নেবে। ওর কাউকে বিশ্বাস নেই—এমন কি, আমাকে পর্য্যন্ত না!

লোকটার মস্ত দোষ। ঠাকুর্দ্দাকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না—আশ্চর্য্য!

পুঁটি স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছে। একপাতা দুপাতা নয়, চার পাতা জোড়া ঠাস বুনানি। চার পাতাই সকাতর মিনতি। ট্রেনে রাঙাদিদি বলিয়াছিলেন, আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। কেবল আজকালকার নয়, সর্ব্বকালের নাটক-নভেল হার মানে তাহা অস্বীকার করিব না। এই লেখার জোরে নন্দরাণীর স্বামী চোদ্দ দিনের ছুটি লইয়া সাত দিনের দিন আসিয়া হাজির হইয়াছিল কথাটা বিশ্বাস হইল।

অতএব, আমিও পরদিন সকালেই যাত্রা করিলাম। টাকাটা সত্যই সঙ্গে লইয়াছি, এবং ভাঙচুর করিয়া প্রতারণা করিতেছি না—ঠাকুর্দ্দা নিজের চক্ষে তাহা যাচাই করিয়া লইলেন, বলিলেন, পথ চলবে জেনে, টাকা নেবে গুণে—আমরা দেবতা নইতো রে ভাই, মানুষ—ভুল হতে কতক্ষণ।

সত্যই ত! রতন কাল রাত্রেই কাশী রওনা হইয়া গিয়াছে। তাহার হাতে চিঠির জবাব দিয়াছি, লিখিয়া দিয়াছি—তথাস্তু। ঠিকানা দিতে পারি নাই, ঠিক নাই বলিয়া। এ ত্রুটি যেন সে নিজ গুণে ক্ষমা করে এ প্রার্থনাও জানাইয়াছি।

যথাসময়ে গ্রামে পৌঁছিলাম, বাড়ীসুদ্ধ লোকের দুশ্চিন্তা ঘুচিল। যত্ন ও সমাদর যাহা পাইলাম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা অভিধানে নাই।

পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদ করার উপলক্ষে কালিদাসবাবুর সহিত

পরিচয় হইল। লোকটা যেমন রুক্ষ মেজাজের তেমনি দাম্ভিক। তাঁহার অনেক টাকা এই কথাটা সকলকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করানো ছাড়া জগতে তাঁহার যে আর কোন কর্ত্তব্য আছে মনে হয় না। সমস্ত স্বোপার্জ্জিত, সদম্ভে বলিলেন, মশাই, বরাত আমি মানি নে, যা করব তা নিজের বাহুবলে। দেবদেবতার অনুগ্রহ আমি ভিক্ষে করি নে। আমি বলি দৈবের দোহাই দেয় কাপুরুষে।

বড়লোক বলিয়া এবং ছোটখাটো তালুকদার বলিয়া গ্রামের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন, এবং অধিকাংশেরই বোধ করি তিনি মহাজন—এবং দুর্দ্দান্ত মহাজন—অতএব সকলেই একবাক্যে তাঁহার কথাগুলা স্বীকার করিয়া লইলেন। তর্করত্ন মহাশয় কি একটা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, এবং আশেপাশে হইতে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-একটা পুরাতন কাহিনীরও সূত্রপাত হইল।

অপরিচিত সামান্য ব্যক্তি অনুমানে তিনি অবহেলাভরে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। টাকার শোকে আমার অন্তরটা তখন পুড়িতেছিল, দৃষ্টিটা সহ্য হইল না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, বাহুবল আপনার কি পরিমাণ আছে জানি নে, কিন্তু টাকা উপায়ের ব্যাপারে দৈব এবং বরাতের জোর যে যথেষ্ট প্রবল তা আমিও স্বীকার করি।

তার মানে?

বলিলাম, মানে আমি নিজেই। বরকেও চিনি নে, কনেকেও না, অথচ টাকা যাচ্চে আমার এবং সে ঢুকচে গিয়ে আপনার সিন্দুকে। একে বরাত বলে না ত বলে কাকে? এই বললেন, আপনি দেবদেবতার অনুগ্রহ নেন না, কিন্তু আপনার ছেলের হাতের আংটি থেকে বৌয়ের গলার হার পর্য্যন্ত তৈরী হবে যে আমারই অনুগ্রহের দানে। হয়ত বা বৌভাতের খাওয়ানটা পর্য্যন্ত আমাকেই যোগাতে হবে।

ঘরের মধ্যে বজ্রঘাত হ'লেও বোধ করি সকলে এত বিচলিত ও

ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। ঠাকুর্দ্দা কি সব বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই সুস্পষ্ট বা সুব্যক্ত হইয়া উঠিল না। কালিদাসবাবু ক্রোধে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনি টাকা দিচ্ছেন তা আমি জানবো কি ক'রে? এবং দিচ্চেনই বা কেন?

বলিলাম, কেন দিচ্চি সে আপনি বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও চাই নে; কিন্তু দেশসুদ্ধ সকলে শুনেচে আমি টাকা দিচ্চি, কেবল আপনি শোনেন নি? মেয়ের মা আপনাদের বাড়ীসুদ্ধ সকলের হাতে-পায়ে ধরেচে, কিন্তু আপনি বি. এ. পাসকরা ছেলের দাম আড়াই হাজারের এক পয়সা কম করতে রাজী হন নি। মেয়ের বাপ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরী করে, তার চল্লিশটা পয়সা দেবার শক্তি নেই—এটা ভেবে দেখেন নি আপনার ছেলে কেনবার এত টাকা হঠাৎ তারা পায় কোথায়? যাই হোক, ছেলেবেচা টাকা অনেকেই নেয়, আপনি নিলেও দোষ নেই, কিন্তু এর পরে গাঁয়ের লোককে বাড়ীতে ডেকে টাকার অহঙ্কার আর করবেন না এবং একজন বাইরের লোকের ভিক্ষের দানে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন এ কথাটাও মনে রাখবেন।

উদ্বেগ ও ভয়ে সকলের মুখ কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। বোধ হয় সবাই ভাবিলেন এবার ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিবে, এবং ফটক বন্ধ করিয়া সকলকে লাঠিপেটা না করিয়া কালিদাসবাবু আর কাহাকেও ঘরে ফিরিতে দিবেন না।

কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, টাকা আমি নেবো না।

বলিলাম, তার মানে ছেলের বিয়ে আপনি এখানে দেবেন না?

কালিদাসবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না তা নয়। আমি কথা দিয়েছি বিবাহ দেবো—তার নড়চড় হবে না। কালিদাস মুখুয্যে কথার খেলাপ করে না। আপনার নামটি কি?

ঠাকুর্দ্দা ব্যগ্রকণ্ঠে আমার পরিচয় দিলেন। কালিদাসবাবু

চিনিতে পারিয়া কহিলেন, ওঃ—তাই বটে। এর বাপের সঙ্গেই না একবার আমার ভয়ানক ফৌজদারী মামলা বাধে?

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ—কিছুই আপনি বিস্মৃত হন না। এ তারই ছেলে বটে, সম্পর্কে আমারও নাতি হয়।

কালিদাসবাবু প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, তা হোক। আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে আজ এমনি বয়সই হ'তো। শশধরের বিয়েতে এসো বাবা। আমার পক্ষ থেকে সেদিন তোমার নিমন্ত্রণ রইলো।

শশধর উপস্থিত ছিল, সে শুধু সকৃতজ্ঞ চোখে আমার প্রতি একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় মুখখানি আনত করিল।

আমি উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিলাম, বলিলাম, যেখানেই থাকি, অন্ততঃ বৌভাতের দিনে এসে নববধূর হাতে অন্ন খেয়ে যাবো; কিন্তু অনেক রূঢ় কথা বলেচি, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

কালিদাসবাবু বলিলেন, রূঢ় কথা যে বলেছো তা সত্যি, কিন্তু আমি ক্ষমাও করেচি; কিন্তু উঠলে চলবে না শ্রীকান্ত, শুভকর্ম্ম উপলক্ষে সামান্য কিছু খাবার আয়োজন করে রেখেচি, তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।

যে আজ্ঞে তাই হবে, বলিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলাম।

সেদিন পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সভাস্থ অভ্যাগতগণের খাওয়াদাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে সদুপদেশ সম্বন্ধে যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম, পুঁটুর বিবাহটা তাহারই একটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ। জগতে এই একটি মাত্রই নিজের চোখে দেখিয়াছি। কারণ, নিঃসম্পর্কীয়, অপরিচিত, হতভাগ্য মেয়ের বাপের কান মলিলেই যেখানে টাকা আদায় হয়, সেখানে বৈষ্ণব সাজিয়া হাতজোড় করিয়া বাঘের গ্রাস হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। নিষ্ঠুর-হৃদয় বলিয়া গালিগালাজ করিয়া সমাজ ও অদৃষ্টকে

ধিক্কার দিয়া ক্ষোভ কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে, কিন্তু প্রতিকার মিলে না। কারণ, প্রতিকার বরের বাপের হাতে নাই, সে আছে মেয়ের বাপেরই নিজের হাতে।

পাঁচ

গহরের খোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুশী হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারী রুক্ষ ; বলিল, দেখুন গে ঐ বোষ্টমী বেটীদের আড্ডায়। কাল থেকে ত ঘরে আসাই হয় নি।

সে কি কথা, নবীন ? বোষ্টমী এলো আবার কোথা থেকে ?

একটা ? এক পাল এসে জুটেছে।

কোথা থাকে তারা ?

ঐ ত মুরারিপুরের আখড়ায়। এই বলিয়া নবীন হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হায় বাবু, আর সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মথুরদাস বাবাজী মলো, তার জায়গায় এসে জুটলো এক ছোকরা বৈরাগী, তার গণ্ডাকয়েক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরাগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব—সেখানেই ত প্রায় থাকেন।

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমার বাবু ত মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈরাগীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাকতে দেবে কেন ?

নবীন রাগ করিয়া কহিল, ঐ সব আউলে-বাউলেগুলোর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে নাকি ? ওরা জাতজন্ম কিছুই মানে না, যে কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাছবিচার করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ'-সাত দিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলে নি ?

নবীন বলিল, বললে যে কমলিলতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়তো। সে কয়দিন বাবু আখড়ার কাছেও যায় নি। আর যাই আপনি চলে গেলেন, বাবুও অমনি খাতা কাগজ কলম নিয়ে আখড়ায় গিয়ে ঢুকলেন।

প্রশ্ন করিয়া জানিলাম দ্বারিক বাউল গান বাঁধিতে, ছড়া রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায়, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী—এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়। বৈষ্ণবীসেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রাচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে করিয়াছে।

ছেলেবেলায় এই আখড়ার কথা শুনিয়াছিলাম আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন্ এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদবধি শিষ্য-পরম্পরায় বৈষ্ণবেরা ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, বলিলাম, নবীন, আখড়াটা আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারবে?

নবীন ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল, বলিল, আমার অনেক কাজ। আর আপনিও ত এই দেশের মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধ কোশের বেশী নয়, ঐ সুমুখের রাস্তা দিয়ে সিধে উত্তর-মুখো চলে গেলে আপনিই দেখতে পাবেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সামনের দীঘির পাড়ে বকুলতলায় বৃন্দাবনলীলা চলচে, দূর থেকেই আওয়াজ কানে যাবে—ভাবতে হবে না!

আমার যাওয়ার প্রস্তাবটা নবীন গোড়াতেই পছন্দ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয় সেখানে—কীর্ত্তন?

নবীন বলিল, হাঁ, দিনরাত খঞ্জনী খর্ত্তালের কামাই নেই।

হাসিয়া বলিলাম, সে ভালোই নবীন। যাই গহরকে ধরে আনি গে।

এবার নবীন হাসিল, বলিল, হাঁ যান ; কিন্তু দেখবেন কম্‌লিলতার কেত্তন শুনে নিজেই যেন আটকে যাবেন না।

দেখি, কি হয়। এই বলিয়া হাসিয়া কমললতা বৈষ্ণবীর আখড়ার উদ্দেশে অপরাহ্ণবেলায় যাত্রা করিলাম।

আখড়ার ঠিকানা যখন মিলিল তখন সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে, দূর হইতে কীর্ত্তন বা খোল-করতালের শব্দমাত্র পাই নাই, সুপ্রাচীন বকুল বৃক্ষটা সহজেই চোখে পড়িল, নীচে ভাঙাচোরা বেদী একটা আছে, কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ক্ষীণ পথের রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া নদীর দিকে গিয়াছে, অনুমান করিলাম হয়ত ওদিকে কাহারও সন্ধান মিলিতে পারে, অতএব সেই দিকেই পা বাড়াইলাম। ভুল করি নাই, শীর্ণ সঙ্কীর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন নদীর তীরে একখণ্ড পরিষ্কৃত গোময়লিপ্ত ঈষদুচ্চ ভূমির উপরে বসিয়া গহর এবং আর এক ব্যক্তি—আন্দাজ করিলাম, ইনিই বৈরাগী দ্বারিকদাস—আখড়ার বর্ত্তমান অধিকারী। নদীর তীর বলিয়া তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয় নাই, বাবাজীকে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। লোকটিকে ভদ্র ও উচ্চ জাতির বলিয়াই মনে হইল। বর্ণ শ্যাম, রোগা বলিয়া কিছু দীর্ঘাকার বলিয়া চোখে ঠেকে ; মাথার চুল চূড়ার মতো করিয়া সুমুখে বাঁধা, দাড়ি-গোঁফ প্রচুর নয়—সামান্যই, চোখেমুখে একটা স্বাভাবিক হাসির ভাব আছে, বয়সটা ঠিক আন্দাজ করিতে পারিলাম না, তবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশী হইবে বলিয়া বোধ করিলাম না। আমার আগমন বা উপস্থিতি উভয়ের কেহই লক্ষ্য

করিল না, দুজনেই নদীর পরপারে পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। সেখানে নানা রঙ ও নানা আকারের টুক্‌রা মেঘের মাঝে ক্ষীণ পাণ্ডুর তৃতীয়ার চাঁদ, এবং ঠিক যেন তাহারই কপালের মাঝখানে ফুটিয়া আছে অত্যুজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা। বহু নিম্নে দেখা যায় দূর গ্রামান্তের নীল বৃক্ষরাজি—তাহার যেন কোথাও আর শেষ নাই, সীমা নাই। কালো, সাদা, পাঁশুটে নানা বর্ণের ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘের গায়ে তখনও অস্তগত সূর্য্যের শেষ দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেন দুষ্ট ছেলের হাতে রঙের তুলি পড়িয়া ছবির আদ্যশ্রাদ্ধ চলিতেছে। তাহার ক্ষণকালের আনন্দ—চিত্রকর আসিয়া কান মলিয়া হাতের তুলি কাড়িয়া লইল বলিয়া।

স্বল্পতোয়া নদীর কতকটা অংশ বোধ করি গ্রামবাসীরা পরিষ্কৃত করিয়াছে, সম্মুখের সেই স্বচ্ছ, কালো অল্প পরিসর জলটুকুর উপরে ছোট ছোট রেখায় চাঁদের ও সন্ধ্যাতারার আলো পাশাপাশি পড়িয়া ঝিকমিক করিতেছে—যেন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া স্যাকরা সোনার দাম যাচাই করিতেছে। কাছে কোথাও বনের মধ্যে বোধ করি অজস্র কাঠমল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই গন্ধে সমস্ত বাতাসটা ভারী হইয়া উঠিয়াছ এবং নিকটে কোন গাছে অসংখ্য বকের বাসা হইতে শাবকগণের একটানা ঝুমঝুম শব্দ বিচিত্র মাধুর্য্যে অবিরাম কানে আসিয়া পশিতেছে। এ সবই ভালো এবং যে দুটো লোক তদ্গত চিত্তে জড়ভরতের মত বসিয়া আছে তাহারাও কবি সন্দেহ নাই, কিন্তু এ দেখিতে এই জঙ্গলে সন্ধ্যাকালে আসি নাই, নবীন বলিয়াছিল একপাল বোষ্টুমী আছে এবং সকলের সেরা বোষ্টুমী কমললতা আছে। তাহারা কোথায়?

ডাকিলাম, গহর!

গহর ধ্যান ভাঙিয়া হতবুদ্ধির মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, গোঁসাই তোমার শ্রীকান্ত না?

গহর দ্রুতবেগে উঠিয়া আমাকে সজোরে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার আবেগ থামিতে চাহে না এমনি ব্যাপার ঘটিল। কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম, বাবাজী, আমাকে হঠাৎ চিনলেন কি করে?

বাবাজী হাত নাড়িলেন—ও চলবে না গোঁসাই, ক্রিয়াপদের শেষের ঐ সম্ভ্রমের দন্ত্য 'ন'টি বাদ দিতে হবে! তবে ত রস জমবে।

বলিলাম, তা যেন দিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমাকে চিনলে কি করে?

বাবাজী কহিলেন, হঠাৎ চিনবো কেন? তুমি যে আমাদের বৃন্দাবনের চেনা মানুষ গোঁসাই, তোমার চোখ দুটি যে রসের সমুদ্দুর—ও যে দেখলেই চোখে পড়ে। যেদিন কমললতা এলো—তারও এমনি দুটি চোখ—তারে দেখেই চিনলাম—কমললতা, কমললতা, এতদিন ছিলে কোথা? কমল এসে সেই যে আপনার হ'লো তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ রইল না। এই ত সাধনা গোঁসাই, একেই ত বলি রসের দীক্ষা।

বলিলাম, কমললতা দেখবো বলেই ত এসেছি গোঁসাই, কই সে?

বাবাজী ভারী খুশী হইলেন, বলিলেন, দেখবে তাকে? কিন্তু সে তোমার অচেনা নয় গোঁসাই, বৃন্দাবনে তাকে অনেকবার দেখেচো। হয়ত ভুলে গেছো, কিন্তু দেখলেই চিনবে সেই কমললতা। গোঁসাই, ডাকো না একবার তারে। এই বলিয়া বাবাজী গহরকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহার কাছে সবাই গোঁসাই, বলিলেন, বলো গে শ্রীকান্ত এসেছে তোমাকে দেখতে।

গহর চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গোঁসাই আমার কথা বুঝি তোমাকে গহর সমস্ত বলেছে?

বাবাজী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ, সমস্ত বলেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, গোঁসাই, ছ'-সাত দিন আসো নি কেন? সে

বললে, শ্রীকান্ত এসেছিল। তুমিই যে শীঘ্রই আবার আসবে তাও সে বলেছে। তুমি বর্ম্মাদেশে যাবে তাও জানি।

শুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম, রক্ষা হোক, ভয় হইয়াছিল সত্যই বা ইনি কোন্ অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে আমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছেন। যাই হোক এ ক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাঁহার আন্দাজটা যে বেঠিক হয় নাই তাহা মানিতেই হইবে।

বাবাজীকে ভালো বলিয়াই ঠেকিল, অন্ততঃ অসাধু প্রকৃতির বলিয়া মনে হইল না। বেশ সরল। কি জানি, কেন ইহাদের কাছে গহর আমার সকল কথাই বলিয়াছে—অর্থাৎ যতটুকু সে জানে। বাবাজী সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন। একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের—হয়ত কবিতা ও বৈষ্ণবী-রসচর্চ্চায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত।

অনতিকাল পরেই গহর গোঁসাইয়ের সঙ্গে কমললতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স ত্রিশের বেশী নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েক গাছি চুড়ি—হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা। ছাপ-ছোপের খুব বেশী আড়ম্বর নাই কিম্বা হয়ত সকালের দিকে ছিল, এ-বেলায় কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে মনে হইল এই চোখ-মুখের ভাবটা যেন পরিচিত এবং চলার ধরণটাও যেন পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি।

বৈষ্ণবী কথা কহিল। সে যে নীচের স্তরের লোক নয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। সে কিছুমাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গোঁসাই, চিনতে পারো ?

বলিলাম, না ; কিন্তু কোথায় যেন দেখেচি মনে হচ্চে।

বৈষ্ণবী কহিল, দেখেচো বৃন্দাবনে। বড়গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোন নি এখনো ?

বলিলাম, তা শুনেচি ; কিন্তু বৃন্দাবনে আমি ত কখনো জন্মেও যাই নি।

বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বইকি। অনেক কালের কথা হঠাৎ স্মরণ হচ্ছে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে ? এই বলিয়া সে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বুঝিলাম তামাসা করিতেছে, কিন্তু আমাকে না বড়গোঁসাইজীকে ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিল, রাত হয়ে আসচে আর জঙ্গলে বসে কেন ? ভেতরে চলো।

বলিলাম, জঙ্গলের পথে আমাদেরও অনেকটা যেতে হবে। বরঞ্চ কাল আবার আসবো।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, এখানের সন্ধান দিলে কে ? নবীন ?

হাঁ, সে-ই।

কমললতার খবর বলে নি ?

হাঁ, তাও বলেছে।

বোষ্টুমীর জাল ছিঁড়ে হঠাৎ বার হওয়া যায় না, তোমাকে সাবধান করে দেয় নি ?

সহাস্যে কহিলাম, হাঁ, তাও দিয়েছে।

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, নবীন হুঁসিয়ার মাঝি। তার কথা না শুনে ভাল কর নি।

কেন বলো ত ?

বৈষ্ণবী ইহার জবাব দিল না, গহরকে দেখাইয়া কহিল, গোঁসাই বলে, তুমি বিদেশে যাচ্ছ চাকরী করতে। তোমার কেউ নেই, চাকরী করবে কেন ?

তবে কি করবো ?

আমরা যা করি। গোবিন্দজীর প্রসাদ কেউ ত আর কেড়ে নিতে পারবে না।

তা জানি; কিন্তু বৈরাগীগিরি আমার নতুন নয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, তা বুঝেছি, ধাতে সয় না বুঝি?

না, বেশীদিন সয় না।

বৈষ্ণবী মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তোমার কমই ভাল। ভেতরে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই। এখানে কমলের বন আছে।

তা শুনেছি; কিন্তু অন্ধকারে ফিরব কি করে?

বৈষ্ণবী পুনশ্চ হাসিল, কহিল, অন্ধকারে ফিরতেই বা আমরা দেবো কেন? অন্ধকার কাটবে গো কাটবে! তখন যেয়ো! এসো।

চলো।

বৈষ্ণবী কহিল, গৌর! গৌর!

গৌর গৌর, বলিয়া আমিও অনুসরণ করিলাম।

ছয়

যদিচ ধর্ম্মাচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদেরও বিঘ্ন ঘটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি ঐ গুরুতর বিষয়ের কোন অন্ধিসন্ধি আমি কোনকালে খুঁজিয়া পাইব না। তথাপি ধার্ম্মিকদের আমি ভক্তি করি। বিখ্যাত স্বামীজী, স্বখ্যাত সাধুজী—কাহাকেও ছোট-বড় করি না, উভয়ের বাণীই আমার কর্ণে সমান মধু বর্ষণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি বাঙ্গলা দেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে, এবং সেইটাই নাকি

বাঙলার নিজস্ব খাঁটি জিনিস। ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাসী-সাধুসঙ্গ কিছু কিছু করিয়াছি, ফললাভের বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার যদি দৈবাৎ খাঁটি বস্তু কপালে জুটিয়া থাকে ত এ সুযোগ ব্যর্থ হইতে দিব না সঙ্কল্প করিলাম। পুঁটুর বৌভাতের নিমন্ত্রণ আমাকে রাখিতেই হইবে, অন্ততঃ সে কয়টা দিন কলিকাতার নিঃসঙ্গ মেসের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবী-আখড়ার আশেপাশে কোথাও কাটাইতে পারিলে আর যাই হোক, জীবনের সঞ্চয়ে বিশেষ লোকসান ঘটিবে না।

ভিতরে আসিয়া দেখিলাম কমললতার কথা মিথ্যা নয়, সেথায় কমলের বনই বটে, কিন্তু দলিত বিদলিত। মত্তহস্তিকুলের সাক্ষাৎ মিলিল না, কিন্তু বহু পদচিহ্ন বিদ্যমান। বৈষ্ণবীরা নানা বয়সের ও নানা চেহারার, এবং নানা কাজে ব্যাপৃত। কেহ দুধ জ্বাল দিতেছে, কেহ ক্ষীর তৈরী করিতেছে, কেহ নাড়ু পাকাইতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ ফলমূল বানাইতেছে—এ সকল ঠাকুরের রাত্রের ভোগের ব্যাপার! একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বৈষ্ণবী একমনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে, এবং তাহারই কাছে বসিয়া আর একজন নানা রঙের ছোপানো ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড সযত্নে কুঞ্চিত করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছে, সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউ কাল স্নানান্তে পরিধান করিবেন। কেহই বসিয়া নাই, তাহাদের কাজের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সকলেই আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু নিমেষমাত্র। কৌতূহলের অবসর নাই, ওষ্ঠাধর সকলেরই নড়িতেছে, বোধ হয় মনে মনে নাম জপ চলিতেছে। এদিকে বেলা শেষ হইয়া দুই একটা করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে সুরু করিয়াছে। কমললতা কহিল, চলো, ঠাকুর নমস্কার করে আসবে! কিন্তু, আচ্ছা—তোমাকে কি বলে ডাকবো বলো ত? নতুনগোঁসাই বলে ডাকলে হয় না?

বলিলাম, কেন হবে না? তোমাদের এখানে গহর পর্য্যন্ত যখন

গহরগোঁসাই হয়েছে তখন আমি ত অন্ততঃ বামুনের ছেলে; কিন্তু আমার নিজের নামটা কি দোষ করলে? তার সঙ্গেই একটা গোঁসাই জুড়ে দাও না!

কমললতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে হয় না ঠাকুর, হয় না। ও-নামটা আমার ধরতে নেই—অপরাধ হয়, এসো।

তা যাচ্ছি, কিন্তু অপরাধটা কিসের?

কিসের তা তোমার শুনে কি হবে? আচ্ছা মানুষ ত!

যে-বৈষ্ণবীটি মালা গাঁথিতেছিল সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নীচু করিল।

ঠাকুরঘরে কালো-পাথর ও পিত্তলের রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি। একটি নয়, অনেকগুলি। এখানেও জন পাঁচ-ছয় বৈষ্ণবী—কাজে নিযুক্ত। আরতির সময় হইয়া আসিতেছে, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

ভক্তিভরে যথারীতি প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। ঠাকুরঘরটি ছাড়া অন্য সব ঘরগুলিই মাটির কিন্তু সযত্ন-পরিচ্ছন্নতার সীমা নাই। বিনা আসনে কোথাও বসিতেই সঙ্কোচ হয় না, তথাপি কমললতা পূবের বারান্দার একধারে আসন পাতিয়া দিল, কহিল, বস, তোমার থাকবার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি।

আমাকে এখানেই আজ থাকতে হবে নাকি?

কেন, ভয় কি? আমি থাকতে তোমার কষ্ট হবে না।

বলিলাম, কষ্টের জন্য নয়, কিন্তু গহর রাগ করবে যে।

বৈষ্ণবী কহিল, সে ভার আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও রাগ করবে না, এই বলিয়া সে হাসিয়া চলিয়া গেল।

একাকী বসিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবীদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। বাস্তবিকই তাহাদের সময় নষ্ট করিবার সময় নাই, আমার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। মিনিট-দশেক পরে কমললতা যখন

ফিরিয়া আসিল তখন কাজ শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমিই মঠের কর্ত্রী নাকি?

কমললতা জিভ কাটিয়া কহিল, আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী—কেউ ছোট-বড় নেই। এক একজনের এক একটা ভার, আমার ওপর প্রভু এই ভার দিয়েছেন, এই বলিয়া সে মন্দিরের উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

বলিলাম, তাই হবে। আচ্ছা, বড়গোঁসাই গহরগোঁসাই এঁদের দেখচি নে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তাঁরা এলেন বলে। নদীতে স্নান করতে গেছেন।

এই রাত্রে? আর ঐ নদীতে?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

গহরও?

হাঁ, গহরগোঁসাইও।

কিন্তু আমাকেই বা স্নান করালে না কেন?

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, আমরা কাউকে স্নান করাই নে, তারা আপনি করে। ঠাকুরের দয়া হলে তুমিও একদিন করবে, সেদিন মানা করলেও শুনবে না।

বলিলাম, গহর ভাগ্যবান্, কিন্তু আমার ত টাকা নেই, আমি গরীব লোক, আমার প্রতি হয়ত ঠাকুরের দয়া হবে না।

বৈষ্ণবী ইঙ্গিতটা বোধ হয়ত বুঝিল, এবং রাগ করিয়া কি যেন একটা বলিতে গেল কিন্তু বলিল না। তারপরে কহিল, গহরগোঁসাই যাই হোন, কিন্তু তুমিও গরীব নও। অনেক টাকা দিয়ে যে পরের কন্যাদায় উদ্ধার করে, ঠাকুর তাকে গরীব ভাবে না। তোমার ওপরেও দয়া হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

বলিলাম, তা হলে সেটা ভয়ের কথা। তবু, কপালে যা লেখা

আছে ঘটবে, আটকানো যাবে না—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যাদায় উদ্ধারের খবর তুমি পেলে কোথায় ?

বৈষ্ণবী কহিল, আমাদের পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষে করতে হয়, আমরা সব খবর শুনতে পাই।

কিন্তু এ খবর বোধ হয় এখনো পাও নি যে, টাকা দিয়ে দায় উদ্ধার করতে আমায় হয় নি ?

বৈষ্ণবী কিছু বিস্মিত হইল, কহিল, না এ খবর পাই নি ; কিন্তু হ'লো কি, বিয়ে ভেঙ্গে গেলো ?

হাসিয়া কহিলাম, বিয়ে ভাঙ্গে নি, কিন্তু ভেঙ্গেছেন কালিদাস-বাবু—বরের বাপ নিজে। পরের ভিক্ষের দানে ছেলে বেচে পণের কড়ি হাত পেতে নিতে তিনি লজ্জা পেলেন। আমিও বেঁচে গেলাম। এই বলিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। বৈষ্ণবী সবিস্ময়ে কহিল, বল কি গো, এ যে অঘটন ঘটলো !

বলিলাম, ঠাকুরের দয়া। শুধু কি গহরগোঁসাইজীই অন্ধকারে পচা নদীর জলে ডুব মারবে, আর সংসারের কোথাও কোন অঘটন ঘটবে না ? তাঁর লীলাই বা প্রকাশ পাবে কি করে বলো ত ? বলিয়াই কিন্তু বৈষ্ণবীর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম কথাটা আমার ভালো হয় নাই—মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবী কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, শুধু হাত তুলিয়া মন্দিরের উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল। যেন অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল।

সম্মুখ দিয়া একজন বৈষ্ণবী মস্ত একথালা লুচি লইয়া ঠাকুরঘরের দিকে গেল। দেখিয়া কহিলাম, আজ তোমাদের সমারোহ ব্যাপার। বোধ হয় বিশেষ কোন পর্ব্বদিন—না ?

বৈষ্ণবী কহিল, না, আজ কোন পর্ব্বদিন নয়। এ আমাদের প্রতিদিনের ব্যাপার, ঠাকুরের দয়ায় অভাব কখনো ঘটে না।

কহিলাম, আনন্দের কথা, কিন্তু আয়োজনটা বোধ করি রাত্রেই বেশী করে করতে হয় ?

বৈষ্ণবী কহিল, তাও না। সেবার সকাল-সন্ধ্যা নেই, দয়া করে যদি দুদিন থাকো নিজেই সব দেখতে পাবে। দাসীর দাসী আমরা, ওঁর সেবা করা ছাড়া সংসারে আর ত আমাদের কোন কাজ নেই। এই বলিয়া সে মন্দিরের দিকে হাতজোড় করিয়া আর একবার নমস্কার করিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদের করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা দেখলে, তাই।

কহিলাম, এসে দেখলাম বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়া, মালা গাঁথা, কাপড় রং করা—এমনি অনেক কিছু। তোমরা সারাদিন কি শুধু এই করো?

বৈষ্ণবী কহিল, হাঁ, সারাদিন শুধু এই করি।

কিন্তু এসব ত কেবল ঘর-গৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন করো কখন?

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

এই রাঁধাবাড়া, জল-তোলা, কুট্‌নো-বাট্‌না, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছোপানো—একেই বলো সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাস-দাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাব কোথায় গোঁসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ দুটি যেন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার হঠাৎ মনে হইল এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমললতা, তোমার বাড়ী কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।

কিন্তু গাছতলা ত আর চিরকাল ছিল না?

বৈষ্ণবী কহিল, তখন ছিল ইট-কাঠের তৈরী কোন এক বাড়ীর ছোট্ট একটি ঘর; কিন্তু সে গল্প করার ত এখন সময় নেই গোঁসাই। এসো ত আমার সঙ্গে, তোমার নতুন ঘরটি দেখিয়ে দিই।

চমৎকার ঘরখানি। বাঁশের আলনায় একটি পরিষ্কার তসরের কাপড় দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐটি প'রে ঠাকুরঘরে এসো। দেরী ক'রো না যেন। এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

একধারে ছোট একটি তক্তপোষে পাতা বিছানা। নিকটেই জলচৌকির উপরে রাখা কয়েকখানি গ্রন্থ ও একথালা বকুল ফুল; এইমাত্র প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ বোধ হয় ধূপধূনা দিয়া গিয়াছে, তাহার গন্ধ ও ধুঁয়ায় ঘরটি তখনও পূর্ণ হইয়া আছে—ভারী ভালো লাগিল। সারাদিনের ক্লান্তি ত ছিলই, ঠাকুর-দেবতাকেও চিরদিন পাশ কাটাইয়া চলি, সুতরাং ওদিকের আকর্ষণ ছিল না—কাপড় ছাড়িয়া ঝুপ্‌ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কি জানি এ কাহার ঘর, কাহার শয্যা; অজ্ঞাত বৈষ্ণবী একটা রাত্রির জন্য আমাকে ধার দিয়া গেল—কিম্বা হয়ত, এ তাহার নিজেরই—কিন্তু এ সকল চিন্তায় মন আমার স্বভাবতঃই ভারী সঙ্কোচ বোধ করে, অথচ আজ কিছু মনেই হইল না, যেন কতকালের পরিচিত আপনার জনের কাছে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, কে যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুন-গোঁসাই, মন্দিরে যাবে না? ওঁরা তোমাকে ডাকচেন যে!

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা সহযোগে কীর্ত্তন গান কানে গেল, বহুলোকের সমবেত কোলাহল নয়, গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামাকণ্ঠ, রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম এ কমললতা। নবীনের বিশ্বাস এই মিষ্ট স্বরই তাহার প্রভুকে মজাইয়াছে। মনে হইল অসম্ভব নয় এবং অত্যন্ত অসঙ্গতও নয়।

মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম; কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলের দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্ত্তন করিতেছে—মদন গোপাল জয় জয় যশোদাদুলাল কি, যশোদাদুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি।

নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারীলাল কি, গিরিধারীলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি।

এই সহজ ও সাধারণ গুটিকয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষঃস্থল মথিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু দেখিতে পাইলাম উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়। গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভারে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া। এই সকল রসের রসিক আমি নয়, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমনধারা করিয়া উঠিল। বাবাজী দ্বারিকাদাস মুদ্রিত নেত্রে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সচেতন কি অচেতন বুঝা গেল না, এবং শুধু কেবল ক্ষণকাল পূর্ব্বেই স্নিগ্ধহাস্য-পরিহাস-চঞ্চল কমললতাই নয়, সাধারণ গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা যে-সকল বৈষ্ণবীদের এইমাত্র সামান্য তুচ্ছ কুরূপা মনে হইয়াছিল, তাহারাও যেন এই ধূপ ও ধুনায় ধূমাচ্ছন্ন গৃহের অনুজ্জ্বল দীপালোকে আমার চক্ষে মুহূর্ত্ত-কালের জন্য অপরূপ হইয়া উঠিল। আমারও যেন মনে হইতে লাগিল অদূরবর্ত্তী ঐ পাথরের মূর্ত্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া কীর্ত্তনের সমস্ত মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছে।

ভাবের এই বিহ্বল মুগ্ধভাবকে আমি অত্যন্ত ভয় করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম—কেহ লক্ষ্যও করিল না। দেখি প্রাঙ্গণের একধারে বসিয়া গহর। কোথাকার একটা আলোর রেখা আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। আমার পদশব্দে তাহার ধ্যান ভাঙিল না, কিন্তু সেই একান্ত সমাহিত মুখের প্রতি চাহিয়া আমিও নড়িতে পারিলাম না, সেইখানে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল শুধু আমাকেই একাকী ফেলিয়া রাখিয়া এ-বাড়ীর সকলেই যেন আর এক দেশে চলিয়া গিয়াছে—সেখানের পথ আমি চিনি না। ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া

শুইয়া পড়িলাম। নিশ্চয় জানি, জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ইহাদের সকলের বড়, তথাপি কিসের ব্যথায় জানি না, মনের ভিতরটা কাঁদিতে লাগিল এবং তেমনই অজানা কারণে চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কানে গেল, ওগো নতুন-গোঁসাই ?

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম—কে ?

আমি গো—তোমার সন্ধ্যেবেলার বন্ধু। এতো ঘুমুতেও পারো !

অন্ধকার ঘরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া কমললতা বৈষ্ণবী।

বলিলাম, জেগে থেকে লাভ হ'তো কি ? তবু সময়টার একটু সদ্ব্যবহার হ'লো।

তা জানি ; কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ পাবে না ?

পাবো।

তবে ঘুমুচ্ছো যে বড় ?

জানি বিঘ্ন ঘটবে না, প্রসাদ পাবোই। আমার সন্ধ্যেবেলাকার বন্ধু রাত্রেও পরিত্যাগ করবে না।

বৈষ্ণবী সহাস্যে কহিল, সে দাসী বৈষ্ণবের, তোমাদের নয়।

বলিলাম, আশা পেলে বোষ্টম হতে কতক্ষণ ? তুমি গহরকে পর্য্যন্ত গোঁসাই বানিয়েছ, আর আমিই কি এত অবহেলার ? হুকুম করলে বোষ্টমের দাসানুদাস হতেও রাজী।

কমললতার কণ্ঠস্বর একটুখানি গম্ভীর হইল, কহিল, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তামাসা করতে নেই গোঁসাই, অপরাধ হয়। গহরগোঁসাই-জীকেও তুমি ভুল বুঝেছো। তার আপন লোকেরাও তাকে কাফের বলে, কিন্তু তারা জানে না সে খাঁটি মুসলমান, বাপ-পিতামহর ধর্ম্মবিশ্বাস সে ত্যাগ করেনি।

কিন্তু তার ভাব দেখে ত তা মনে হয় না।

বৈষ্ণবী কহিল, সেইটেই আশ্চর্য্য ; কিন্তু আর দেরী ক'রো না, এসো। একটু ভাবিয়া কহিল, কিম্বা প্রসাদ না হয় তোমাকে এখানেই দিয়ে যাই—কি বলো ?

বলিলাম, আপত্তি নেই ; কিন্তু গহর কোথায় ? সে থাকে ত দুজনকে একত্রেই দাও না।

তার সঙ্গে বসে খাবে ?

বলিলাম, চিরকালই ত খাই। ছেলেবেলায় ওর মা আমাকে অনেক ফলার মেখে দিয়েছে, তোমাদের প্রসাদের চেয়ে সে তখন কম মিষ্টি হ'তো না। তা ছাড়া গহর ভক্ত, গহর কবি—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।

অন্ধকারেও মনে হইল বৈষ্ণবী একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, তারপরে কহিল, গহরগোঁসাইজী নেই, কখন চলে গেছে আমরা জানতে পারি নি।

কহিলাম, গহরকে দেখলাম সে উঠানে বসে। তাকে কি তোমরা ভেতরে যেতে দাও না ?

বৈষ্ণবী কহিল, না।

বলিলাম, গহরকে আজ আমি দেখেচি। কমললতা, আমার তামাসাতে তুমি রাগ করলে কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাসা করচো না। অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় তা নয়।

বৈষ্ণবী এ অনুযোগের আজ জবাব দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটুখানি পরেই সে অন্য একটি বৈষ্ণবীর হাতে আলো ও আসন এবং নিজে প্রসাদের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল, কহিল, অতিথি সেবার ত্রুটি হবে নতুনগোঁসাই, কিন্তু এখানকার সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।

হাসিয়া বলিলাম, ভয় নেই গো সন্ধ্যার-বন্ধু, বোষ্টম না হয়েও

তোমার নতুনগোঁসাইজীর রসবোধ আছে, আতিথ্যের ত্রুটি নিয়ে সে রসভঙ্গ করে না। রাখো কি আছে—ফিরে এসে দেখবে প্রসাদের কণিকাটুকুও অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুরের প্রসাদ অমনি ক'রেই ত খেতে হয়। এই বলিয়া কমললতা নীচে ঠাঁই করিয়া সমুদয় খাদ্যসামগ্রী একে একে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙিয়া গেল কাঁসর-ঘণ্টার বিকট শব্দে। সুবিপুল বাদ্যভাণ্ড সহযোগে মঙ্গল আরতি সুরু হইয়াছে। কানে গেল ভোরের সুরে কীর্ত্তনের পদ—কানু গলে বনমালা বিরাজে, রাই গলে মোতি সাজে। অরুণিত চরণে, মঞ্জীর রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে। তারপরে সারাদিন ধরিয়া চলিল ঠাকুরসেবা। পূজাপাঠ, কীর্ত্তন, নাওয়ানো, খাওয়ানো, গা-মোছানো, চন্দন-মাখানো, মালা-পরানো—ইহার আর বিরাম-বিচ্ছেদ নাই। সবাই ব্যস্ত, সবাই নিযুক্ত। মনে হইল পাথরের দেবতারই এই অষ্ট-প্রহরব্যাপী অফুরন্ত সেবা সহে, আর কিছু হইলে এত বড় ধকলে কবে ক্ষইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত।

কাল বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তোমরা সাধন-ভজন করো কখন? সে উত্তরে বলিয়াছিল—এই ত সাধন-ভজন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই রাঁধাবাড়া ফুল-তোলা মালা-গাঁথা দুধ জ্বাল দেওয়া একেই বলো সাধনা? সে মাথা নাড়িয়া তখনি জবাব দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, আমরা একেই বলি সাধনা—আমাদের আর কোন সাধন-ভজন নেই।

আজ সমস্ত দিনের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম কথাগুলা তাহার বর্ণে বর্ণে সত্য। অতিরঞ্জন অত্যুক্তি কোথাও নাই। দুপুরবেলায় কোন এক ফাঁকে বলিলাম, কমললতা, আমি জানি তুমি অন্য

সকলের মত নও। সত্যি বলো ত ভগবানের প্রতীক এই যে পাথরের মূর্ত্তি—

বৈষ্ণবী হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল, কহিল, প্রতীক কী গো—উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান। এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না নতুনগোঁসাই—

আমার কথায় সেই-ই যেন লজ্জা পাইল বেশী। আমিও কেমন একপ্রকার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি তো জানি নে, তাই জিজ্ঞেসা করচি তোমরা কি সত্যই ভাবো ঐ পাথরের মূর্ত্তির মধ্যেই ভগবানের শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর—

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল, ভাবতে যাবো কিসের জন্যে গো, এ যে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংস্কারের মোহ তোমরা কাটাতে পারো না বলেই ভাবো রক্তমাংসের দেহ ছাড়া চৈতন্যের আর কোথাও থাকবার যো নেই; কিন্তু তা কেন? আর এও বলি, শক্তি আর চৈতন্যের হদিস কি তোমরাই সবখানি পেয়ে বসে আছ যে বলবে পাথরের মধ্যে তার জায়গা হবে না? হয় গো হয়, ভগবানেরও কোথাও থাকতে বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে ভগবান বলতে যাবো কেন বলো ত?

যুক্তি হিসাবে কথাগুলো স্পষ্টও নয়, পূর্ণও নয়, কিন্তু এ ত তা নয়, এ তাহার জীবন্ত বিশ্বাস। তাহার সেই জোর ও অকপট উক্তির কাছে হঠাৎ কেমনধারা থতমত খাইয়া গেলাম; তর্ক করিতে, প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না, ইচ্ছাও করিল না। বরঞ্চ ভাবিলাম, সত্যই ত পাথরই হোক আর যাই হোক, এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আপনাকে একান্ত সমর্পণ না করিতে পারিলে বৎসরের পর বৎসর দিনান্তব্যাপী এই অবিচ্ছিন্ন সেবার জোর পাইত ইহারা কি করিয়া? এমন সোজা হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দাঁড়াইবার অবলম্বন মিলিত কোথায়? ইহারা শিশু ত নয়, ছেলেখেলার এই মিথ্যা অভিনয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মন যে শ্রান্তির অবসাদে দুদিনেই এলাইয়া

পড়িত ; কিন্তু সে হয় নাই, বরঞ্চ ভক্তি ও প্রীতির অখণ্ড একাগ্রতায় আত্মনিবেদনের আনন্দোৎসব ইহাদের বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ জীবনের পাওয়ার দিক দিয়া সে কি তবে সবই ভুয়া, সবই ভুল, সবই আপনাকে ঠকানো !

বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই, কথা কও না যে ?

বলিলাম, ভাবচি।

কাকে ভাবচো ?

ভাবচি তোমাকেই।

ইস্! বড় সৌভাগ্য যে আমার! একটু পরে কহিল, তবুও থাকতে চাও না, কোথায় কোন্ বর্ম্মাদের দেশে চাকরী করতে যেতে চাও। চাকরী করবে কেন ?

বলিলাম, আমার ত মঠের জমিজমাও নেই, মুগ্ধ ভক্তের দলও নেই—খাবো কি ?

ঠাকুর দেবেন।

কহিলাম, অত্যন্ত দুরাশা ; কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের ওপর খুব ভরসা তাও ত মনে হয় না। নইলে ভিক্ষে করতে যাবে কেন ?

বৈষ্ণবী কহিল, যাই তিনি দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে। নইলে নিজেদের গরজ নেই, থাকলে যেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না।

কমললতা, তোমার দেশ কোথায় ?

কালকেই ত বলেছি গোঁসাই, ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে পথে।

তাহলে গাছতলায় আর পথে পথে না থেকে মঠে থাকো কিসের জন্যে ?

অনেকদিন পথে পথেই ছিলুম গোঁসাই, সঙ্গী পাই ত আবার একবার পথই সম্বল করি!

বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব এ কথা ত বিশ্বাস হয় না কমললতা! যাকে ডাকবে সেই যে রাজী হবে।

বৈষ্ণবী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকচি নতুনগোঁসাই—রাজী হবে?

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, হাঁ রাজী। নাবালক অবস্থায় যে লোক যাত্রার দলকে ভয় করে নি, সাবালক অবস্থায় তার বোষ্টুমীকে ভয় কি?

যাত্রার দলেও ছিলে নাকি?

হাঁ।

তাহলে ত গান গাইতেও পারো!

না, অধিকারী অতটা দূর এগোতে দেয় নি, তার আগেই জবাব দিয়েছিল। তুমি অধিকারী হলে কি হ'তো বলা যায় না।

বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল, বলিল, আমিও জবাব দিতুম। সে যাক, এখন আমাদের একজন জানলেই কাজ চলে বলে। এদেশে যেমন তেমন করেও ঠাকুরের নাম দিতে পারলে ভিক্ষের অভাব হয় না। চলো না গোঁসাই বেরিয়ে পড়া যাক। বলছিলে শ্রীবৃন্দাবনধাম কখনো দেখো নি, চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাটলো, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়। সত্যি, যাবে নতুনগোঁসাই?

হঠাৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভারি বিস্ময় জন্মিল, কহিলাম, পরিচয় ত এখনো আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নি, আমাকে এতোটা বিশ্বাস হলো কি করে?

বৈষ্ণবী কহিল, চব্বিশ ঘণ্টা ত কেবল এক পক্ষেই নয় গোঁসাই, ওটা দু' পক্ষেই। আমার বিশ্বাস পথে-প্রবাসে আমাকেও তোমার অবিশ্বাস হবে না। কাল পঞ্চমী, বেরিয়ে পড়বার ভারি শুভদিন—

চলো। আর পথের ধারে রেলের পথ ত রইলই—ভালো না লাগে ফিরে এস, আমি বারণ করব না।

একজন বৈষ্ণবী আসিয়া খবর দিল—ঠাকুরের প্রসাদ ঘরে দিয়ে আসা হয়েছে।

কমললতা বলিল, চলো তোমার ঘরে গিয়ে বসিগে।

আমার ঘর? তাই ভালো।

আর একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না যে সে পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহাও নিশ্চিত, কিন্তু যে কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পলাইতে পারিলে যেন বাঁচে —তাহার একমুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিতেছে না।

ঘরে আসিয়া খাইতে বসিলাম। অতি পরিপাটি প্রসাদ—পলায়নের ষড়যন্ত্রটা জমিত ভালো, কিন্তু কে একজন অত্যন্ত জরুরি কাজে কমললতাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সুতরাং এককী মুখ বুজিয়াই সেবা সমাপ্ত করিতে হইল। বাহিরে আসিয়া কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না, বাবাজী দ্বারিকাদাসই বা গেলেন কোথায়? দুই-চারিজন প্রাচীন বৈষ্ণবী ঘোরাঘুরি করিতেছে—কাল সন্ধ্যায় ঠাকুর-ঘরে ধোঁয়ার ঘোরে ইহাদেরই বোধ হয় অপ্সরা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আজ দিনের বেলায় কড়া আলোতে কল্যকার সেই অধ্যাত্ম সৌন্দর্য-বোধটা তেমন অটুট রহিল না, গা-টা কেমনতর করিয়া উঠিল, সোজা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সেই শৈবালাচ্ছন্ন শীর্ণকায়া মন্দস্রোতা সুপরিচিত স্রোতস্বতী এবং সেই লতাগুল্ম কণ্টকাকীর্ণ তট-ভূমি, এবং সেই সর্পসঙ্কুল সুদৃঢ় বেতসকুঞ্জ ও সুবিস্তৃত বেণুবন। দীর্ঘ-কালের অনভ্যাসবশতঃ গা ছমছম করিতে লাগিল, অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছি, কোথাও একটি লোক আড়ালে বসিয়াছিল, উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা আশ্চর্য্য হইলাম এ জায়গাতেও মানুষ থাকে! লোকটির বয়স হয়ত আমাদের মতো—আবার বছর-

দশেক বেশী হওয়াও বিচিত্র নয়। খর্ব্বাকৃতি রোগা গড়ন, গায়ের রং-টা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নীচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট, চোখের ভ্রূ দুটোও তেমনি অস্বাভাবিক রকমের দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিস্তীর্ণ। বস্তুতঃ এত বড় ঘন মোটা ভুরু যে মানুষের হয়, ইতিপূর্বে এ জ্ঞান আমার ছিল না, দূর হইতে সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত প্রকৃতির কোন হাস্যকর খেয়ালে একজোড়া মোটা গোঁফ ঠোঁটের বদলে লোকটার কপালে গজাইয়াছে। গলা-জোড়া মোটা তুলসীর মালা, পোষাক-পরিচ্ছদও অনেকটা বৈষ্ণবদের মতো, কিন্তু যেমন ময়লা তেমনি জীর্ণ।

মশাই ?

থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আজ্ঞা করুন।

আপনি এখানে কবে এসেছেন শুনতে পারি কি ?

পারেন। এসেছি কাল বৈকালে।

রাত্তিরে আখড়াতে ছিলেন বুঝি ?

হাঁ, ছিলাম।

ওঃ!

মিনিটখানেক নীরবে কাটিল। পা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লোকটা বলিল, আপনি ত বোষ্টম নয়,—ভদ্রলোক—আখড়ার মধ্যে আপনাকে থাকতে দিলে যে!

বলিলাম, সে খবর তাঁরাই জানেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করবেন।

ওঃ! কম্‌লিলতা থাকতে বললে বুঝি ?

হাঁ।

ওঃ! জানেন ওর আসল নাম কি ? ঊষাঙ্গিনী। বাড়ী সিলেটে, কিন্তু দেখায় যেন ও কলকাতার মেয়েমানুষ। আমার বাড়ীও সিলেটে। গাঁয়ের নাম মামুদপুর। শুনবেন ওর স্বভাব-চরিত্র ?

বলিলাম, না; কিন্তু লোকটার ভাবগতিক দেখিয়া এবার সত্যই

বিস্ময়াপন্ন হইলাম। প্রশ্ন করিলাম, কমললতার সঙ্গে আপনার কি কোন সম্বন্ধ আছে?

আছে না?

কি সেটা?

লোকটা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কেন, মিথ্যে নাকি? ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কণ্ঠিবদল করিয়েছিল। তার সাক্ষী আছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি জাত?

আমরা দ্বাদশ-তিলি।

আর, কমললতারা?

প্রত্যুত্তরে লোকটা তাহার সেই মোটা ভ্রূ-জোড়া ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ওরা শুঁড়ী, ওদের জলে আমরা পা ধুই নে। একবার ডেকে দিতে পারেন?

না। আখড়ায় সবাই যেতে পারে, ইচ্ছা হলে আপনিও পারেন।

লোকটা রাগ করিয়া বলিল, যাবো মশাই, যাবো। দারোগাকে দুপয়সা খাইয়ে রেখেছি, পেয়াদা সঙ্গে ক'রে একেবারে ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে আনবো। বাবাজীর বাবাও রাখতে পারবে না। শালা রাস্কেল কোথাকার।

আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিতে লাগিলাম। লোকটা পিছন হইতে কর্কশকণ্ঠে কহিল, তাতে আপনার কি হ'লো? গিয়ে একবার ডেকে দিলে কি শরীর ক্ষয়ে যেতো নাকি? ওঃ—ভদ্দরলোক!

আর ফিরিয়া চাহিতে ভরসা হইল না। পাছে রাগ সামলাইতে না পারি এবং অতি দুর্ব্বল লোকটার গায়ে হাত দিয়া ফেলি এই ভয়ে একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিলাম। মনে হইতে লাগিল বৈষ্ণবীর পলাইবার হেতুটা বোধ হয় এইখানেই কোথায় জড়িত।

মনটা বিগড়াইয়াছিল, ঠাকুরঘরে নিজেও গেলাম না, কেহ ডাকিতেও আসিল না। ঘরের মধ্যে একখানি জলচৌকির উপরে গুটিকয়েক বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী সযত্নে সাজানো ছিল, তাহারি একখানা হাতে করিয়া প্রদীপটা শিয়রের কাছে আনিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নয়, শুধু সময় কাটাই-বার জন্য। ক্ষোভের সহিত একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, কমললতা সেই যে গিয়াছে আর আসে নাই। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি যথারীতি আরম্ভ হইল, তাহার মধুর কণ্ঠ বার বার কানে আসিতে লাগিল, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, কমললতা সেই অবধি কোন তত্ত্বই আমার লয় নাই। আর সেই ভ্রূওয়ালা লোকটা। কোন সত্যই কি তাহার অভিযোগের মধ্যে নাই ?

আরও একটা কথা। গহর কৈ ? সেও আজ আমার খোঁজ লইল না। ভাবিয়াছিলাম দিনকয়েক এখানেই কাটাইব, পুঁটুর বিবাহের দিনটি পর্যন্ত—সে আর হয় না। হয়ত কালই কলিকাতায় রওনা হইয়া পড়িব।

ক্রমশঃ আরতি ও কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। কল্যকার সেই বৈষ্ণবী আসিয়া আজও বহু যত্নে প্রসাদ রাখিয়া গেল, কিন্তু যে জন্য পথ চাহিয়াছিলাম তাহার দেখা মিলিল না। বাহিরে লোকজনের কথা-বার্ত্তা আনাগোনার পায়ের শব্দ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল, তাহার আসিবার কোন সম্ভাবনাই আর নাই জানিয়া আহার করিয়া হাতমুখ ধুইয়া দীপ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বোধ করি তখন অনেক রাত্রি, কানে গেল,—নতুনগোঁসাই ?

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কমললতা; আস্তে আস্তে বলিল, আসি নি বলে মনে বোধ হয় অনেক দুঃখ করেছো—না গোঁসাই ?

বলিলাম, হাঁ, করেচি।

বৈষ্ণবী মুহূর্ত্তকাল নীরব হইয়া রহিল, তারপর বলিল, বনের মধ্যে ও-লোকটা তোমাকে কি বলছিল ?

তুমি দেখেছিলে নাকি ?

হাঁ।

বলছিলো সে তোমার স্বামী—অর্থাৎ, তোমাদের সামাজিক আচারমতে তুমি তার কণ্ঠিবদল-করা পরিবার।

তুমি বিশ্বাস করেছো ?

না, করি নি।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে আমার স্বভাব-চরিত্রের ইঙ্গিত করে নি ?

করেছে।

আমার জাত ?

হাঁ, তাও ?

বৈষ্ণবী একটুখানি থামিয়া বলিল, শুনবে আমার ছেলেবেলার ইতিহাস ? কিন্তু হয়ত তোমার ঘৃণা হবে।

বলিলাম, তবে থাক, ও আমি শুনতে চাইনে।

কেন ?

বলিলাম, তাতে লাভ কি হবে কমললতা ? তোমাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে; কিন্তু কাল চলে যাবো, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না। নিরর্থক আমার সেই ভালো-লাগাটুকু নষ্ট করে ফেলে ফল কি হবে বলো ত ?

বৈষ্ণবী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সে কি করিতেছে ভাবিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, াক ভাবচো ?

ভাবচি, কাল তোমাকে যেতে দেবো না।

তবে, কবে যেতে দেবে ?

যেতে কোনোদিনই দেবো না; কিন্তু অনেক রাত হ'লো, ঘুমোও। মশারিটা ভাল করে গোঁজা আছে ত ?

কি জানি, আছে বোধ হয় !

বৈষ্ণবী হাসিয়া কহিল, আছে বোধ হয় ? বাঃ—বেশ ত ! এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া বিছানার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঘুমোও গোঁসাই—আমি চললুম। এই বলিয়া সে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং বাহির হইতে অত্যন্ত সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সাত

আজ আমাকে বৈষ্ণবী বার বার করিয়া শপথ করাইয়া লইল তাহার পূর্ব্ব বিবরণ শুনিয়া আমি ঘৃণা করিব কিনা।

বলিলাম, শুনতে আমি চাই নে, কিন্তু শুনলেও আমি ঘৃণা করব না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, কিন্তু করবে না কেন ? সে শুনলে মেয়ে-পুরুষে সবাই ত ঘৃণা করে।

বলিলাম, তুমি কি বলবে আমি জানি নে কিন্তু তবুও আন্দাজ করতে পারি। সে শুনলে মেয়েরাই যে মেয়েদের সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে সে জানি, এবং তার কারণও জানি, কিন্তু তোমাকে বলতে আমি চাইনে। পুরুষেরাও করে কিন্তু অনেক সময়ে সে ছলনা, অনেক সময়ে আত্মবঞ্চনা। তুমি যা বলবে তার চেয়েও অনেক কুশ্রী কথা আমি তোমাদের নিজের মুখেও শুনেচি, চোখেও দেখেচি; কিন্তু তবুও ঘৃণা হয় না।

কেন হয় না ?

বোধ হয় আমার স্বভাব; কিন্তু কালই ত বলেচি তোমাকে,

তার দরকার নেই। শুনতে আমি একটুও উৎসুক নই। তা ছাড়া কোথাকার কে—সে-সব কাহিনী নাই বা আমাকে বললে।

বৈষ্ণবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা গোঁসাই, তুমি পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম এসব বিশ্বাস করো ?

না।

না কেন ? এ কি সত্যিই নেই তুমি ভাবো ?

আমার ভাবনার অন্য জিনিষ আছে, এসব ভাববার বোধ হয় সময় পেয়ে উঠি নে।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, একটা ঘটনা তোমাকে বলব, বিশ্বাস করবে ? ঠাকুরের দিকে মুখ ক'রে বলছি তোমাকে মিথ্যে বলব না।

হাসিয়া কহিলাম, করব গো কমললতা, করব। ঠাকুরের দিব্যি না করে বললেও তোমাকে বিশ্বাস করব।

বৈষ্ণবী কহিল, তবে বলি। একদিন গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনলুম হঠাৎ তাঁর পাঠশালার বন্ধু এসেছিলেন বাড়ীতে। ভাবলুম, যে-লোক একটা দিন আমাদের এখানে না এসে পারে না, সে রইলো কোন্ ছেলেবেলার বন্ধুকে নিয়ে মেতে ছ'-সাত দিন ! আবার ভাবলুম, এ কেমনধারা বামুন-বন্ধু যে অনায়াসে পড়ে রইলো মুসলমানের ঘরে, কারও ভয় করলে না। তার কি কোথাও কেউ নেই নাকি ? জিজ্ঞাসা করতে গহরগোঁসাইও ঠিক এই কথাই বললে। বললে, সংসারে তার আপনার কেউ নেই বলে তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।

মনে মনে বললুম, তাই হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই ?

নাম শুনে যেন চমকে গেলুম। জানো ত গোঁসাই, ও নামটা আমার করতে নেই।

হাসিয়া বলিলাম, জানি। তোমার মুখেই শুনেছি।

বৈষ্ণবী কহিল, জিজ্ঞেস করলুম বন্ধু দেখতে কেমন? বয়স কত? গোঁসাই কত কি যে বলে গেল তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেল না, কিন্তু বুকের ভেতরটায় ঢিপঢিপ করতে লাগলো। তুমি ভাববে এমন মানুষ ত দেখি নি—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়! কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই—এ সত্যি?

বলিলাম, তারপর?

বৈষ্ণবী বলিল, তারপরে নিজেও হাসতে লাগলুম, কিন্তু ভুলতে আর পারলুম না। সব কাজকর্ম্মেই কেবল একটা কথা মনে হয় তুমি আবার কবে আসবে। তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাবো কবে।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার মুখের পানে চাহিয়া আর হাসিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবী বলিল, সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশী এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না। পূর্ব্বজন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে!

একটু থামিয়া আবার সে বলিল, আমি জানি তুমি থাকতেও আসো নি, থাকবেও না। যত প্রার্থনাই জানাই নে কেন দু-এক-দিন পরেই চলে যাবে; কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সামলাবো তাই কেবল ভাবি। এই বলিয়া সে সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল

ভাষায় রমণীর প্রণয়-নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্ব্বে কখনো পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই এবং ইহা অভিনয় যে নয় তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমললতা দেখিতে ভালো, অক্ষর-পরিচয়হীন মূর্খও নয়, তাহার কথাবার্ত্তায়, তাহার গানে, তাহার যত্ন ও অতিথিসেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে এবং সেই ভালো-লাগাটা প্রশস্তি ও রসিকতার অত্যুক্তি ফলাও করিয়া তুলিতে নিজেও কৃপণতা করি নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে পরিণতি যে এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবে, বৈষ্ণবীর আবেদনে, অশ্রুমোচনে ও মাধুর্য্যের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে সমস্ত মন যে এমন তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাহার কি জানিতাম! যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কেবল লজ্জাতেই যে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাই নয়, কি একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি-স্বস্তি রহিল না। জানি না, কোন্ অশুভলগ্নে কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এ যে এক পুঁটুর জাল কাটিয়া আর এক পুঁটুর ফাঁদে গিয়া ঘাড়মোড় গুঁজিয়া পড়িলাম। এদিকে বয়স ত যৌবনের সীমানা ডিঙ্গাইতেছে, এই সময়ে অযাচিত, নারীপ্রেমের বন্যা নামিল নাকি, কোথায় পলাইয়া যে আত্মরক্ষা করিব ভাবিয়া পাইলাম না। যুবতী-রমণীর প্রণয়ভিক্ষাও যে পুরুষের কাছে এত অরুচিকর হইতে পারে তাহার ধারণাও ছিল না। ভাবিলাম, অকস্মাৎ মূল্য আমার এত বাড়িল কি করিয়া? আজ রাজলক্ষ্মীর প্রয়োজনও আমাতে শেষ হইতে চাহে না—বজ্রমুষ্টি এতটুকু শিথিল করিয়াও আমাকে সে নিষ্কৃতি দিবে না এ মীমাংসা চুকিয়াছে; কিন্তু এখানে আর না। সাধুসঙ্গ মাথায় থাক, স্থির করিলাম, কালই এ স্থান ত্যাগ করিব।

বৈষ্ণবী হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল—এই যাঃ। তোমার জন্যে যে চা আনিয়েছি গোঁসাই!

বলো কি ? পেলে কোথায় ?

সহরে লোক পাঠিয়েছিলুম। যাই, তৈরি করে আনি গে। কোথাও পালিয়ো না যেন।

না ; কিন্তু তৈরি করতে জানো ত ?

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সেইদিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা বাজিল। চা-পান আশ্রমের ব্যবস্থা নয়, হয়ত নিষেধই আছে, তবু ও-জিনিষটা যে আমি ভালোবাসি এ খবর সে জানিয়াছে এবং সহরে লোক পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস জানি না, বর্ত্তমানেরও না, কেবল আভাসে এইটুকু শুনিয়াছি তাহা ভালো নয়, তাহা নিন্দার্হ, শুনিলে লোকের ঘৃণা জন্মে। তথাপি, আমার কাছে সে কাহিনী সে লুকাইতে চাহে নাই, বলিবার জন্যই বার বার পীড়াপীড়ি করিয়াছে, তবু আমিই শুনিতে রাজী হই নাই। আমার কৌতূহল নাই—কারণ, প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তাহার। একলা বসিয়া সেই প্রয়োজনের কথাটা ভাবিতে গিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম আমাকে না বলিয়া তাহার অন্তরের গ্লানি ঘুচিতেছে না—মনের মধ্যে সে কিছুতেই জোর পাইতেছে না।

শুনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমললতার উচ্চারণ করিতে নাই। জানি না কে তাহার এই পরমপূজ্য গুরুজন এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছে। দৈবাৎ আমাদের নামের মিলটাই বোধ করি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত জনমের স্বপ্ন-সাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতার জলাঞ্জলি দিয়াছে।

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের

তত্ত্ব পায় নাই। সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত—দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না—আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত জনমের রুদ্ধ দ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়।

* * * *

বৈষ্ণবী চা আনিয়া দিল, সবই নূতন ব্যবস্থা, পান করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। মানুষের মন কত সহজেই না পরিবর্ত্তিত হয়—আর যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, তোমরা কি শুঁড়ী?

কমললতা হাসিয়া বলিল, না, সোনার-বেণে; কিন্তু তোমাদের কাছে ত প্রভেদ নেই, ও দুই-ই এক।

কহিলাম, অন্ততঃ আমার কাছে তাই বটে। দুই-ই এক কেন, সবই এক হলেও ক্ষতি ছিল না।

বৈষ্ণবী বলিল, তাইত মনে হয়। তুমি গহরের মায়ের হাতেও খেয়েছো?

বলিলাম, তাঁকে তুমি জানো না। গহর বাপের মতো হয় নি, তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে। এমন শান্ত, আত্মভোলা মিষ্টি মানুষ আর কখনো দেখেচো? ওর মা ছিলেন তেমনি। একবার ছেলে-বেলায় গহরের বাপের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা আমার মনে আছে। কাকে নাকি লুকিয়ে অনেকগুলো টাকা দেওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধলো, গহরের বাপ ছিল বদরাগী লোক, আমরা ত ভয়ে গেলাম পালিয়ে। ঘণ্টাকয়েক পরে চুপিচুপি ফিরে এসে দেখি গহরের মা চুপ করে বসে। গহরের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রথমটা তিনি কথা

কইলেন না, কিন্তু আমাদের মুখের পানে চেয়ে হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে ফোঁটা কতক জল গড়িয়ে পড়লো। এ অভ্যাস তাঁর ছিল।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, এতে হাসির কি হ'লো?

বলিলাম, আমরাও ত তাই ভাবলাম; কিন্তু হাসি থামলে কাপড়ে চোখ মুছে ফেলে বললেন, আমি কি বোকা মেয়ে বাপু! ও দিব্যি নেয়েখেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে আর আমি না খেয়ে উপুস করে রেগে জ্বলে-পুড়ে মরচি। কি দরকার বলো ত! আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ-অভিমান ধুয়ে মুছে নির্ম্মল হয়ে গেল। মেয়েদের এ যে কত বড় গুণ ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভুক্তভোগী নাকি গোঁসাই?

একটু বিব্রত হইলাম। প্রশ্নটা তাহাকে ছাড়িয়া যে আমার ঘাড়ে পড়িবে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, সবই কি নিজে ভুগতে হয় কমললতা, পরের দেখেও শেখা যায়। ভুরুওয়ালা লোকটার কাছে তুমি কি কিছু শেখো নি?

বৈষ্ণবী বলিল, কিন্তু ও-ত আমার পর নয়।

আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না—একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী নিজেও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপরে হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমাকে মিনতি করি গোঁসাই, আমার গোড়ার কথাটা একবার শোন—

বেশ, বলো!

কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল বলা সহজ নয়। আমার মত নত-মুখে তাহাকেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল; কিন্তু সে হার মানিল না, অন্তর্বিদ্রোহে জয়ী হইয়া এক সময়ে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন আমারও মনে হইল তাহার স্বভাবতঃ সুশ্রী মুখের 'পরে যেন বিশেষ একটি দীপ্তি পড়িয়াছে। বলিল, অহঙ্কার যে মরেও

মরে না গোঁসাই। আমাদের বড়গোঁসাই বলে, ও যেন তুষের আগুন, নিবেও নিবে না। ছাই সরালেই চোখে পড়ে ধিকিধিকি জ্বলচে; কিন্তু তাই বলে ফুঁ দিয়েও ত বাড়াতে পারবো না। আমার এ পথে আসাই যে তাহলে মিথ্যে হয়ে যাবে। শোন; কিন্তু মেয়েমানুষ ত—হয়ত সব কথা খুলে বলতেও পারবো না।

আমার কুণ্ঠার অবধি রহিল না। শেষবারের মত মিনতি করিয়া বলিলাম, মেয়েদের পদস্খলনের বিবরণে আমার আগ্রহ নেই, ঔৎসুক্য নেই, ও শুনতে আমার কোনদিন ভালো লাগে না কমললতা! তোমাদের বৈষ্ণব-সাধনায় অহঙ্কার বিনাশের কোন্ পন্থা মহাজনেরা নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন আমি জানি নে, কিন্তু নিজের গোপন পাপ অনাবৃত করার স্পর্দ্ধিত বিনয়ই যদি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়, এসব কাহিনী যাদের কাছে অত্যন্ত রুচিকর এমন বহুলোকের সাক্ষাৎ তুমি পাবে কমললতা, আমাকে ক্ষমা কর। এ ছাড়া বোধ হয় কালই আমি চলে যাবো—জীবনে হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না।

বৈষ্ণবী কহিল, তোমাকে ত আগেই বলেছি গোঁসাই, প্রয়োজন তোমার নয়, আমার; কিন্তু কালকের পর আর আমাদের দেখা হবে না, এই কি তুমি সত্যিই বলতে চাও? না, কখনো তা নয়, আমার মন বলে আবার দেখা হবে—আমি সেই আশা নিয়েই থাকবো; কিন্তু যথার্থ-ই কি আমার সম্বন্ধে তোমার কোন কথাই জানতে ইচ্ছা করে না? চিরকাল শুধু একটা সন্দেহ আর অনুমান নিয়েই থাকবে?

প্রশ্ন করলাম, আজ বনের মধ্যে যে-লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যাকে তুমি আশ্রমে ঢুকতে দাও না, যার দৌরাত্ম্যে তুমি পালাতে চাচ্চো, সে কি তোমার সত্যিই কেউ নয়? নিছক পর?

কিসের ভয়ে পালাচ্চি তুমি বুঝেছো গোঁসাই?

হাঁ, এই ত মনে হয়! কিন্তু কে ও?

কে ও? ও আমার ইহ-পরকালের নরক যন্ত্রণা। তাইত অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে বলি, প্রভু, আমি তোমার দাসী—মানুষের ওপর থেকে এত বড় ঘৃণা আমার মন থেকে মুছে দাও—আমি আবার সহজ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

তাহার চোখের দৃষ্টিতে যেন আত্মগ্লানি ফুটিয়া উঠিল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী কহিল, অথচ ওর চেয়ে আপন একদিন আমার কেউ ছিল না—জগতে অত ভাল বোধ করি কেউ কাউকে বাসে নি।

তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং এই সুরূপা রমণীর তুলনায় সেই ভালবাসার পাত্রটির কুৎসিত কদাকার মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া মনও ভারী ছোট হইয়া গেল।

বুদ্ধিমতী বৈষ্ণবী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহা বুঝিল; কহিল, গোঁসাই, এ ত শুধু ওর বাইরেটা—ওর ভেতরের পরিচয়টা শোন।

বলো।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, আমার আরও দুটি ছোট ভাই আছে, কিন্তু বাপ-মায়ের আমিই একমাত্র মেয়ে। বাড়ী আমাদের শ্রীহট্টে, কিন্তু বাবা কারবারি লোক, তাঁর ব্যবসা কলকাতায় বলে ছেলেবেলা থেকে আমি কলকাতায় মানুষ। মা সংসার নিয়ে দেশের বাড়ীতেই থাকেন, আমি পূজোর সময় যদি কখনো দেশে যেতুম মাসখানেকের বেশী থাকতে পারতুম না। আমার ভালও লাগত না। কলকাতাতেই আমার বিয়ে হয়, সতেরো বছর বয়সে কলকাতাতেই আমি তাঁকে হারাই, তাঁর নামের জন্যেই গোঁসাই, তোমার নামটা গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনে আমি চমকে উঠি। এইজন্যই নতুনগোঁসাই বলে ডাকি, নামটা তোমার মুখে আনতে পারি নে।

বলিলাম, সে আমি বুঝেচি, তারপর?

বৈষ্ণবী কহিল, যার সঙ্গে আজ তোমার দেখা তার নাম মন্মথ, ও ছিল আমাদের সরকার। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আমার বয়েস যখন একুশ বছর তখন আমার সন্তান-সম্ভাবনা হ'লো—

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, মন্মথর একটি পিতৃহীন ভাইপো আমাদের বাসায় থাকতো, বাবা তাকে কলেজে পড়াতেন। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য ছোট ছিল, আমাকে সে যে কত ভালবাসত তার সীমা ছিল না। তাকে ডেকে বললুম, যতীন, কখনো তোমার কাছে কিছু চাই নি ভাই, আমার এ বিপদে শেষবারের মতো আমাকে একটু সাহায্য করো, আমাকে এক টাকার বিষ কিনে এনে দাও।

কথাটা প্রথমে সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু যখন বুঝলে মুখখানা তার মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললুম, দেরী করলে হবে না ভাই, তোমাকে এখুনি কিনে এনে দিতে হবে। এ ছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

শুনে যতীনের সে কি কান্না! সে ভাবতো আমাকে দেবতা, ডাকতো আমাকে দিদি বলে। কি আঘাত, কি ব্যথাই সে যে পেলে, তার চোখের জল আর শেষ হতেই চায় না। বললে, ঊষাদিদি, আত্মহত্যার মতো মহাপাপ আর নেই। একটা অন্যায়ের কাঁধে আর একটা তার বড়ো অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি পথ খুঁজে পেতে চাও? কিন্তু লজ্জা থেকে বাঁচবার এই উপায় যদি তুমি স্থির করে থাকো দিদি, আমি কখনো সাহায্য করব না। এ ছাড়া তুমি আর যা আদেশ করবে আমি স্বচ্ছন্দে পালন করব। তার জন্যেই আমার মরা হলো না।

ক্রমশঃ কথাটা বাবার কানে গেল। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান

বৈষ্ণব, তেমনি শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু দুঃখে, লজ্জায় দু-তিন দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। তারপরে গুরুদেবের পরামর্শে আমাকে নিয়ে নবদ্বীপে এলেন। কথা হলো মন্মথ এবং আমি দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হবো; তখন ফুলের মালা আর তুলসীর মালা বদল ক'রে নতুন আচারে হবে আমাদের বিয়ে। তাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা জানি নে, কিন্তু যে-শিশু গর্ভে এসেছে মা হয়ে তাকে যে হত্যা করতে হবে না সেই ভরসাতেই যেন অর্দ্ধেক বেদনা মুছে গেল। উদ্যোগ আয়োজন চললো, দীক্ষাই বলো আর ভেকই বলো তাও আমাদের সাঙ্গ হলো, আমার নতুন নামকরণ হলো—কমললতা; কিন্তু তখনো জানি নে যে বাবা দশহাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তবে মন্মথকে রাজী করিয়েছিলেন; কিন্তু হঠাৎ কি কারণে জানি নে বিয়ের দিনটা দিনকয়েক পেছিয়ে গেল। বোধ হয় সপ্তাহখানেক হবে। মন্মথকে বড় একটা দেখি নে, নবদ্বীপের বাসায় আমি একলাই থাকি। এমনই ক'দিন যায়, তারপরে শুভদিন আবার এসে উপস্থিত হলো। স্নান করে, শুচি হয়ে শান্ত মনে ঠাকুরের প্রসাদী মালা হাতে প্রতীক্ষা করে রইলুম।

বাবা বিষণ্ণমুখে একবার ঘুরে গেলেন, কিন্তু নবীন বৈষ্ণবের বেশে মন্মথর যখন দেখা মিললো, হঠাৎ সমস্ত মনের ভেতরটায় যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। সে আনন্দের কি ব্যথার ঠিক জানি নে, হয়ত দুই-ই ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে আসি; কিন্তু লজ্জায় সে আর হয়ে উঠলো না।

আমাদের কলকাতার পুরানো দাসী কি সব জিনিষপত্র নিয়ে এলো, সে আমাকে মানুষ করেছিল, তার কাছেই দিন পিছোবার কারণ শুনতে পেলুম।

কতকালের কথা, তবু গলা ভারী হইয়া তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণটা কি বললে সে?

বৈষ্ণবী কহিল, বললে, মন্মথ হঠাৎ দশ হাজারের বদলে বিশ হাজার টাকা দাবী করে বসলো। আমি কিছুই জানতুম না, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, মন্মথ কি টাকার বদলে রাজী হয়েছে নাকি? আর বাবাও বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন? দাসী বললে, উপায় কি দিদিমণি? ব্যাপারটা ত সহজ নন, প্রকাশ হয়ে পড়লে যে সমাজ-জাত-কুল-মান সব যাবে। মন্মথ আসল কথাটা শেষকালে প্রকাশ করে দিলে, বললে, দায়ী ত সে নন, দায়ী তার ভাইপো যতীন। সুতরাং বিনা দোষে যদি তাকে জাত দিতেই হয় ত বিশ হাজারের কমে পারবে না। তা ছাড়া পরের ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া—এ কি কম কঠিন!

যতীন তার ঘরে বসে পড়ছিলো তাকে ডেকে এনে কথাটা শোনানো হলো। শুনে প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরে বললে, মিছে কথা।

পিতৃব্য মন্মথ গর্জ্জন করে উঠলো—পাজি নচ্ছার নেমকহারাম! যে লোক তাকে ভাত-কাপড় দিয়ে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করচে তুই তারই করলি সর্ব্বনাশ! কি কাল-সাপকেই না আমি মনিবের ঘরে ডেকে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম বাপ-মা-মরা ছেলে মানুষ হবে! ছি ছি! এই না বলে সে বুকে কপালে পটাপট করাঘাত করতে লাগল, বললে একথা ঊষা নিজের মুখে ব্যক্ত করেছে আর তুই বলিস, না!

যতীন চমকে উঠে বললে, ঊষাদিদি নিজে বলেছেন আমার নামে? কিন্তু তিনি ত কখ্‌খনো মিথ্যে বলেন না—এত বড় মিথ্যে অপবাদ তাঁর মুখ থেকে কিছুতেই বার হতে পারে না।

মন্মথ আর একবার তর্জ্জন করে উঠলো—ফের! তবু অস্বীকার করবি পাজী হতভাগা শয়তান! জিজ্ঞেস কর্ তবে মনিবকে। তিনি কি বলেন শোন্।

কর্ত্তা সায় দিয়ে বললেন, হাঁ।

যতীন বললে, দিদি নিজে করেছেন আমার নাম ?

কর্ত্তা আবার ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ।

বাবাকে সে দেবতা বলে জানত, এর পর আর প্রতিবাদ করলে না, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। কি ভাবলে সে জানে।

রাত্রে কেউ আর খোঁজ করলে না, সকালে কে এসে তার খবর দিলে, সবাই ছুটে গিয়ে দেখলে আমাদের ভাঙা আস্তাবলের এক কোণে যতীন গড়ায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে।

বৈষ্ণবী কহিল, শাস্ত্রে ভাইপোর আত্মহত্যায় খুড়োর অশৌচের বিধি আছে কিনা জানি নে গোঁসাই, হয়ত নেই, হয়ত ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়—সে যাই হোক, শুভদিন দিনকয়েক মাত্র পেছিয়ে গেল—তার পরে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ, শুচি হয়ে মন্মথ গোঁসাই মালা-তিলক ধারণ করে অধীনার পাপ-বিমোচনের শুভ-সঙ্কল্প নিয়ে নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হলেন।

একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বৈষ্ণবী পুনরায় কহিল, সেদিন ঠাকুরের প্রসাদী মালা ঠাকুরের পাদপদ্মে ফিরিয়ে দিয়ে এলুম। মন্মথর অশৌচ গেল, কিন্তু পাপিষ্ঠা ঊষার অশৌচ ইহজীবনে আর ঘুচল না নতুনগোঁসাই।

কহিলাম, তারপরে ?

বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়াছিল, জবাব দিল না। বুঝিলাম, এবার তাহার সামলাইতে সময় লাগিবে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলাম।

ইহার শেষ অংশটু শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রশ্ন করা উচিত কিনা ভাবিতেছিলাম, বৈষ্ণবী আর্দ্র মৃদুকণ্ঠে নিজেই বলিল, গ্যাখো গোঁসাই, পাপ জিনিষটা সংসারে এমন ভয়ঙ্কর কেন জানো ?

বলিলাম, নিজের বিশ্বাস মতো জানি এরকম, কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে সে হয়ত না মিলতে পারে।

সে প্রত্যুত্তরে কহিল, জানি নে তোমার রিশ্বাস কি, কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মতো ক'রে বুঝে রেখেছি গোঁসাই। স্পর্দ্ধাভরে তুমি কত লোককে বলতে শুনবে—কিছুই হয় না। তারা কত লোকের নজির দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে ; কিন্তু তার ত কোন দরকার নেই। তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে। আজও কিছু আমাদের হয় নি। হ'লে একে এতো ভয়ঙ্কর আমি বলতুম না , কিন্তু তা ত নয়, এর দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধ নির্দ্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্মহত্যায়, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। বল ত গোঁসাই, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কিছু আছে ? কিন্তু এমনই হয়, এমনি ক'রেই ঠাকুর বোধ হয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষে করেন।

এ নিয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাহার যুক্তি এবং ভাষা কোনটাই প্রাঞ্জল নয়, তথাপি ইহাই মনে করিলাম, তাহার দুষ্কৃতির শোকাচ্ছন্ন স্মৃতি হয়ত এই পথেই আপন পাপ-পুণ্যের উপলব্ধি অর্জ্জন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা এর পরে কি হ'লো ?

শুনিয়া সহসা সে যেন ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি বলো গোঁসাই, এর পরেও আমার কথা তোমার শুনতে ইচ্ছে করে ?

সত্যিই বলচি, করে।

বৈষ্ণবী বলিল, আমার ভাগ্য যে এ জন্মে আবার তোমার দেখা পেলুম। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিন-চারেক পরে একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হলো, তাকে গঙ্গার তীরে বিসর্জ্জন দিয়ে গঙ্গায় স্নান করে বাসায় ফিরে

এলুম। বাবা কেঁদে বললেন, আমি ত আর থাকতে পারি নে মা। বললুম, না বাবা, তুমি আর থেকো না, তুমি বাড়ী যাও। অনেক দুঃখ দিলুম, আর তুমি আমার জন্যে ভেবো না।

বাবা বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিবি ত মা?

বললুম, না বাবা, আমার খবর নেবার আর তুমি চেষ্টা ক'রো না।

কিন্তু তোমার মা যে এখনো বেঁচে রয়েছে, ঊষা?

বললুম, আমি মরবো না বাবা, কিন্তু আমার সতী-লক্ষ্মী মা, তাঁকে বলো ঊষা মরেছে। মা দুঃখ পাবেন, কিন্তু মেয়ে তাঁর বেঁচে আছে শুনলে তার চেয়েও বেশী দুঃখ পাবেন। চোখের জল মুছে বাবা কলকাতায় চলে গেলেন।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কমললতা বলিতে লাগিল, হাতে টাকা ছিল, বাড়ীভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গী জুটে গেল—তারা যাচ্ছিলো শ্রীবৃন্দাবনে—আমিও সঙ্গ নিলুম।

বৈষ্ণবী একটু থামিয়া বলিল, তারপরে কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছতলায় কতদিন কেটে গেল—

বলিলাম, তা জানি, কিন্তু কত শত বাবাজীর কত শত-সহস্র চোখের দৃষ্টির বিবরণ ত বললে না কমললতা?

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, বাবাজীদের দৃষ্টি অতিশয় নির্ম্মল, তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার কথা বলতে নেই গোঁসাই।

বলিলাম, না না, অশ্রদ্ধা নয়, অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের কাহিনী শুনতে চাইছি কমললতা!

এবার সে হাসিল না বটে, কিন্তু চাপা-হাসি গোপন করিতেও পারিল না, কহিল, যে বাবাজী ভালবাসে তাকে সব কথা খুলে বলতে নেই, আমাদের বোষ্টমের শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বলিলাম, তবে থাক। সব কথায় কাজ নেই, কিন্তু একটা বলো। গোঁসাইজী দ্বারিকাদাসকে যোগাড় করলে কোথায়?

কমললতা সঙ্কোচে জিভ কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, বলিল, ঠাট্টা করতে নেই, উনি যে আমার গুরুদেব গোঁসাই।

গুরুদেব? তুমি ওঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছো?

না, দীক্ষা নিই নি বটে, কিন্তু উনি তাঁর মতোই পূজনীয়।

কিন্তু এই যে এতগুলি বৈষ্ণবী—সেবাদাসী নাকি যে বলো—

কমললতা পুনশ্চ জিভ কাটিয়া বলিল, ওরা আমার মতোই ওঁর শিষ্যা। ওদেরও তিনি উদ্ধার করেছেন।

কহিলাম, নিশ্চয়ই করেছেন; কিন্তু পরকীয়া সাধনা, না কি এমনি একটা সাধন-পদ্ধতি তোমাদের আছে—তাতে তো দোষ নেই—

বৈষ্ণবী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমরা দূর থেকে আমাদের কেবল ঠাট্টা-তামাসাই করলে, কাছে এসে কখনো ত কিছু দেখলে না, তাই সহজেই বিদ্রূপ করতে পারো। আমাদের বড়গোঁসাইজী সন্ন্যাসী, ওঁকে উপহাস করলে অপরাধ হয় নতুন-গোঁসাই, অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

তাহার কথা ও গাম্ভীর্য্যে একটু অপ্রতিভ হইলাম। বৈষ্ণবী তাহা লক্ষ্য করিয়া স্মিতমুখে বলিল, দুদিন থাকো না গোঁসাই আমাদের কাছে। কেবল বড়গোঁসাইজীর জন্যেই বলচি নে, আমাকে ত তুমি ভালবাসো, আর কখনো যদি দেখা না-ও হয় তবুও দেখে যাবে কমললতা সত্যিই কি নিয়ে সংসারে থাকে। যতীনকে আমি আজো ভুলি নি—দুদিন থাকো—আমি বলচি তোমাকে, তুমি যথার্থ-ই খুশী হবে।

চুপ করিয়া রহিলাম। ইহাদের সম্বন্ধে একেবারেই যে কিছু জানি না তাহা নয়, জাত-বোষ্টমের মেয়ে টগরের কথাটাও মনে পড়িল, কিন্তু রহস্য করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। যতীনের

প্রায়শ্চিত্তের ঘটনা সকল আলোচনার মাঝখানে রহিয়া রহিয়া আমাকেও যেন উন্মনা করিয়া দিতেছিল।

বৈষ্ণবী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হাঁ গোঁসাই, এ বয়সে সত্যিই কাউকে কখনো কি ভালোবাসো নি ?

তোমার কি মনে হয় কমললতা ?

আমার মনে হয়—না। তোমার মনটা হ'ল আসলে বৈরাগীর মন, উদাসীনের মন—প্রজাপতির মতো। বাঁধন তুমি কখনো কোনকালে নেবে না।

হাসিয়া বলিলাম, প্রজাপতির উপমা ত ভালো হ'ল না কমল-লতা, ওটা যে অনেকটা গালাগালির মত শুনতে। আমার ভালো-বাসার মানুষ কোথাও যদি সত্যই কেউ থাকে, তার কানে গেলে যে অনর্থ বাধবে।

বৈষ্ণবীও হাসিল, কহিল, ভয় নেই গোঁসাই ; সত্যিই যদি কেউ থাকে আমার কথায় সে বিশ্বাসও করবে না, তোমার মধু-মাখানো ফাঁকিও সে সারা জীবনে ধরতে পারবে না।

বলিলাম, তবে তার দুঃখ কিসের ? হোক না ফাঁকি কিন্তু তার কাছে ত সে-ই সত্যি হয়ে রইলো।

বৈষ্ণবী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হয় না গোঁসাই, মিথ্যে কখনো সত্যির জায়গা নিয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝতে না পারুক, কারণটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট না হোক, তবু অন্তরটা তাদের নিরন্তর অশ্রুমুখী হয়েই থাকে। মিথ্যের কাণ্ড দেখেচি ত। এমনি ক'রে এ-পথে কত লোকই এলো, এ-পথ যাদের সত্যি নয় জলের ধারা-পথে শুকনো বালির মতো সমস্ত সাধনাই তাদের চিরদিন আলগা হয়ে রইলো, কখনো জমাট বাঁধতে পারলে না।

একটু থামিয়া সে যেন হঠাৎ নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, তারা রসের খবর ত পায় না, তাই প্রাণহীন নির্জ্জীব পুতুলের নিরর্থক সেবায় প্রাণ তাদের দুদিনে হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবে এ কোন্ মোহের ঘোরে নিজেকে দিনরাত ঠকিয়ে মরি। এদের দেখেই আমাদের তোমরা উপহাস করতে শেখো—কিন্তু এ কি আমি বাজে বকে মরচি গোঁসাই, এসব অসংলগ্ন প্রলাপের তুমি ত একটা কথাও বুঝবে না ; কিন্তু এমন যদি কেউ তোমার থাকে, তুমি তাকে ভুলবে, কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনো তার চোখের জলের ধারা।

স্বীকার করিলাম যে তাহার বক্তব্যের প্রথম অংশটা বুঝি নাই, কিন্তু শেষের দিকটার প্রতিবাদে কহিলাম, তুমি কি আমাকে এই কথাই বলতে চাও কমললতা যে, আমাকে ভালোবাসার নামই হলো দুঃখ পাওয়া ?

দুঃখ ত বলিনি গোঁসাই, বলেছি চোখের জলের কথা।

কিন্তু ও দুই-ই এক কমললতা, শুধু কথার ঘোরফের।

বৈষ্ণবী কহিল, না গোঁসাই, ও দুটো এক নয়। না কথার ঘোরফের, না ভাবের। মেয়েরা ওর এটাও ভয় করে না, ওটাও এড়াতে চায় না ; কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে ?

কিছুই যদি না বুঝি আমাকে বলাই বা কেন ?

না বলেও যে থাকতে পারি নে গো। প্রেমের বাস্তবতা নিয়ে তোমরা পুরুষের দল যখন বড়াই করতে থাকো তখন ভাবি আমাদের জাত যে আলাদা। তোমাদের ও আমাদের ভালোবাসার প্রকৃতিই যে বিভিন্ন। তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা ; তোমরা চাও উল্লাস, আমরা চাই শান্তি। জানো গোঁসাই, ভালেবাসার নেশাকে আমরা অন্তরে ভয় করি, ওর মত্ততায় আমাদের বুকের কাঁপন থামে না।

কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করিল

না, ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল, ও আমাদের সত্যিও নয়, আমাদের আপনও নয়। ওর ছুটোছুটির চঞ্চলতা যেদিন থামে সেই দিনেই কেবল আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। ওগো নতুনগোঁসাই, নির্ভর হতে পারার চেয়ে ভালোবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের আর নেই, কিন্তু ঐ জিনিষটিই যে তোমার কাছে কেউ কখনো পাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, পাবে না নিশ্চয় জানো ?

বৈষ্ণবী বলিল, নিশ্চয় জানি। তাই তোমার বড়াই আমার সয় না।

আশ্চর্য্য হইলাম। বলিলাম, বড়াই ত তোমার কাছে কখনো করি নি কমললতা ?

সে কহিল, জেনে করো নি, কিন্তু তোমার ঐ উদাসীন বৈরাগী মন—ওর চেয়ে বড় অহঙ্কারী জগতে আর কিছু আছে নাকি !

কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি ক'রে ?

জানলুম তোমাকে ভালোবেসেছি বলে।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, তোমার দুঃখ আর চোখের জলের প্রভেদটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি কমললতা। অবিশ্রাম ভাবের পূজো আর রসের আরাধনার বোধ করি এমনি পরিণামই ঘটে।

প্রশ্ন করিলাম, ভালোবেসেছো একি সত্যি, কমললতা ?

হাঁ সত্যি।

কিন্তু তোমার জপতপ, তোমার কীর্ত্তন, তোমার রাত্রিদিনের ঠাকুরসেবা এ সবের কি হবে বলো ত ?

বৈষ্ণবী কহিল, এরা আমার আরও সত্যি, আরও সার্থক হয়ে উঠবে। চলো না গোঁসাই, সব ফেলে দুজনে পথে পথে বেরিয়ে পড়ি ?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সে হয় না কমললতা, কাল আমি চলে

যাচ্চি ; কিন্তু যাবার আগে গহরের কথাটা একটু জেনে যেতে ইচ্ছে করে।

বৈষ্ণবী নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, গহরের কথা ? না, সে শুনে তোমার কাজ নেই ; কিন্তু সত্যিই কি কাল যাবে ?

হাঁ, সত্যিই কাল যাবো।

বৈষ্ণবী মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিল, কিন্তু এ আশ্রমে আবার তুমি আসবে, তখন কিন্তু কমললতাকে আর খুঁজে পাবে না গোঁসাই।

আট

এখানে আর একদণ্ডও থাকা উচিত নয় এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না কিন্তু তখনি কে যেন আড়ালে দাঁড়াইয়া চোখ টিপিয়া ইশারায় নিষেধ করে, বলে, যাবে কেন ? ছ'-সাত দিন থাকবে ব'লেই ত এসেছিলে—থাক না। কষ্ট ত কিছুই নেই।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিলাম, কে ইহারা একই দেহের মধ্যে বাস করিয়া একই সময়ে ঠিক উল্টো মতলব দেয়। কাহার কথা বেশী সত্য ? কে বেশী আপনার ? বিবেক, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি—এমন কত নাম, কত দার্শনিক ব্যাখ্যাই না ইহার আছে, কিন্তু নিঃসংশয় সত্যকে আজও কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল ? যাহাকে ভালো বলিয়া মনে করি ইচ্ছা আসিয়া সেখানে পা বাড়াইতে বাধা দেয় কেন ? নিজের মধ্যে এই বিরোধ, এই দ্বন্দ্বের শেষ হয় না কেন ? মন বলিতেছে আমার চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ, চালিয়া যাওয়াই কল্যাণের, তবে পরক্ষণে সেই মনের দুচোখ ভরিয়া জল দেখা দেয় কিসের জন্য ? বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃত্তি, মন—এই সব কথার সৃষ্টি করিয়া কোথায় সত্যকার সান্ত্বনা ?

তথাপি যাইতেই হইবে, পিছাইলে চলিবে না এবং কালই। এই যাওয়াটা যে কি করিয়া সম্পন্ন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। ছেলেবেলার একটা পথ জানি, সে অন্তর্হিত হওয়া। বিদায়-বাণী নয়, ফিরিয়া আসিবার স্তোকবাক্য নয়, কারণ প্রদর্শন, নয়, প্রয়োজনের কর্ত্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ নয়—শুধু আমি যে ছিলাম এবং আমি যে নাই এই সত্য ঘটনাটা আবিষ্কারের ভার যাহারা রহিল তাহাদের 'পরে নিঃশব্দে অর্পণ করা।

স্থির করিলাম, ঘুমানো হইবে না, ঠাকুরের মঙ্গল আরতি সুরু হইবার পূর্ব্বেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্থান করিব। একটা মুস্কিল, পুঁটুর পণের টাকাটা ছোট ব্যাগ সমেত কমললতার কাছে আছে, কিন্তু সে থাক্। হয় কলিকাতা, নয় বর্ম্মা হইতে চিঠি লিখিব, তাহাতে আরও একটা কাজ এই হইবে যে আমাকে প্রত্যর্পণ না করা পর্য্যন্ত কমললতাকে বাধ্য হইয়া এখানেই থাকিতে হইবে, পথে-বিপথে বাহির হইবার সুযোগ পাইবে না। এদিকে যে-কয়টা টাকা আমার জামার পকেটে পড়িয়া আছে কলিকাতায় পৌঁছিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এমনি করিয়াই কাটিল, এবং ঘুমাইব না বলিয়া বার বার সঙ্কল্প করিলাম বলিয়াই বোধ করি কোন্ এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল বুঝি স্বপ্নে গান শুনিতেছি। একবার ভাবিলাম রাত্রের ব্যাপার হয়ত এখানো সমাপ্ত হয় নাই, আবার মনে হইল প্রত্যুষের মঙ্গল-আরতি বুঝি সুরু হইয়াছে, কিন্তু কাসর-ঘণ্টার সুপরিচিত দুঃসহ নিনাদ নাই। অসম্পূর্ণ অপরিতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না, চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারি না, কিন্তু কানে গেল ভোরের সুরে মধুর-কণ্ঠের আদরের অনুচ্চ আহ্বান—'রাই জাগো, রাই জাগো, শুক-

শারী বলে, কত নিদ্রা যাওলো কালো-মাণিকের কোলে' গোঁসাইজী তার কত ঘুমাবে গো—ওঠো ?

বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মশারি তোলা, পূবের জানালা খোলা—সম্মুখে আম্রশাখায় পুষ্পিত লবঙ্গ-মঞ্জরির কয়েকটা সুদীর্ঘ স্তবক নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া আছে, তাহারি ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল আকাশের কতকটা জায়গায় ফিকে-রাঙার আভাস দিয়াছে—অন্ধকার রাতে সুদূর গ্রামান্তে আগুন লাগার মতো—মনের কোথায় যেন একটুখানি ব্যথিত হইয়া উঠে। গোটাকয়েক বাদুড় বোধ করি উড়িয়া বাসায় ফিরিতেছিল তাহাদের পক্ষ তাড়নার অস্ফুট শব্দ পরে পরে কানে আসিয়া পৌঁছিল, বুঝা গেল আর যাই হোক রাত্রিটা শেষ হইতেছে। এটা দোয়েল, বুলবুল ও শ্যামাপাখীর দেশ! হয়ত বা উহাদের রাজধানী—কলিকাতা সহর। আর ঐ বিরাট বকুল-গাছটা তাহাদের লেন-দেন কাজকারবারের বড়বাজার—দিনের বেলায় ভীড় দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা রং-বেরঙের পোষাক-পরিচ্ছদের অতি বিচিত্র সমাবেশ। আর রাত্রে আখড়ার চতুর্দ্দিকে বনে-জঙ্গলে ডালে ডালে তাহাদের অগুণতি আড্ডা। ঘুম ভাঙার সাড়াশব্দ কিছু কিছু পাওয়া গেল—ভাবে বোধ হইল চোখে-মুখে জল দিয়া তৈরী হইয়া লইতেছে, এইবার সমস্ত দিনব্যাপী নাচ-গানের মোচ্ছব সুরু হইবে। সবাই এরা লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ—ক্লান্তও হয় না, কসরৎও থামায় না। ভিতরে বৈষ্ণবদলের কীর্ত্তনের পালা যদিবা কদাচিৎ বন্ধ হয়, বাহিরে সে বালাই নাই। এখানে ছোট বড়, ভালমন্দ বাছবিচার চলে না, ইচ্ছা এবং সময় থাক না থাক গান তোমাকে শুনিতেই হইবে। এদেশের বোধ করি এইরূপই ব্যবস্থা। মনে পড়িল কাল সমস্ত দুপুর পিছনের বাঁশবনে গোটা-দুই হর-গৌরী পাখীর চড়া গলার পিয়া-পিয়া-পিয়া ডাকের অবিশ্রান্ত প্রতিযোগিতায় আমার দিবানিদ্রার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ আমারি ন্যায় বিক্ষুব্ধ কোন

একটা ডাহুক নদীর কলমীদলের উপরে বসিয়া ততোধিক কঠিন কণ্ঠে ইহাদের বার বার তিরস্কার করিয়াও স্তব্ধ করিতে পারে নাই। ভাগ্য ভালো যে এদেশে ময়ূর মিলে না, নহিলে উৎসবের গানের আসরে তাহারা আসিয়া যোগ দিলে আর মানুষ টিকিতে পারিত না। সে যাই হোক, দিনের উৎপাত এখনো আরম্ভ হয় নাই, হয়ত আর একটু নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিতাম, কিন্তু স্মরণ হইল গতরাত্রির সঙ্কল্পের কথা; কিন্তু গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িবারও যো নেই— প্রহরীর সতর্কতায় মতলব ফাঁসিয়া গেল। রাগ করিয়া বলিলাম, আমি রাইও নই, আমার বিছানায় শ্যামও নেই—দুপুর রাতে ঘুম-ভাঙ্গানোর কি দরকার ছিল বলো ত?

বৈষ্ণবী কহিল, রাত কোথায় গোঁসাই, তোমার যে আজ ভোরের গাড়ীতে কলকাতা যাবার কথা। মুখ-হাত ধুয়ে এসো, আমি চা তৈরি করে আনি গে; কিন্তু স্নান ক'রো না যেন। অভ্যাস নেই, অসুখ করতে পারে।

বলিলাম, তা পারে। সকালের গাড়ীতে যখন হোক আমি যাবো, কিন্তু তোমার এত উৎসাহ কেন বলো ত?

সে কহিল, আর কেউ ওঠার আগে আমি যে তোমাকে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে চাই গোঁসাই। স্পষ্ট করিয়া তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু ছড়ানো চুলের পানে চাহিয়া ঘরের এই অত্যল্প আলোকেও বুঝা গেল সেগুলি ভিজা—স্নান সারিয়া বৈষ্ণবী প্রস্তুত হইয়া লইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আশ্রমেই আবার ফিরে আসবে ত?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

সেই ছোট টাকার থলিটি সে বিছানায় রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার ব্যাগ। এটা পথে সাবধানে রেখো—টাকাগুলো একবার দেখে নাও।

হঠাৎ মুখে কথা যোগাইল না, তারপরে বলিলাম, কমললতা, তোমার মিছে এ পথে আসা। একদিন নাম ছিল তোমার ঊষা, আজো সেই ঊষাই আছো—একটুও বদলাতে পারো নি!

কেন বলো ত?

তুমি বলো ত কেন বললে আমাকে টাকা গুণে নিতে? গুণ নিতে পারি বলে কি সত্যিই মনে করো? যারা ভাবে একরকম বলে অন্যরকম, তাদের বলে ভণ্ড। যাবার আগে বড়গোঁসাইজীকে আমি নালিশ জানিয়ে যাবো আখড়ার খাতা থেকে তোমার নামটা যেন তিনি কেটে দেন। তুমি বোষ্টমদলের কলঙ্ক।

সে চুপ করিয়া রহিল। আমিও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলাম, আজ সকালে আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

নেই? তাহলে আর একটু ঘুমোও। উঠলে আমাকে খবর দিও—কেমন?

কিন্তু, এখন তুমি করবে কি?

আমার কাজ আছে। ফুল তুলতে যাবো।

এই অন্ধকারে? ভয় করবে না?

না, ভয় কিসের? ভোরের পূজোর ফুল আমিই তুলে আনি। নইলে ওদের বড় কষ্ট হয়।

ওদের মানে অন্যান্য বৈষ্ণবীদের। এই দুটো দিন এখানে থাকিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম যে সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহার কর্ত্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের 'পরেই; কিন্তু স্নেহে, সৌজন্যে ও সর্ব্বোপরি সবিনয় কর্ম্মকুশলতায় এই কর্ত্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে কোথাও ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষের অতটুকু আবর্জ্জনাও জমিতে পায় না। এই আশ্রম-লক্ষ্মীটি আজ উৎকণ্ঠা-ব্যাকুলতায় যাই-যাই করিতেছে। এ যে কত

বড় দুর্ঘটনা, কত বড় নিরুপায় দুর্গতিতে এতগুলি নিশ্চিন্ত নরনারী স্খলিত হইয়া পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া আমারও ক্লেশবোধ হইল। এই মঠে মাত্র দুটি দিন আছি, কিন্তু কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি—ইহার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই যেন পারি না এমনি মনোভাব। ভাবিলাম লোকে মিছাই বলে সকলে মিলিয়া আশ্রম—এখানে সবাই সমান; কিন্তু একের অভাবে যে কেন্দ্রভ্রষ্ট উপগ্রহের মতো সমস্ত আয়তনই দিগ্বিদিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে তাহা চোখের উপরেই যেন দেখিতে লাগিলাম। বলিলাম, আর শোবো না কমললতা, চলো তোমার সঙ্গে গিয়ে ফুল তুলে আনি গে।

বৈষ্ণবী কহিল, তুমি স্নান করো নি, কাপড় ছাড়ো নি, তোমার ছোঁয়া ফুলে পূজো হবে কেন?

বলিলাম, ফুল তুলতে না দাও, ডাল নুইয়ে ধরতে দেবে ত? তাতেও তোমার সাহায্য হবে।

বৈষ্ণবী বলিল, ডাল নোয়াবার দরকার হয় না, ছোট ছোট গাছ, আমি নিজেই পারি।

বলিলাম, অন্ততঃ সঙ্গে থেকে দুটো সুখদুঃখের গল্প করতে পারবো ত? তাতেও তোমার শ্রম লঘু হবে।

এবার বৈষ্ণবী হাসিল, হঠাৎ বড় দরদ যে গোঁসাই—আচ্ছা চলো, আমি সাজিটা আনি গে, তুমি ততক্ষণ হাত-মুখধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।

আশ্রমের বাহিরে অল্প একটু দূরে ফুলের বাগান। ঘন ছায়াচ্ছন্ন আমবনের ভিতর দিয়া পথ। শুধু অন্ধকারের জন্য নয়, রাশিকৃত শুকনো পাতায় পথের রেখা বিলুপ্ত। বৈষ্ণবী আগে, আমি পিছনে, তবু ভয় করিতে লাগিল পাছে সাপের ঘাড়ে পা দিই। বলিলাম, কমললতা, কথা ভুলবে না ত?

বৈষ্ণবী বলিল, না। অন্ততঃ তোমার জন্যেও আজ পথ চিনে আমাকে চলতে হবে।

কমললতা, একটা অনুরোধ রাখবে ?

কি অনুরোধ ?

এখান থেকে তুমি আর কোথাও চলে যেয়ো না।

গেলে তোমার লোকসান কি ?

জবাব দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী বলিল, মুরারি ঠাকুরের একটি গান আছে—'সখি হে ফিরিয়া আপনার ঘরে যাও; জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও।' গোঁসাই বিকালে তুমি কলকাতায় চলে যাবে, আজ একটা বেলার বেশী বোধ করি এখানে আর থাকতে পারবে না—না ?

বলিলাম, কি জানি, আগে সকালবেলাটা কাটুক।

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, একটু পরে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল—

'কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ-দুখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।'

থামিলে বলিলাম, তারপরে ?

তারপরে আর জানি নে !

বলিলাম, তবে আর একটা কিছু গাও—

বৈষ্ণবী তেমনি মৃদুকণ্ঠে গাহিল—

"চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।"

এবারেও থামিলে বলিলাম, তারপরে ?

বৈষ্ণবী কহিল, তারপরে আর নেই, এখানেই শেষ।

শেষই বটে। দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। ভারি ইচ্ছা করিতে লাগিল দ্রুতপদে পাশে গিয়া কিছু একটা বলিয়া এই অন্ধকার পথটা তাহার হাত ধরিয়া চলি। জানি সে রাগ করিবে

না, বাধা দিবে না, কিন্তু কিছুতেই পা-ও চলিল না, মুখেও একটা কথা আসিল না, যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ধীরে ধীরে নীরবে বনের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পথের ধারে বেড়া দিয়া ঘেরা আশ্রমের ফুলের বাগান, ঠাকুরের নিত্যপূজার জোগান দেয়। খোলা জায়গায় অন্ধকার আর নাই কিন্তু ফর্সাও তেমন হয় নাই। তথাপি দেখা গেল অজস্র ফুটন্ত মল্লিকায় সমস্ত বাগানটা যেন সাদা হইয়া আছে। সামনের পাতাঝরা ন্যাড়া চাঁপাগাছটায় ফুল নাই কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি অসময়ে প্রস্ফুটিত গোটাকয়েক রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে সে ত্রুটি পূর্ণ হইয়াছে। আর সবচেয়ে মানাইয়াছে মাঝখানটায়। নিশান্তের এই ঝাপ্সা আলোতেও চেনা যায় শাখায়-পাতায় জড়াজড়ি করিয়া গোটা-পাঁচ-ছয় স্থলপদ্মের গাছ—ফুলের সংখ্যা নাই—বিকশিত সহস্র আরক্ত আঁখি মেলিয়া বাগানের সকল দিকে তাহারা চাহিয়া আছে।

কখনো এত প্রত্যূষে শয্যা ছাড়িয়া উঠি না, এমন সময়টা চিরদিন নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতন কাটিয়া যায়—আজ কি যে ভালো লাগিল তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে রক্তিম দিগন্তে জোতির্ম্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায় সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর ঐ লতায়-পাতায় শোভায়-সৌরভে ফুলে ফুলে পরিব্যাপ্ত সম্মুখের উপবন—সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুরুদ্ধ ভাষা। করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা পেয়েছো, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।

বৈষ্ণবী সাজিটা চাঁপা-ডালে ঝুলাইয়া আগলের বাঁধন খুলিতেছিল, আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল—হঠাৎ তোমার হলো কি গোঁসাই?

নিজের কথাটা নিজের কানেও কেমন খাপছাড়া ঠেকিয়াছিল, তাহার সবিস্ময়-প্রশ্নে মনে মনে ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। মুখে উত্তর যোগাইল না, লজ্জিতের আবরণ একটা অর্থহীন হাসির চেষ্টাও ঠিক সফল হইল না, শেষে চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল, আমি সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে দিয়েছি, কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলারও ভরসা হইল না। সে মৃদু গুঞ্জনে গাহিতে লাগিল —"কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে, কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া। যদুনাথ দাস কহে—"

থামাইতে হইল। বলিলাম, যদুনাথ দাস থাক, ওদিকে কাঁসরের বাদ্যি শুনতে পাচ্চো কি ? ফিরবে না ?

সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় আরম্ভ করিল, "ধরম করম যাউক্ তাহে না ডরাই, মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই—" আচ্ছা নতুনগোঁসাই, জানো মেয়েদের মুখে গান অনেক ভালো লোকে শুনতে চায় না, তাদের ভারি খারাপ লাগে ?

বলিলাম, জানি ; কিন্তু আমি অতটা ভালো বর্ব্বর নই।

তবে বাধা দিয়ে আমাকে থামালে কেন ?

ওদিকে হয়ত আরতি স্থরু হয়েছে—তুমি না থাকলে যে তার অঙ্গহানি হবে।

এটি মিথ্যে ছলনা, গোঁসাই।

ছলনা হবে কেন ?

কেন তা তুমিই জানো ; কিন্তু এ কথা তোমাকে বলল কে ?

আমার অভাবে ঠাকুরের সেবায় সত্যিই অঙ্গহানি হতে পারে, এ কি তুমি বিশ্বাস করো ?

করি। আমাকে কেউ বলে নি কমললতা—আমি নিজের চোখে দেখেচি।

সে আর কিছু বলিল না, কি একরকম অন্যমনস্কের মতো ক্ষণকাল আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে ফুল তুলিতে লাগিল। ডালা ভরিয়া উঠিলে কহিল, হয়েছে—আর না।

স্থলপদ্ম তুললে না ?

না, ও আমরা তুলি নে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। চলো এবার যাই।

আলো ফুটিয়াছে, কিন্তু গ্রামের একান্তে এই মঠ—এদিকে বড় কেহ আসে না। তখনো পথ ছিল জনহীন, এখনো তেমনি। চলিতে চলিতে একসময়ে আবার সেই প্রশ্নই করিলাম, তুমি কি এখান থেকে সত্যিই চলে যাবে ?

বার বার এ কথা জেনে তোমার কি হবে গোঁসাই ?

এবারেও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম সত্যিই কেন বার বার এ কথা জানিতে চাই —জানিয়া আমার লাভ কি।

* * *

মঠে ফিরিয়া দেখা গেল ইতিমধ্যে সবাই জাগিয়া উঠিয়া প্রাত্যহিক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। তখন কাঁসরের শব্দে ব্যস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে বৃথা তাড়া দিয়াছিলাম। অবগত হইলাম তাহা মঙ্গল-আরতির নয়, সে শুধু ঠাকুরদের ঘুম-ভাঙানোর বাদ্য। এ তাঁদেরই সয়।

দুজনকে অনেকেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহারও চাহনিতে কৌতূহল নাই। শুধু পদ্মার বয়স অত্যন্ত কম বলিয়া সে-ই কেবল

একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। ঠাকুরদের সে মালা গাঁথে। ডালাটা তাহারি কাছে রাখিয়া দিয়া কমললতা সস্নেহ-কৌতুকে তর্জ্জন করিয়া বলিল, হাসলি যে পোড়ারমুখী?

সে কিন্তু আর মুখ তুলিল না। কমললতা ঠাকুরঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, আমিও আমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

স্নানাহার যথারীতি এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। বিকালের গাড়ীতে আমার যাবার কথা। বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া দেখি সে ঠাকুরঘরে। ঠাকুর সাজাইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র কহিল, নতুনগোঁসাই, যদি এলে আমাকে একটু সাহায্য করো না ভাই। পদ্মা মাথাধরে শুয়ে আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'বোনেই হঠাৎ জ্বরে পড়েচে—কি যে হবে জানি নে। এই বাসন্তী-রঙের কাপড় দুখানি কুঁচিয়ে দাও না গোঁসাই।

অতএব, ঠাকুরের কাপড় কুঁচাইতে বসিয়া গেলাম, যাওয়া ঘটিল না। পরের দিনও না এবং তার পরের দিনও না। বৈষ্ণবীর প্রত্যূষের ফুল তুলিবার সঙ্গী আমি। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে একটা-না-একটা কিছু কাজ আমাকে দিয়া সে করাইয়া লয়। এমনি করিয়া দিনগুলো যেন স্বপ্নে কাটে। সেবায়, সহৃদয়তায়, আনন্দে, আরাধনায়, ফুলে, গন্ধে, কীর্ত্তনে, পাখীর গানে কোথাও আর ফাঁক নাই। অথচ সন্দিগ্ধ মন মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া ভর্ৎসনা করিয়া উঠে, এ কি ছেলেখেলা? বাহিরের সকল সংস্রব রুদ্ধ করিয়া গুটি-কয়েক নির্জ্জীব পুতুল লইয়া এ কি মাতামাতি? এত বড় আত্ম-প্রবঞ্চনায় মানুষ বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু তবু ভালো লাগে, যাই যাই করিয়াও পা বাড়াইতে পারি না। এদিকটায় ম্যালেরিয়া কম, তথাপি অনেকেই এই সময়টায় জ্বরে পড়িতেছিল। গহর একটি দিন মাত্র আসিয়াছিল, আর আসে নাই, তাহারও খোঁজ

লইবার সময় করিয়া উঠিতে পারি না—এ আমার হইয়াছে ভালো।

সহসা মনের ভিতরটা ভয় ও ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিল—এ আমি করিতেছি কি? সঙ্গদোষে এই সবই কি সত্য বলিয়া একদিন বিশ্বাসে দাঁড়াইবে নাকি? স্থির করিলাম, আর না—যা-ই কেন না ঘটুক, এ জায়গা ছাড়িয়া কাল আমাকে পলাইতেই হইবে।

প্রত্যহ রাত্রিশেষে বৈষ্ণবী আসিয়া আমাকে জাগায়। ভোরের সুরে বৈষ্ণব-কবিদের ঘুম ভাঙানোর গান। ভক্তি ও ভালবাসার সে কি সকরুণ আবেদন! হঠাৎ সাড়া দিই না, কান পাতিয়া শুনি। চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িতে চায়। মশারি তুলিয়া সে দোর জানালা খুলিয়া দেয়—রাগ করিয়া উঠিয়া বসি, এবং মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সঙ্গে চলি।

দিনকয়েকের অভ্যাসে আপনিই আজ ঘুম ভাঙিল। ঘর অন্ধকার। একবার মনে হইল রাত্রি এখনো পোহায় নাই, কিন্তু সন্দেহ জন্মিল। বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম—দেখি রাত কোথায়, সকাল হইয়াছে। কে একজন খবর দিতে কমললতা আসিয়া দাঁড়াইল; এমন অস্নাত, অপ্রস্তুত চেহারা তাহার পূর্ব্বে দেখি নাই।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমারো অসুখ নাকি?

সে ম্লান হাসিয়া কহিল, আজ তুমি জিতেছো গোঁসাই।

কিসে, বলো ত?

শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই, সময়ে উঠতে পারি নি।

আজ তবে ফুল তুলতে গেল কে?

উঠানের ধারে আধমরা একটা টগর গাছে সামান্য কয়েকটা ফুল ছিল তাহাই দেখাইয়া কহিল, এ বেলা যা ক'রে হোক ওতেই চলে যাবে।

কিন্তু ঠাকুরের গলার মালা?

মালা আজ তাঁদের পরাতে পারবো না।

শুনিয়া মন কেমন করিয়া উঠিল—সেই নির্জ্জীব পুতুলগুলার জন্যেই; বলিলাম, স্নান ক'রে তবে আমি তুলে এনে দিই?

তা যাও, কিন্তু এত ভোরে নাইতে পাবে না! অসুখ করবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোঁসাইজীকে দেখচি নে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তিনি ত এখানে নেই, পরশু নবদ্বীপে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে দেখতে।

কবে ফিরবেন?

সে ত জানি নে গোঁসাই।

এতদিন মঠে থাকিয়াও বৈরাগী দ্বারিকাদাসের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। কতকটা আমার নিজের দোষে, কতকটা তাঁহার নির্লিপ্ত স্বভাবের জন্য। বৈষ্ণবীর মুখে শুনিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়া জানিয়াছি ও লোকটির মধ্যে কপটতা নাই, অনাচার নাই, আর নাই মাষ্টারি করিবার ঝোঁক। বৈষ্ণব-ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার নির্জ্জন ঘরের মধ্যে কাটে। ইহার ধর্ম্মমতে আমার আস্থাও নাই, বিশ্বাসও নাই, কিন্তু এই মানুষটির কথাগুলি এমন নয়। চাহিবার ভঙ্গী এমন স্বচ্ছ ও গভীর, বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় অহর্নিশ এমন ভরপূর হইয়া আছেন যে, তাঁহার মত ও পথ লইয়া বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে শুধু সঙ্কোচ নয়, দুঃখ বোধ হয়। আপনিই বুঝা যায় এখানে তর্ক করিতে যাওয়া একেবারে নিষ্ফল। একদিন সামান্য একটুখানি যুক্তির অবতারণা করায় তিনি হাসিমুখে এমন নীরবে চাহিয়া রহিলেন যে কুণ্ঠায় আমার মুখেও আর কথা রহিল না। তারপর হইতে তাঁহাকে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছি। তবে, একটা কৌতূহল ছিল। এতগুলি নারী-পরিবৃত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন রসের অনুশীলনে নিমগ্ন রহিয়াও চিত্তের শান্তি ও দেহের

নির্ম্মলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলার রহস্য, ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব; কিন্তু সে সুযোগ এ যাত্রায় বোধ করি আর মিলিল না। মনে মনে বলিলাম, আবার যদি কখনো আসা হয় ত তখন দেখা যাইবে।

বৈষ্ণবের মঠেও বিগ্রহ-মূর্ত্তি সচরাচর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু এ আশ্রমে সে বিধি ছিল না। ঠাকুরের বৈষ্ণব-পূজারী একজন বাহিরে থাকে, সে আসিয়া যথারীতি আজও পূজা করিয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরের সেবার ভার আজ অনেকখানি আসিয়া পড়িল আমার 'পরে। বৈষ্ণবী দেখাইয়া দেয়, আমি করি সব, কিন্তু রহিয়া রহিয়া সমস্ত অন্তর তিক্ত হইয়া উঠে। এ কি পাগলামি আমাকে পাইয়া বসিতেছে! তথাপি, আজও যাওয়া বন্ধ রহিল। আপনাকে বোধ হয় এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, এতদিন এখানে আছি ও বিপদে ইহাদের ফেলিয়া যাইব কিরূপে? সংসারে কৃতজ্ঞতা বলিয়াও ত একটা কথা আছে!

আরও দুই দিন কাটিল, কিন্তু আর না। কমললতা সুস্থ হইয়াছে, পদ্মা ও লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোনেই সারিয়া উঠিয়াছে। দ্বারিকাদাস গত সন্ধ্যায় ফিরিয়াছেন, তাঁহার কাছে বিদায় লইতে গেলাম। গোঁসাইজী কহিলেন, আজ যাবে গোঁসাই? আবার কবে আসবে?

সে ত জানি নে গোঁসাই।

কমললতা কিন্তু কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবে।

আমাদের কথাটা ইহার কানেও গিয়াছে জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, সে কাঁদতে যাবে কিসের জন্যে?

গোঁসাইজী একটু হাসিয়া বলিলেন, তুমি জানো না বুঝি?

না।

ওর স্বভাবই এমনি। কেউ চলে গেলে ও যেন শোকে সারা হয়ে যায়।

কথাটা আরও খারাপ লাগিল, বলিলাম, যার স্বভাব শোক করা সে করবেই। আমি তাকে থামাবো কি দিয়ে? কিন্তু বলিয়াই তাঁহার চোখের পানে চাহিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমারই পিছনে দাঁড়াইয়া কমললতা।

দ্বারিকাদাস কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, ওর ওপর রাগ ক'রো না গোঁসাই, শুনেচি ওরা তোমার যত্ন করতে পারে নি, অসুখে পড়ে তোমাকে অনেক খাটিয়েছে, অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার কাছে কাল নিজেই বড় দুঃখ করছিলো। আর বোষ্টম-বৈরাগীর আদর যত্ন করবার কিই বা আছে! কিন্তু আবার যদি কখনো তোমার এদিকে আসা হয় ভিখিরীদের দেখা দিয়ে যেয়ো। দেবে ত গোঁসাই?

ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম, কমললতা সেইখানে তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল! বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে কত কি বলার, কত কি শোনার কল্পনা ছিল, সমস্ত নষ্ট করিয়া দিলাম। চিত্তের দুর্ব্বলতার গ্লানি অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু উত্ত্যক্ত অসহিষ্ণু মন এমন অশোভন রূঢ়তায় যে নিজের মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া বসিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

নবীন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গহরের খোঁজে আসিয়াছে। কাল হইতে এখনও সে গৃহে ফিরে নাই। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—সে কি নবীন, সে ত এখানেও আর আসে না।

নবীন বিশেষ বিচলিত হইল না, বলিল, তবে বোধ হয় কোন্ বনবাদাড়ে ঘুরচে—নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছে—এইবার কখন সাপে কামড়ানোর খবরটা পেলেই নিশ্চিন্দি হওয়া যায়।

তার সন্ধান করা ত দরকার, নবীন?

দরকার ত জানি, কিন্তু খুঁজবো কোথায়? বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নিজের প্রাণটা ত আর দিতে পারি নে বাবু; কিন্তু তিনি কোথায়? একবার জিজ্ঞেসা করে যেতে চাই যে?

তিনিটা কে?

ঐ যে কমলিলতা।

কিন্তু সে জানবে কি ক'রে, নবীন?

সে জানে না? সব জানে।

আর বিতর্ক না করিয়া উত্তেজিত নবীনকে মঠের বাহিরে লইয়া আসিলাম, বলিলাম, সত্যিই কমললতা কিছুই জানে না, নবীন। নিজে অসুখে পড়ে তিন-চার দিন সে আখড়ার বাইরেও যায় নি।

নবীন বিশ্বাস করিল না। রাগ করিয়া বলিল, জানে না? ও সব জানে। বোষ্টুমী কি মন্তর জানে—ও পারে না কি? কিন্তু পড়তো একবার নবনের পাল্লায়, ওর চোখ মুখ ঘুরিয়ে কেত্তন করা বার করে দিতুম। বাপের অতগুলো টাকা ছোঁড়া যেন ভেল্‌কিতে উড়িয়ে দিলে!

তাহাকে শান্ত করার জন্য কহিলাম, কমললতা টাকা নিয়ে কি করবে নবীন? বোষ্টমী মানুষ, মঠে থাকে, গান গেয়ে দুটো ভিক্ষে ক'রে ঠাকুরদেবতার সেবা করে, দুবেলা দুমুঠো খাওয়া বই ত নয়—ওকে টাকার কাঙাল বলে ত আমার বোধ হয় না নবীন।

নবীন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, ওর নিজের জন্যে নয়, তা আমরাও জানি। দেখলে যেন ভদ্দর ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। যেমনি চেহারা, তেমনি কথাবার্ত্তা, বড়বাবাজীটাও লোভী নয়, কিন্তু একপাল পুষ্যি রয়েছে যে। ঠাকুরসেবার নাম করে তাদের যে লুচি-মণ্ডা ঘি-দুধ নিত্যি চাই। নয়ন চক্কোত্তির মুখে কানাঘুষোয় শুনচি আখড়ার নামে বিশ বিঘে জমি নাকি খরিদ হয়ে গেছে।

কিছুই থাকবে না বাবু, যা আছে সব বৈরাগীদের পেটে গিয়েই একদিন ঢুকবে।

বলিলাম, হয়ত গুজোব, সত্যি নয়; কিন্তু সে-পক্ষে তোমাদের নয়ন চক্কোত্তিও ত কম নয়, নবীন!

নবীন সহজেই স্বীকার করিয়া কহিল, সে ঠিক। বিট্‌লে বামুন মস্ত ধড়িবাজ; কিন্তু বিশ্বেস না করি কি ক'রে বলুন। সেদিন খামোকা আমার ছেলেদের নামে দশ বিঘে জমি দানপত্তর করে দিলে। অনেক মানা করলুম, শুনলে না। বাপ বহুত রেখে গেছে মানি, কিন্তু বিলোলে ক'দিন বাবু? একদিন বললে কি জানেন? বললে, আমরা ফকিরের বংশ, ফকিরি আমার ত কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না? শুনুন কথা।

নবীন চলিয়া গেল। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, আমি কিসের জন্য যে এতদিন মঠে পড়িয়া আছি এ কথা সে জিজ্ঞাসাও করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেই যে কি বলিতাম জানি না, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পাইতাম। তাহার কাছেই আরও একটা খবর পাইলাম, কালিদাসবাবুর ছেলের ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সাতাশে তারিখটা আমার খেয়াল ছিল না।

নবীনের কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করিতে অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে একটা সন্দেহ জাগিল—বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়। সেই ভুরুওয়ালা কদাকার লোকটার কণ্ঠিবদল-করা স্বামিত্বের হাঙ্গামার ভয়ে কদাচ নয়—এ গহর। এখানে আমার থাকার সম্বন্ধে তাই বোধ করি বৈষ্ণবী সেদিন সকৌতুকে বলিয়াছিল, আমি ধরে রাখলে সে রাগ করবে না গোঁসাই। রাগ করবার লোক সে নয়, কিন্তু কেন সে আর আসে না? হয়ত বা নিজের মনে মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে। সংসারে

গহরের আসক্তি নাই, আপন বলিতেও কেহ নাই। টাকাকড়ি বিষয়-আশয় সে যেন বিলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে। ভালো যদি সে বাসিয়াও থাকে, মুখ ফুটিয়া কোনদিন হয়ত সে বলিবেও না কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চির-নিষিদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্মভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমললতা পলাইতে চায়। নবীন চলিয়া গিয়াছে, বকুলতলার সেই ভাঙা বেদিটার উপরে একলা বসিয়া ভাবিতেছি। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম পাঁচটার গাড়ী ধরিতে গেলে দেরী করা আর চলে না; কিন্তু প্রতিদিন না যাওয়াটাই এমনি অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল যে ব্যস্ত হইয়া উঠিব কি আজও মন পিছু হটিতে লাগিল।

যেখানেই থাকি পুঁটুর বৌভাতে অন্ন গ্রহণ করিয়া যাইব কথা দিয়াছিলাম। নিরুদ্দিষ্ট গহরের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্ত্তব্য। এতদিন অনাবশ্যক অনুরোধ অনেক মানিয়াছি, কিন্তু আজ সত্যকার কারণ যখন বিদ্যমান তখন মানা করিবার কেহ নাই। দেখি পদ্মা আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, তোমাকে দিদি একবার ডাকচে গোঁসাই।

আবার ফিরিয়া আসিলাম। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবী কহিল, কলকাতার বাসায় পৌঁছতে তোমার রাত হবে, নতুনগোঁসাই। ঠাকুরের প্রসাদ দুটি সাজিয়ে রেখেচি, ঘরে এসো।

প্রত্যহের মতোই সযত্ন আয়োজন। বসিয়া গেলাম। এখানে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করার প্রথা নাই, আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইতে হয়, উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখা চলে না।

যাবার সময়ে বৈষ্ণবী কহিল, নতুনগোঁসাই, আবার আসবে ত?

তুমি থাকবে ত?

তুমি বলো কতদিন আমাকে থাকতে হবে?

তুমিও বলো কতদিনে আমাকে আসতে হবে ?

না, সে তোমাকে আমি বলবো না।

না বলো অন্য একটা কথার জবাব দেবে, বলো ?

এবার বৈষ্ণবী একটুখানি হাসিয়া কহিল, না, সেও তোমাকে আমি বলবো না। তোমার যা ইচ্ছে হয় ভাবো গে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।

অনেকবার মুখে আসিয়া পড়িতে চাহিল—আজ আর সময় নেই কমললতা, কাল যাবো—কিন্তু কিছুতেই এ কথা বলা হ'ল না!

চললাম।

পদ্মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কমললতার দেখাদেখি সেও হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। বৈষ্ণবী তাহাতে রাগ করিয়া বলিল, হাত তুলে নমস্কার কিরে পোড়ারমুখী, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম কর্।

কথাটায় যেন চমক লাগিল। তাহার মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখিলাম সে তখন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। আর কোন কথা না বলিয়া তাহাদের আশ্রম ছাড়িয়া তখন বাহির হইয়া আসিলাম।

নয়

আজ অবেলায় কলিকাতার বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তারপরে এর চেয়েও দুঃখময় বর্ম্মায় নির্ব্বাসন। ফিরিয়া আসিবার হয়ত আর সময়ও হইবে না, প্রয়োজনও ঘটিবে না। হয়ত এই যাওয়াই শেষের যাওয়া। গণিয়া দেখিলাম আজ দশদিন। দশটা দিন জীবনের কতটুকুই বা। তথাপি মনের মধ্যে

সন্দেহ নাই, দশদিন পূর্ব্বে যে-আমি এখানে আসিয়াছিলাম এবং যে-আমি বিদায় লইয়া আজ চলিয়াছি, তাহারা এক নয়।

অনেককেই সখেদে বলিতে শুনিয়াছি, অমুক যে এমন হইতে পারে তাহা কে ভাবিয়াছে। অর্থাৎ অমুকের জীবনটা যেন সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের মতো তাহার অনুমানের পাঁজিতে লেখা নির্ভুল হিসাবে! গরমিলটা শুধু অভাবিত নয়, অন্যায়। যেন তাহার বুদ্ধির আঁক-কষার বাহিরে দুনিয়ার সার কিছু নাই। জানেও না সংসারে কেবল বিভিন্ন মানুষই আছে তাই নয়; একটা মানুষই যে কত বিভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয় তাহার নির্দ্দেশ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। এখানে একটা নিমেষও তীক্ষ্ণতায়, তীব্রতায় সমস্ত জীবনকেও অতিক্রম করিতে পারে।

সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বনবাদাড়ের মধ্য দিয়া এ-পথ ও-পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ষ্টেশনে চলিয়াছিলাম, অনেকটা ছেলেবেলায় পাঠশালে যাইবার মতো! ট্রেনের সময় জানি না, তাগিদও নাই—শুধু জানি ওখানে পৌঁছিলে যখন হোক গাড়ী একটা জুটিবেই। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে মনে হইল সব পথগুলাই যেন চেনা। যেন কতদিন এ পথে কতবার আনাগোনা করিয়াছি। শুধু আগে ছিল সেগুলা বড়, এখন কি করিয়া যেন সঙ্কীর্ণ এবং ছোট্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ঐ না খাঁয়েদের গলায়-দড়ের বাগান? তাইত বটে। এ যে আমাদেরই গ্রামের দক্ষিণপাড়ার শেষপ্রান্ত দিয়া চলিয়াছি। সে নাকি কবে শূলের ব্যথায় ঐ তেঁতুল গাছের উপরের ডালে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মতো এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলায় চোখে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত, এবং চোখ বুজিয়া সবাই একদৌড়ে স্থানটা পার হইয়া যাইতাম।

গাছটা তেমনই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মতো, মাথা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব্ব করিবার কিছু নাই, আরও পাঁচটা তেঁতুল গাছ যেমন হয় সেও তেমনি। জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহুবর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মতো চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছো? ভয় করে না ত?

কাছে গিয়া পরম স্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়।

সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল, বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল! চললাম বন্ধু।

সারি সারি অনেকগুলা বাগানের পরে একটুখানি খোলা জায়গা, অন্যমনে হয়ত একটু পার হইয়া আসিতাম, কিন্তু সহসা বহুদিনের বিস্মৃত-প্রায় পরিচিত ভারী একটি মিষ্ট গন্ধে চমক লাগিল—এদিক ওদিক চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল—বাঃ! এ যে আমাদের সেই যশোদা বৈষ্ণবীর আউশ ফুলের গন্ধ। ছেলেবেলায় ইহার জন্য যশোদার কত উমেদারিই না করিয়াছি। এ জাতীয় গাছ এদিকে মিলে না, কি জানি সে কোথা হইতে আনিয়া তাহার আঙ্গিনার একধারে পুঁতিয়াছিল। ট্যারা-বাঁকা গাঁটেভরা বুড়ো-মানুষের মতো তাহার চেহারা—সেদিনের মতো আজও তাহার সেই একটিমাত্র সজীব শাখা এবং ঊর্দ্ধে গুটিকয়েক সবুজ পাতার মধ্যে তেমনি গুটিকয়েক সাদা সাদা ফুল। ইহার নীচে ছিল যশোদার স্বামীর সমাধি। বোষ্টমঠাকুরকে আমরা দেখি নাই, আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি গোলোকে রওনা হইয়াছিলেন। তাহারই ছোট্ট মনোহারী দোকানটি তখন বিধবা চালাইত। দোকান ত নয়,

একটি ডালায় ভরিয়া যশোদা মালা-ঘুন্‌সি, আর্শি-চিরুণী, আলতা, তেলের মশলা, কাঁচের পুতুল, টিনের বাঁশী প্রভৃতি লইয়া দুপুরবেলায় বাড়ী বাড়ী বিক্রী করিত। আর ছিল তাহার মাছ ধরিবার সাজ-সরঞ্জাম। বড়ো ব্যাপার নয়, দু-এক পয়সা মূল্যের ডোর-কাঁটা। এই কিনিতে যখন তখন তাহার ঘরে গিয়া আমরা উৎপাত করিতাম। এই আউশ গাছের একটা শুকনো ডালের উপর কাদা দিয়া জায়গা করিয়া যশোদা সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিত। ফুলের জন্য আমরা উপদ্রব করিলে সে সমাধিটি দেখাইয়া বলিত, না বাবাঠাকুর, ও আমার দেবতার ফুল, তুললে তিনি রাগ করেন।

বৈষ্ণবী নাই, সে কবে মরিয়াছে জানি না—হয়ত, খুব বেশিদিন নয়। চোখে পড়িল গাছের একধারে আর একটি ছোট মাটির টিপি, বোধ হয় যশোদারই হইবে। খুব সম্ভব, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ স্বামীর পাশেই সে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। স্তূপের খোঁড়া মাটি অধিকতর উর্ব্বর হইয়া বিছুটি ও বনচাঁড়ালের গাছে গাছে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—যত্ন করিবার কেহ নাই।

পথ ছাড়িয়া সেই শৈশবের পরিচিত বুড়ো গাছটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, সন্ধ্যা দেওয়া সেই দীপটি আছে নীচে পড়িয়া, এবং তাহারি উপরে সেই শুকনো ডালটি আছে আজও তেমনি তেলে তেলে কালো হইয়া।

যশোদার ছোট্ট ঘরটি এখনো সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয় নাই—সহস্র ছিদ্রময় শতজীর্ণ খড়ের চালখানি দ্বার ঢাকিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আজও প্রাণপণে আগলাইয়া আছে।

কুড়ি-পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বের কত কথাই কনে পড়িল। কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান, আর সেই ছোট ঘরখানি। সে আজ এই হইয়াছে; কিন্তু এর চেয়েও ঢের বড় করুণ বস্তু তখনও দেখার বাকি ছিল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল সেই ঘরের মধ্য হইতে ভাঙা চালের নীচে দিয়া গুঁড়ি মারিয়া একটা কঙ্কালসার

কুকুর বাহির হইয়া আসিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোধ করি অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে চায়; কিন্তু কণ্ঠ এত ক্ষীণ যে, সে তাহার মুখেই বাধিয়া রহিল।

বলিলাম, কি রে, কোন অপরাধ করি নি ত?

সে আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া জানি না এবার ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু মলিন চোখ দুটো মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মতো আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে যশোদার কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুলকাটা রাঙা পাড়ের সেলাই করা বগ্‌লস এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটীরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় ঢুকিয়া কাড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিক্ষাও এ পায় নাই—অনশনে অর্দ্ধাশনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হয়ত ভাবে, কোথাও না কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এই কি এমনি? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?

যাইবার পূর্ব্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটায় একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম। অন্ধকারে দেখা কিছুই গেল না, শুধু চোখে পড়িল দেয়ালে সাঁটা পটগুলি। রাজা রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা জাতীয় দেবদেবতার প্রতিমূর্ত্তি নূতন কাপড়ের গাঁট হইতে সংগ্রহ করিয়া যশোদা ছবির সখ মিটাইত। মনে পড়িল ছেলেবেলায় মুগ্ধ চক্ষে এগুলি বহুবার দেখিয়াছি। বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া, দেওয়ালের কাদা মাখিয়া এগুলি আজও কোনমতে টিকিয়া আছে।

আর রহিয়াছে পাশের কুলুঙ্গিতে তেমনি দুর্দ্দশায় পড়িয়া সেই রঙ-করা হাঁড়িটি। এর মধ্যে থাকিত তাহার আলতার বাণ্ডিল, দেখামাত্রই সে কথা আমার মনে পড়িল। আরও কি কি যেন এদিকে ওদিকে পড়িয়া আছে অন্ধকারে ঠাহর হইল না। তাহারা সবাই মিলিয়া আমাকে প্রাণপণে কিসের যেন ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু সে-ভাষা আমার অজানা। মনে হইল, বাড়ীর এক কোণে এ যেন মৃত-শিশুর পরিত্যক্ত খেলাঘর। গৃহস্থালির নানা ভাঙাচোরা জিনিষ দিয়া সযত্নে রচিত তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে সে ফেলিয়া গিয়াছে। আজ তাহাদের আদর নাই, প্রয়োজন নাই, আঁচল দিয়া বার বার ঝাড়া-মোছা করিবার তাগিদ গিয়াছে ফুরাইয়া—পড়িয়া আছে শুধু কেবল জঞ্জালগুলা কেহ মুক্ত করে নাই বলিয়া।

সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থামিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম সে-বেচারা এইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে, তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্ বন্ধুহীন, লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙা ঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হঠাৎ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না এমনি দশা।

চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম কেন এমন হয়? আর কোন একটা দিনে এসব দেখিয়া হয়ত বিশেষ কিছু মনে হইত না, কিন্তু আজ আপন অন্তরাকাশই নাকি মেঘের ভারে ভারাতুর, তাই ওদের দুঃখের হাওয়ায় তাহারা অজস্র ধারায় ফাটিয়া পড়িতে চায়!

ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তখনি গাড়ী মিলিল। কলিকাতার বাসায় পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবে না। টিকিট কিনিয়া উঠিয়া বসিলাম, বাঁশী বাজাইয়া সে যাত্রা সুরু করিল। ষ্টেশনের প্রতি তাহার মোহ নাই, সজল চক্ষে বার বার ফিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন হয় না।

আবার সেই কথাটাই মনে পড়িল—দশটা দিন মানুষের জীবনে কতটুকু, অথচ কতই না বড়!

কাল প্রভাতে কমললতা একলা যাইবে ফুল তুলিতে। তারপরে চলিবে তাহার সারাদিনের ঠাকুরসেবা। কি জানি, দিন-দশকের সাথী নতুনগোঁসাইকে ভুলিতে তাহার ক'টা দিন লাগিবে।

সেদিন সে বলিয়াছিল, সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছি, দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

তাই হোক। তাই যেন হয়।

ছেলেবেলা হইতে নিজের জীবনের কোন লক্ষ্যও নাই, জোর করিয়া কোনো কিছু কামনা করিতেও জানি না—সুখ-দুঃখের ধারণাও আমার স্বতন্ত্র। তথাপি, এতটা কাল কাটিল শুধু পরের দেখাদেখি, পরের বিশ্বাসে ও পরের হুকুম তামিল করিতে। তাই কোন কাজই আমাকে দিয়া সুনির্ব্বাহিত হয় না। দ্বিধায় দুর্ব্বল সকল সঙ্কল্প, সকল উদ্যমই আমার অনতিদূরে ঠোকর খাইয়া পথের মধ্যে ভাঙিয়া পড়ে। সবাই বলে অলস, সবাই বলে অকেজো। তাই বোধ করি ওই অকেজো বৈরাগীদের আখড়াতেই আমার অন্তরবাসী অপরিচিত বন্ধু অস্ফুট ছায়ারূপে আমাকে দেখা দিয়া গেলেন। বার বার রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলাম, বার বার স্মিতহাস্যে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।

আর ঐ বৈষ্ণবী কমললতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল

আছে, ভাষার ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্ত্তনের সুর—মর্ম্মে যাহার পশে সে-ই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই—কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

আমাকে বলিয়াছিল, চলো না গোঁসাই এখান থেকে যাই, গান গেয়ে পথে পথে দুজনের দিন কেটে যাবে।

বলিতে তাহার বাধে নাই কিন্তু আমার বাধিল। আমার নাম দিল সে নতুনগোঁসাই। বলিল, ও নামটা আমাকে যে মুখে আনতে নেই গোঁসাই। তাহার বিশ্বাস আমি তাহার গত জীবনের বন্ধু। আমাকে তাহার ভয় নাই, আমার কাছে সাধনায় তাহার বিঘ্ন ঘটিবে না। বৈরাগী দ্বারিকাদাসের শিষ্যা সে, কি জানি কোন্ সাধনায় সিদ্ধিলাভের মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়িল—মনে পড়িল তাহার সেই চিঠি। স্নেহে ও স্বার্থে মিশামিশি সেই কঠিন লিপি। তবুও জানি এ জীবনের পূর্ণচ্ছেদে সে আমার শেষ হইয়াছে। হয়ত এ ভালোই হইয়াছে কিন্তু সে শূন্যতা ভরিয়া দিতে কি কোথায় কেহ আছে? জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একে একে কত কথা কত ঘটনাই স্মরণ হইল। শিকারের আয়োজনে কুমার সাহেবের সেই তাঁবু, সেই দলবল, বহুবর্ষ পরে প্রবাসে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন দীপ্ত কালো চোখে তাহার সে কি বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি! যে মরিয়াছে বলিয়া জানিতাম তাহাকে চিনিতে পারি নাই—সেদিন শ্মশান-পথে তাহার সে কি ব্যগ্র-ব্যাকুল মিনতি! শেষে ক্রুদ্ধ হতাশ্বাসে কি তীব্র অভিমান! পথরোধ করিয়া কহিল, যাবে বললেই তোমাকে যেতে দেবো

নাকি? কই যাও ত দেখি! এই বিদেশে বিপদ ঘটলে দেখবে কে? ওরা না আমি? এবার তাহাকে চিনিলাম। এই জোরেই তাহার চিরদিনের সত্য পরিচয়। জীবনে এ আর তাহার ঘুচিল না—এ হইতে কখনো কেহ তাহার কাছে অব্যাহতি পাইল না।

আবার পথের প্রান্তে মরিতে বসিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম শিয়রে বসিয়া সে। তখন সকল চিন্তা সঁপিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইলাম। সে ভার তাহার, আমার নয়।

দেশের বাড়ীতে আসিয়া জ্বরে পড়িলাম, এখানে সে আসিতে পারে না—এখানে সে মৃত—এর বাড়া লজ্জা তাহার নাই, তথাপি যাহাকে কাছে পাইলাম সে ওই রাজলক্ষ্মী।

চিঠিতে লিখিয়াছে—তখন তোমাকে দেখিবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরিব শুধু চাকরের মুখে খবর লইয়া? তারপরেও বাঁচিতে বলো নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব দিই নাই। জানি না বলিয়া নয়—সাহস হয় নাই।

মনে মনে বলিলাম, শুধু কি রূপে? সংযমে, শাসনে, সুকঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণে এই প্রখর বুদ্ধিশালিনীর কাছে ঐ স্নিগ্ধ সুকোমল আশ্রমবাসিনী কমললতা কতটুকু? কিন্তু ওই এতটুকুর মধ্যেই এবার যেন আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে মর্য্যাদা, আছে আমার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ! ও কখনো আমার সকল চিন্তা, সকল ভালোমন্দ আপন হাতে লইয়া রাজলক্ষ্মীর মতো আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না।

ভাবিতেছিলাম কি করিব বিদেশে গিয়া। কি হইবে আমার চাকরীতে? নূতন ত নয়—সেদিনেই বা কি এমন পাইয়াছিলাম যাহাকে ফিরিয়া পাইতে আজ লোভ করিতে হইবে? কেবল কমললতাই ত বলে নাই, দ্বারিকাগোঁসাইও একান্ত সমাদরে আহ্বান

করিয়াছিল আশ্রমে থাকিতে। সে কি সমস্তই বঞ্চনা, মানুষকে ঠকানো ছাড়া কি এ আমন্ত্রণে কোন সত্যই নাই? এতকাল জীবনটা কাটিল যে ভাবে, এই কি ইহার শেষ কথা? কিছুই জানিতে বাকি নাই, সব জানাই কি আমার সমাপ্ত হইয়াছে? চিরদিন ইহাকে শুধু অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষাই করিয়াছি, বলিয়াছি সব ভুয়া, সব ভুল, কিন্তু কেবলমাত্র অবিশ্বাস ও উপহাসকেই মূলধন করিয়া সংসারে বৃহৎ বস্তু কে কবে লাভ করিয়াছে?

গাড়ী আসিয়া হাবড়া ষ্টেশনে থামিল। স্থির করিলাম রাত্রিটা বাসায় থাকিয়া জিনিষপত্র যা-কিছু আছে, দেনা-পাওয়া যা-কিছু বাকি সমস্তই চুকাইয়া দিয়া কালই আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। রহিল আমার চাকরী, রহিল আমার বর্ম্মা যাওয়া।

বাসায় পৌঁছিলাম—রাত্রি তখন দশটা। আহারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া লইতেছিলাম, পিছনে সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক আসিল, বাবু এলেন?

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিলাম—রতন কখন এলি রে?

এসেছি সন্ধ্যাবেলায়। বারান্দায় তোফা হাওয়া—আলিস্যিতে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বেশ করেছিলে? খাওয়া হয় নি ত?

আজ্ঞে না।

তবেই দেখচি মুস্কিলে ফেললি রতন।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার?

স্বীকার করিতে হইল, আমারও হয় নাই।

রতন খুসি হইয়া কহিল, তবে ত ভালই হয়েছে। আপনার প্রসাদ পেয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারবো।

মনে মনে বলিলাম, ব্যাটা নাপ্‌তে বিনয়ের অবতার। কিছুতেই অপ্রতিভ হয় না। মুখে বলিলাম, তা হলে কাছাকাছি কোন দোকানে খুঁজে ছাখ যদি প্রসাদের জোগাড় করে আনতে পারিস; কিন্তু শুভাগমন হলো কিসের জন্যে? আবার চিঠি আছে নাকি?

রতন কহিল, আজ্ঞে না। চিঠি লেখালিখিতে অনেক ভজকটো। যা বলবার তিনি মুখেই বলবেন।

তার মানে? আবার আমাকে যেতে হবে নাকি?

আজ্ঞে, না! মা নিজেই এসেছেন।

শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই রাত্রে কোথায় রাখি, কি বন্দোবস্ত করি ভাবিয়া পাইলাম না; কিন্তু কিছু ত একটা করা চাই, জিজ্ঞাসা করিলাম, এসে পর্য্যন্ত কি ঘোড়ার গাড়ীতেই বসে আছেন নাকি?

রতন হাসিয়া কহিল, মা সেই মানুষই বটে! না বাবু, আমরা চারদিন হলো এসেছি—এই চারটে দিনই আপনাকে দিনরাত পাহারা দিচ্ছি! চলুন।

কোথায়? কতদূরে?

দূরে একটু বটে, কিন্তু আমার গাড়ী ভাড়া করা আছে, কষ্ট হবে না।

অতএব, আর একদফা জামাকাপড় পরিয়া দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিতে হইল। শ্যামবাজারে কোন্ একটা গলির মধ্যে একখানি দোতলা বাড়ী, সুমুখে প্রাচীর-ঘেরা একটুখানি ফুলের বাগান; রাজলক্ষ্মীর বুড়া দরওয়ান দ্বার খুলিয়াই আমাকে দেখিতে পাইল; তাহার আনন্দের সীমা নাই—ঘাড় নাড়িয়া মস্ত নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবুজি?

বলিলাম, হাঁ তুলসীদাস, ভালো আছি। তুমি ভালো আছো?

প্রত্যুত্তরে সে তেমনি আর একটা নমস্কার করিল। তুলসী মুঙ্গের জেলার লোক, জাতিকে কুর্ম্মী, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাকে সে বরাবর বাঙলা রীতিতে পা ছুঁইয়া প্রণাম করে।

আর একজন হিন্দুস্থানী চাকর আমাদের শব্দসাড়ায় বোধ করি সেই মাত্র ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে, রতনের প্রচণ্ড তাড়ায় সে বেচারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। অকারণে অপরকে ধমক দিয়া রতন এ বাড়ীতে আপন মর্য্যাদা বহাল রাখে। বলিল, এসে পর্য্যন্ত কেবল ঘুম মারচো আর রুটি সাঁটচো বাবা, তামাকটুকু পর্য্যন্ত সেজে রাখতে পারো নি? যাও জলদি—

এ লোকটি নূতন, ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া একখানি বড় ঘর—গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে ফুলকাটা জাজিম ও গোটা-দুই তাকিয়া। কাছেই আমার বহু ব্যবহৃত, অত্যন্ত প্রিয় গুড়গুড়িটি এবং ইহারই অদূরে সযত্নে রাখা আমার জরির কাজ-করা মখমলের চটি। এটি রাজলক্ষ্মীর নিজের হাতে বোনা, পরিহাসচ্ছলে আমার একটা জন্মদিনে সে উপহার দিয়াছিল। পাশের ঘরটিও খোলা, এ ঘরেও কেহ নাই। খোলা দরজার ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম একধারে নূতন কেনা খাটের উপরে বিছানা পাতা। আর একধারে তেমনি নূতন আলনায় সাজানো শুধু আমারই কাপড়জামা। গঙ্গামাটিতে যাইবার পূর্ব্বে এগুলি তৈরি হইয়াছিল। মনেও ছিল না, কখনো ব্যবহারেও লাগে নাই।

রতন ডাকিল, মা।

যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া রাজলক্ষ্মী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, রতন, তামাক নিয়ে আয় বাবা। তোকেও এ ক'দিন অনেক কষ্ট দিলুম।

কষ্ট কিছুই নয় মা। সুস্থ দেহে ওঁকে যে বাড়ী ফিরিয়ে

আনতে পেরেছি এই আমার ঢের। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীকে নূতন চোখে দেখিলাম। দেহে রূপ ধরে না। সেদিনের পিয়ারীকে মনে পড়িল, শুধু কয়েকটা বছরের দুঃখ-শোকের ঝড়-জলে স্নান করিয়া যেন সে নব-কলেবর ধরিয়া আসিয়াছে। এই দিন-চারেকের নূতন বাড়ীটার বিলি-ব্যবস্থায় বিস্মিত হই নাই, কারণ তাহার একটা বেলার গাছতলার বাসাও সুশৃঙ্খলায় সুন্দর হইয়া উঠে; কিন্তু রাজলক্ষ্মী আপনাকে আপনি যেন এই ক'দিনেই ভাঙিয়া গড়িয়াছে। আগে সে অনেক গহনা পরিত, মাঝখানে—সমস্ত খুলিয়া ফেলিল—যেন সন্ন্যাসিনী। আজ আবার পরিয়াছে—গোটা কয়েকমাত্র—কিন্তু দেখিয়া মনে হইল সেগুলা অতিশয় মূল্যবান। অথচ পরনের কাপড়খানা দামী নয়—সাধারণ মিলের শাড়ী—আটপৌরে, ঘরে পরিবার। মাথার আঁচলের পাড়ের নীচে দিয়া ছোট চুল গালের আশেপাশে ঝুলিতেছে, ছোট বলিয়াই বোধ হয় তাহারা শাসন মানে নাই। দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি অতো দেখচো?

দেখচি তোমাকে।

নতুন নাকি?

তাইত মনে হচ্চে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

না।

মনে হচ্ছে রতন তামাক নিয়ে আসবার আগে আমার হাত দুটো তোমার গলায় জড়িয়ে দিই। দিলে কি করবে বলো ত? বলিয়াই হাসিয়া উঠিল, কহিল, ছুঁড়ে ফেলে দেবে না ত?

আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, দিয়েই দেখো না। কিন্তু, এত হাসি—সিদ্ধি খেয়েচো নাকি?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বুদ্ধিমান রতন একটু জোর

করিয়াই পা ফেলিয়া উঠিতেছিল। রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, রতন আগে যাক, তারপরে তোমাকে দেখাচ্চি সিদ্ধি খেয়েচি কি আর কিছু খেয়েচি।···কিন্তু—বলিতে বলিতেই তাহার গলা হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, এই অজানা জায়গায় চার-পাঁচদিন আমাকে একলা ফেলে রেখে তুমি পুঁটুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলে? জানো, রাতদিন আমার কি ক'রে কেটেচে?

হঠাৎ তুমি আসবে আমি জানবো কি ক'রে?

হাঁ গো হাঁ, হঠাৎ বইকি! তুমি সব জানতে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যেই চলে গিয়েছিলে।

রতন আসিয়া তামাক দিল, বলিল, কথা আছে মা, বাবুর প্রসাদ পাবো। ঠাকুরকে খাবার আনতে বলে দেবো? রাত বারোটা হয়ে গেল।

বারোটা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ঠাকুর পারবে না বাবা, আমি নিজে যাচ্ছি। তুই আমার শোবার ঘরে একটা জায়গা ক'রে দে।

খাইতে বসিয়া আমার গঙ্গামাটির শেষের দিনগুলার কথা মনে পড়িল। তখন এই ঠাকুর ও এই রতনই আমার খাবার তত্ত্বাবধান করিত। তখন রাজলক্ষ্মীর খোঁজ লইবার সময় হইত না। আজ কিন্তু ইহাদের দিয়া চলিবে না—রান্নাঘরে তাহার নিজের যাওয়া চাই; কিন্তু এইটাই তাহার স্বভাব, ওটা ছিল বিকৃতি। বুঝিলাম, কারণ যাহাই হোক, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

খাওয়া সাঙ্গ হইলে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটুর বিয়ে কেমন হলো?

বলিলাম, চোখে দেখি নি, কানে শুনেচি ভালোই হয়েছে।

চোখে দেখ নি? এতদিন তবে ছিলে কোথায়?

বিবাহের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া সে ক্ষণকাল গালে হাত দিয়া থাকিয়া কহিল, অবাক্ করলে। আসবার আগে পুঁটুকে কিছু একটা যৌতুক দিয়েও এলে না?

সে আমার হয়ে তুমি দিও।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমার হয়ে কেন, নিজের হয়েই মেয়েটাকে কিছু পাঠিয়ে দেবো; কিন্তু ছিলে কোথায় বললে না?

বলিলাম, মুরারিপুরে বাবাজীদের আখড়ার কথা মনে আছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আছে বইকি। বোষ্টুমীরা ওখান থেকেই ত পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসতো। ছেলেবেলার কথা আমার খুব মনে আছে।

সেইখানেই ছিলাম।

শুনিয়া যেন রাজলক্ষ্মীর গায়ে কাঁটা দিল—বোষ্টমদের আখড়ার? মা গো মা—বল কি গো? তাদের যে শুনেছি সব ভয়ঙ্কর ইল্লুতে কাণ্ড! কিন্তু বলিয়াই সহসা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল। শেষে মুখে আঁচল চাপিয়া কহিল, তা তোমার অসাধ্যি কাজ নেই। আরায় যে মূর্ত্তি দেখেচি! মাথায় জট পাকানো, গা-ময় রুদ্রাক্ষির মালা, হাতে পেতলের বালা—সে অপরূপ—

কথা শেষ করিতে পারিল না, হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। রাগ করিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলাম। অবশেষে বিষম খাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া অনেক কষ্টে হাসি থামিলে বলিল, বোষ্টুমীরা কি বললে তোমায়? নাক-খাঁদা উল্কি-পরা অনেকগুলো সেখানে থাকে যে গো—

আর একটা তেমনি প্রবল হাসির ঝোঁক আসিতেছিল, সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলাম, এবার হাসলে ভয়ানক শাস্তি দেবো। কাল চাকরদের সামনে মুখ বার করতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে সরিয়া বসিল, মুখে বলিল, সে তোমার মতো

বীরপুরুষের কাজ নয়। নিজেই লজ্জায় বেরুতে পারবে না। সংসারে তোমার মতো ভীতু মানুষ আর আছে নাকি?

বলিলাম, কিছুই জানো না লক্ষ্মী। তুমি অবজ্ঞা করলে, ভীতু বললে, কিন্তু সেখানে একজন বৈষ্ণবী বলতো আমাকে অহঙ্কারী—দাম্ভিক!

কেন, তার কি করেছিলে?

কিছুই না। সে আমার নাম নিয়েছিল নতুনগোঁসাই। বলতো, গোঁসাই, তোমায় মতো উদাসীন বৈরাগী-মনের চেয়ে দাম্ভিক মন পৃথিবীতে আর ছুটি নেই।

রাজলক্ষ্মীর হাসি থামিল, কহিল, কি বললে সে?

বললে, এ রকম উদাসীন, বৈরাগী-মনের মানুষের চেয়ে দাম্ভিক ব্যক্তি দুনিয়ায় আর খুঁজে মেলে না। অর্থাৎ কিনা আমি দুর্দ্ধর্ষ বীর। ভীতু মোটেই নই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হইল। পরিহাসে কানও দিল না, কহিল, তোমার উদাসী মনের খবর সে মাগী পেলে কি করে?

বলিলাম, বৈষ্ণবীদের প্রতি ওরূপ অশিষ্ট ভাষা অতিশয় আপত্তিকর।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা জানি; কিন্তু তিনি তোমার নাম দিলেন নতুনগোঁসাই—তাঁর নামটি কি?

কমললতা। কেউ কেউ রাগ করে কম্‌লিলতাও বলে। বলে, ও যাদু জানে। বলে, ওর কীর্ত্তন-গানে মানুষ পাগল হয়। সে যা চায় তাই দেয়।

তুমি শুনেচো?

শুনেচি। চমৎকার।

ওর বয়েস কতো?

বোধ হয় তোমার মতোই হবে। একটু বেশি হতেও পারে।

দেখতে কেমন?

ভালো। অন্ততঃ, মন্দ বলা চলে না। নাক-খাঁদা, উল্কি-পরা যাদের তুমি দেখেচো তাদের দলের নয়। এ ভদ্রঘরের মেয়ে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ওর কথা শুনেই বুঝেচি। যে-ক'দিন ছিলে তোমাকে যত্ন করত ত?

বলিলাম, হাঁ। আমার কোন নালিশ নেই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তা করুক। যে সাধ্যিসাধনায় তোমাকে পেতে হয় তাতে ভগবান মেলে। সে বোষ্টম-বৈরাগীর কাজ নয়। আমি ভয় করতে যাবো কোথাকার কে এক কমললতাকে? ছি! এই বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়াও একটা বড় নিঃশ্বাস পড়িল। বোধ হয় একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই শব্দে হুঁস হইল। মোটা তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া চিৎ হইয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। উপরে কোথায় একটা ছোট মাকড়সা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাল বুনিতেছিল, উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় ছায়াটা তার মস্ত বড় বীভৎস জন্তুর মতো কড়িকাঠের গায়ে দেখাইতে লাগিল। আলোকের ব্যবধানে ছায়াটাও কত গুণেই না কায়াটাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়া আমারই বালিশের এককোণে কনুয়ের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিলাম তাঁহার কপালের চুলগুলা ভিজা। বোধ হয় একমাত্র চোখে-মুখে জল দিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, লক্ষ্মী, হঠাৎ এ রকম কলকাতায় চলে এলে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, হঠাৎ মোটেই নয়। সেদিন থেকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই এমন মন কেমন করতে লাগলো যে কিছুতেই টিকতে পারলুম না, ভয় হলো বুঝি হার্টফেল করবে—এ জন্মে আর চোখে দেখতে পাবো না, এই বলিয়া সে গুড়গুড়ির নলটা আমার মুখ

হইতে সরাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল, বলিল, একটু থামো। ধুঁয়োর জ্বালায় মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাই নে এমনি অন্ধকার করে তুলেচো!

গুড়গুড়ির নল গেলো কিন্তু পরিবর্ত্তে তাহার হাতটা রহিল আমার মুঠোর মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বঙ্কু আজকাল কি বলে?

রাজলক্ষ্মী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, বৌমারা ঘরে এলে সব ছেলেই যা বলে তাই।

তার বেশী কিছু নয়?

কিছু নয় তা বলি নে, কিন্তু ও আমাকে কি দুঃখ দেবে? দুঃখ দিতে পারো শুধু তুমি। তোমরা ছাড়া সত্যিকার দুঃখ মেয়েদের আর কেউ দিতে পারে না।

কিন্তু আমি কি দুঃখ তোমাকে কখনো দিয়েচি, লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী অনাবশ্যক আমার কপালটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া দিয়া বলিল, কখনো না। বরঞ্চ আমিই তোমাকে আজ পর্য্যন্ত কত দুঃখই না দিলুম। নিজের সুখের জন্য তোমাকে লোকের চোখে হেয় করলুম, খেয়ালের ওপর তোমায় অসম্মান হতে দিলুম—তার শাস্তি এখন তাই দুকূল ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে! দেখতে পাচ্ছো ত?

হাসিয়া বলিলাম, কই না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা হ'লে মন্তর পড়ে কেউ দুচোখে তোমার ঠুলি পরিয়ে দিয়েচে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এত পাপ করেও সংসারে এত ভাগ্য আমার মতো কারো কখনো দেখেচো? কিন্তু আমার তাতেও আশা মিটলো না, কোথা থেকে এসে জুটলো ধর্ম্মের বাতিক, আমার হাতের লক্ষ্মীকে আমি পা দিয়ে ঠেলে দিলুম। গঙ্গামাটি থেকে চলে এসেও চৈতন্য হলো না, কাশী থেকে তোমাকে অনাদরে বিদায় দিলুম।

তাহার দুই চোখ জলে টলটল করিতে লাগিল, আমি হাত দিয়া

মুছাইয়া দিলে, বলিল, বিষের গাছ নিজের হাতে পুঁতে এইবার তাতে ফল ধরলো। খেতে পারি নে, শুতে পারি নে, চোখের ঘুম গেলো শুকিয়ে, এলোমেলো কত কি ভয় হয় তার মাথামুণ্ডু নেই—গুরুদেব তখনো বাড়ীতে ছিলেন, তিনি কি একটা কবজ হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা, সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশহাজার ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু, পারলুম কই? মনের মধ্যে হু হু করে, পূজোয় বসলেই দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে—এমনি সময়ে এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ ধরা পড়লো।

কে ধরলে—গুরুদেব? এবার বোধ হয় আর একটা কবজ লিখে দিলেন?

হাঁ গো দিলেন। বলে দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে।

তাই দিও তাতে যদি তোমার রোগ সারে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেই চিঠিখানা নিয়ে আমার দুদিন কাটলো। কোথা দিয়ে যে কাটলো জানি নে। রতনকে ডেকে তার হাতে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলুম। গঙ্গায় স্নান করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে দাঁড়িয়ে বললুম, মা, চিঠিখানা সময়ে থাকতে যেন তাঁর হাতে পড়ে। আমাকে আত্মহত্যা করে না মরতে হয়। আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমাকে এমন করে বেঁধেছিলে কেন বলো ত?

সহসা এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারিলাম না। তারপর বলিলাম, এ তোমাদের মেয়েদেরই সম্ভব। এ আমরা ভাবতেও পারি নে, বুঝতেও পারি নে।

স্বীকার করো?

করি।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় এক মুহূর্ত্ত আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সত্যিই বিশ্বাস ক'রো। এ আমাদেরই সম্ভব, পুরুষে সত্যিই এ পারে না।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি আমাদের পাটনার লছমন সাউ। আমাকে সে বারাণসী কাপড় বিক্রী করত। বুড়ো আমাকে বড়ো ভালোবাসতো, আমাকে বেটী বলে ডাকতো। আশ্চর্য্য হয়ে বললে, বেটী, আপ ইহা? তার কলকাতায় দোকান ছিল জানতুম, বললুম সাউজী, আমি কলকাতায় যাবো, আমাকে একটা বাড়ী ঠিক করে দিতে পারো?

সে বললে, পারি। বাঙালীপাড়ায় তার নিজেরই একখানা বাড়ী ছিল, সস্তায় কিনেছিলো, বললে, চাও ত বাড়ীটা আমি সেই টাকাতেই তোমাকে দিতে পারি। সাউজী ধর্ম্মভীরু লোক, তার উপর আমার বিশ্বাস ছিল, রাজী হয়ে তাকে বাড়ীতে ডেকে এনে টাকা দিলুম, সে রসিদ লিখে দিলে। তারই লোকজন এসব জিনিষপত্র কিনে দিয়েছে। ছ-সাতদিন পরেই রতনদের সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এলুম, মনে মনে বললুম, মা অন্নপূর্ণা, দয়া তুমি আমাকে করেছো, নইলে এ সুযোগ কখনো ঘটতো না। দেখা তাঁর আমি পাবোই। এই ত দেখা পেলুম।

বলিলাম, কিন্তু আমাকে যে শীঘ্রই বর্ম্মা যেতে হবে, লক্ষ্মী!

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ ত, চলো না। সেখানে অভয়া আছেন, দেশময় বুদ্ধদেবের বড় বড় মন্দির আছে—এসব দেখতে পাবো।

কহিলাম, কিন্তু সে বড় নোংরা দেশ লক্ষ্মী, শুচিবায়ুগ্রস্তদের বিচার-আচার থাকে না—সে দেশে তুমি যাবে কি করে?

রাজলক্ষ্মী আমার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি কি একটা কথা বলিল, ভালো বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, আর একটু চেঁচিয়ে বলো শুনি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না।

তারপরে অসাড়ের মতো তেমনি ভাবেই পড়িয়া রহিল। শুধু

তাহার উষ্ণ ঘন নিঃশ্বাস আমার গলার উপরে, আমার গালের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

১০

ওগো, ওঠো! কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোও—রতন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে!

আমার সাড়া না পাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় ডাকিল, বেলা হলো—কত ঘুমোবে?

পাশ ফিরিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিলাম, ঘুমোতে দিলে কই? এই ত সবে শুয়েছি।

কানে গেল টেবিলের উপর চায়ের বাটিটা রতন ঠক্ করিয়া রাখিয়া দিয়া বোধ হয় লজ্জায় পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ছি ছি, কি বেহায়া তুমি! মানুষকে মিথ্যে কি অপ্রতিভ করতেই পারো! নিজে সারারাত কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোলে, বরঞ্চ আমিই জেগে বসে পাখার বাতাস করলুম পাছে গরমে তোমার ঘুম ভেঙে যায়। আবার আমাকেই এই কথা। ওঠো বলছি, নইলে গায়ে জল ঢেলে দেবো।

উঠিয়া বসিলাম। বেলা না হইলেও তখন সকাল হইয়াছে, জানালাগুলি খোলা, সকালের সেই স্নিগ্ধ আলোকে রাজলক্ষ্মীর কি অপরূপ মূর্তিই চোখে পড়িল। তাহার স্নান, পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়ে-পাণ্ডার দেওয়া শ্বেত ও রক্ত-চন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরনে নূতন বারাণসী শাড়ী, পূবের জানালা দিয়া এক টুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের একধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপা-হাসি তাহার ঠোঁটের কোণে, অথচ কৃত্রিম ক্রোধে আকুঞ্চিত ভ্রূদুটির নীচে চঞ্চল চোখের

দৃষ্টি যেন উচ্ছল আবেগে ঝলঝল করিতেছে—চাহিয়া আজও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কাল থেকে কি অতো দেখচো বলো ত ?

কহিলাম, তুমিই বলো ত কি অতো দেখচি ?

রাজলক্ষ্মী আবার একটু হাসিয়া বলিল, বোধ হয় দেখচো এর চেয়ে পুঁটু দেখতে ভাল কিনা, কমললতা দেখতে ভাল কিনা—না ?

বলিলাম, না। রূপের দিক দিয়ে কেউ তারা তোমার কাছেও লাগে না, সে এমনিই বলা যায়। অতো ক'রে দেখতে হয় না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সে যাক্‌গে ; কিন্তু গুণে ?

গুণে ? সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের সম্ভাবনা আছে তা মানতেই হবে।

গুণের মধ্যে ত শুনলুম কেত্তন করতে পারে।

হাঁ, চমৎকার।

চমৎকার—তা তুমি বুঝলে কি ক'রে ?

বাঃ—তা আর বুঝি নে ? বিশুদ্ধ তাল, লয়, সুর—

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তাল কাকে বলে ?

বলিলাম, তাল তাকে বলে, ছেলেবেলায় যা তোমার পিঠে পড়তো। মনে নেই ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, নেই আবার! সে আমার খুব মনে আছে। কাল খামোকা তোমায় ভীতু বলে অসম্মান করেছি বই ত নয়, কিন্তু কমললতা শুধু তোমার উদাসী মনের খবরটাই পেয়েছে, তোমার বীরত্বের কাহিনী শোনে নি বুঝি ?

না, আত্মপ্রশংসা আপনি করতে নেই, সে তুমি শুনিয়ো ; কিন্তু তার গলা সুন্দর, গান সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই।

আমারও নেই। বলিয়াই সহসা তাহার দুই চক্ষু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, হাঁ গা, তোমার সেই গানটি মনে আছে ? সেই যে পাঠশালার ছুটি হলে তুমি গাইতে, আমরা মুগ্ধ

হয়ে শুনতুম—সেই—কোথা গেলি প্রাণের প্রাণ বাপ দুর্য্যোধন রে-এ-এ-এ-এ—

হাসি চাপিতে সে মুখে আঁচল চাপা দিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বড্ড ভাবের গান। তোমার মুখে শুনলে গোরু-বাছুরের চোখেও জল এসে পড়তো—মানুষ ত কোন্ ছার।

রতনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অনতিবিলম্বে সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আবার চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছি মা, তৈরী হতে দেরী হবে না। এই বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া চায়ের বাটিটা হাতে তুলিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মী আমাকে বলিল, আর দেরী ক'রো না, ওঠো। এবার চা ফেলা গেলে রতন ক্ষেপে যাবে। ওর অপব্যয় সহ্য হয় না। কি বলিস রতন?

রতন জবাব দিতে জানে। কহিল, আপনার না সইতে পারে মা, কিন্তু বাবুর জন্যে আমার সব সয়। এই বলিয়া সে বাটিটা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার রাগ হইলে রাজলক্ষ্মীকে সে 'আপনি' বলিত, না হইলে 'তুমি' বলিয়া ডাকিত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, রতন তোমাকে সত্যিই বড় ভালোবাসে!

বলিলাম, আমারও তাই মনে হয়।

হাঁ। কাশী থেকে তুমি চলে এলে ও ঝগড়া ক'রে আমার কাজ ছেড়ে দিলে। রাগ ক'রে বললুম, আমি যে তোর এত করলুম রতন, তার কি এই প্রতিফল? ও বললে, রতন নেমকহারাম নয় মা। আমিও চললুম বর্ম্মায়, তোমার ঋণ আমি বাবুর সেবা করে শোধ দেবো। তখন হাতে ধরে, ঘাট মেনে তবে ওকে শান্ত করি।

একটু থামিয়া বলিল, তারপরে তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন-পত্র এলো।

বাধা দিয়া বলিলাম, মিছে কথা ব'লো না। তোমার মতামত জানার জন্যে—

এবার সেও আমাকে বাধা দিল, কহিল, হাঁ গো হাঁ, জানি। রাগ করে যদি লিখতুম করো গে—করতে ত?

না।

না বইকি। তোমরা সব পারো।

না, সবাই সব কাজ পারে না।

রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল, কি জানি রতন মনে কি বুঝলে, কেবলি দেখি আমার মুখের পানে চেয়ে তার দুচোখ ছলছল ক'রে আসে। তারপরে, তার হাতে যখন চিঠির জবাব দিলুম ডাকে ফেলতে, সে বললে, মা, এ চিঠি ডাকে ফেলতে পারবো না—আমি নিজে নিয়ে যাবো হাতে ক'রে। বললুম, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ করে লাভ কি বাবা? রতন চোখটা হঠাৎ মুছে ফেলে বললে, কি হয়েছে আমি জানি নে, মা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় যেন পদ্মাতীরের তলা ক্ষয়ে গেছে—গাছপালা, বাড়ীঘর নিয়ে কখন যে তলিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই। তোমার দয়ায় আমারও আর অভাব নেই মা—এ টাকা তুমি দিলেও আমি নিতে পারবো না। কিন্তু বিশ্বনাথ মুখ তুলে যদি চান, আমার দেশের কুঁড়েতে তোমার দাসীটাকে কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দিও, সে বর্ত্তে যাবে।

বলিলাম, ব্যাটা নাপতে কি সেয়ানা!

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল। বলিল, কিন্তু আর দেরী ক'রো না, যাও।

দুপুরবেলা আমাকে সে খাওয়াইতে বসিলে বলিলাম, কাল

পরনে ছিল আটপৌরে কাপড়, আজ সকাল থেকে বারাণসী শাড়ীর সমারোহ কেন বলো ত?

তুমি বলো ত কেন?

আমি জানি নে।

নিশ্চয় জানো। এ কাপড়খানা চিনতে পারো?

তা পারি। বর্ম্মা থেকে আমি কিনে পাঠিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেদিন আমি ভেবে রেখেছিলুম জীবনে সবচেয়ে বড় দিনটিতে এটি পরবো—তাছাড়া কখনো পারবো না।

তাই পরেচো আজ?

হঁা, তাই পরেচি আজ।

হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু সে ত হয়েছে, এখন ছাড়োগে?

সে চুপ করিয়া রহিল। বলিলাম, খবর পেলাম তুমি এখুনি নাকি কালীঘাটে যাবে?

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—এখুনি? সে কি করে হবে? তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে ত ছুটি পাবো।

বলিলাম, না, তখনো পাবে না। রতন বলছিলো তোমার খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু কাল ছটিখানি খেয়েছিলে, আবার আজ থেকে সুরু হয়েছে উপবাস। আমি কি স্থির করেচি জানো? এখন থেকে তোমাকে কড়া শাসনে রাখবো, যা খুশি তাই আর করতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তা হলে ত বাঁচি গো মশাই। খাই-দাই থাকি, কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

কহিলাম, সেইজন্যেই আজ তুমি কালীঘাটে যেতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি শুধু আজকের দিনটি আমাকে ভিক্ষে দাও, তারপরে আগেকার দিনে নবাব বাদশা'দের যেমন কেনা-বাঁদী থাকতো তার বেশী তোমার কাছে চাইবো না।

এতো বিনয় কেন বলো ত?

বিনয় ত নয়, সত্যি। আপনার ওজন বুঝে চলি নি, তোমাকে মানি নি, তাই অপরাধের পরে অপরাধ ক'রে কেবলই সাহস বেড়ে গেছে। আজ আমার সেই লক্ষ্মীর অধিকার তোমার কাছে আর নেই—নিজের দোষে হারিয়ে বসে আছি।

চাহিয়া দেখিলাম তাহার চোখে জল আসিয়াছে, বলিল, শুধু আজকের দিনটির জন্য হুকুম দাও, আমি মায়ের আরতি দেখে আসি গে।

বলিলাম, না হয় কাল যেয়ো। নিজেই বললে সারারাত জেগে বসে আমার সেবা করেচো—আজ তুমি বড় শ্রান্ত।

না, আমার কোন শ্রান্তি নেই। শুধু আজ বলে নয়, কত অসুখেই দেখেচি রাতের পর রাত জেগেও তোমার সেবায় আমার কষ্ট হয় না। কিসে আমার সমস্ত অবসাদ যেন মুছে দিয়ে যায়। কতদিন হলো ঠাকুরদেবতা ভুলে ছিলুম, কিছুতে মন দিতে পারি নি—লক্ষ্মীটি, আজ আমাকে মানা ক'রো না—যাবার হুকুম দাও।

তবে চলো, দুজনে একসঙ্গে যাই।

রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, তাই চলো! কিন্তু মনে মনে ঠাকুরদেবতাকে তাচ্ছিল্য করবে না ত?

বলিলাম, শপথ করতে পারবো না; বরঞ্চ তোমার পথ চেয়ে আমি মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকবো। আমার হয়ে দেবতার কাছে তুমি বর চেয়ে নিও।

কি বর চাইবো, বলো?

অন্নের গ্রাস মুখে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন কামনাই খুঁজিয়া পাইলাম না। সে কথা স্বীকার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, বলো ত লক্ষ্মী, কি আমার জন্যে তুমি চাইবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাইবো আয়ু, চাইবো স্বাস্থ্য, আর চাইবো আমার ওপর এখন থেকে যেন তুমি কঠিন হতে পারো। প্রশ্রয়

দিয়ে আর যেন না আমার তুমি সর্ব্বনাশ করো। করতেই ত বসেছিলে।

লক্ষ্মী, এ হলো তোমার অভিমানের কথা।

অভিমান ত আছেই। তোমার সে চিঠি কখনো কি ভুলতে পারবো!

অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলাম।

সে হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তা বলে এ-ও আমার সয় না; কিন্তু কঠোর হতে ত তুমি পারবে না, সে তোমার স্বভাব নয়, কিন্তু এ-কাজ আমাকে এখন থেকে নিজেই করতে হবে, অবহেলা করলে চলবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কাজটা কি? আরও খাড়া উপোস?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, উপোসে আমার শাস্তি হয় না, বরং অহঙ্কার বাড়ে। ও আমার পথ নয়।

তবে পথটা কি ঠাওরালে?

ঠাওরাতে পারি নি, খুঁজে বেড়াচ্চি।

আচ্ছা, সত্যিই আমি কখনো কঠিন হতে পারি, এ তোমার বিশ্বাস হয়?

হয় গো হয়—খুব হয়।

কখ্খনো হয় না—এ তোমার মিছে কথা।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথাই ত, কিন্তু সেই হয়েছে আমার বিপদ গোঁসাই; কিন্তু বেশ নামটি বার করেছে তোমার কমললতা। কেবল ওগো হাঁগো ক'রে প্রাণ যায়, এখন থেকে আমিও ডাকবো নতুনগোঁসাই বলে।

স্বচ্ছন্দে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তবু হয়ত আচমকা কখনো কমললতা বলে ভুল হবে—তাতে স্বস্তিও পাবে। বলো ঠিক না?

হাসিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, স্বভাব কখনো ম'লেও যায় না।

বাদশাহী আমলের কেনা-বাঁদীদের মতো কথাই হচ্ছে বটে! এতক্ষণে তারা তোমাকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিতো।

শুনিয়া রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জল্লাদের হাতে নিজেই ত সঁপে দিয়েছি।

বলিলাম, চিরকাল তুমি এত দুষ্টু যে কোন জল্লাদের সাধ্য নেই তোমাকে শাসন করে।

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে গিয়াই তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—এ কি! খাওয়া হয়ে এলো যে। দুধ কই? মাথা খাও, উঠে পড়ো না যেন। বলিতে বলিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, এ আর সেই কমললতা!

মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া পাতের কাছে দুধের বাটি রাখিয়া পাখা-হাতে সে বাতাস করিতে বসিল, বলিল, এতকাল মনে হ'তো, এ নয়—কোথায় যেন আমার পাপ আছে। তাই, গঙ্গামাটিতে মন বসলো না, ফিরে এলুম কাশীধামে। গুরুদেবকে ডাকিয়ে এনে চুল কেটে গয়না খুলে একেবারে তপস্যা জুড়ে দিলুম। ভাবলুম আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরী হলো বলে। এক আপদ তুমি—সে-ও বিদায় হলো; কিন্তু সেদিন থেকে চোখের জল যে কিছুতেই থামে না। ইষ্টমন্ত্র গেলুম ভুলে, ঠাকুরদেবতা করলেন অন্তর্দ্ধান, বুক উঠলো শুকিয়ে; ভয় হলো, এই যদি ধর্ম্মের সাধনা তবে এ সব হচ্ছে কি! শেষে পাগল হবো নাকি!

আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম, বলিলাম, তপস্যার গোড়াতে দেবতারা সব ভয় দেখান। টিকে থাকলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সিদ্ধিতে আমার কাজ নেই, সে আমি পেয়েছি।

কোথায় পেলে?

এখানে। এই বাড়ীতে।

অবিশ্বাস্য। প্রমাণ দাও।

প্রমাণ দিতে যাবো তোমার কাছে? আমার বয়ে গেছে।

কিন্তু ক্রীতদাসীরা এরূপ উক্তি কদাচ করে না।

ছ্যাখো, রাগিও না বলচি। একশোবার ক্রীতদাসী ক্রীতদাসী করো ত ভালো হবে না।

আচ্ছা, খালাস দিলাম। এখন থেকে তুমি স্বাধীন।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, স্বাধীন যে কতো এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কাল কথা কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সরিয়ে রেখে আমি উঠে বসলুম। হাত দিয়ে দেখি ঘামে তোমার কপাল ভিজে—আঁচলে মুছে দিয়ে একখানা পাখা নিয়ে বসলুম, মিটমিটে আলোটা দিলুম উজ্জ্বল ক'রে—তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে চোখ আর ফিরুতে পারলুম না। এ যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়ে নি? এতদিন কাণা হয়ে ছিলুম কি? ভাবলুম, এ যদি পাপ, তবে পুণ্যে আমার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম্ম তবে থাক্ গে আমার ধর্মচর্চ্চা—জীবনে এই যদি হয় মিথ্যে তবে জ্ঞান না হতেই বরণ করেছিলুম একে কার কথায়? ও কি, খাচ্চো না যে? সব দুধই পড়ে রইলো যে!

আর পারি নে।

তবে কিছু ফল নিয়ে আসি?

না, তাও না।

কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ যে!

যদি হয়ে থাকি সে অনেকদিনের অবহেলায়। একদিনে সংশোধন করতে চাইলেই মারা যাবো।

বেদনায় মুখ তাহার পাংশু হইয়া উঠিল, কহিল, আর হবে না। যে শাস্তি পেলুম সে আর ভুলবো না। এই আমার মস্ত লাভ।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ভোর হলে উঠে এলুম। ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গে না, নইলে লোভের বশে তোমাকে জাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি। তারপর দরওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেলুম—মা যেন সব তাপ মুছে নিলেন। বাড়ী এসে আহ্নিকে বসলুম, দেখতে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসো নি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পুজোর মন্ত্র! এসেছেন আমার ইষ্টদেবতা, গুরুদেব—এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো কিন্তু সে আমার বুকের রক্ত-নেঙড়ানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে-ওঠা ঝর্ণার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে বয়ে গেল। আনি গে ছুটো ফল? বঁটি নিয়ে কাছে বসে নিজের হাতে বানিয়ে, অনেকদিন তোমায় খেতে দিই নি—যাই? কেমন?

যাও।

রাজলক্ষ্মী তেমনই দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

আমার আবার নিঃশ্বাস পড়িল। এ আর সেই কমললতা!

কি জানি কে উহার জন্মকালে সহস্র নামের মধ্যে বাছিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী নাম দিয়াছিল!

দুজনে কালীঘাট হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন রাত্রি ন'টা। রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া, কাপড় ছাড়িয়া সহজ মানুষের মতো কাছে আসিয়া বসিল। বলিলাম, রাজপোষাক গেছে—বাঁচলাম।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও আমার রাজপোষাকই বটে, কিন্তু রাজার দেওয়া যে? যখন মরবো ঐ কাপড়খানা আমাকে পরিয়ে দিতে ব'লো।

তাই হবে; কিন্তু সারাদিন ধরে আজ কি তুমি শুধু স্বপ্ন দেখেই কাটাবে? এইবার কিছু খাও।

খাই।

রতনকে বলে দিই ঠাকুর এইখানে তোমার খাবার দিয়ে যাক।

এইখানে? বেশ যাহোক। তোমার সামনে বসে আমি খাবো কেন? কখনো দেখেচো খেতে?

দেখি নি, কিন্তু দেখলে দোষ কি?

তা কি হয়! মেয়েদের রাক্ষুসে খাওয়া তোমাদের আমরা দেখতেই বা দেবো কেন?

ও ফন্দি আজ খাটবে না, লক্ষ্মী। তোমাকে অকারণ উপোস করতে আমি কিছুতেই দেবো না। না খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা কবো না।

নাই বা কইলে।

আমিও খাবো না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এইবার জিতেছো। এ আমার সইবে না।

ঠাকুর খাবার দিয়া গেল, ফল-মূল-মিষ্টান্ন। সে নামমাত্র আহার করিয়া বলিল, রতন তোমাকে নালিশ জানিয়েছে আমি খাই নে, কিন্তু কি ক'রে খাবো বলো ত? কলকাতায় এসেছিলুম হারা-মোকদ্দমার আপিল করতে। তোমার বাসা থেকে প্রত্যহ রতন ফিরে আসতো, আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারতুম না পাছে সে বলে, দেখা হয়েছে কিন্তু বাবু এলেন না। যে দুর্ব্যবহার করেছি আমার বলবার ত কিছু নেই।

বলবার দরকার ত নেই। তখন বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেতে।

কে তেলাপোকা—তুমি?

তাইত জানি। এমন নিরীহ জীব সংসারে কে আছে?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, অথচ, তোমাকেই মনে মনে আমি যত ভয় করি এমন কাউকে নয়।

এটি পরিহাস; কিন্তু হেতু জিজ্ঞেসা করতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী আবার ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার হেতু তোমাকে আমি চিনি। আমি জানি মেয়েদের দিকে তোমার সত্যিকার আসক্তি এতটুকু নেই, যা আছে তা লোক-দেখানো শিষ্টাচার। সংসারে কোন-কিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বললে তোমাকে ফেরাবো কি দিয়ে?

বলিলাম, একটু ভুল হলো লক্ষ্মী। পৃথিবীর একটি জিনিষে আজও লোভ আছে—সে তুমি। কেবল ঐখানে 'না' বলতে বাধে। ওর বদলে দুনিয়ার সব-কিছু যে ছাড়তে পারি, শ্রীকান্তর এই জানাটাই আজও তুমি জানতে পারো নি।

হাতটা ধুয়ে আসি গে, বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন দিনের ও দিনান্তের সর্ব্ববিধ কাজকর্ম্ম সারিয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া আমার কাছে বসিল। কহিল, কমললতার গল্প শুনবো, বলো।

যতটা জানি, সমস্তই বলিলাম, শুধু নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু বাদ দিলাম, কারণ, ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা।

আগাগোড়া মন দিয়া শুনিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, যতীনের মরণটাই ওকে সবচেয়ে বেজেছে। ওর দোষেই সে মারা গেল।

ওর দোষ কিসে?

দোষ বইকি। কলঙ্ক এড়াতে ওকেই ত কমললতা ডেকেছিলো

সকলের আগে আত্মহত্যায় সাহায্য করতে। সেদিন যতীন স্বীকার করতে পারে নি, কিন্তু আর একদিন নিজের কলঙ্ক এড়াতে, তার ঐ পথটাই সকলের আগে চোখে পড়ে গেলো। এমনি হয়, তাই পাপের সহায় হতে কখনো বন্ধুকে ডাকতে নেই—তাতে একের প্রায়শ্চিত্ত পড়ে অপরের ঘাড়ে। ও নিজে বাঁচলে, কিন্তু মলো তার স্নেহের ধন।

যুক্তিটা ভালো বোঝা গেল না, লক্ষ্মী।

তুমি বুঝবে কি ক'রে? বুঝেছে কমললতা, বুঝেছে তোমার রাজলক্ষ্মী।

ওঃ—এই?

এই বইকি? আমার বাঁচা কতটুকু বলো ত যখন চেয়ে দেখি তোমার পানে?

কিন্তু কালই যে বললে তোমার মনে সব কালি মুছে গিয়েছে—আর কোন গ্লানি নেই—সে কি তবে মিছে?

মিছেই ত। কালি মুছবে ম'লে—তার আগে নয়। মরতেও চেয়েছি, কিন্তু পারি নে কেবল তোমারই জন্যে।

তা জানি; কিন্তু এ নিয়ে বার বার যদি ব্যথা দাও, আমি এখনি নিরুদ্দেশ হবো; কোথাও আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল, বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না। তুমি সব পারো, তোমার নিষ্ঠুরতা কোথাও বাধা মানে না।

এমন কথা আর বলবে না বলো?

না।

ভাববে না বলো?

তুমি বলো আমাকে ফেলে কখনো যাবে না?

আমি ত কখনো যাই নে লক্ষ্মী, যখনি দূরে গেছি—তুমি শুধু চাও নি বলেই।

সে তোমার লক্ষ্মী নয়—সে আর কেউ।

সেই আর কেউকেই আজও ভয় করি যে।

না, তাকে ভয় করো না, সে রাক্ষুসী মরেছে। এই বলিয়া সে আমার সেই হাতটাকেই খুব জোর করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে থাকিয়া হঠাৎ সে অন্য কথা পাড়িল, বলিল, তুমি কি সত্যিই বর্ম্মায় যাবে?

সত্যিই যাবো।

কি করবে গিয়ে—চাকরী? কিন্তু আমরা ত দুজন—কতটুকুই বা আমাদের দরকার?

কিন্তু সেটুকুও ত চাই।

সে ভগবান দিয়ে দেবেন; কিন্তু চাকরী করতে তুমি পারবে না, ও তোমার ধাতে পোষাবে না।

না পোষালে চলে আসবো।

আসবেই জানি। শুধু আড়ি ক'রে অতদূরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাও।

কষ্ট না করলেই পারো।

রাজলক্ষ্মী একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া বলিল, যাও, চালাকি ক'রো না।

বলিলাম, চালাকি করি নি, গেলে তোমার সত্যিই কষ্ট হবে। রাঁধাবাড়া, বাসন-মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা-পাতা—

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবে ঝি-চাকরেরা করবে কি?

কোথায় ঝি-চাকর? তার টাকা কৈ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাই থাক্; কিন্তু যতই ভয় দেখাও আমি যাবোই।

চলো। শুধু তুমি আর আমি। কাজের তাড়ায় না পাবে ঝগড়া করবার অবসর, না পাবে পূজো-আহ্নিক-উপোস করার ফুরসৎ।

তা হোক গে। কাজকে আমি কি ভয় করি নাকি?

করো না সত্যি, কিন্তু পেরেও উঠবে না। দুদিন বাদেই ফেরবার তাড়া লাগাবে।

তাতেই বা ভয় কিসের? সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনবো। রেখে আসতে হবে না ত। এই বলিয়া সে এক-মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, সেই ভালো। দাস-দাসী লোকজন কেউ নেই, একটি ছোট্ট বাড়ীতে শুধু তুমি আর আমি—যা খেতে দেবো তাই খাবে, যা পরতে দেবো তাই পরবে—না, তুমি দেখো, আমি হয়ত আর আসতেই চাইবো না।

সহসা আমার কোলের উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কি ভাবচো?

রাজলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল, আমরা কবে যাবো?

বলিলাম, এই বাড়ীটার একটা ব্যবস্থা করে নাও, তারপরে যেদিন ইচ্ছে, চলো যাত্রা করি।

সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া আবার চোখ বুজিল।

আবার কি ভাবচো?

রাজলক্ষ্মী চাহিয়া বলিল, ভাবচি একবার মুরারিপুরে যাবে না?

বলিলাম, বিদেশে যাবার পূর্ব্বে একবার দেখা দিয়ে আসবো তাঁদের কথা দিয়েছিলাম।

তবে চলো, কালই দুজনে যাই।

তুমি যাবে?

কেন ভয় কিসের? তোমাকে ভালোবাসে কমললতা আর তাকে ভালোবাসে আমাদের গহরদাদা। এ হয়েছে ভালো।

এ সব কে তোমাকে বললে?

তুমিই বলেছো।

না, আমি বলি নি।

হাঁ, তুমিই বলেছো, শুধু জানো না কখন বলেছো।

শুনিয়া সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, সে যাই হোক, সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।

কেন নয়?

সে বেচারাকে ঠাট্টা করে তুমি অস্থির করে তুলবে।

রাজলক্ষ্মী ভ্রূকুঞ্চিত করিল, কুপিত কণ্ঠে কহিল, এতকালে আমার এই পরিচয় পেয়েছো তুমি? তোমাকে সে ভালোবাসে এই নিয়ে তাকে লজ্জা দিতে যাবো আমি? তোমাকে ভালোবাসাটা কি অপরাধ? আমিও ত মেয়েমানুষ। হয়ত বা তাকে আমিও ভালোবেসে আনবো।

কিছুই তোমার অসম্ভব নয় লক্ষ্মী—চলো যাই।

হাঁ চলো, কাল সকালের গাড়ীতেই বেরিয়ে পড়বো দুজনে—তোমার কোন ভাবনা নেই—এ জীবনে তোমাকে অসুখী করবো না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, শ্বাস-প্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে—সহসা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল।

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম ও কি?

রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না—কিছু ত নয়।

তাহার এই হাসিটাও আজ যেন আমার কেমনধারা লাগিল!

এগার

পরদিন আমার অনিচ্ছায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না ; কিন্তু পরের দিন আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না ; মুরারিপুর আখড়ার উদ্দেশে যাত্রা করিতেই হইল। রাজলক্ষ্মীর বাহন রতন, সে নহিলে কোথাও পা বাড়ানো চলে না, কিন্তু রান্নাঘরের দাসী লালুর মা-ও সঙ্গে চলিল। কতক জিনিষপত্র লইয়া রতন ভোরের গাড়ীতে রওনা হইয়া গিয়াছে, সেখানকার ষ্টেশনে নামিয়া সে খান-দুই ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিবে। আবার আমাদের সঙ্গেও মোটঘাট যাহা বাঁধা হইয়াছে তাহাও কম নয়।

প্রশ্ন করিলাম, সেখানে বসবাস করতে চললে নাকি ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, দু-একদিন থাকবো না ? দেশের বনজঙ্গল, নদী-নালা, মাঠ-ঘাট তুমিই একলা দেখে আসবে, আর আমি কি সে-দেশের মেয়ে নই ? আমার দেখতে সাধ যায় না ?

তা যায় মানি, কিন্তু এত জিনিষপত্র, এত রকমের খাবারদাবার আয়োজন—

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঠাকুরের স্থানে কি শুধু হাতে যেতে বলো ? আর তোমাকে ত বইতে হবে না, তোমার ভাবনা কিসের ?

ভাবনা যে কত ছিল সে আর বলিব কাহাকে ? আর এই ভয়টাই বেশী ছিল যে বৈষ্ণব-বৈরাগীর ছোঁয়া ঠাকুরের প্রসাদ সে স্বচ্ছন্দে মাথায় তুলিবে কিন্তু মুখে তুলিবে না। কি জানি, সেখানে গিয়া কোন একটা ছলে উপবাস সুরু করিবে, না রাঁধিতে বসিবে বলা কঠিন। কেবল একটা ভরসা ছিল মনটি রাজলক্ষ্মীর সত্যিকার ভদ্র মন। অকারণে গায়ে পড়িয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে পারে না। যদিবা এসব কিছু করে, হাসিমুখে রহস্যে-কৌতুকে এমন করিয়াই করিবে যে আমি ও রতন ছাড়া আর কেহ বুঝিতেও পারিবে না।

রাজলক্ষ্মীর দৈহিক ব্যবস্থায় বাহুল্য ভার কোন কালেই নাই, তাহাতে সংযম ও উপবাসে সেই দেহটিকে যেন লঘুতার একটি দীপ্তি দান করিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার আজিকার সাজসজ্জাটি হইয়াছে বিচিত্র। প্রত্যূষে স্নান করিয়া আসিয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়ে-পাণ্ডার সযত্ন-রচিত অলক-তিলক তাহার ললাটে, পরনে তেমনি নানা ফুলে-ফলে লতায়-পাতায় বিচিত্র খয়ের রঙের বৃন্দাবনী শাড়ী, গায়ে সেই কয়টি অলঙ্কার, মুখের 'পরে স্নিগ্ধ প্রসন্নতা—আপন মনে কাজে ব্যাপৃত। কাল গোটা-দুই লম্বা আয়না-লাগানো আলমারি কিনিয়া আনিয়াছে, আজ যাইবার পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি করিয়া কি-সব তাহাতে সে গুছাইয়া তুলিতেছিল। কাজের সঙ্গে হাতের বালার হাঙ্গরের চোখ দুটা মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে, হীরা ও পান্না বসানো গলার হারের বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা পাড়ের ফাঁক দিয়া ঝলকিয়া উঠিতেছে, তাহার কানের কাছেও কি যেন একটা নীলাভ দ্যুতি, টেবিলে চা খাইতে বসিয়া আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়াছিলাম। তাহার একটা দোষ ছিল, বাড়ীতে সে জামা অথবা সেমিজ পরিত না। তাই কণ্ঠ ও বাহুর অনেকখানিই হয়ত অসতর্ক মুহূর্ত্তে অনাবৃত হইয়া পড়িত, অথচ বলিলে হাসিয়া কহিত, অতো পারিনে বাপু। পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে, দিনরাত বিবিয়ানা আর সয় না। অর্থাৎ জামা-কাপড়ের বেশী বাঁধাবাঁধি শুচিবায়ুগ্রস্তদের অত্যন্ত অস্বস্তিকর। আলমারির পাল্লা বন্ধ করিয়া হঠাৎ আয়নায় তাহার চোখ পড়িল আমার 'পরে। তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রাগিয়া বলিল, আবার চেয়ে আছ? এবার বারে বারে কি আমাকে এতো দেখো বলো ত?—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, ভাবছিলাম, বিধাতাকে ফরমাশ দিয়ে না জানি কে তোমাকে গড়িয়েছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি। নইলে এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দ আর

কার? আমার পাঁচ-ছ' বছর আগে এসেচো, আসবার সময় তাঁকে বায়না দিয়ে এসেছিলে—মনে নেই বুঝি?

না, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

চালান দেবার সময় কানে কানে তিনিই বলে দিয়েছিলেন; কিন্তু হলো চা খাওয়া? দেরী করলে যে আজও যাওয়া হবে না!

নাই বা হলো।

কেন বলো ত?

সেখানে ভীড়ের মধ্যে হয়ত তোমাতে খুঁজে পাবো না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমাকে পাবে। আমি তোমাকে খুঁজে পেলে বাঁচি।

বলিলাম, সেও ত ভালো নয়।

সে হাসিয়া কহিল, না সে হবে না। লক্ষ্মীটি, চলো। শুনেচি নতুনগোঁসাইয়ের সেখানে একটা আলাদা ঘর আছে, আমি গিয়েই তার খিলটা ভেঙে রেখে দেবো। ভয় নেই, খুঁজতে হবে না—দাসীকে এমনিই পাবে।

তবে চলো।

আমরা মঠে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-কালীন পূজা সেইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে। বিনা আহ্বানে, বিনা সংবাদে এতগুলি প্রাণী অকস্মাৎ গিয়া হাজির, তথাপি কি যে তাহারা খুশী হইল বলিতে পারি না। বড়গোঁসাই আশ্রমে নাই, গুরুদেবকে দেখিতে আবার নবদ্বীপে গিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জন-দুই বৈরাগী আসিয়া আমারই ঘরে আস্তানা গাড়িয়াছে।

কমললতা, পদ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং আরও অনেকে আসিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিল, কমললতা গাঢ়স্বরে কহিল, নতুন-গোঁসাই, তুমি যে এত শীঘ্র এসে আবার আমাদের দেখা দেবে এ আশা করিনি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল, যেন কত কালের চেনা। বলিল,

বলেন শুধু লক্ষ্মী। আমি বলি, ওগো, হাঁগো। আজকাল বলচেন নতুনগোঁসাই ব'লে ডাকতে। বলেন, তবু স্বস্তি পাবো!

পদ্মা হঠাৎ হাততালি দিয়া উঠিল—আমি বুঝেচি।

কমললতা তাহাকে ধমকে দিল—পোড়ারমুখীর ভারি বুদ্ধি। কি বুঝেছিস বল্ ত?

নিশ্চয় বুঝেচি। বলবো?

বলতে হবে না, যা। বলিয়াই সে সস্নেহে রাজলক্ষ্মীর একটা হাত ধরিয়া কহিল, কিন্তু কথায় কথায় বেলা বাড়চে ভাই, রোদ্দুরে মুখখানি শুকিয়ে উঠেচে। খেয়ে কিছু আসো নি জানি—চলো, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করবে, তারপরে সবাই মিলে তাঁর প্রসাদ পাবো। তুমিও এসো গোঁসাই। বলিয়া সে তাহাকে মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

এইবার মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। কারণ, এখন আসিবে প্রসাদ গ্রহণের আহ্বান। খাওয়া-ছোঁয়ার বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর জীবনে এমন করিয়াই গাঁথা যে এ সম্বন্ধে সত্যাসত্যের প্রশ্নই অবৈধ। এ শুধু বিশ্বাস নয়—এ তাহার স্বভাব। এ ছাড়া সে বাঁচে না। জীবনের এই একান্ত প্রয়োজনের সহজ ও সক্রিয় সজীবতা কতদিন কত সঙ্কট হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে সে-কথা কাহারো জানিবার উপায় নাই। নিজে সে বলিবে না—জানিয়াও লাভ নাই। আমি শুধু জানি, যে রাজলক্ষ্মীকে একদিন না চাহিয়াই দৈবাৎ পাইয়াছি, আজ সে আমার সকল পাওয়ার বড়ো; কিন্তু সে কথা এখন থাক।

তাহার যত-কিছু কঠোরতা সে কেবল নিজেকে লইয়া, অথচ অপরের প্রতি জুলুম ছিল না। বরঞ্চ হাসিয়া বলিত, কাজ কি বাপু অতো কষ্ট করার। এ-কালে অতো বাছতে গেলে মানুষের প্রাণ

বাঁচে না। আমি যে কিছুই মানি না সে জানে। শুধু তাহার চোখের উপর ভয়ঙ্কর একটা কিছু না ঘটিলেই সে খুশী। আমার পরোক্ষ অনাচারের কাহিনীতে কখনো বা সে নিজের দুইকান চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করে, কখনো বা গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া বলে, আমার অদৃষ্টে কেন তুমি এমন হলে? তোমাকে নিয়ে আমার যে সব গেল।

কিন্তু আজিকার ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়। এই নির্জ্জন মঠে যে কয়টি প্রাণী শান্তিতে বাস করে তাহারা দীক্ষিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের জাতিভেদ নাই, পূর্বাশ্রমের কথা ইহারা কেহ মনেও করে না। তাই, অতিথি কেহ আসিলে ঠাকুরের প্রসাদ নিঃসঙ্কোচ-শ্রদ্ধার বিতরণ করে, এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াও আজো কেহ ইহাদের অপমানিত করে নাই; কিন্তু এই অপ্রীতিকর কার্য্যই আজ যদি অনাহূত আসিয়া আমাদের দ্বারাই সংঘটিত হয় ত পরিতাপের অবধি রহিবে না। বিশেষ করিয়া আমার নিজের। জানি, কমললতা মুখে কিছুই বলিবে না, তাহাকে বলিতেও দিবে না—হয়ত বা শুদ্ধমাত্র একটিবার আমার প্রতি চাহিয়াই মাথা নীচু করিয়া অন্যত্র সরিয়া যাইবে। এই নির্ব্বাক্ অভিযোগের জবাব যে কি এইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম। এমনি সময়ে পদ্মা আসিয়া বলিল, এসো নতুনগোঁসাই, দিদিরা তোমাকে ডাকচে। হাত-মুখ ধুয়েছো?

না।

তবে এসো আমি জল দিই। প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে।

প্রসাদটা কি হলো আজ?

আজ হলো ঠাকুরের অন্নভোগ।

মনে মনে বলিলাম, তবে ত সংবাদ আরও ভালো। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রসাদ কোথায় দিলে?

পদ্মা বলিল, ঠাকুরঘরের বারান্দায়। বাবাজীমশায়দের সঙ্গে

তুমি বসবে, আমরা মেয়েরা খাবো পরে। আজ আমাদের পরিবেশন করবে রাজলক্ষ্মীদিদি, নিজে।

সে খাবে না ?

না। সে ত আমাদের মত বোষ্টম নয়—বামুনের মেয়ে। আমাদের ছোঁয়া খেলে তার পাপ হয়।

তোমার কমললতাদিদি রাগ করলে না ?

রাগ করবে কেন, বরঞ্চ হাসতে লাগলো। রাজলক্ষ্মীদিদিকে বললে, পরজন্মে আমরা দু-বোনে গিয়ে জন্মাবো এক মায়ের পেটে। আমি জন্মাব আগে, আর তুমি আসবে পরে। তখন মায়ের হাতে দু-বোনে এক পাতায় বসে খাবো। তখন কিন্তু জাত যাবে বললে মা তোমার কান মলে দেবে।

শুনিয়া খুশী হইয়া ভাবিলাম, এইবার ঠিক হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী কখনো কথায় তাহার সমকক্ষ পায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জবাব দিলে সে ?

পদ্মা কহিল, রাজলক্ষ্মীদিদিও শুনে হাসতে লাগলো, বললে, মা কেন দিদি, তখন বড় বোন হয়ে তুমিই দেবে আমার কান মলে, ছোটর আস্পর্দ্ধা কিছুতেই সইবে না।

প্রত্যুত্তর শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, শুধু প্রার্থনা করিলাম ইহার নিহিত অর্থ কমললতা যেন না বুঝিতে পারিয়া থাকে।

গিয়া দেখিলাম প্রার্থনা আমার মঞ্জুর হইয়াছে, কমললতা সে কথায় কান দেয় নাই। বরঞ্চ, এই অমিলটুকু মানিয়া লইয়াই ইতিমধ্যে দুজনের ভারী একটি মিল হইয়া গিয়াছে।

বিকালের গাড়ীতে বড়গোঁসাই দ্বারিকাদাস ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিল আরও জনকয়েক বাবাজী। সর্ব্বাঙ্গের ছাপ-ছোপের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে ইহারাও

অবহেলায় নয়। আমাকে দেখিয়া বড়গোঁসাই খুশী হইলেন, কিন্তু পার্ষদগণ গ্রাহ্য করিল না। না করিবারই কথা, কারণ শুনা গেল, ইহাদের একজন নামজাদা কীর্ত্তনীয়া এবং আর একজন মৃদঙ্গের ওস্তাদ।

প্রসাদ পাওয়া সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই মরা নদী ও সেই বনবাদাড়। বেণু ও বেতসকুঞ্জ চারিদিকে—গায়ের চামড়া বাঁচানো দায়। আসন্ন সূর্য্যাস্তকালে তটপ্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিব সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি কচু-জাতীয় 'আঁধারমাণিক' ফুল ফুটিয়াছে। তাহার বীভৎস মাংস-পচা গন্ধে তিষ্ঠিতে দিল না। মনে মনে ভাবিলাম, কবিরা ফুল এত ভালোবাসেন, কেহ এটাকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের উপহার দিয়া আসে না কেন! সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, গিয়া দেখি সেখানে সমারোহ ব্যাপার। ঠাকুর ও ঠাকুরঘর সাজানো হইতেছে, আরতির পরে কীর্ত্তনের বৈঠক বসিবে।

পদ্মা কহিল, নতুনগোঁসাই, কেত্তন শুনতে তুমি ভালোবাসো, আজ মনোহরদাস বাবাজীর গান শুনলে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। কি চমৎকার!

বস্তুতঃ বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলীর মত মধুর বস্তু আমার আর নাই, বলিলাম, সত্যিই বড় ভালোবাসি পদ্মা। ছেলেবেলায় দু-চার ক্রোশের মধ্যে কোথাও কীর্ত্তন হবে শুনলে আমি ছুটে যেতাম, কিছুতে ঘরে থাকতে পারতাম না। বুঝি-না-বুঝি তবু শেষ পর্য্যন্ত বসে থাকতাম। কমললতা, তুমি গাইবে না আজ?

কমললতা বলিল, না গোঁসাই, আজ না। আমার ত তেমন শিক্ষা নেই, ওঁদের সামনে গাইতে লজ্জা করে। তাছাড়া সেই অসুখটা থেকে গলা তেমনই ধরে আছে, এখনও সারে নি।

বলিলাম, লক্ষ্মী কিন্তু তোমার গান শুনতেই এসেছে। ও ভাবে আমি বুঝি বাড়িয়ে বলেছি।

কমললতা সলজ্জে কহিল, বাড়িয়ে নিশ্চয়ই বলেছো গোঁসাই। তারপরে স্মিতমুখে রাজলক্ষ্মীকে বলিল, তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই, সামান্য যা জানি তোমাকে আর একদিন শোনাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রসন্ন মুখে কহিল, আচ্ছা দিদি, তোমার যেদিন ইচ্ছে হবে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি নিজে এসো তোমার গান শুনে যাবো। আমাকে বলিল, তুমি কীর্ত্তন শুনতে এত ভালোবাসো, কই, আমাকে ত সে-কথা বলো নি।

উত্তর দিলাম, কেন বলবো তোমাকে? গঙ্গামাটিতে অসুখে যখন শয্যাগত, দুপুরবেলাটা কাটতো শুকনো শূন্য মাঠের পানে চেয়ে, দুর্ভর সন্ধ্যা কিছুতে একলা কাটতে চাইত না।

রাজলক্ষ্মী চট করিয়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়া ফেলিল, কহিল, আর যদি বলো পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো। তারপর নিজেই অপ্রতিভ হইয়া হাত সরাইয়া বলিল, কমললতাদিদি, ব'লে এসো ত ভাই তোমাদের বড়গোঁসাইজীকে, আজ বাবাজীমশায়ের কীর্ত্তনের পরে আমি ঠাকুরদের গান শোনাবো।

কমললতা সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলিল, কিন্তু বাবাজীরা বড় খুঁতখুঁতে ভাই!

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক গে, ভগবানের নাম ত হবে। বিগ্রহ-মূর্ত্তিগুলিকে হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, ওঁরা হয়ত খুশী হবেন, বাবাজীদের জন্যেও ততো ভাবি নে দিদি, কিন্তু আমার এই দুর্ব্বাসা ঠাকুরটি প্রসন্ন হলে বাঁচি।

বলিলাম, হলে কিন্তু বখশিস পাবে।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বলিল, রক্ষে করো গোঁসাই, সকলের সুমুখে যেন বখশিস দিতে এসো না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

শুনিয়া বৈষ্ণবীরা হাসিতে লাগিল, পদ্মা খুশী হইলেই হাত-তালি দেয়, বলিল, আ—মি—বু—ঝে—চি!

কমললতা তাহার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া সহাস্যে কহিল—দূর হ পোড়ারমুখী—চুপ কর্। রাজলক্ষ্মীকে কহিল, নিয়ে যাও ত ভাই ওকে, কি জানি হঠাৎ কি একটা বলে বসবে।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে কীর্ত্তনের আসর বসিল। আজ আলো জ্বলিল অনেকগুলো। মুরারিপুর আখড়া বৈষ্ণব-সমাজে নিতান্ত অখ্যাত নয়, নানাস্থান হইতে কীর্ত্তনীয়া বৈরাগীর দল আসিয়া জুটিলে এরূপ আয়োজন প্রায়ই হয়। মঠে সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র মজুত আছে, দেখিলাম সেগুলো হাজির করা হইয়াছে। একদিকে বসিয়া বৈষ্ণবীগণ—সকলেই পরিচিত, অন্যদিকে উপবিষ্ট অজ্ঞাতকুলশীল অনেকগুলি বৈরাগী-মূর্ত্তি—নানা বয়স ও নানা চেহারার। মাঝখানে সমাসীন বিখ্যাত মনোহরদাস ও তাঁহার মৃদঙ্গবাদক। আমার ঘরের অধুনা দখলিকার একজন ছোকরা বাবাজী দিতেছে হারমোনিয়ামে সুর। এটা প্রচার হইয়াছে যে, কে একজন সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলা আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে —তিনিই গাহিবেন গান। তিনি যুবতী, তিনি রূপসী, তিনি বিত্ত-শালিনী। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে দাস-দাসী, আসিয়াছে বহুবিধ খাদ্যসম্ভার, আর আসিয়াছে কে-এক নতুনগোঁসাই—সে নাকি এই দেশেরই একজন ভবঘুরে!

মনোহরদাসের কীর্ত্তনের ভূমিকা ও গৌরচন্দ্রিকার মাঝামাঝি এক সময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কমললতার কাছে বসিল। হঠাৎ, বাবাজীমশায়ের গলাটা একটু কাঁপিয়াই সামলাইয়া গেল, এবং মৃদঙ্গের বোলটা যে কাটিল না সে নিতান্তই একটা দৈবাতের লীলা! শুধু দ্বারিকাদাস দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন চোখ বুজিয়া ছিলেন তেমনি রহিলেন, কি জানি, হয়ত জানিতেই পারিলেন না কে আসিল আর কে আসিল না।

রাজলক্ষ্মী পরিয়া আসিয়াছে একখানা নীলাম্বরী শাড়ী, তাহারি সরু জরির পাড়ের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়াছে গায়ের নীলরঙের জামা। আর সব তেমনি আছে। কেবল সকালের উড়ে পাণ্ডার পরিকল্পিত কপালের ছাপছোপ এবেলা অনেকখানি মুছিয়াছে—অবশিষ্ট যা আছে সে যেন আশ্বিনের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ, নীল আকাশে কখন মিলাইল বলিয়া। অতি শিষ্ট-শান্ত মানুষ, আমার প্রতি কটাক্ষেও চাহিল না—যেন চেনেই না। তবু যে কেন একটুখানি হাসি চাপিয়া লইল, সে সেই জানে। কিম্বা আমারও ভুল হইতে পারে—অসম্ভব নয়।

আজ বাবাজীমশায়ের গান জমিল না; কিন্তু সে তাঁর দোষে নয়, লোকগুলোর অধীরতায়। দ্বারিকাদাস চোখ চাহিয়া রাজলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দিদি, আমার ঠাকুরদের এবার তুমি কিছু নিবেদন করে শোনাও, শুনে আমরাও ধন্য হই।

রাজলক্ষ্মী সেইদিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিল। দ্বারিকাদাস খোলটার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওটায় কোন বাধা জন্মাবে না ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না।

শুনিয়া শুধু তিনি নয়, মনোহরদাসও মনে মনে কিছু বিস্ময়বোধ করিলেন। কারণ, সাধারণ মেয়েদের কাছে এতটা বোধ করি তাঁহারা আশা করেন না।

গান সুরু হইল। সঙ্কোচের জড়িমা, অজ্ঞতার দ্বিধা কোথাও নাই—নিঃসংশয়ের কণ্ঠ অবাধ জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। এ বিদ্যায় সে সুশিক্ষিতা জানি, এ ছিল তাহার জীবিকা; কিন্তু বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের এই ধারাটাও সে যে এত যত্ন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে তাহা ভাবি নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিগণের এত বিভিন্ন পদাবলী যে তাহার কণ্ঠস্থ তাহা কে জানিত। শুধু সুরে-তালে-লয়ে নয়, বাক্যের বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায় এবং প্রকাশ-

ভঙ্গীর মধুরতায় এই সন্ধ্যায় সে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল তাহা অভাবিত। পাথরের ঠাকুর তাহার সম্মুখে, পিছনে বসিয়া ঠাকুর দুর্ব্বাসা—কাহাকে বেশী প্রসন্ন করিতে যে তাহার এই আরাধনা বলা কঠিন। গঙ্গামাটির অপরাধের এতটুকু স্খলনও যদি ইহাতে হয় কি জানি এ কথা তাহার মনের মধ্যে আজ ছিল কিনা।

সে গাহিতেছিল—

এক পদ-পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জর-জর ভেল,
তুয়া দরশন-আশে কিছু নাহি জানলু চিরদুখ অবদূরে গেল।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়নু গৃহ-সুখ আশ,
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণনু, কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

বড়গোঁসাইজীর চোখে ধারা বহিতেছিল, তিনি আবেগ ও আনন্দের প্রেরণায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিগ্রহের কণ্ঠ হইতে মল্লিকার মালা তুলিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, প্রার্থনা করি তোমার সমস্ত অকল্যাণ যেন দূর হয় ভাই।

রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তারপরে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা সকলের সম্মুখে মাথায় লইল, চুপি চুপি বলিল, এ মালা তোলা রইলো, বখশিসের ভয় না দেখালে এখানেই তোমার গলায় পরিয়ে দিতুম। বলিয়াই চলিয়া গেল।

গানের আসর শেষ হইল। মনে হইল জীবনটা যেন আজ সার্থক হইল।

ক্রমশঃ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন আরম্ভ হইল। তাহাকে অন্ধকারে একটু আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ও মালা রেখে দাও, এখানে নয়, বাড়ী ফিরে গিয়ে তোমার হাত থেকে পরবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এখানে ঠাকুরবাড়ীতে পরে ফেললে আর খুলতে পারবে না—এই বুঝি ভয়?

না, ভয় আর নেই, সে ঘুচেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার থাকলে তোমাকে আজ তা দান করতাম।

উঃ—কি দাতা! সে তোমারি থাকতো গো।

বলিলাম, তোমাকে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ।

কেন বলো ত?

বলিলাম, আজ মনে হচ্ছে তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্নেহে, সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েছি, সংসারে তার তুলনা নেই। নিজের অযোগ্যতায় লজ্জা পাই লক্ষ্মী—তোমার কাছে সত্যিই আমি বড় কৃতজ্ঞ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এবার কিন্তু সত্যিই আমি রাগ করবো।

তা ক'রো। ভাবি এ ঐশ্বর্য্য আমি রাখবো কোথায়?

কেন, চুরি যাবার ভয় নাকি?

না, সে মানুষ ত চোখে দেখতে পাই নে লক্ষ্মী। চুরি করে তোমাকে ধরে রাখবার মতো এত বড় জায়গাই বা সে বেচারা পাবে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিল না, হাতটা আমার টানিয়া ক্ষণকাল বুকের কাছে ধরিয়া রাখিল, তারপরে বলিল, এমন ক'রে মুখোমুখি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে হাসবে যে। কিন্তু ভাবচি, রাত্রে তোমাকে শুতে দিই কোথায়—জায়গা ত নেই?

না থাক্, যেখানে হোক শুয়ে রাত্রিটা কাটবেই।

তা কাটবে, কিন্তু শরীর ত ভালো নয়, অসুখ করতে পারে যে।

তোমার ভাবনা নেই, ওরা ব্যবস্থা একটা করবেই।

রাজলক্ষ্মী চিন্তার সুরে বলিল, দেখচি ত সব, ব্যবস্থা কি করবে জানি নে, কিন্তু ভাবনা নেই আমার, আছে ওদের? এসো। যাহোক দুটি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

বাস্তবিক লোকের ভীড়ে শোবার স্থান ছিল না। সে-রাত্রে কোনমতে একটা খোলা বারান্দায় মশারি টাঙাইয়া আমার শয়নের ব্যবস্থা ছিল। রাজলক্ষ্মী খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, হয়ত বা রাত্রে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া গেল, কিন্তু আমার ঘুমের বিঘ্ন ঘটিল না।

পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম রাশীকৃত ফুল তুলিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিল। আমার পরিবর্ত্তে কমললতা আজ রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গী করিয়াছিল। সেখানে নির্জ্জনে তাদের কি কথা হইয়াছে জানি না, কিন্তু আজ তাহাদের মুখ দেখিয়া আমি ভারি তৃপ্তিলাভ করিলাম। যেন কতদিনের বন্ধু দুজনে—তাহারা কত কালের আত্মীয়। কাল উভয়ে একত্রে এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, জাতের বিচার সেখানে প্রতিবন্ধক ঘটায় নাই। একজন অপরের হাতে খায় না এই লইয়া কমললতা আমার কাছে হাসিয়া বলিল, তুমি ভেবো না গোঁসাই, সে বন্দোবস্ত আমাদের হয়ে গেছে। আসচে বারে আমি বড় বোন হয়ে জন্মে ওঁর দুটি কান ভালো করে মলে দেবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার বদলে আমিও একটা সর্ত্ত করিয়ে নিয়েছি গোঁসাই। যদি মরি ওঁকে বোষ্টমীগিরিতে ইস্তফা দিয়ে তোমার সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি মুক্তি পাবো না সে খুব জানি, তখন ভূত হয়ে দিদির ঘাড়ে চাপবো—সেই সিন্ধবাদের দৈত্যের মতো—কাঁধে বসে সব কাজ ওঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বো।

কমললতা সহাস্যে কহিল, তোমার মরে কাজ নেই ভাই, তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারবো না।

সকালে চা খাইয়া বাহির হইলাম গহরের খোঁজে। কমললতা আসিয়া বলিল, বেশী দেরী ক'রো না গোঁসাই, আর তাকেও সঙ্গে করে এনো। এদিকে একজন বামুন ধরে এনেছি আজ ঠাকুরের

ভোগ রাঁধতে। যেমন নোংরা তেমনি কুড়ে, রাজলক্ষ্মী সঙ্গে গেছে তাকে সাহায্য করতে।

বলিলাম, ভালো করো নি। রাজলক্ষ্মীর আজ খাওয়া হবে বটে, কিন্তু তোমার ঠাকুর থাকবে উপবাসী।

কমললতা সভয়ে জিভ কাটিয়া বলিল, অমন কথা বলো না গোঁসাই, সে কানে শুনলে এখানে আর জলগ্রহণ করবে না।

হাসিয়া বলিলাম, চব্বিশ ঘণ্টাও কাটে নি কমললতা, কিন্তু তাকে তুমি চিনেছো।

সে-ও হাসিয়া বলিল, হাঁ গোঁসাই, চিনেছি। শত-লক্ষেও এমন মানুষ তুমি একটিও খুঁজে পাবে না ভাই। তুমিই ভাগ্যবান্।

গহরের দেখা মিলিল না, সে বাড়ী নাই। তাহার এক বিধবা মামাতো ভগিনী থাকে স্নুনাম গ্রামে, নবীন জানাইল সে দেশে কি-এক নূতন ব্যাধি আসিয়াছে, লোক মরিতেছে বিস্তর। দরিদ্র আত্মীয়া ছেলেপুলে লইয়া বিপদে পড়িয়াছে, তাই সে গিয়াছে চিকিৎসা করাইতে। আজ দশ-বারোদিন সংবাদ নাই—নবীন ভয়ে সারা হইয়াছে—কিন্তু কোন পথ তাহার চোখে পড়িতেছে না। হঠাৎ হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার বাবু বোধ হয় আর বেঁচে নেই। মুখ্যু চাষা মানুষ আমি, কখনো গাঁয়ের বা'র হই নি, কোথায় সে দেশ, কোথা দিয়ে যেতে হয়, জানি নে, নইলে ঘর-সংসার সব ভেসে গেলেও নবীন নাকি থাকে এখনো বাড়ী বসে! চক্কোত্তিমশাইকে দিনরাত সাধছি ঠাকুর দয়া করো, তোমাকে জমি বেচে আমি একশ টাকা দেবো, আমাকে একবার নিয়ে চলো, কিন্তু বিট্‌লে বামুন নড়লে না। কিন্তু এও বলে রাখচি বাবু, আমার মনিব যদি যায় মারা, চক্কোত্তিকে ঘরে আগুন দিয়ে আমি পোড়াবো, তারপর সেই আগুনে

নিজে মরবো আত্মহত্যা করে। অত বড়ো নেমকহারামকে আমি জ্যান্ত রাখবো না।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, জেলার নাম জানো নবীন ?

নবীন কহিল, কেবল শুনেচি গাঁখানা আছে নাকি নদে জেলার কোন্ এক টেরে, ইষ্টিশান থেকে অনেক দূরে যেতে হয় গরুর-গাড়ীতে। বলিল, চক্কোত্তি জানে, কিন্তু বামুন তাও বলতে চায় না।

নবীন পুরাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিল, কিন্তু সে সকল হইতে কোন হদিস্ মিলিল না। কেবল মিলিল এই খবরটা যে, মাস-দুই পূর্ব্বেও বিধবা কন্যার মেয়ের বিয়ে বাবদ চক্রবর্ত্তী শ-দুই টাকা গহরের কাছে আদায় করিয়াছে।

বোকা গহরের অনেক টাকা, সুতরাং অক্ষম দরিদ্রেরা ঠকাইবেই, এ লইয়া ক্ষোভ করা বৃথা, কিন্তু এত বড় শয়তানিও সচরাচর চোখে পড়ে না।

নবীন বলিল, বাবু ম'লেই ওর ভালো—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বাঁচে। একপয়সাও আর ধার শোধ করতে হয় না।

অসম্ভব নয়।

গেলাম দুজনে চক্রবর্ত্তীর গৃহে। এমন বিনয়ী, সদালাপী পরদুঃখ-কাতর ভদ্রব্যক্তি সংসারে দুর্লভ ; কিন্তু বৃদ্ধ হইয়া স্মৃতিশক্তি তাঁহার এত ক্ষীণ হইয়াছে যে কিছুই তাঁহার মনে পড়িল না, এমন কি জেলার নাম পর্য্যন্ত না। বহু চেষ্টায় একটা টাইম্-টেব্‌ল সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত রেল-ষ্টেশন একে একে পড়িয়া গেলাম কিন্তু ষ্টেশনের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না। দুঃখ করিয়া বলিলেন, লোকে কত কি জিনিষপত্র টাকাকড়ি ধার বলে চেয়ে নিয়ে যায় বাবা, মনে করতে পারি নে, আদায়ও হয় না। মনে মনে বলি, মাথার ওপর ধর্ম্ম আছেন, তিনিই এর বিচার করবেন।

নবীন আর সহিতে পারিল না, গর্জ্জন করিয়া উঠিল, হাঁ, তিনিই তোমার বিচার করবেন, না করেন করব আমি।

চক্রবর্ত্তী স্নেহার্দ্র মধুর কণ্ঠে বলিলেন, নবীন, মিছে রাগ করিস কেন দাদা, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, পারলে কি আর এটুকু করি নে? গহর কি আমার পর? সে যে আমার ছেলের মত রে!

নবীন কহিল, সে-সব আমি জানি নে, তোমাকে শেষবারের মতো বলচি, বাবুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে ত চলো, নইলে যেদিন তাঁর মন্দ খবর পাবো সেদিন রইলে তুমি আর আমি।

চক্রবর্ত্তী প্রত্যুত্তরে ললাটে করাঘাত করিয়া শুধু বলিলেন, কপাল নবীন, কপাল। নইলে তুই আমাকে এমন কথা বলিস!

অতএব, পুনরায় দুজনে ফিরিয়া আসিলাম। বাটির বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি ক্ষণকাল আশা করিলাম অনুতপ্ত চক্রবর্ত্তী যদি এখনো ফিরিয়া ডাকে; কিন্তু কোন সাড়া আসিল না, দ্বারের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, চক্রবর্ত্তী পোড়া কলিকাটি ঢালিয়া ফেলিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক সাজিতে বসিয়াছে।

গহরের সংবাদ পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় মেয়েদের ভীড় জমিয়াছে, বাবাজীরা কেহ নাই, সম্ভবতঃ সুপ্রচুর প্রসাদ সেবার পরিশ্রমে নির্জীব হইয়া কোথাও বিশ্রাম করিতেছেন। রাত্রিকালে আর একদফা লড়িতে হইবে তাহার বল-সঞ্চয়ের প্রয়োজন।

উঁকি মারিয়া দেখিলাম ভীড়ের মাঝখানে বসিয়া এক গণক, পাঁজিপুঁথি, খড়ি, শেলেট, পেন্সিল প্রভৃতি গণনার যাবতীয় উপকরণ তাহার কাছে। আমার প্রতি সর্ব্বাগ্রে চোখ পড়িল পদ্মার, সে চেঁচাইয়া উঠিল, নতুনগোঁসাই এসেছে!

কমললতা বলিল, তখনি জানি গহর গোঁসাই তোমাকে এমনি ছেড়ে দেবে না, কি খেলে সে—

রাজলক্ষ্মী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—থাক্ দিদি, ও আর জিজ্ঞাসা ক'রো না।

কমললতা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, রোদ্দুরে মুখ শুকিয়ে গেছে, রাজ্যের ধূলোবালি উঠেছে মাথায়—স্নানটান হয়েছো তো ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তেল ছোঁন না, হলেও ত বোঝা যাবে না দিদি।

অবশ্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই নবীন করিয়াছে, কিন্তু আমি স্বীকার করি নাই, অস্নাত অভুক্তই ফিরিয়া আসিয়াছি।

রাজলক্ষ্মী মহানন্দে কহিল, গণকঠাকুর আমার হাত দেখে বলেছে আমি রাজরাণী হবো।

কি দিলে ?

পদ্মা বলিয়া দিল—পাঁচ টাকা। রাজলক্ষ্মীদিদির আঁচলে বাঁধা ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাকে দিলে আমি তার চেয়েও ভালো বলতে পারতাম।

গণক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, বেশ বাংলা বলিতে পারে—বাঙ্গালী বলিলেই হয়—সেও হাসিয়া কহিল, না মশাই, টাকার জন্যে নয়, টাকা আমি অনেক রোজগার করি। সত্যিই এমন ভালো হাত আমি আর দেখি নি। দেখবেন, আমার হাত দেখা কখনো মিথ্যে হবে না।

বলিলাম, ঠাকুর, হাত না দেখে কিছু বলতে পারো কি ?

সে কহিল, পারি। একটা ফুলের নাম করুন।

বলিলাম, শিমুল ফুল।

গণক হাসিয়া কহিল, শিমুল ফুলই সই। আমি এর থেকেই

বলে দেবো আপনি কি চান। এই বলিয়া সে খড়ি দিয়া মিনিট-দুই আঁক কষিয়া হিসাব করিয়া বলিল, আপনি চান একটা খবর জানতে।

কি খবর?

সে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল, না—মামলা-মোকদ্দমা নয়; আপনি কোন লোকের খবর পেতে চান।

খবরটা বলতে পারো ঠাকুর?

পারি। খবর ভালো; দু-একদিনেই জানতে পারবেন।

শুনিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম, এবং আমার মুখ দেখিয়া সকলেই তাহা অনুমান করিল।

রাজলক্ষ্মী খুশী হইয়া কহিল, দেখলে ত। আমি বলচি ইনি খুব ভালো গোণেন, কিন্তু তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না —হেসে উড়িয়ে দাও।

কমললতা বলিল, অবিশ্বাস কিসের? নতুনগোঁসাই, দেখাও ত ভাই তোমার হাতটা একবার ঠাকুরকে।

আমি করতল প্রসারিত করিয়া ধরিতে গণক নিজের হাতে লইয়া মিনিট দুই-তিন সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিল, হিসাব করিল, তারপরে বলিল, মশায়, আপনার ত দেখি মস্ত ফাঁড়া—

ফাঁড়া? কবে?

খুব শীঘ্র। মরণ-বাঁচনের কথা।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই—ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে।

গণক আমার হাতটা ছাড়িয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, দেখি মা তোমার হাতটা আর একবার—

না। আমার হাত দেখতে হবে না—হয়েছে।

তাহার তীব্র ভাবান্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুর গণকে তৎক্ষণাৎ বুঝিল হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই, বলিল, আমি ত দর্পণ মাত্র

মা ; ছায়া যা পড়বে তাই আমার মুখে ফুটবে—কিন্তু রুষ্ট গ্রহকেও শান্ত করা যায়, তার ক্রিয়া আছে—সামান্য দশ-কুড়ি টাকা খরচের ব্যাপার মাত্র।

তুমি আমাদের কলকাতার বাড়ীতে যেতে পারো ?

কেন পারবো না মা, নিয়ে গেলেই পারি।

আচ্ছা।

দেখিলাম তাহার গ্রহের কোপের প্রতি পুরা বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহাকে প্রসন্ন করার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ।

কমললতা বলিল, চলো গোঁসাই, তোমার চা তৈরি করে দিই গে—খাবার সময় হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি তৈরী করে আনচি দিদি, তুমি ওঁর বসবার জায়গাটা একটু ঠিক করে দাও গে। রতনকে বলো তামাক দিতে। কাল থেকে তার ছায়া দেখবার যো নেই।

অন্যান্য সকলে গণৎকার লইয়া কলরব করিতে লাগিল, আমরা চলিয়া আসিলাম।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আমার দড়ির খাট, রতন ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া দিল, তামাক দিল, হাত-মুখ ধোয়ার জল আনিয়া দিল—কাল সকাল হইতে বেচারার খাটুনির বিরাম নাই, অথচ কর্ত্রী বলিলেন তাহার ছায়া পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। ফাঁড়া আমার আসন্ন, কিন্তু রতনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয় বলিত, আজ্ঞে না, ফাঁড়া আপনার নয়—আমার।

কমললতা নীচে বারান্দায় বসিয়া গহরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, রাজলক্ষ্মী চা লইয়া আসিল, মুখ অত্যন্ত ভারী, সুমুখের টুলে বাটিটা রাখিয়া দিয়া কহিল, ছাখো, তোমাকে একশোবার বলেচি বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ো না—বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ?

তোমাকে গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড় করচি কথাটা আমার শোনো।

এতক্ষণ চা তৈরী করিতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী বোধ হয় ইহাই ভাবিয়া স্থির করিয়াচিল। 'খুব শীঘ্র' অর্থে আর কি হইতে পারে?

কমললতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বনে-জঙ্গলে গোঁসাই আবার কখন গেলো?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কখন গেলেন সে কি আমি দেখে রেখেচি দিদি? আমার কি সংসারে আর কাজ নেই?

আমি বলিলাম, ও দেখে নি, ওর অনুমান। গণক ব্যাটা আচ্ছা বিপদ ঘটিয়ে গেল।

শুনিয়া রতন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, গণকের দোষটা কি? সে যা দেখবে তাইত বলবে? পৃথিবীতে ফাঁড়া বলে কি কথা নেই? বিপদ কারও কখনো ঘটে না নাকি?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া বৃথা। কমললতাও রাজলক্ষ্মীকে চিনিয়াছে, সে চুপ করিয়া রহিল।

চায়ের বাটিটা আমি হাতে করা মাত্র রাজলক্ষ্মী কহিল, অমনি দুটো ফল আর মিষ্টি নিয়ে আসি গে?

বলিলাম, না।

না কেন? না ছাড়া হাঁ বলতে কি ভগবান তোমাকে দেন নি? কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা অধিকতর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার চোখ দুটো অতো রাঙা দেখাচ্চে কেন? পচা নদীর জলে নেয়ে আসো নি ত?

না, স্নানই আজ করি নি।

কি খেলে সেখানে?

খাই নি কিছুই। ইচ্ছেও হয় নি।

কি ভাবিয়া কাছে আসিয়া সে আমার কপালের উপর হাত রাখিল, তারপরে জামার ভিতরে আমার বুকের কাছে সেই হাতটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল, যা ভেবেছি ঠিক তাই। কমলদিদি, দেখো ত এঁর গা-টা—গরম বোধ হচ্ছে না?

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল না, কহিল, হলোই বা একটু গরম রাজু—ভয় কি?

সে নামকরণে অত্যন্ত পটু। এই নূতন নামটা আমারও কানে গেল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার মানে জ্বর যে দিদি!

কমললতা কহিল, তাই যদি হয়েই থাকে তোমরা জলে এসে ত পড়ো নি? এসেছো আমাদের কাছে, আমরাই তার ব্যবস্থা করবো ভাই, তোমার কিছু চিন্তা নেই।

নিজের এই অসঙ্গত ব্যাকুলতায় অপরের অবিচলিত শান্ত-কণ্ঠ রাজলক্ষ্মীকে প্রকৃতিস্থ করিল, সে লজ্জা পাইয়া কহিল, তাই বলো দিদি। একে এখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, তাতে বার বার দেখেচি ওঁর কিছু একটা হলে সহজে সারে না—ভারি ভোগায়। আবার কোথা থেকে এসে ঐ গোণকার পোড়ারমুখো ভয় দেখিয়ে দিলে—

দেখালেই বা।

না ভাই দিদি, আমি দেখেচি কিনা ওদের ভালো কথা ফলে না, কিন্তু মন্দটি ঠিক খেটে যায়।

কমললতা স্মিতহাস্যে কহিল, ভয় নেই রাজু, এ ক্ষেত্রে খাটবে না। সকাল থেকে গোঁসাই রোদ্দুরে অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, তাতে সময় স্নানাহার হয় নি, তাই হয়ত গা একটু তপ্ত হয়েছে—কাল সকালে থাকবে না।

লালুর মা আসিয়া কহিল, মা, রান্নাঘরে বামুনঠাকুর তোমাকে ডাকচে।

যাই, বলিয়া সে কমললতার প্রতি একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল।

আমার রোগের সম্বন্ধে কমললতার কথাই ফলিল। জ্বরটা ঠিক সকালেই গেল না বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম; কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের ভিতরের কথাটা কমললতা টের পাইল, এবং আরও একজন বোধ হয় পাইলেন তিনি বড়গোঁসাইজী নিজে।

যাবার দিন আমাদের আড়ালে ডাকিয়া কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, গোঁসাই, তোমাদের বিয়ের বছরটি মনে আছে ভাই? নিকটেই দেখি একটা থালায় ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও ফুলের মালা।

প্রশ্নের জবাব দিল রাজলক্ষ্মী, বলিল, উনি ছাই জানেন—জানি আমি।

কমললতা হাসিমুখে কহিল, এ কি রকম কথা যে একজনের মনে রইলো আর একজনের রইলো না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, খুব ছোট বয়সে কিনা—তাই। ওঁর তখনো ভালো জ্ঞান হয় নি।

কিন্তু উনিই যে বয়সে বড়ো রে রাজু?

ইঃ ভারী বড়ো। মোটে পাঁচ-ছ বছরের। আমার বয়স তখন আট-ন' বছর, একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, আজ থেকে তুমি হলে আমার বর! বর! বর! এই বলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, কিন্তু ও-রাক্ষস তক্ষণি আমার মালা সেইখানে দাঁড়িয়ে খেয়ে ফেললে।

কমললতা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ফুলের মালা খেয়ে ফেললে কি ক'রে?

আমি বলিলাম, ফুলের মালা নয়, পাকা বঁইচি ফলের মালা। সে যাকে দেবে সেই খেয়ে ফেলবে।

কমললতা হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু সেই থেকে সুরু হলো আমার দুর্গতি। ওঁকে ফেললুম হারিয়ে, তার পরের কথা আর জানতে চেয়ো না দিদি—কিন্তু লোকে যা ভাবে তাও না—তারা কত কিই না ভাবে! তারপরে অনেকদিন কেঁদে কেঁদে হাতড়ে বেড়ালুম খুঁজে খুঁজে—তখন ঠাকুরের দয়া হলো—যেমন নিজে দিয়েও হঠাৎ একদিন কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ আর একদিন হাতে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। এই বলিয়া সে উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

কমললতা বলিল, সেই ঠাকুরের মালা-চন্দন বড়গোঁসাই দিয়েছেন পাঠিয়ে, আজ ফিরে যাবার দিনে তোমরা দুজনকে দুজনে পরিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, ওঁর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে ও আদেশ ক'রো না। আমার ছেলেবেলার সেই রাঙা-মালা আজও চোখ বুজলে ওঁর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সেই মালাই চিরদিন থাক্ দিদি।

বলিলাম, কিন্তু সে-মালা ত খেয়ে ফেলেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁ গো রাক্ষস—এইবার আমাকে সুদ্ধ খাও। এই বলিয়া সে হাসিয়া চন্দনের বাটিতে সব কয়টি আঙ্গুল ডুবাইয়া আমার কপালে ছাপ মারিয়া দিল।

সকলে দ্বারিকাদাসের ঘরে গেলাম দেখা করিতে। তিনি কি একটা গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত ছিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, এসো ভাই, বসো।

রাজলক্ষ্মী মেজেতে বসিয়া বলিল, বসবার যে আর সময় নেই

গোঁসাই। অনেক উপদ্রব করেছি, যাবার আগে তাই নমস্কার জানিয়ে তোমার ক্ষমা ভিক্ষে করতে এলুম।

গোঁসাই বলিলেন, আমরা বৈরাগী মানুষ, ভিক্ষে নিতেই পারি, দিতে পারবো না ভাই; কিন্তু আবার কবে উপদ্রব করতে আসবে বল ত দিদি? আশ্রমটি যে আজ অন্ধকার হয়ে যাবে।

কমললতা বলিল, সত্যি কথা গোঁসাই—সত্যিই মনে হবে বুঝি আজ কোথাও আলো জ্বলে নি, সব অন্ধকার হয়ে আছে।

বড়গোঁসাই বলিলেন, গানে, আনন্দে, হাসিতে, কৌতুকে এ কয়দিন মনে হচ্ছিল যেন চারিদিকে আমাদের বিদ্যুতের আলো জ্বলচে—এমন আর কখনো দেখি নি। আমাকে বলিলেন, কমললতা তোমার নাম দিয়েছে নতুনগোঁসাই, আর আমি ওর নাম দিলাম আনন্দময়ী।

এইবার তাঁহার উচ্ছ্বাসে আমাকে বাধা দিতে হইল, বলিলাম, বড়গোঁসাই, বিদ্যুতের আলোটাই আমাদের চোখে লাগলো, কিন্তু তার কড়কড় ধ্বনি যাদের দিবারাত্রি কর্ণরন্ধ্রে পশে তাদের একটু জিজ্ঞাসা করো? আনন্দময়ীর সম্বন্ধে অন্ততঃ, রতনের মতামতটা—

রতন পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ওদের কথা তুমি শুনো না গোঁসাই, ওরা দিন-রাত আমায় হিংসে করে। আমার পানে চাহিয়া কহিল, এবার যখন আসবো এই রোগা-পট্‌কা অরসিক লোকটিকে ঘরে তালাবন্ধ করে আসবো—ওঁর জ্বালায় কোথাও গিয়ে যদি আমার স্বস্তি আছে!

বড়গোঁসাই বলিলেন, পারবে না আনন্দময়ী—পারবে না। ফেলে আসতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, নিশ্চয় পারবো। সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছে হয় গোঁসাই, যেন আমি শীগ্‌গির মরি।

বড়গোঁসাই বলিলেন, এ ইচ্ছে ত বৃন্দাবনে একদিন তাঁর মুখেও

প্রকাশ পেয়েছে ভাই, কিন্তু পারেন নি। হাঁ, আনন্দময়ি, কথাটি তোমার কি মনে নেই? সখি! কারে দিয়ে যাবো, তারা কানু-সেবার কি বা জানে—

বলিতে বলিতে তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, সত্য প্রেমের কতটুকুই বা জানি আমরা? কেবল ছলনায় নিজেদের ভোলাই বই ত নয়; কিন্তু তুমি জানতে পেরেছো ভাই। তাই বলি তুমি যেদিন এ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করবে, আনন্দময়ি—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন শিহরিয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, এমন আশীর্ব্বাদ ক'রো না গোসাই, এমন যেন না কপালে ঘটে। বরঞ্চ, আশীর্বাদ করো এমনি হেসে-খেলেই একদিন যেন ওকে রেখে মরতে পারি।

কমললতা কথাটা সামলাইয়া লইতে বলিল, বড়গোঁসাই তোমার ভালবাসার কথাটাই বলেছেন রাজু, আর কিছু নয়।

আমি বুঝিয়াছিলাম অনুক্ষণ অন্য ভাবের ভাবুক দ্বারিকাদাস—তাঁহার চিন্তার ধারাটা সহসা আর এক পথে চলিয়া গিয়াছিল মাত্র।

রাজলক্ষ্মী শুষ্কমুখে বলিল, একে ত এই শরীর, তাতে একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে—একগুঁইয়ে লোক, কারও কথা শুনতে চান না—আমি দিনরাত কি ভয়ে ভয়েই যে থাকি দিদি, সে আর জানাবো কাকে?

এইবার মনে মনে আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, যাবার সময়ে কথায় কথায় কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি আমাকে অবহেলায় বিদায় দেওয়ার যে মর্মান্তিক আত্মগ্লানি লইয়া এবার রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে আসিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার হাস্য-পরিহাসের অন্তরালেও কি একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার মন হইতে কিছুতে ঘুচিতেছে না। সেইটা শান্ত করার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলাম, তুমি যতই কেন না লোকের

কাছে আমার রোগাদেহের নিন্দে করো লক্ষ্মী, এ দেহের বিনাশ নেই। আগে তুমি না মরলে আমি মরচি নে এ নিশ্চয়—

কথাটা সে শেষ করিতেও দিল না, খপ্ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তবে তুমি তিন সত্যি করো! বলো এ কথা কখনো মিথ্যা হবে না! বলিতে বলিতেই উদ্গত অশ্রুতে দুই চক্ষু তাহার উপ্চাইয়া উঠিল।

সবাই অবাক্ হইয়া রহিল। তখন, লজ্জায় হাতটা আমার সে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, ঐ পোড়ামুখো গোণক্কারটা মিছামিছি আমাকে এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে—

এ কথাটাও সে সম্পূর্ণ করিতে পারিল না, এবং মুখের হাসি ও লজ্জার বাধা সত্ত্বেও ফোঁটা দুই চোখের জল তাহার গালের উপরে গড়াইয়া পড়িল।

আবার একবার সকলের কাছে একে একে বিদায় লওয়া হইল। বড়গোঁসাই কথা দিলেন এবার কলিকাতায় গেলে আমাদের ওখানে তিনি পদার্পণ করিবেন এবং পদ্মা কখনো সহর দেখে নাই, সেও সঙ্গে যাইবে।

ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া সর্বাগ্রে চোখে পড়িল সেই 'পোড়ারমুখো গণক্কার' লোকটাকে। প্লাটফর্মে কম্বল পাতিয়া বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, আশেপাশে লোকও জুটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ও সঙ্গে যাবে নাকি ?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ হাসি আর একদিকে চাহিয়া গোপন করিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল সেও সঙ্গে যাইবে।

বলিলাম্, না, ও যাবে না।

কিন্তু ভালো না হোক, মন্দ কিছু ত হবে না। আসুক না সঙ্গে।

বলিলাম, না। ভালোমন্দ যাই হোক ও আসবে না, ওকে যা দেবার দিয়ে এখান থেকেই বিদায় করো, ওর গ্রহশান্তি করার ক্ষমতা এবং সাধুতা যদি থাকে যেন তোমার চোখের আড়ালেই করে।

তবে তাই বলে দিই, এই বলিয়া সে রতনকে দিয়া তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইল। তাহাকে কি দিল জানি না, কিন্তু সে অনেক-বার মাথা নাড়িয়া ও অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া সহাস্যমুখে বিদায় গ্রহণ করিল।

অনতিবিলম্বে ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা অভিমুখে আমরাও যাত্রা করিলাম।

বার

রাজলক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে আমার অর্থাগমের বৃত্তান্তটা প্রকাশ করিতে হইল। আমাদের বর্ম্মা-অফিসের একজন বড়-দরের সাহেব ঘোড়দৌড়ের খেলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া আমার জমানো টাকা ধার লইয়া ছিলেন। নিজেই সর্ত্ত করিয়াছিলেন শুধু সুদ নয়, সুদিন যদি আসে মুনাফার অর্দ্ধেক দিবেন। এবার কলিকাতায় আসিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইলে তিনি কর্জ্জের চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই আমার সম্বল।

সেটা কত?

আমার পক্ষে অনেক, কিন্তু তোমার কাছে অতিশয় তুচ্ছ।

কত শুনি?

সাত-আট হাজার।

এ আমাকে দিতে হবে।

সভয়ে কহিলাম, সে কি কথা! লক্ষ্মী দানই করেন, তিনি হাতও পাতেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, লক্ষ্মীর অপব্যয় সয় না। তিনি সন্ন্যাসী ফকিরকে বিশ্বাস করেন না—তারা অযোগ্য বলে। আনো টাকা।

কি করবে?

করবো আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান। এখন থেকে এই হবে আমার বাঁচবার মূলধন।

কিন্তু এটুকু মূলধনে চলবে কেন? তোমার একপাল দাসী-চাকরের পনের দিনের মাইনে দিতেই যে কুলোবে না। এর ওপর আছে গুরু-পুরুত, আছে তেত্রিশকোটি দেবদেবতা, আছে বহু বিধবার ভরণপোষণ—তাদের উপায় হবে কি?

তাদের জন্য ভাবনা নেই, তাদের মুখ বন্ধ হবে না। আমার নিজের ভরণপোষণের কথাই ভাবচি। বুঝলে?

বলিলাম, বুঝেচি। এখন থেকে কোন একটা ছলনায় আপনাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও—এই ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, তা নয়। সে সব টাকা রইল অন্য কাজের জন্যে, কিন্তু তোমার কাছে হাত পেতে যা নেবো এখন থেকে সেই হবে আমার ভবিষ্যতের পুঁজি। কুলোয় খাবো, না হয় উপোস করবো।

তা হ'লে তোমার অদৃষ্টে তাই আছে।

কি আছে—উপোস? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তুমি ভাবচো সামান্য, কিন্তু সামান্যকেই কি করে বাড়িয়ে বড় ক'রে তুলতে হয় সে বিদ্যে আমি জানি। একদিন বুঝবে আমার ধনের সম্বন্ধে তোমরা যা সন্দেহ করো তা সত্যি নয়।

এ কথা এতদিন বলো নি কেন?

বলি নি বিশ্বাস করবে না বলে। আমার টাকা তুমি ঘৃণায় ছোঁও না, কিন্তু তোমার বিতৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায়।

ব্যথিত হইয়া কহিলাম, হঠাৎ এসব কথা আজ কেন বলচো লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আজ হঠাৎ ঠেকবে কিন্তু এ যে আমার রাত্রি-দিনের ভাবনা। তুমি কি ভাবো অধর্ম্ম-পথের উপার্জন দিয়ে আমি ঠাকুরদেবতার সেবা করি? সে-অর্থের এক কণা তোমার চিকিৎসায় খরচ করলে তোমাকে কি বাঁচাতে পারতুম? ভগবান আমার কাছে থেকে তোমাকে কেড়ে নিতেন। আমি যে তোমারই, এ কথা সত্যি বলে তুমি বিশ্বাস করো কই।

বিশ্বাস করি ত।

না, করো না।

তাহার প্রতিবাদের তাৎপর্য বুঝিলাম না। সে বলিতে লাগিল, কমললতার সঙ্গে পরিচয় তোমার দুদিনের, তবু তার সমস্ত কাহিনী তুমি মন দিয়ে শুনলে, তোমার কাছে তার সকল বাধা ঘুচলো—সে মুক্ত হয়ে গেল; কিন্তু আমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করলে না, কোন কথা কখনো বললে না, লক্ষ্মী, তোমার সব ঘটনা আমাকে খুলে বলো। কেন জিজ্ঞাসা করো নি? করো নি ভয়ে, কিন্তু বিশ্বাস করো না আমাকে, তুমি বিশ্বাস করতে পারো না আপনাকে।

বলিলাম, তাকেও জিজ্ঞাসা করি নি, জানতেও চাই নি। নিজে সে জোর করে শুনিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত শুনেচো। সে পর, তার বৃত্তান্ত শুনতে চাও নি প্রয়োজন নেই বলে। আমাকেও কি তাই বলবে নাকি?

না, তা বলবো না; কিন্তু তুমি কি কমললতার চেলা? সে যা করেচে তোমাকেও তাই করতে হবে?

ও কথায় আমি ভুলবো না। আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে।

এ ত বড় মুস্কিল। আমি চাইনে শুনতে, তবু শুনতেই হবে?

হাঁ, হবে। তোমার ভাবনা, শুনলে হয়ত আমাকে আর ভালোবাসতে পারবে না, হয়ত বা আমাকে বিদায় দিতে হবে।

তোমার বিবেচনায় সেটা তুচ্ছ ব্যাপার নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না, সে হবে না—তোমাকে শুনতেই হবে। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার মনে এতটুকু জোর নেই যে উচিত মনে হলে আমাকে দূর করে দিতে পারো।

এই অক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া কবুল করিয়া বলিলাম, তুমি যে সকল জোরালো পুরুষদের উল্লেখ করে আমাকে অপদস্থ করচো লক্ষ্মী, তাঁরা বীরপুরুষ—নমস্য ব্যক্তি। তাঁদের পদধূলির যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে বিদায় দিয়ে একটা দিনও আমি থাকতে পারবো না, হয়ত তখনি ফিরিয়ে আনতে দৌড়বো, এবং তুমি 'না' বলে বসলে আমার দুর্গতির অবধি থাকবে না। অতএব এ সকল ভয়াবহ বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি জানো, ছেলেবেলায় মা আমাকে এক মৈথিলী-রাজপুত্রের হাতে বিক্রী করে দিয়েছিলেন।

হাঁ, আর এক রাজপুত্রের মুখে খবরটা শুনেছিলাম অনেক কাল পরে। সে ছিল আমার বন্ধু।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁ, তোমার বন্ধুরই বন্ধু ছিল সে। একদিন মাকে রাগ করে বিদায় করে দিলুম, তিনি দেশে ফিরে এসে রটালেন আমার মৃত্যু। এখবর তো শুনেছিলে?

হাঁ, শুনেছিলাম।

শুনে তুমি কি ভাবলে?

ভাবলাম, আহা! লক্ষ্মী মরে গেল!

এই? আর কিছু না?

আরও ভাবলাম, কাশীতে মরে তবু যা হোক একটা সগ্গতি হলো। আহা!

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, যাও—মিথ্যে আহা! আহা! করে তোমাকে দুঃখ জানাতে হবে না। তুমি একটা 'আহা'ও বলো নি আমি দিব্যি করে বলতে পারি! কই, আমাকে ছুঁয়ে বল ত?

বলিলাম, এতদিন আগেকার কথা কি ঠিক মনে থাকে? বলেছিলাম বলেই যেন মনে পড়চে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, থাক্, কষ্ট করে অতদিনের পুরানো কথা আর মনে ক'রে কাজ নেই, আমি সব জানি। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া থামিয়া বলিল, আর আমি? কেঁদে কেঁদে বিশ্বনাথকে প্রত্যহ জানাতুম, ভগবান, আমার অদৃষ্টে এ তুমি কি করলে! তোমাকে সাক্ষী রেখে যাঁর গলায় মালা দিয়েছিলুম, এ জীবনে তাঁর দেখা কি কখনো পাবো না? এমনি অশুচি হয়েই চিরকাল কাটবে? সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছে করে।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ক্লেশ বোধ হইল, কিন্তু আমার নিষেধ শুনিবে না বুঝিয়া মৌন হইয়া রহিলাম।

এই কথাগুলি সে অন্তরে অন্তরে কতদিন, কতভাবে তোলা-পাড়া করিয়াছে, আপন অপরাধে ভারাক্রান্ত মনে নীরবে কত মর্ম্মান্তিক বেদনাই সহ্য করিয়াছে, তবু প্রকাশ পাইতে ভরসা পায় নাই পাছে কি করিতে কি হইয়া যায়। এতদিনে এই শক্তি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে সে কমললতার কাছে। বৈষ্ণবী আপন প্রচ্ছন্ন কলুষ অনাবৃত করিয়া মুক্তি পাইয়াছে, রাজলক্ষ্মী নিজেও আজ ভয় ও মিথ্যা মর্য্যাদার শিকল ছিঁড়িয়া তাহারি মতো সহজ হইয়া

দাঁড়াইতে চায়, অদৃষ্টে তাহার যাহাই কেননা ঘটুক। এ বিদ্যা দিয়াছে তাহাকে কমললতা। সংসারে একটিমাত্র মানুষের কাছেও যে এই দর্পিতা নারী হেঁট হইয়া আপন দুঃখের সমাধান ভিক্ষা করিয়াছে, এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া মনের মধ্যে ভারী একটা তৃপ্তিবোধ করিলাম।

উভয়েই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া রাজলক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিল, রাজপুত্র হঠাৎ মারা গেলেন, কিন্তু মা আবার চক্রান্ত করিলেন আমাকে বিক্রী করবার—

এবার কার কাছে ?

অপর একটি রাজপুত্র—তোমার সেই বন্ধু-রত্নটি—যাঁর সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে—কি হলো মনে নেই ?

বলিলাম, সে-ই বোধ হয়। অনেকদিনের কথা কিনা ; কিন্তু তারপরে ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ষড়যন্ত্র খাটলো না। বললুম, মা তুমি বাড়ী যাও। মা বললেন, হাজার টাকা নিয়েছি যে। বললুম, সেই টাকা নিয়ে তুমি দেশে যাও, দালালির টাকা যেমন করে পারি আমি শোধ করে দেবো। বললুম, আজ রাত্রির গাড়ীতেই যদি বিদায় না হও মা, কাল সকালেই দেবো আমি আপনাকে আপনি বিক্রী করে মা-গঙ্গার জলে। জানো ত মা আমাকে, আমি মিথ্যে ভয় তোমাকে দেখাচ্চি নে। মা বিদায় হলেন। তাঁর মুখেই আমার মরণ-সংবাদ পেয়ে তুমি দুঃখ করে বলেছিলে—আহা মরে গেল! এই বলিয়া সে নিজেই একটুখানি হাসিল, বলিল, সত্যি হলে তোমার মুখের সেই আহাটুকুই আমার ঢের ; কিন্তু এবার যেদিন সত্যি সত্যিই মরবো সেদিন কিন্তু দুফোঁটা চোখের জল ফেলো। ব'লো পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালা বদল করেছে, তাহা-দের প্রেমে জগৎ পবিত্র, পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত

ভালোবেসেছে, এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন কাউকে বাসে নি। আমার কানে কানে তখন বলবে বলো এই কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাবো।

এ কি, তুমি কাঁদচো যে?

সে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, নিরুপায় ছেলে-মানুষের ওপর তার আত্মীয়-স্বজন যত অত্যাচার করেছে, অন্তর্যামী ভগবান কি তা দেখতে পান নি ভাবো? এর বিচার তিনি করবেন, না চোখ বুঁজেই থাকবেন?

বলিলাম, থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি; কিন্তু তাঁর ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো, আমার মতো পাষণ্ডের পরামর্শ তিনি কোন কালেই নেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কেবল ঠাট্টা? কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, আচ্ছা, লোকে যে বলে স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম এক না হলে চলে না, কিন্তু ধর্ম্মে-কর্ম্মে তোমার আমার ত সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তোমাদের তবে চলে কি করে?

চলে সাপে-নেউলের মতোই। একালে প্রাণে বধ করায় হাঙ্গামা আছে, তাই একজন আর একজনকে বধ করে না, নির্ম্মম হয়ে বিদায় করে করে দেয়, যখন আশঙ্কা হয় তার ধর্ম্মসাধনায় বিঘ্ন ঘটচে।

তারপরে কি হয়?

হাসিয়া বলিলাম, তারপরে সে নিজেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। নাকে খত দিয়ে বলে, আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে, এ জীবনে এত বড় ভুল আর করবো না, রইলো আমার জপ-তপ, গুরু-পুরুত—আমাকে ক্ষমা কর।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল, কহিল, ক্ষমা পায় ত?

পায়, কিন্তু তোমার গল্পের কি হলো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বলচি। ক্ষণকাল নিষ্পলক চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মা দেশে চলে গেলেন। আমাকে

একজন বুড়ো ওস্তাদ গান-বাজনা শেখাতেন, লোকটি বাঙ্গালী, এককালে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু ইস্তফা দিয়ে আবার সংসারী হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে ছিল মুসলমান স্ত্রী, তিনি শেখাতে আসতেন আমাকে নাচ। তাঁকে বলতুম আমি দাদামশাই—আমাকে সত্যিই বড় ভালবাসতেন। কেঁদে বললুম, দাদামশাই, আমাকে তুমি রক্ষা করো, এ সব আর আমি পারবো না। তিনি গরীব লোক, হঠাৎ সাহস করলেন না। আমি বললুম, আমার যে টাকা আছে তাতে অনেকদিন চলে যাবে। তারপর কপালে যা আছে হবে, এখন কিন্তু পালাই চলো। তারপরে তাঁদের সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরলুম—এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, মথুরা —শেষে আশ্রয় নিলুম এসে পাটনায়। অর্দ্ধেক টাকা জমা দিলুম এক মহাজনের গদীতে, আর অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে ভাগে খুললুম একটা মনোহারী আর একটা কাপড়ের দোকান। বাড়ী কিনে খোঁজ করে বঙ্কুকে আনিয়ে নিয়ে দিলুম তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে, আর জীবিকার জন্যে যা করতুম সে ত তুমি নিজের চোখেই দেখেচো।

তাহার কাহিনী শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তারপরে বলিলাম, তুমি বলেই অবিশ্বাস হয় না—আর কেউ হলে মনে হতো মিথ্যা বানানো একটা গল্প শুনছি মাত্র।

রাজলক্ষ্মী কহিল, মিথ্যে বলতে বুঝি আমি পারি নে?

বলিলাম, পারো হয়ত, কিন্তু আমার কাছে আজও বলো নি বলেই আমার বিশ্বাস।

এ বিশ্বাস কেন?

কেন? তোমার ভয়, মিথ্যে ছলনায় পাছে কোন দেবতা রুষ্ট হন। তোমাকে শাস্তি দিতে পাছে আমার অকল্যাণ করেন?

আমার মনের কথাই বা জানতে পারো কি করে ?

আমি পারি এ আমার দিবানিশির ভাবনা বলে, কিন্তু তোমার ত তা নয়।

হলে খুশী নও ?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হই নে। আমি তোমার দাসী, দাসীকে তার চেয়ে বেশী ভাববে না এই আমি চাই।

উত্তরে বলিলাম, সেই সে-যুগের মানুষ তুমি—সেই হাজার বছরের পুরনো সংস্কার।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাই যেন আমি হতে পারি! এমনি যেন চিরদিন থাকি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ যুগের মেয়েদের আমি দেখি নি তুমি ভাবচো ? অনেক দেখেচি। বরঞ্চ তুমিই দেখো নি, কিম্বা দেখেছো কেবল বাইরে থেকে। এদের কারুর সঙ্গে আমাকে বদল করো ত দেখি কেমন থাকতে পারো ? আমাকে ঠাট্টা করছিলে নাক খত দিয়েছি ব'লে, তখন তুমি দেবে দশ হাত মেপে নাক খত!

কিন্তু এ মীমাংসা যখন হবার নয় তখন ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। কেবল এইটুকু বলতে পারি, এঁদের সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত অবিচার করচো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, অবিচার যদি করেও থাকি অত্যন্ত অবিচার করি নি তা বলতে পারি। ওগো গোঁসাই, আমিও যে অনেক ঘুরেচি, অনেক দেখেচি। তোমরা যেখানে অন্ধ সেখানেও যে আমাদের দশজোড়া চোখ খোলা।

কিন্তু সে-দেখেচো রঙিন চশমা দিয়ে, তাই সমস্ত ভুল দেখেচো। দশ জোড়াই ব্যর্থ।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, কি বলবো, আমার হাত-পা বাঁধা, নইলে এমন জব্দ করতুম যে জন্মে ভুলতে না; কিন্তু সে থাক্ গে, আমি সে-যুগের মতো তোমার দাসী হয়েই যেন থাকি, তোমার

সবাই যেন হয় আমার সবচেয়ে বড় কাজ; কিন্তু তোমাকে আমার কথা ভাবতে আমি একটুও দেবো না। সংসারে তোমার অনেক কাজ—এখন থেকে তাই করতে হবে। হতভাগীর জন্যে তোমার অনেক সময় এবং আরও অনেক কিছু গেল—আর নষ্ট করতে আমি দেবো না।

বলিলাম, এইজন্যেই ত আমি যত শীঘ্র পারি সেই সাবেক চাকরীতে গিয়ে ভর্ত্তি হতে চাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাকরী করতে তোমাকে ত দিতে পরেবো না।

কিন্তু মনোহারী দোকান চালাতেও ত আমি পেরে উঠবো না।

কেন পেরে উঠবে না?

প্রথম কারণ, জিনিষের দাম আমার মনে থাকে না, দ্বিতীয় কারণ, দাম নেওয়া এবং দ্রুত হিসেব করে বাকি ফিরিয়ে দেওয়া সে আরও অসম্ভব। দোকান ত উঠবেই, খদ্দেরের সঙ্গে লাঠালাঠি না বাধলে বাঁচি।

তবে একটা কাপড়ের দোকান করো।

তার চেয়ে একটা জ্যান্ত-ভালুকের দোকান করে দাও, সে বরঞ্চ চালানো সহজ হবে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, একমনে এত আরাধনা করে কি শেষে ভগবান এমনি একটা অকর্ম্মা মানুষ আমাকে দিলেন যাকে নিয়ে সংসারে এতটুকু কাজ চলে না!

বলিলাম, আরাধনায় ত্রুটি ছিল। সংশোধনের সময় আছে, এখনো কর্ম্মঠ লোক তোমার মিলতে পারে। বেশ সুপুষ্টু নীরোগ বেঁটে-খাটো জোয়ান, যাকে কেউ হারাতে, কেউ ঠকাতে পারবে না, যাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, হাতে টাকাকড়ি দিয়ে নির্ভয়, যাকে খবরদারি করতে হবে না, ভীড়ের মধ্যে যাকে হারিয়ে ফেলবার উৎকণ্ঠা নেই, যাকে সাজিয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে আনন্দ—হ্যাঁ ছাড়া যে না বলতে জানে না—

রাজলক্ষ্মী নির্ব্বাক্-মুখে আমার প্রতি চাহিয়াছিল, অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গে তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল। বলিলাম, ও কি ও ?

না, কিছু না।

তবে শিউরে উঠলে কেন ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মুখে মুখে যে-ছবি তুমি আঁকলে তার অর্দ্ধেক সত্যি হলেও বোধ হয় আমি ভয়ে মরে যাই।

কিন্তু আমার মতো এমন অকর্ম্মা লোক নিয়েই বা তুমি করবে কি ?

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া বলিল, করবো আর কি! ভগবানকে অভিসম্পাত করবো আর চিরকাল জ্বলে-পুড়ে মরবো। এজন্মে আর ত কিছু চোখে দেখি নে।

এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে মুরারিপুর আখড়ায় পাঠিয়ে দাও না কেন ?

তাদেরই বা তুমি কি উপকার করবে ?

তাদের ফুল তুলে দেবো। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বেঁচে থাকবো, তারপরে তারা দেবে আমাকে সেই বকুলতলায় সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোন্ সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে প্রদীপ জ্বেলে, কখনো বা তার ভুল হবে—সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমললতা, কোনদিন বা দেবে সে এক-মুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে ; কোনদিন বা দেবে কুন্দ। আর পরিচিত কেউ যদি কখনো আসে পথ ভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, ঐখানে থাকে আমাদের নতুনগোঁসাই। ঐ যে একটু উঁচু—ঐ যেখানটায় শুকনো মল্লিকা কুঁদ-করবীর সঙ্গে মিশে ঝরা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন ?

বলিলাম, সে আমি জানি নে। হয়ত অনেক টাকা খরচ করে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হলো না। সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না। গাছের ডালে ডালে করবে পাখীর কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা শুকনো ডাল, সে-সব মুক্ত করার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব-কবিদের গান, তারপর সময় হলে ডেকে বলবে, কমললতা-দিদি, আমাদের এক করে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিও মন্দির গড়িয়ে, ক'রো রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।

বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার ছবিটি যে হলো আরও মধুর, আরও সুন্দর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ত কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোঁসাই, এ যে সত্যি। তফাৎ যে ঐখানে। আমি পারবো কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার আঁকা ছবি শুধু কথা হয়েই থাকবে।

কি করে জানলে ?

জানি। তোমার নিজের চেয়েও বেশি জানি। ঐ ত আমার পূজো, ঐ ত আমার ধ্যান। আহ্নিক শেষ করে কার পায়ে দিই জলাঞ্জলি ? কার পায়ে দিই ফুল ? সে ত তোমারই।

নীচে হইতে মহারাজের ডাক আসিল, মা, রতন নেই, চায়ের জল তৈরী হয়ে গেছে।

যাই বাবা, বলিয়া সে চোখ মুছিয়া তখনি উঠিয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের বাটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে

রাখিয়া দিয়া বলিল, তুমি বই পড়তে এতো ভালোবাসো, এখন থেকে তাই কেন করো না ?

তাতে ত টাকা আসবে না !

কি হবে টাকায় ? টাকা ত আমাদের অনেক আছে।

একটু থামিয়া বলিল, উপরের ঐ দক্ষিণের ঘরটা হবে তোমার পড়ার ঘর। আনন্দ-ঠাকুরপো আনবে বই কিনে, আর আমি সাজিয়ে তুলবো আমার মনের মতো করে। ওর একপাশে থাকবে আমার শোবার-ঘর, অন্য পাশে হবে আমার ঠাকুর-ঘর। এ জন্মে রইলো আমার ত্রিভুবন—এর বাইরে যেন না কখনো দৃষ্টি যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার রান্নাঘর ? আনন্দ সন্ন্যাসী মানুষ, ওখানে চোখ না দিলে যে তাকে একটা দিনও রাখা যাবে না ; কিন্তু তার সন্ধান পেলে কি করে ? কবে আসবে সে ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ধান দিয়েছেন কুশারীমশাই—আনন্দ আসবে বলচে খুব শীঘ্র। তারপরে সকলে মিলে যাবো গঙ্গামাটিতে—থাকবো সেখানে কিছুদিন।

বলিলাম, তা যেন গেলে, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে এবার তোমার লজ্জা করবে না ?

রাজলক্ষ্মী কুণ্ঠিত-হাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু তারা ত কেউ জানে না কাশীতে আমি নাক-চুল কেটে সং সেজেছিলুম ? চুল আমার অনেকটা বেড়েছে, আর নাক গেছে বেমালুম জুড়ে। দাগটুকু পর্য্যন্ত নেই—আর তুমি যে আছ সঙ্গে, আমার সব অন্যায় সব লজ্জা মুছে দিতে।

একটু থামিয়া বলিল, খবর পেয়েছি সেই হতভাগী মালতীটা এসেছে ফিরে, সঙ্গে এনেছে তার স্বামীকে। আমি তাকে দেবো একটা হার গড়িয়ে।

বলিলাম, তা দিয়ো, কিন্তু আবার গিয়ে সুনন্দার পাল্লায় পড়ো—

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না গো না, সে ভয় আর নেই, তার মোহ আমার কেটেচে, বাপরে বাপ; এমনি ধর্ম্মবুদ্ধি দিলে যে দিনে রাতে না পারি চোখের জল সামলাতে, না পারি খেতে শুতে। পাগল হয়ে যে যাইনি এই ঢের। এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তোমার লক্ষ্মী আর যা-ই হোক, অস্থির মনের লোক নয়। সে সত্যি বলে একবার যখন বুঝবে তাকে আর কেউ টলাতে পারবে না। একটুখানি নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, আমার সমস্ত মনটি যেন এখন আনন্দে ডুবে আছে, সব সময়েই মনে হয় এ জীবনের সমস্ত পেয়েছি, আর আমার কিচ্ছু চাই নে। এ যদি না ভগবানের নির্দ্দেশ হয় ত আর কি হবে বলো ত? প্রতিদিন পূজো করে ঠাকুরের চরণে নিজের জন্যে আর কিছু কামনা করি নে, কেবল প্রার্থনা করি এমনি আনন্দ যেন সংসারে সবাই পায়। তাইত আনন্দ-ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়েছি তার কাজে এখন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করবো বলে।

বলিলাম, ক'রো!

রাজলক্ষ্মী নিজের মনে কি ভাবিতে লাগিল, সহসা বলিয়া উঠিল, দ্যাখো, এই সুনন্দা মেয়েটির মতো এমন সৎ, এমন নির্লোভ, এমন সত্যবাদী মেয়ে দেখি নি, কিন্তু ওর বিদ্যের ঝাঁঝ যতদিন না মরবে ততদিন ও বিদ্যে কাজে লাগবে না।

কিন্তু সুনন্দার বিদ্যের দর্প ত নেই!

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, ইতরের মতো নেই—আর সে কথাও আমি বলি নি। ও কত শ্লোক, কত শাস্ত্র-কথা, কত গল্প-উপাখ্যান জানে; ওর মুখে শুনে শুনেই ত আমার ধারণা হয়েছিল আমি তোমার কেউ নই, আমাদের সম্বন্ধ মিথ্যে—আর তাইত বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম—কিন্তু ভগবান আমাকে ঘাড়ে ধরে বুঝিয়ে দিলেন এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই। তবেই দ্যাখো ওর বিদ্যের মধ্যে কোথাও মস্ত ভুল আছে। তাই দেখি ও কাউকে সুখী

করতে পারে না, সবাইকে দুঃখ দেয়; কিন্তু ওর বড় জা ওর চেয়ে অনেক বড়। সাদামাটা মানুষ, লেখাপড়া জানে না, কিন্তু মনের ভেতরটা দয়া-মায়ায় ভরা। কত দুঃখী দরিদ্র পরিবার ও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিপালন করে—কেউ জানতে পায় না। ঐ যে তাঁতীদের সঙ্গে একটা সুব্যবস্থা হলো, সে কি সুনন্দাকে দিয়ে কখনো হতো? তেজ দেখিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াতেই হয়েছে ভাবো? কখ্‌খনো না। সে করেছে ওর বড়জা কেঁদে কেটে স্বামীর পায়ে ধরে। সুনন্দা সমস্ত সংসারের কাছে ওর গুরুজন ভাসুরকে চোর বলে ছোট করে দিলে—এইটেই কি শাস্ত্র-শিক্ষার বড় কথা? ওর পুঁথির বিদ্যে যতদিন না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, লোভ-মোহের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে পারবে, ততদিন ওর বইয়ে-পড়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের ফল মানুষকে অযথা বিঁধবে, অত্যাচার করবে, সংসারে কাউকে কল্যাণ দেবে না তোমাকে বলে দিলুম।

কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, এসব তুমি শিখলে কার কাছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি জানি কার কাছে। হয়ত তোমারি কাছে। তুমি বলো না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর, তাই তোমার কাছে শেখা ত কেবল শেখা নয়, সত্যি ক'রে পাওয়া। হঠাৎ একদিন আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয় এসব এলো কোথা থেকে। সে যাকগে, এবার গিয়ে কিন্তু বড় কুশারী-গিন্নীর সঙ্গে ভাব করবো, সেবার তাঁকে অবহেলা করে যে ভুল করেছি, এবার তার সংশোধন হবে। যাবে ত গঙ্গামাটিতে?

কিন্তু বর্ম্মা? আমার চাকরী?

আবার চাকরী? এই যে বললুম, চাকরী তোমাকে আমি করতে দেবো না।

লক্ষ্মী, তোমার স্বভাবটি বেশ। তুমি বলো না কিছুই, চাও না

কিছুই, জোর করো না কারো ওপর—খাঁটি বৈষ্ণবী-তিতিক্ষার নমুনা শুধু তোমার কাছেই মেলে।

তাই বলে যার যা খেয়াল তাতেই সায় দিতে হবে? সংসারে আর কারও সুখ দুঃখ নেই নাকি? তুমি নিজেই সব?

ঠিক বটে! কিন্তু অভয়া? সে প্লেগের ভয়ও করে নি, সে দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়ে না বাঁচালে আজ ত আমাকে তুমি পেতে না। আজ তাদের কি হলো এ কথা একবার ভাববে না?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্তে করুণা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া বলিল, তবে তুমি থাকো, আনন্দ-ঠাকুরপোকে নিয়ে আমি যাই বর্ম্মায়, গিয়ে তাদের ধরে আনিগে। কোন একটা উপায় এখানে হবেই।

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু সে বড় অভিমানী, আমি না গেলে হয়ত আসবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আসবে। সে বুঝবে যে তুমিই এসেছো তাদের নিতে। দেখো, আমার কথা ভুল হবে না।

কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে ত?

রাজলক্ষ্মী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তারপরে অনিশ্চিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেই-ই আমার ভয়। হয়ত পারবো না; কিন্তু তার আগে চলো না গিয়ে দিনকতক থাকিগে গঙ্গামাটিতে।

সেখানে কি তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে?

আছে একটু। কুশারীমশাই খবর পেয়েছেন পাশের পোড়ামাটি গাঁ-টা তারা বিক্রী করবে। ওটা ভাবচি কিনবো। সে বাড়ীটাও ভালো করে তৈরী করাবো, যেন সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট না হয়। সেবারে দেখেচি ঘরের অভাবে তোমার কষ্ট হতো।

বলিলাম, ঘরের অভাবে কষ্ট হতো না, কষ্ট হতো অন্য কারণে।

রাজলক্ষ্মী ইচ্ছা করিয়াই এ কথায় কান দিল না, বলিল, আমি দেখেচি সেখানে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে—বেশিদিন সহরে

রাখতে যে তোমাকে ভরসা হয় না, তাই ত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু এই ভঙ্গুর দেহটাকে নিয়ে যদি অনুক্ষণ তুমি এত বিব্রত থাকো, মনে শান্তি পাবে না লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এ উপদেশ খুব কাজের, কিন্তু আমাকে না দিয়ে নিজে যদি একটু সাবধানে থাকো, হয়ত সত্যিই শান্তি একটু পেতে পারি।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ, এ বিষয়ে তর্ক করা শুধু নিষ্ফল নয়, অপ্রীতিকর। তাহার নিজের স্বাস্থ্য অটুট, কিন্তু সে সৌভাগ্য যাহার নাই, বিনা দোষেও যে তাহার অসুখ করিতে পারে এ কথা সে কিছুতেই বুঝিবে না। বলিলাম, সহরে আমি কোন কালেই থাকতে চাই নে। সেদিন গঙ্গামাটি আমার ভালোই লেগেছিল, নিজের ইচ্ছেয় চলেও আসি নি—এ কথা আজ তুমি ভুলে গেছো লক্ষ্মী।

না গো না, ভুলি নি। সারা জীবনে ভুলবো না—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। বলিল, সেবারে তোমার মনে হতো যেন কোন্ অচেনা জায়গায় এসে পড়েচো, কিন্তু এবারে গিয়ে দেখো তার আকৃতি প্রকৃতি এমনি বদলে যাবে যে তাকে আপনার বলে বুঝতে একটুও গোল হবে না। আর কেবল ঘরবাড়ী থাকবার জায়গাই নয়, এবার গিয়ে আমি বদলাবো নিজেকে, আর সবচেয়ে বদলে ভেঙে গড়ে তুলবো নতুন করে তোমাকে—আমার নতুন গোঁসাইজীকে। কমললতাদিদি আর যেন না দাবী করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে।

বলিলাম, এইসব বুঝি ভেবে ভেবে স্থির করেছো?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, হাঁ। তোমাকে কি বিনামূল্যে অমনি অমনিই নেবো—তার ঋণ পরিশোধ করবো না? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম, যাবার আগে সেই আসার

চিহ্ন রেখে যাবো না? এমনি নিষ্ফলা চলে যাবো? কিছুতেই তা আমি হতে দেবো না।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধায় ও স্নেহে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিলাম, হৃদয়ের বিনিময় নর-নারীর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা—সংসারে নিত্য নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে; বিরাম নাই, বিশেষত্ব নাই, আবার এই দান ও প্রতিগ্রহই ব্যক্তি-বিশেষের জীবন অবলম্বন করিয়া কি বিচিত্র বিস্ময় ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মন অভিষিক্ত করিয়াও ফুরাইতে চাহে না। এই সেই অক্ষয় সম্পদ্, মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তোলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বঙ্কুর কি করবে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে ত আমাকে আর চায় না। ভাবে এ আপদ দূর হলেই ভালো।

কিন্তু সে যে তোমার নিকট-আত্মীয়—তাকে যে ছেলেবেলায় মানুষ করে তুলেচো?

সেই মানুষ-করার সম্বন্ধই থাকবে, আর কিছু মানবো না। নিকট-আত্মীয় আমার সে নয়।

কেন নয়? অস্বীকার করবে কি করে?

অস্বীকার করার ইচ্ছে আমারও ছিল না, বলিয়া সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা তুমিও জানো না! আমার বিয়ের গল্প শুনেছিলে?

শুনেছিলাম লোকের মুখে; কিন্তু তখন ত আমি দেশে ছিলাম না।

না ছিলে না! এমন দুঃখের ইতিহাস আর নেই, এমন

নিষ্ঠুরতাও বোধ হয় কোথাও হয় নি। বাবা মাকে কখনো নিয়ে যান নি, আমিও কখনো তাঁকে দেখি নি। আমরা দুবোনে মামার বাড়ীতেই মানুষ। ছেলেবেলা জ্বরে জ্বরে আমার কি চেহারা ছিল মনে আছে ত?

আছে।

তবে শোনো। বিনাদোষে শাস্তির পরিমাণ শুনলে তোমার মত নিষ্ঠুর লোকেরও দয়া হবে। জ্বরে ভুগি কিন্তু মরণ হয় না। মামা নিজেও নানা অসুখে শয্যাগত, হঠাৎ খবর জুটলো, দত্তদের বামুনঠাকুর আমাদের বর, মামার মতোই স্বভাব-কুলীন। বয়স ষাটের কাছে, আমাদের দুবোনকেই একসঙ্গে তার হাতে দেওয়া হবে। সবাই বললে এ সুযোগ হারালে আইবুড়ো নাম আর ওদের খণ্ডাবে না। সে চাইলে একশ, মামা পাইকিরি দর হাঁকলে পঞ্চাশ টাকা। এক আসনে একসঙ্গে—মেহন্নত কম। সে নাবলো পঁচাত্তরে; বললে, মশাই, দু-দুটো ভাগ্নীকে কুলীনে পার করবেন, একজোড়া রামছাগলের দাম দেবেন না? ভোর-রাত্রে লগ্ন, দিদি নাকি জেগে ছিল কিন্তু আমাকে পুঁটুলি বেঁধে এনে উচ্ছুগ্যু করে দিলে। সকাল হতে বাকী পঁচিশ টাকার জন্যে ঝগড়া সুরু হ'লো। মামা বললেন, ধারে কুশণ্ডিকে হোক, সে বললে, সে অতো হাবা নয়, এসব কারবারে ধারধোর চলবে না। সে গা ঢাকা দিলে, বোধ হয় ভাবলে মামা খুঁজেপেতে এনে তাকে টাকা দিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করবেন। একদিন যায়, দুদিন যায়, মা কাঁদাকাটা করেন, পাড়ার লোকেরা হাসে, মামা গিয়ে দত্তদের কাছে নালিশ করেন, কিন্তু বর আর এলো না। তাদের গাঁয়ে খোঁজ নেওয়া হলো, সেখানে সে যায় নি। আমাদের দেখিয়ে কেউ বলে আধকপালী, কেউ বলে পোড়াকপালী—দিদি লজ্জায় ঘরের বা'র হয় না—সেই ঘর থেকে ছ'মাস পরে বা'র করা হলো একেবারে শ্মশানে। আরও ছ'মাস পরে কলকাতার কোন একটা হোটেল থেকে খবর এলো,

বরও সেখানে রাঁধতে রাঁধতে জ্বরে মরেচে। বিয়ে আর পূরো হলো না।

বলিলাম, পঁচিশ টাকা দিয়ে বর কিনলে ঐ রকমই হয়।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত সে আমার ভাগে পঁচিশ টাকা পেয়েছিল, কিন্তু তুমি পেয়েছিলে কি? শুধু একছড়া বঁইচির মালা—তাও কিনতে হয় নি—বন থেকে সংগ্রহ হয়েছিল।

কহিলাম, দাম না থাকলে তাকে অমূল্য বলে। আর একটা মানুষ দেখাও ত, যে আমার মতো অমূল্য ধন পেয়েছে?

তুমি বলো ত এ কি তোমার মনের সত্যি কথা?

টের পাও না?

না গো না, পাই নে, সত্যি পাই নে—কিন্তু বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, পাই শুধু তখন যখন তুমি ঘুমোও—তোমার মুখের পানে চেয়ে; কিন্তু সে কথা যাক। আমাদের ছুবোনের মতো শাস্তিভোগ এদেশে কতশত মেয়ের কপালেই ঘটে। আর কোথাও বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও এমন দুর্গতি করতে মানুষের বুকে বাজে, এই বলিয়া সে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হয়ত তুমি ভাবচো আমার নালিশটা বাড়াবাড়ি, এমন দৃষ্টান্ত আর ক'টা মেলে? এর উত্তরে যদি বলতুম একটা হলেও সমস্ত দেশের কলঙ্ক; তাতেও আমার জবাব হতো, কিন্তু সে আমি বলবো না! আমি বলবো, অনেক হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেই সব বিধবাদের কাছে, যাঁদের আমি অল্পস্বল্প সাহায্য করি? তাঁরা সবাই সাক্ষ্য দেবেন তাঁদেরও হাত-পা বেঁধে আত্মীয়-স্বজনে এমনিই জলে ফেলে দিয়েছিল।

বলিলাম, তাই বুঝি তাদের ওপর এত মায়া?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমারও হতো যদি চোখ চেয়ে আমাদের দুঃখটা দেখতে। এখন থেকে একটি একটি করে আমিই তোমাকে সমস্ত দেখাবো।

আমি দেখবো না, চোখ বুঁজে থাকবো।

পারবে না। আমার কাজের ভার একদিন ফেলে যাবো আমি তোমার ওপর। সব ভুলবে, কিন্তু সে ভুলতে কখনো পারবে না। এই বলিয়া সে একটুখানি মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ নিজের পূর্ব্ব কথার অনুসরণে বলিয়া উঠিল, হবেই ত এমনি অত্যাচার। যে দেশে মেয়ের বিয়ে না হ'লে ধর্ম্ম যায়, জাত যায়, লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারে না—হাবা-বোবা-অন্ধ-আতুর কারও রেহাই নেই—সেখানে একটাকে ফাঁকি দিয়ে লোক অন্যটাকেই রাখে, এ ছাড়া সে-দেশে মানুষের আর কি উপায় আছে বলো ত? সেদিন সবাই মিলে আমাদের বোন দুটিকে যদি বলি না দিত, দিদি হয়তো মরতো না, আর আমি—এ জন্মে এমন করে তোমাকে হয়ত পেতুম না, কিন্তু মনের মধ্যে তুমিই চিরদিন এমনি প্রভু হয়েই থাকতে। আর, তাই বা কেন? আমাকে এড়াতে তুমি পারতে না, যেখানে হোক, যতদিনে হোক নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে হতোই।

একটা জবাব দিব ভাবিতেছি, হঠাৎ নীচ হইতে বালক-কণ্ঠে ডাক আসিল, মাসিমা?

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে?

ও-বাড়ীর মেজবৌয়ের ছেলে, এই বলিয়া সে ইঙ্গিতে পাশের বাড়ীটা দেখাইয়া সাড়া দিল—ক্ষিতীশ, ওপরে এসো বাবা।

পরক্ষণেই একটি ষোল-সতের বছরের সুশ্রী বলিষ্ঠ কিশোর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাকেই দেখিয়া প্রথমটা সঙ্কুচিত হইল, পরে নমস্কার করিয়া তাহার মাসিমাকেই কহিল, আপনার নামে কিন্তু বারো টাকা চাঁদা পড়েচে মাসিমা।

তা পড়ুক বাবা, কিন্তু সাবধানে সাঁতার কেটো, কোনো দুর্ঘটনা না হয়।

নাঃ—কোন ভয় নেই মাসিমা।

রাজলক্ষ্মী আলমারি খুলিয়া তাহার হাতে টাকা দিল, ছেলেটি দ্রুতবেগে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, মা বলে দিলেন ছোটমামা পরশু সকালে এসে সমস্ত এষ্টিমেট করে দেবেন। —বলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল।

প্রশ্ন করিলাম, এষ্টিমেট কিসের ?

বাড়ীটা মেরামত করতে হবে না ? তেতলার ঘরটা আধখানা করে তারা ফেলে রেখেচে, পূরো করতে হবে না ?

তা হবে কিন্তু এত লোককে তুমি চিনলে কি করে ?

বাঃ, এরা যে সব পাশের বাড়ীর লোক ; কিন্তু আর না। যাই— তোমার খাবার তৈরীর সময় হয়ে গেল। এই বলিয়া সে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

তেরো

এক সকালে স্বামীজি আনন্দ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে রতন জানিত না, বিষণ্ণমুখে আসিয়া আমাকে খবর দিল, বাবু, গঙ্গামাটির সেই সাধুটা এসে হাজির হয়েছে। বলিহারী তাকে, খুঁজে খুঁজে বা'র করেছে ত ?

রতন সর্ব্বপ্রকার সাধু-সজ্জনকেই সন্দেহের চোখে দেখে, রাজলক্ষ্মীর গুরুদেবটিকে ত সে দুচক্ষে দেখিতে পারে না, বলিল, দেখুন, এ আবার মাকে কি মতলব দেয়। টাকা বা'র করে নেবার কত ফন্দিই যে এই ধার্ম্মিক ব্যাটারা জানে।

হাসিয়া বলিলাম, আনন্দ বড়লোকের ছেলে, ডাক্তারি পাস করেছে, তার নিজের টাকার দরকার নেই।

হুঁঃ—বড়লোকের ছেলে। টাকা থাকলে নাকি কেউ আবার এ-পথে যায় ! এই বলিয়া সে তাহার সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়া

চলিয়া গেল। রতনের আসল আপত্তি এইখানে, মায়ের টাকা কেহ বা'র করিয়া লইবার সে ঘোরতর বিরুদ্ধে। অবশ্য, তাহার নিজের কথা স্বতন্ত্র।

বজ্রানন্দ আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল, কহিল, আর একবার এলুম দাদা। খবর ভালো ত? দিদি কই?

বোধ হয় পূজোয় বসেছেন, সংবাদ পান নি নিশ্চয়ই।

তবে সংবাদটা নিজেই দিই গে। পূজো করা পালিয়ে যাবে না, এখন একবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পূজোর ঘরটা কোন্ দিকে দাদা? নাপ্‌তে ব্যাটা গেল কোথায়—চায়ের একটু জল চড়িয়ে দিক না।

পূজার ঘরটা দেখাইয়া দিলাম। আনন্দ রতনের উদ্দেশে একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া সেইদিকে প্রস্থান করিল।

মিনিট-দুই পরে উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল, আনন্দ কহিল, দিদি গোটা-পাঁচেক টাকা দিন, চা খেয়ে একবার শিয়ালদার বাজারটা ঘুরে আসিগে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কাছেই যে একটা ভালো বাজার আছে আনন্দ, অতদূর যেতে হবে কেন? আর তুমিই বা যাবে কিসের জন্যে, রতন যাক না।

কে, রত্না? ও ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই দিদি, আমি এসেচি বলেই হয়ত ও বেছে বেছে পচামাছ কিনে আনবে—বলিয়াই হঠাৎ দেখিল রতন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া; জিভ কাটিয়া বলিল, রতন দোষ নিও না বাবা, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ও-পাড়ার গেছো—ডেকে সাড়া পাই নি কিনা।

রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। রতন কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিল না, গম্ভীর মুখে বলিল, আমি বাজারে যাচ্চি মা, কিষণ চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে।—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, রতনের সঙ্গে আনন্দের বুঝি বনে না?

আনন্দ বলিল, ওকে দোষ দিতে পারি নে দিদি। ও আপনার হিতৈষী—বাজে লোকজন ঘেঁষতে দিতে চায় না; কিন্তু আজ ওর সঙ্গ নিতে হবে, নইলে খাওয়াটা ভাল হবে না। বহুদিন উপবাসী।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া ডাকিয়া বলিল, রতন, আর গোটা-কয়েক টাকা নিয়ে যা বাবা, বড় দেখে একটা রুইমাছ আনতে হবে কিন্তু। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মুখ-হাত ধুয়ে এসো গে ভাই, আমি চা তৈরি করে আনচি। এই বলিয়া সেও নীচে নামিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, দাদা, হঠাৎ তলব হ'লো কেন ?

সে কৈফিয়ৎ কি আমার দেবার, আনন্দ ?

আনন্দ সহাস্যে কহিল, দাদার দেখচি এখনো সেই ভাব—রাগ পড়ে নি। আবার গা ঢাকা দেবার মতলব নেই ত? সেবার গঙ্গামাটিতে কি হাঙ্গামাতেই ফেলেছিলেন! এদিকে দেশশুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন, ওদিকের বাড়ীর কর্ত্তা নিরুদ্দেশ। মাঝখানে আমি —নতুন লোক—এদিকে ছুটি, ওদিকে ছুটি, দিদি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন, রতন লোক তাড়াবার উয্যুগ করলে—সে কি বিভ্রাট! আচ্ছা মানুষ আপনি।

আমিও হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, রাগ এবারে পড়ে গেছে, ভয় নেই।

আনন্দ বলিল, ভরসাও নেই। আপনাদের মতো নিঃসঙ্গ, একাকী লোকদের আমি ভয় করি। কেন যে নিজেকে সংসারে জড়াতে দিলেন তাই আমি অনেক সময়ে ভাবি।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট! মুখে বলিলাম, আমাকে দেখচি তাহলে ভোলো নি, মাঝে মাঝে মনে করতে ?

আনন্দ বলিল, না দাদা, আপনাকে ভোলাও শক্ত, বোঝাও শক্ত, মায়া কাটানো আরও শক্ত। বিশ্বাস না হয় বলুন, দিদিকে ডেকে সাক্ষী মানি। আপনার সঙ্গে পরিচয় ত মাত্র দু-তিন দিনের,

কিন্তু সেদিন যে দিদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও কাঁদতে বসি নি—সেটা নিতান্তই সন্ন্যাসী-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ব'লে।

বলিলাম, সেটা বোধ হয় দিদির খাতিরে। তাঁর অনুরোধেই ত এতদূরে এলে।

আনন্দ কহিল, নেহাৎ মিথ্যে নয় দাদা। ওঁর অনুরোধ ত অনুরোধ নয়, যেন মায়ের ডাক। পা আপনি চলতে সুরু করে। কত ঘরেই ত আশ্রয় নিই কিন্তু ঠিক এমনিই আর দেখি নে। আপনিও ত শুনেচি অনেক ঘুরেছেন কোথাও দেখেছেন এঁর মত আর একটি?

বলিলাম, অনেক—অনেক।

রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে আমার কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, চায়ের বাটিটা আনন্দের কাছে রাখিয়া দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি অনেক গা?

আনন্দ বোধ করি একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল; আমি বলিলাম, তোমার গুণের কথা। উনি সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন বলেই আমি সজোরে তার প্রতিবাদ করছিলাম।

আনন্দ চায়ের বাটিটা মুখে তুলিতেছিল, হাসির নাড়ার খানিকটা চা মাটিতে পড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল।

আনন্দ বলিল, দাদা, আপনার উপস্থিত বুদ্ধিটা অদ্ভুত। ঠিক উল্টোটি চোখের পলকে মাথায় এলো কি করে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আশ্চর্য কি আনন্দ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর গল্প বানিয়ে বলতে বলতে এ বিদ্যের উনি একেবারে মহামহোপাধ্যায় হয়ে গেছেন।

বলিলাম, আমাকে তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না?

একটুও না।

আনন্দ হাসিয়া কহিল, বানিয়ে বলার বিদ্যেয় আপনিও কম নয় দিদি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—একটুও না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জ্বলে-পুড়ে শিখতে হয়েছে ভাই। তুমি কিন্তু আর দেরি ক'রো না, চা খেয়ে স্নান করে নাও, কাল গাড়ীতে তোমার যে খাওয়া হয় নি তা বেশ জানি। ওঁর মুখে আমার সুখ্যাতি শুনতে গেলে তোমার সমস্ত দিনে কুলোবে না।—এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, আপনাদের মত এমন দুটি লোক সংসারে বিরল। ভগবান আশ্চর্য মিল করে আপনাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

তার নমুনা দেখলে ত ?

নমুনা, সে প্রথম দিনে সাঁইথিয়া ষ্টেশনে গাছতলাতেই দেখেছিলুম। তার পরে আর একটিও কখনো চোখে পড়লো না।

আহা! কথাগুলো যদি ওঁর সামনেই বলতে আনন্দ!

আনন্দ কাজের লোক, কাজের উদ্যম ও শক্তি তাহার বিপুল। তাহাকে কাছে পাইয়া রাজলক্ষ্মীর আনন্দের সীমা নাই। দিনে-রাতে খাওয়ার আয়োজন ত প্রায় ভয়ের কোঠায় গিয়া ঠেকিল। অবিশ্রাম দুজনের কত পরামর্শ-ই যে হয় তাহার সবগুলো জানি না, শুধু কানে আসিয়াছে যে গঙ্গামাটিতে একটা ছেলেদের ও একটা মেয়েদের ইস্কুল খোলা হবে। এখানে বিস্তর গরীব এবং ছোট-জাতের লোকের বাস, উপলক্ষ্য বোধ করি তাহারই। শুনিতেছি একটা চিকিৎসার ব্যাপারও চলিবে। এই সকল বিষয়ে কোনোদিন আমার কিছুমাত্র পটুতা নাই। পরোপকারের বাসনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, কোন-কিছু একটা খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে ভাবিলেও আমার শ্রান্ত মন আজ নয় কাল করিয়া দিন পিছাইতে চায়। তাহাদের নূতন উদ্যোগে মাঝে মাঝে আনন্দ আমাকে টানিতে গিয়াছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়াছে, ওঁকে আর জড়িও না আনন্দ, তোমার সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড হয়ে যাবে।

শুনিলে প্রতিবাদে করিতেই হয়, বলিলাম, এই যে সেদিন বললে

আমার অনেক কাজ, এখন থেকে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে!

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েছে গোঁসাই, অমন কথা আর কখনো মুখে আনবো না।

তবে কি কোনোদিন কিছুই করবো না।

কেন করবে না? কেবল অসুখ-বিসুখ করে আমাকে ভয়ে আধমরা করে তুলো না, তাতেই তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

আনন্দ কহিল, দিদি, সত্যিই ওঁকে আপনি অকেজো করে তুলবেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আমাকে করতে হবে না ভাই, যে বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন—কোথাও ত্রুটি রাখেন নি।

আনন্দ হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, তার ওপর এক গোণক্কার পোড়ারমুখো এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে উনি বাড়ীর বা'র হলে আমার বুক টিপটিপ করে—যতক্ষণ না ফেরেন কিছুতে মন দিতে পারি নে।

এর মধ্যে আবার গোণক্কার জুটলো কোথা থেকে? কি বললে সে?

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, আমার হাত দেখে সে বললে, মস্ত ফাঁড়া—জীবন-মরণের সমস্যা।

দিদি, এসব আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি বলিলাম, হাঁ করেন, আলবৎ করেন। তোমার দিদি বলেন, ফাঁড়া বলে কি পৃথিবীতে কথা নেই? কারও কখনো কি বিপদ ঘটে না?

আনন্দ হাসিয়া কহিল, ঘটতে পারে, কিন্তু হাত গুণে বলবে কি দিদি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা জানি নে ভাই, শুধু আমার ভরসা আমার মতো ভাগ্যবতী যে, তাকে কখনো ভগবান এত বড় দুঃখে ডোবাবেন না।

আনন্দ স্তব্ধমুখে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্য কথা পাড়িল।

ইতিমধ্যে বাড়ীর লেখাপড়া, বিলিব্যবস্থার কাজ চলিতে লাগিল, রাশীকৃত ইট-কাঠ, চুন-সুরকি, দরজা-জানালা আসিয়া পড়িল—পুরাতন গৃহটিকে রাজলক্ষ্মী নূতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

সেদিন বৈকালে আনন্দ কহিল, দাদা, চলুন একটু ঘুরে আসিগে।

ইদানীং আমার বাহির হইবার প্রস্তাবেই রাজলক্ষ্মী অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকে, কহিল, ঘুরে আসতে আসতেই যে রাত হয়ে যাবে আনন্দ, ঠাণ্ডা লাগবে না ?

আনন্দ বলিল, গরমে লোকে সারা হচ্চে দিদি, ঠাণ্ডা কোথায় ?

আজ আমার নিজের শরীরটাও বেশ ভালো ছিল না, বললাম, ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ উঠতেও তেমন ইচ্ছে হচ্ছে না আনন্দ।

আনন্দ বলিল, ওটা জড়তা। সন্ধ্যেটা বসে থাকলে অনিচ্ছে আরো চেপে ধরবে—উঠে পড়ুন।

রাজলক্ষ্মী ইহার সমাধান করিতে কহিল, তার চেয়ে একটা কাজ করি নে আনন্দ। ক্ষিতীশ পরশু আমাকে একটি ভালো হারমোনিয়ম কিনে দিয়ে গেছে, এখনো সেটা দেখবার সময় পাই নি। আমি দুটো ঠাকুরদের নাম করি, তোমরা দুজনে বসে শোনো, সন্ধ্যেটা কেটে যাবে। এই বলিয়া সে রতনকে ডাকিয়া বাক্সটা আনিতে কহিল।

আনন্দ বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদের নাম মানে কি গান নাকি দিদি ?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

—দিদির কি এ বিদ্যেও আছে নাকি ?

সামান্য একটুখানি। তারপরে আমাকে দেখাইয়া কহিল, ছেলে-বেলায় ওঁর কাছেই হাতে খড়ি।

আনন্দ খুশী হইয়া বলিল, দাদাটি দেখচি বর্ণচোরা আম, বাইরে থেকে ধরবার জো নেই।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সরল মনে তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। কারণ, আনন্দ বুঝিবে না কিছুই, আমার আপত্তিকে ওস্তাদের বিনয়-বাক্য কল্পনা করিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে, এবং হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া বসিবে। পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের দুর্যোধনের গানটা জানি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে এ আসরে সেটা মানানসই হইবে না।

হারমোনিয়ম আসিলে প্রথমে সচারাচর প্রচলিত দুই-একটা 'ঠাকুরদের' গান গাহিয়া রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণব-পদাবলী আরম্ভ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুর আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই। আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল, আমাকে দেখাইয়া মুগ্ধচিত্তে কহিল, এ কি সমস্তই ওঁর কাছে শেখা দিদি ?

সমস্তই কি কেউ একজনের কাছে শেখে আনন্দ ?

সে ঠিক। তারপরে সে আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, এবার কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করতে হবে। দিদি একটু ক্লান্ত।

না হে, আমার শরীর ভালো নেই।

শরীরের জন্য আমি দায়ী, অতিথির অনুরোধ রাখবেন না ?

রাখবার জো নেই হে, শরীর বড়ো খারাপ।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সামলাইতে

পারিল না, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। আনন্দ ব্যাপারটা এবারে বুঝিল, কহিল, দিদি, তবে বলুন কার কাছে এত শিখলেন ?

আমি বলিলাম, যাঁরা অর্থের পরিবর্ত্তে বিদ্যা দান করেন তাঁদের কাছে, আমার কাছে নয় হে ; দাদা কখনো এ বিদ্যের ধার দিয়েও চলেন নি।

আনন্দ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমিও সামান্য কিছু জানি দিদি, কিন্তু বেশী শেখবার সময় পাই নি। সুযোগ যদি হলো এবার আপনার শিষ্যত্ব নিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করবো ; কিন্তু আজ কি এখানেই থেমে যাবেন, আর কিছু শোনাবেন না ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আজ ত সময় নেই ভাই, তোমাদের খাবার তৈরী করতে হবে যে।

আনন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা জানি। সংসারের ভার যাঁদের ওপর, সময় তাঁদের কম ; কিন্তু বয়সে আমি ছোট, আপনার ছোট ভাই, আমাকে শেখাতে হবে। অপরিচিত স্থানে একলা যখন সময় কাটতে চাইবে না তখন এই দয়া আপনার স্মরণ করবো।

রাজলক্ষ্মী স্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, তুমি ডাক্তার, বিদেশে তোমার এই স্বাস্থ্যহীন দাদাটির প্রতি দৃষ্টি রেখো ভাই, আমি যতটুকু জানি তোমাকে আদর করে শেখাবো।

কিন্তু এ ছাড়া আপনার কি আর চিন্তা নেই দিদি ?

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল, আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দাদার মতো ভাগ্য সহসা চোখে পড়ে না।

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, এমন অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিই কি সহসা চোখে পড়ে আনন্দ ? ভগবান তাদের হাল ধরবার মজবুত লোক দেন, নইলে তারা অকূলে ভেসে যায়—কোনকালে ঘাটে ভিড়তে পারে না। এমনি করেই সংসারে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় ভায়া, কথাটা মিলিয়ে দেখো, প্রমাণ পাবে।

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল—তাহার অনেক কাজ।

ইহার দিনকয়েক মধ্যেই বাড়ীর কাজ সুরু হইল, রাজলক্ষ্মী জিনিষ-পত্র একটা ঘরে বন্ধ করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। বাড়ীর ভার রহিল বুড়া তুলসীদাসের ওপরে।

যাবার দিনে রাজলক্ষ্মী আমার হাতে একখানা পোষ্টকার্ড দিয়া বলিল, আমার চার-পাতা জোড়া চিঠির এই জবাব—পড়ে দেখ। —বলিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েলী অক্ষরে গুটি দুই-তিন ছত্রের লেখা। কমললতা লিখিয়াছে, সুখেই আছি বোন। যাঁদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি, আমাকে ভালো রাখবার দায় যে তাঁদের ভাই। প্রার্থনা করি তোমরা কুশলে থাকো। বড়গোঁসাইজী তাঁহার আনন্দময়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণাশ্রিতা—কমললতা

সে আমার নাম উল্লেখও করে নাই; কিন্তু এই কয়টি অক্ষরের আড়ালে কত কথাই না তাহার রহিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখিলাম একফোঁটা চোখের জলের দাগ কি কোথাও পড়ে নাই? কিন্তু কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না।

চিঠিখানা হাতে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে রৌদ্রতপ্ত নীলাভ আকাশ, প্রতিবেশী-গৃহের একজোড়া নারিকেল বৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়া কতকটা অংশ তাহার দেখা যায়, সেখানে অকস্মাৎ দুটি মুখ পাশাপাশি যেন ভাসিয়া আসিল। একটি আমার রাজলক্ষ্মীর—কল্যাণের প্রতিমা; অপরটি কমললতার অপরিস্ফুট, অজানা—যেন স্বপ্নে দেখা ছবি।

রতন আসিয়া ধ্যান ভাঙিয়া দিল, বলিল, স্নানের সময় হয়েছে বাবু, মা বলে দিলেন।

স্নানের সময়টুকুও উত্তীর্ণ হইবার যো নাই।

আবার একদিন সকালে গঙ্গামাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেবার আনন্দ ছিল অনাহূত অতিথি, এবারে সে আমন্ত্রিত বান্ধব। বাড়ীতে ভীড় ধরে না, গ্রামের আত্মীয় অনাত্মীয় কত লোকই যে আমাদের দেখিতে আসিয়াছে, সকলের মুখেই প্রসন্ন হাসি ও কুশল প্রশ্ন। রাজলক্ষ্মী কুশারী-গৃহিণীকে প্রণাম করিল, সুনন্দা রান্নাঘরে কাজে নিযুক্ত ছিল, বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, দাদা, আপনার শরীরটা ত ভাল দেখাচ্চে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ভালো আর কবে দেখায় ভাই? আমি ত পারলুম না, এবার তোমরা যদি পারো এই আশাতেই তোমাদের কাছে এনে ফেললুম।

আমার বিগত দিনের অস্বাস্থ্যের কথা বড়গিন্নীর বোধ হয় মনে পড়িল, স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ভরসা দিয়া কহিলেন, ভয় নেই মা, এদেশের জল-হাওয়ায় উনি দুদিনেই সেরে উঠবেন।

অথচ, নিজে ভাবিয়া পাইলাম না, কি আমার হইয়াছে এবং কিসের জন্যই বা এত দুশ্চিন্তা।

অতঃপর নানাবিধ কাজের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে সুরু হইল। পোড়ামাটি ক্রয় করার কথাবার্ত্তা দামদস্তুর হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থানান্বেষণ প্রভৃতি কিছুতেই কাহারো আলস্য রহিল না।

শুধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না। হয়ত এ আমার স্বভাব, হয়তো বা ইহা আর-কিছু একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। একটা সুবিধা হইয়াছিল আমার ঔদাস্যে কেহ বিস্মিত হয় না, যেন আমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমি দুর্ব্বল, আমি অসুস্থ, আমি কখন আছি, কখন নাই। অথচ কোন অসুখ নাই, খাইদাই

থাকি। আনন্দ তাহার ডাক্তারি-বিদ্যা লইয়া মাঝে মাঝে আমাকে নাড়াচাড়া দিবার চেষ্টা করিলেই রাজলক্ষ্মী সস্নেহ অনুযোগে বাধা দিয়া বলে, ওঁকে টানাটানি করে কাজ নেই ভাই, কি হতে কি হবে, তখন আমাদেরই ভুগে মরতে হবে।

আনন্দ বলে, যে ব্যবস্থা করচেন, ভোগার মাত্রা এতে বাড়বে বই কমবে না দিদি! এ আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

রাজলক্ষ্মা সহজেই স্বীকার হইয়া বলে, সে আমি জানি আনন্দ, ভগবান আমার জন্মকালে এ দুঃখ কপালে লিখে রেখেছেন।

ইহার পরে আর তর্ক চলে না!

দিন কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিগত-কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্ম্মের প্রেরণা আমাতে নাই; লড়াই করিয়া হুটোপুটি করিয়া, সংসারে দশজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসার সাধ্যও নাই, সঙ্কল্পও নাই। সহজে যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি। বাড়ীঘর টাকাকড়ি বিষয়-আশয় মান-সম্ভ্রম এ সকল আমার কাছে ছায়াময়। অপরের দেখাদেখি নিজের জড়ত্বকে যদিবা কখনো কর্ত্তব্যবুদ্ধির তাড়নায় সচেতন করিতে যাই অচিরকাল মধ্যেই দেখি আবার সে চোখ বুঁজিয়া ঢুলিতেছে—শত ঠেলাঠেলিতেও আর গা নাড়িতে চাহে না। শুধু দেখি একটা বিষয়ে তন্দ্রাতুর মন কলরবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে, সে ঐ মুরারিপুরের দশটা দিনের স্মৃতির আলোড়নে। ঠিক যেন কানে শুনিতে পাই বৈষ্ণবী কমললতার সস্নেহ অনুরোধ—নতুনগোঁসাই, এইটি করে দাও না ভাই! ঐ যাঃ—সব নষ্ট করে দিলে? আমার ঘাট হয়েছে গো, তোমায় কাজ করতে বলে—নাও ওঠো। পদ্মা পোড়ারমুখী গেল কোথায়, একটু জল চড়িয়ে দিক না, চা খাবার যে তোমার সময় হয়েছে গোঁসাই।

সেদিন চায়ের পাত্রগুলি সে নিজে ধুইয়া রাখিত পাছে ভাঙে।

আজ তাহাদের প্রয়োজন গিয়াছে ফুরাইয়া, তথাপি কখনো কাজে লাগার আশায় কি জানি সেগুলি সে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে কিনা।

জানি সে পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না, তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুর আশ্রমে দিন তাহার প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। হয়ত, একদিন এই খবরটাই অকস্মাৎ আসিয়া পৌঁছিবে। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশেহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায় অবিশ্রাম কর্ম্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ ছায়া; করুণায় মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সর্ব্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্তলোকে সে যে-আসনে অধিষ্ঠিত, তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানি না।

বিদুষী সুনন্দার দুর্নিবার্য্য প্রভার স্বল্পকালের জন্যও যে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, ইহারই দুঃসহ পরিতাপে পুনরায় আপন সত্তাকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে। একটা কথা সে আজও আমাকে কানে কানে বলে, তুমি কম নও গো, কম নও। তোমার চলে যাবার পথ বেয়ে সর্ব্বস্ব যে আমার চোখের পলকে ছুটে পালাবে, কে জানতো বলো? উঃ—সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবলেও ভয় হয় সে দিন-গুলো আমার কেটেছিল করে? দম বন্ধ হয়ে মরে যাই নি এই আশ্চয্যি। আমি উত্তর দিতে পারি না, শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি।

আমার সম্বন্ধে আর তাহার ত্রুটি ধরিবার জো নাই। শতকর্ম্মের মধ্যে শতবার অলক্ষ্যে আসিয়া দেখিয়া যায়। কখনো হঠাৎ আসিয়া কাছে বসে, হাতের বইটা সরাইয়া দিয়া বলে, চোখ বুঁজে একটুখানি শুয়ে পড়তো, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। অতো পড়লে চোখ ব্যথা করবে যে!

আনন্দ আসিয়া বাহির হইতে বলে, একটা কথা জেনে নেবার আছে—আসতে পারি কি ?

রাজলক্ষ্মী বলে, পারো। তোমার কোথায় আসতে মানা আনন্দ ?

আনন্দ ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া বলে, এই অসময়ে দিদি কি ওঁকে ঘুম পাড়াচ্চেন নাকি ?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া জবাব দেয়, তোমার লোকসানটা হলো কি ? না ঘুমোলেও তোমার পাঠশালার বাছুরের পাল চরাতে যাবেন না !

দিদি দেখচি ওঁকে মাটি করবেন।

নইলে নিজে যে মাটি। নির্ভাবনায় কাজকর্ম্ম করতে পারি নে।

আপনারা দুজনেই ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবেন, এই বলিয়া আনন্দ বাহির হইয়া যায়।

ইস্কুল তৈরীর কাজে আনন্দের নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ নাই, সম্পত্তি খরিদের হাঙ্গামায় রাজলক্ষ্মী গলদঘর্ম্ম, এমনি সময়ে কলিকাতার বাড়ী ঘুরিয়া বহু ডাকঘরের ছাপছোপ পিঠে লইয়া বহু বিলম্বে নবীনের সাংঘাতিক চিঠি আসিয়া পৌঁছিল—গহর মৃত্যুশয্যায়। শুধু আমারই পথ চাহিয়া আজও সে বাঁচিয়া আছে। খবরটা আমাকে যেন শূল দিয়া বিঁধিল। ভগিনীর বাটি হইতে সে কবে ফিরিয়াছে জানি না। সে যে এতদূর পীড়িত তাহাও শুনি নাই—শুনিবার বিশেষ চেষ্টাও করি নাই—আজ আসিয়াছে একেবারে শেষ সংবাদ। দিন-ছয়ের পূর্ব্বের চিঠি, এখনো বাঁচিয়া আছে কিনা তাই বা কে জানে ? তার করিয়া খবর পাবার ব্যবস্থা এদেশেও নাই, সে-দেশেও নাই। ও চিন্তা বৃথা। চিঠি পড়িয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিল—তোমাকে যেতে হবে ত !

হাঁ।

চলো আমিও সঙ্গে যাই।

সে কি হয়? তাদের এ বিপদের মাঝে তুমি যাবে কোথায়?

প্রস্তাবটা যে অসঙ্গত সে নিজেই বুঝিল, মুরারিপুর আখড়ার কথা আর সে মুখে আনিতে পারিল না, বলিল, রতনের কাল থেকে জ্বর, সঙ্গে যাবে কে? আনন্দকে বলবো?

না। আমার তল্পি বইবার লোক সে নয়।

তবে কিষণ সঙ্গে যাক।

তা যাক, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না।

গিয়ে রোজ চিঠি দেবে বলো?

সময় পেলে দেবো।

না, সে শুনবো না। একদিন চিঠি না পেলে আমি নিজে যাবো, তুমি যতই রাগ করো।

অগত্যা রাজী হইতে হইল, এবং প্রত্যহ সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেইদিনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম দুশ্চিন্তায় রাজলক্ষ্মীর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে, সে চোখ মুছিয়া শেষবারের মতো সাবধান করিয়া কহিল, শরীরে অবহেলা করবে না বলো?

না গো না।

ফিরতে একটা দিনও বেশী দেরী করবে না বলো?

না, তাও করবো না।

অবশেষে গরুর গাড়ী রেল-ষ্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা সুরু করিল।

আষাঢ়ের এক অপরাহ্ণ-বেলায় গহরদের বাটির সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সাড়া পাইয়া নবীন বাহিরে আসিয়া আমার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। যে-ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষের প্রবল কণ্ঠের এই বুক-ফাটা কান্নায় শোকের একটা নূতন মূর্ত্তি চোখে দেখিতে পাইলাম।

সে যেমন গভীর, তেমনি বৃহৎ ও তেমনি সত্য। গহরের মা নাই, ভগ্নী নাই, কন্যা নাই, জায়া নাই, অশ্রুজলের মালা পরাইয়া এই সঙ্গীহীন মানুষটিকে সেদিন বিদায় দিতে কেহ ছিল না, তবু মনে হয় তাহাকে সঙ্গীহীন, ভূষণহীন কাঙ্গাল-বেশে যাইতে হয় নাই, তাহার লোকান্তরের যাত্রাপথে শেষ পাথেয় নবীন একাকী দুহাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর কবে মারা গেল নবীন ?

পরশু। কাল সকালে আমরা তাঁকে মাটি দিয়ে এসেছি।

মাটি কোথায় দিলে ?

নদীর তীরে, আমবাগানে। তিনিই বলেছিলেন।

নবীন বলিতে লাগিল, মামাতো-বোনের বাড়ী থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন, সে জ্বর আর সারলো না।

চিকিৎসা হয়েছিল ?

এখানে যা হবার সমস্তই হয়েছিল—কিছুতেই কিছু হলো না। বাবু নিজেই সব জানতে পেরেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আখড়ার বড়গোঁসাইজী আসতেন ?

নবীন কহিল, মাঝে মাঝে। নবদ্বীপ থেকে তাঁর গুরুদেব এসেছেন, তাই রোজ আসতে সময় পেতেন না। আর একজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করিতে লাগিল, তবু সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলাম, ওখান থেকে আর কেউ আসতো না নবীন ?

নবীন বলিল, হাঁ, কমললতা।

তিনি কবে এসেছিলেন ?

নবীন বলিল, রোজ। শেষ তিনদিন তিনি খান নি শোন নি, বাবুর বিছানা ছেড়ে একবারটি ওঠেন নি।

আর প্রশ্ন করলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। নবীন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন এখন—আখড়ায় ?

হাঁ।

একটু দাঁড়ান, বলিয়া সে ভিতরে গিয়া একটা টিনের বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া আমার কাছে দিয়া বলিল, এটা আপনাকে দিতে তিনি বলে গিয়েছেন।

কি আছে এতে নবীন ?

খুলে দেখুন, বলিয়া সে আমার হাতে চাবি দিল। খুলিয়া দেখিলাম দড়ি দিয়া বাঁধা তাহার কবিতার খাতাগুলা। উপরে লিখিয়াছে, শ্রীকান্ত, রামায়ণ শেষ করার সময় হলো না। বড়-গোঁসাইকে দিও, তিনি যেন মঠে রেখে দেন, নষ্ট না হয়। দ্বিতীয়টি লাল শালুতে বাঁধা ছোট পুঁটুলি। খুলিয়া দেখিলাম নানা মূল্যের এক তাড়া নোট এবং আমাকে লেখা আর একখানি পত্র। সে লিখিয়াছে—ভাই শ্রীকান্ত, আমি বোধ হয় বাঁচাবো না। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি নে। যদি না হয় নবীনের হাতে বাক্সটি রেখে গেলাম, নিও। টাকাগুলি তোমার হাতে দিলাম, কমললতার যদি কাজে লাগে দিও। না নিলে যা ইচ্ছে ক'রো। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন।—গহর।

দানের গর্ব্ব নাই, কাকুতি-মিনতিও নাই। শুধু মৃত্যু আসন্ন জানিয়া এই গুটিকয়েক কথায় বাল্যবন্ধুর শুভকামনা করিয়া তাহার শেষ নিবেদন রাখিয়া গিয়াছে। ভয় নাই, ক্ষোভ নাই, উচ্ছ্বসিত হা-হুতাশে মৃত্যুকে সে প্রতিবাদ করে নাই। সে কবি, মুসলমান ফকির-বংশের রক্ত তাহার শিরায়—শান্ত মনে এই শেষ রচনাটুকু সে তাহার বাল্যবন্ধুর উদ্দেশে লিখিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত চোখের জল আমার পড়ে নাই, কিন্তু আর তাহারা নিষেধ মানিল না, বড় বড় ফোঁটায় চোখের কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপিয়া একটা কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে, তাহারই কোন একটা সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথে অস্তোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি রাঙা হইয়া আসিয়া

পড়িল প্রাচীর সংলগ্ন সেই শুষ্ক-প্রায় জাম গাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও মালতী লতার কুঞ্জ। সেদিন শুধু কুঁড়ি ধরিয়াছিল, ইহারই গুটিকয়েক আমাকে সে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কেবল কাঠপিঁপড়ার ভয়ে পারে নাই। আজ তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল, কতক ঝরিয়াছে তলায়, কত বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে আশেপাশে, ইহারই কতকগুলি কুড়াইয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তের শেষ দান মনে করিয়া।

নবীন বলিল, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বলিলাম, নবীন, বাইরের ঘরটা একবার খুলে দাও না দেখি।

নবীন ঘর খুলিয়া দিল। আজও রহিয়াছে সেই বিছানাটি তক্তপোষের একধারে গুটানো, একটি ছোট পেন্সিল, কয়েক টুকরা ছেঁড়া-কাগজ—এই ঘরে গহর সুর করিয়া শুনাইয়াছিল তাহার স্বরচিত কবিতা—বন্দিনী সীতার দুঃখের কাহিনী। এই গৃহে কতবার আসিয়াছি, কতদিন খাইয়াছি, শুইয়াছি, উপদ্রব করিয়া গিয়াছি, সেদিন হাসিমুখে যাহারা আসিয়াছিল আজ তাহাদের কেহ জীবিত নাই। আজ সমস্ত আসা-যাওয়া শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে নবীনের মুখে শুনিলাম এমনি একটি ছোট নোটের পুঁটুলি তাহার ছেলেদের হাতেও গহর দিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট সম্পত্তি যাহা যাহা রহিল পাইবে তাহারা মামাতো ভাই-বোনেরা, এবং তাহার পিতার নির্ম্মিত একটি মসজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম মস্ত ভীড়। গুরুদেবের শিষ্য-শিষ্যা অনেক সঙ্গে আসিয়াছে, বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, এবং হাতভাবে তাহাদের শীঘ্র বিদায় হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈষ্ণবসেবাদি বিধিমতেই চলিতেছে অনুমান করিলাম।

দ্বারিকাদাস আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমার

আগমনের হেতু তিনি জানেন। গহরের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মুখে কেমন যেন একটা বিব্রত, উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই। আন্দাজ করিলাম হয়ত এতদিন ধরিয়া এতগুলি বৈষ্ণব পরিচর্য্যায় তিনি ক্লান্ত, বিপর্য্যস্ত; নিশ্চিন্ত হইয়া আলাপ করিবার সময় নাই।

খবর পাইয়া পদ্মা আসিল, আজ তাহার মুখেও হাসি নাই, যেন সঙ্কুচিত—পলাইতে পারিলে বাঁচে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতাদিদি বড় ব্যস্ত, না পদ্মা ?

না, ডেকে দেবো দিদিকে ?—বলিয়াই চলিয়া গেল। এ সমস্তই আজ অমন অপ্রত্যাশিত, খাপছাড়া যে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একটু পরে কমললতা আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, এস গোঁসাই, আমার ঘরে গিয়ে বসবে চলো।

আমার বিছানা প্রভৃতি ষ্টেশনে রাখিয়া শুধু ব্যাগটাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, আর ছিল গহরের সেই বাক্সটা আমার চাকরের মাথায়। কমললতার ঘরে আসিয়া সেগুলো তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, একটু সাবধানে রেখে দাও, বাক্সটায় অনেকগুলো টাকা আছে।

কমললতা বলিল, জানি। তারপরে খাটের নীচে সেগুলো রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা খাওয়া হয় নি বোধ হয় ?

না।

কখন এলো ?

বিকেলবেলা।

যাই, তৈরী করে আনি গে, বলিয়া চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া গেল।

পদ্মা মুখ-হাত ধোয়ার জল দিয়া চলিয়া গেল, দাঁড়াইল না।

আমার মনে হইল, ব্যাপার কি!

খানিক পরে কমললতা চা লইয়া আসিল, আর কিছু ফল-মূল-

মিষ্টান্ন ও-বেলার ঠাকুরের প্রসাদ। বহুক্ষণ অভুক্ত—অবিলম্বে বসিয়া গেলাম।

অনতিবিলম্বে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের শব্দ আসিয়া পৌঁছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, কই তুমি গেলে না?

না, আমার বারণ।

বারণ? তোমার? তার মানে?

কমললতা ম্লান হাসিয়া কহিল, বারণ মানে বারণ গোঁসাই। অর্থাৎ ঠাকুরঘরে যাওয়া আমার নিষেধ।

আহারে রুচি চলিয়া গেল—বারণ করলে কে?

বড়গোঁসাইজীর গুরুদেব। আর যাঁরা সঙ্গে এসেছেন—তাঁরা।

কি বলেন তাঁরা?

বলেন আমি অশুচি, আমার সেবায় ঠাকুর কলুষিত হন।

অশুচি তুমি? বিদ্যুদ্বেগে একটা কথা মনে জাগিল—সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

হ্যাঁ, তাই।

কিছুই জানি না, তবুও অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম, এ মিথ্যে—এ অসম্ভব!

অসম্ভব কেন গোঁসাই?

তা জানি না কমললতা, কিন্তু এত বড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয় মানুষের সমাজে এ তোমার মৃত্যু-পথযাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার!

তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ নেই। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাঁর কাছে ত ভয় ছিল না, ছিল শুধু তোমাকে? আজ আমি নির্ভর হয়ে বাঁচলুম, গোঁসাই।

সংসারে এত লোকের মাঝে তোমার ভয় ছিল শুধু আমাকে? আর কাউকে নয়?

না—আর কাউকে না। শুধু তোমাকে।

ইহার পরে দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোঁসাইজী কি বলেন?

কমললতা কহিল, তাঁর ত কোন উপায় নেই। নইলে কোন বৈষ্ণবই যে এ মঠে আর আসবে না। একটু পরে বলিল, এখানে থাকা চলবে না, একদিন আমাকে যেতে হবে তা জানতুম, শুধু এমনি করে যে যেতে হবে তা ভাবি নি গোঁসাই। কেবল কষ্ট হয় পদ্মার কথা মনে করে। ছেলেমানুষ, তার কোথাও কেউ নেই—বড়-গোঁসাই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাকে নবদ্বীপে, দিদি চলে গেলে যে বড্ড কাঁদবে। যদি পারো তাকে একটু দেখো। এখানে থাকতে যদি না চায় আমার নাম তাকে করে রাজুকে দিয়ে দিও—ওর যা ভালো সে তা করবেই করবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই টাকাগুলো কি হবে?

না। আমি ভিখারী, টাকা নিয়ে কি করবো বলো ত?

তবু যদি কখনো কাজে লাগে—

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, টাকা আমারো ত একদিন অনেক ছিল গো, কি কাজে লাগলো? তবু যদি কখনো দরকার হয় তুমি আছো কি করতে? তখন তোমার কাছে চেয়ে নেবো—অপরের টাকা নিতে যাবো কেন?

এ কথায় কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে পুনশ্চ কহিল, না গোঁসাই, আমার টাকা চাই নে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেচি, তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনিই পূর্ণ করে দেবেন। লক্ষ্মীটি, আমার জন্যে ভেবো না।

পদ্মা ঘরে আসিয়া বলিল, নতুনগোঁসাইয়ের জন্যে প্রসাদ কি এ ঘরেই আনবো দিদি?

হাঁ, এখানেই নিয়ে এসো। চাকরটিকে দিলে?

হাঁ, দিয়েছি।

তবু পদ্মা যায় না, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি খাবে না, দিদি?

খাবো রে পোড়ারমুখী, খাবো। তুই যখন আছিস তখন না খেয়ে কি দিদির নিস্তার আছে?

পদ্মা চলিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া কমললতাকে দেখিতে পাইলাম না পদ্মার মুখে শুনিলাম সে বিকালে আসে। সারাদিন কোথায় থাকে কেহ জানে না। তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া কেবলি ভয় হইতে লাগিল, পাছে সে চলিয়া গিয়া থাকে, আর দেখা না হয়।

বড়গোঁসাইজীর ঘরে গেলাম। খাতাগুলি রাখিয়া বলিলাম, গহরের রামায়ণ। তার ইচ্ছে এগুলি মঠে থাকে।

দ্বারিকাদাস হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তাই হবে নতুনগোঁসাই। যেখানে মঠের সব গ্রন্থ থাকে তার সঙ্গেই এটি তুলে রাখবে।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলাম, তার সম্বন্ধে কমললতার অপবাদ তুমি বিশ্বাস করো গোঁসাই?

দ্বারিকাদাস মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমি? কখ্খনো না।

তবু ত তাকে চলে যেতে হচ্চে?

আমাকেও যেতে হবে গোঁসাই। নির্দ্দোষকে দূর করে যদি নিজে থাকি, তবে মিথ্যেই এ পথে এসেছিলাম, মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম নিয়েছি।

তবে কেনই বা তাকে যেতে হবে? মঠের কর্ত্তা ত তুমি—তুমি ত তাকে রাখতে পারো?

গুরু! গুরু! গুরু! বলিয়া দ্বারিকাদাস অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। বুঝিলাম গুরুর আদেশ—ইহার অন্যথা নাই।

আজ আমি চলে যাচ্চি গোঁসাই, বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিবার কালে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, দেখি, চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমাকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও প্রতিনমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে অপরাহ্ণ-বেলা সায়াহ্নে গড়াইয়া পড়িল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল, কিন্তু কমললতার দেখা নাই। নবীনের লোক আসিয়া উপস্থিত আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে, ব্যাগ মাথায় লইয়া কিষণ ছটফট করিতেছে—সময় আর নাই—কিন্তু কমললতার ফিরিল না। পদ্মার বিশ্বাস সে আর একটু পরেই আসিবে, কিন্তু আমার সন্দেহ ক্রমশঃ প্রত্যয়ে দাঁড়াইল—সে আসিবে না। শেষ বিদায়ের কঠোর পরীক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া সে পূর্ব্বাহ্ণেই পলায়ন করিয়াছে, দ্বিতীয় বস্ত্রটুকুও সঙ্গে লয় নাই। কাল আত্মপরিচয় দিয়াছিল ভিক্ষুক বৈরাগিণী বলিয়া, আজ সেই পরিচয়ই সে অক্ষুণ্ণ রাখিল।

যাবার সময় পদ্মা কাঁদিতে লাগিল। আমার ঠিকানা দিয়া বলিলাম, দিদি বলেছে আমাকে চিঠি লিখিতে—তোমার যা ইচ্ছে তাই আমাকে লিখে জানিও পদ্মা।

কিন্তু আমি ত ভাল লিখতে জানি নে, গোঁসাই।

তুমি যা লিখবে আমি তাই পড়ে নেবো।

দিদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

আবার দেখা হবে পদ্মা, আজ আমি যাই, বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

চোদ্দ

সমস্ত পথ চোখ যাহাকে অন্ধকারেও খুঁজিতেছিল, তাহার দেখা পাইলাম রেলওয়ে ষ্টেশনে। লোকের ভীড় হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল, একখানি টিকিট কিনে দিতে হবে গোঁসাই—

সত্যিই তবে সকলকে ছেড়ে চল্‌লে ?

এ ছাড়া ত আর উপায় নেই।

কষ্ট হয় না, কমললতা ?

এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করো গোঁসাই, জানো ত সব।

কোথায় যাবে

যাবো বৃন্দাবনে ; কিন্তু অতো দূরের টিকিট চাই নে—তুমি কাছাকাছি কোন-একটা জায়গার কিনে দাও।

অর্থাৎ আমার ঋণ যত কম হয়। তারপর স্থরু হবে পরের কাছে ভিক্ষে, যতদিন না পথ শেষ হয়। এই ত ?

ভিক্ষে কি এই প্রথম স্থরু হবে গোঁসাই ? আর কি কখনো করি নি ?

চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার পানে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, দাও বৃন্দাবনেরই টিকিট কিনে।

তবে চলো একসঙ্গে যাই ?

তোমারো কি ঐ এক পথ নাকি ?

বলিলাম, না, এক নয়, তবু যতটুকু এক করে নিতে পারি।

গাড়ী আসিলে দুজনে উঠিয়া বসিলাম। পাশের বেঞ্চে নিজের হাতে তাহার বিছানা করিয়া দিলাম।

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ও কি করচো গোঁসাই ?

করচি যা কখনো কারো জন্যে করি নি—চিরদিন মনে থাকবে বলে।

সত্যিই কি মনে রাখতে চাও ?

সত্যিই মনে রাখতে চাই, কমললতা। তুমি ছাড়া সে কথা আর কেউ জানবে না।

কিন্তু আমার যে অপরাধ হবে, গোঁসাই ?

না, অপরাধ হবে না—তুমি স্বচ্ছন্দে বসো।

কমললতা বসিল, কিন্তু বড় সঙ্কোচের সহিত। গাড়ী চলিতে লাগিল কত গ্রাম, কত নগর, কত প্রান্তর পার হইয়া—অদূরে বসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার জাবনের কত কাহিনীই বলিতে লাগিল। তাহার পথে বেড়ানোর কথা, তাহার মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড বাসের কথা, কত তীর্থ ভ্রমণের গল্প, শেষে দ্বারিকাদাসের আশ্রমে মুরারিপুর আশ্রমে আসা। আমার মনে পড়িয়া গেল ঐ লোকটির বিদায়কালের কথাগুলি, বলিলাম, জানো কমললতা, বড়গোঁসাই তোমার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না।

করেন না ?

একেবারে না। আমার আসবার সময়ে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগলো, বললেন, নির্দ্দোষকে দূর করে যদি নিজে থাকি নতুনগোঁসাই, মিথ্যে তাঁর নাম নেওয়া, মিথ্যে আমার এ পথে আসা। মঠ তিনিও থাকবেন না কমললতা, এমন নিষ্পাপ মধুর আশ্রমটি একেবারে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে।

না, যাবে না, একটা কোন পথ ঠাকুর নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন।

যদি কখনো তোমার ডাক পড়ে, ফিরে যাবে সেখানে ?

না।

তাঁরা যদি অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে ফিরে চান ?

তবুও না।

একটু পরে কি ভাবিয়া কহিল, শুধু যাবো যদি তুমি যেতে বলো। আর কারো কথায় না।

কিন্তু কোথায় তোমার দেখা পাবো ?

এ প্রশ্নের উত্তর সে দিল না, চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে ডাকিলাম, কমললতার সাড়া আসিল না, চাহিয়া দেখিলাম সে গাড়ীর এককোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুঁজিয়াছে। সারাদিনের শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইল না। তারপরে নিজেও যে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। হঠাৎ একসময়ে কানে গেল—নতুনগোঁসাই ?

চাহিয়া দেখি সে আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে। কহিল, ওঠো, তোমার সাঁইথিয়ায় গাড়ী দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, পাশের কামরায় কিষণ ছিল, ডাকিয়া তুলিতে সে আসিয়া ব্যাগ নামাইল, বিছানা বাঁধিতে গিয়া দেখা গেল যে দু-একখানায় তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম, সে তাহা ইতিপূর্ব্বেই ভাঁজ করিয়া আমার বেঞ্চের একধারে রাখিয়াছে। কহিলাম, এটুকুও তুমি ফিরিয়ে দিলে—নিলে না ?

কতবার ওঠানামা করতে হবে, এ বোঝা বইবে কে ?

দ্বিতীয় বস্ত্রটিও সঙ্গে আনো নি—সেও কি বোঝা ? দেবো দু-একটা বা'র করে ?

বেশ যা হোক তুমি। তোমার কাপড় ভিখারীর গায়ে মানাবে কেন ?

বলিলাম, কাপড় মানাবে না কিন্তু ভিখারীকেও খেতে হয়। পোঁছতে আরও দুদিন লাগবে, গাড়ীতে খাবে কি ? যে খাবারগুলো আমার সঙ্গে আছে তাও কি ফেলে দিয়ে যাবো—তুমি ছোঁবে না ?

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, ইস্, রাগ গ্যাখো ! ওগো, ছোঁব গো ছোঁব ; থাক ও সব, তুমি চলে গেলে আমি পেট ভরে গিলবো।

সময় শেষ হইতেছে, আমার নামিবার মুখে কহিল, একটু দাঁড়াও ত গোঁসাই, কেউ নেই, আজ লুকিয়ে তোমায় একটা প্রণাম করে নিই। বলিয়া হেঁট হইয়া আজ সে আমার পায়ের ধূলা লইল।

প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখনো পোহায় নাই। নীচে ও উপরের অন্ধকার স্তরে একটা ভাগাভাগি সুরু হইয়াছে, আকাশের একপ্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ পূর্ণশশী, অপর প্রান্তে উষার আগমনী। সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এমনি সময়ে তাহার সাথী হইয়াছিলাম। আর্ আজ?

বাঁশী বাজাইয়া সবুজ আলোর লণ্ঠন নাড়িয়া গার্ডসাহেব যাত্রার সঙ্কেত করিল। কমললতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কণ্ঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া, বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাই নি—আজ একটি কথা রাখবে?

হাঁ, রাখবো, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বলিতে তাহার একমুহূর্ত্ত বাধিল, তারপর কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ করো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার বলে আর তোমাকে অসম্মান করবো না।

হাত ছাড়িয়া দিলাম, গাড়ী দূর হইতে দূরে চলিল, গবাক্ষপথে তাহার আনত মুখের 'পরে ষ্টেশনের সারি সারি আলো কয়েকবার আসিয়া পড়িয়া আবার সমস্ত অন্ধকারে মিলাইল। শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।

